তীর্থংকর

রোলাঁ গান্ধি রাসেল রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ

ও

দিলীপ সংবাদ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নব সংস্করণের ভূমিকা

তীর্থংকর ইতিপূর্বে তিনটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। এই নব সংস্করণে দু'একটি কথা বলতে চাই।

এ-বইটি আমার বড় প্রিয় বই আরো এইজন্যে যে আমার জীবনের একটি মহৎ অভীপ্সা ফুটে উঠেছে শুধু যে তীর্থংকর পাঁচটি মহাজনের চিত্রণে তাই নয়, ফুটে উঠেছে তাঁদেরই কথালাপের মাধ্যমে। এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। এঁদের মধ্যে শেষ মহাজন মহাপ্রয়াণ করেছেন মাত্র তিন-চার বৎসর আগে—বার্ট্রাণ্ড রাসেল। আমার নিয়তি আমাকে নানাদিকে ছুটিয়েছে। কখনো বা ব্যর্থতার অভিমুখে। কিন্তু একটি মস্ত ক্ষতিপূরণ মিলেছে মহাজনদের সংস্পর্শে। না, ক্ষতিপূরণ ব'লে থেমে গেলে খুব কমই বলা হবে। আমি বলতে চাই—আমার জীবনে নানা দুরাশাই হাজারো বিফলতার মধ্যে দিয়ে আলোপদ্মের মতন প্রস্ফুটিত হয়েছে মহানুভব দ্রষ্টা ঋষি কবি কর্মী দার্শনিকের আশীর্বাদে। শুধু চলতি আশীর্বাদ নয়—স্নেহোচ্ছল সম্ভাষণ। এই পাঁচজনের—আরো কয়েকটি মহাপুরুষের কাছে আমি গিয়েছিলাম সত্যিই নম্রশীর্ষ হ'য়ে প্রণাম ক'রে তাঁদের কাছে জ্ঞানের সম্পদ, কর্মের প্রেরণা, প্রেমের পাথেয় পেতে। যত দিন যায় ততই যেন আমি শুনি তাঁদের নানা বিচিত্র কথালাপের ঝঙ্কারের মাধ্যমে নীলাকাশের আয় আয় ডাক। উপমাটি মুরলীধরের বাঁশির সুরকে মনে করিয়ে দেয়। আমার প্রাণলোকে এ উপমা সত্য—কবিত্বের অত্যুক্তি নয়। আমি মহাজনদের কাছে বৈদিক শিষ্যদের মতনই সমিৎপাণি হয়ে গিয়েছিলাম প্রাণের টানে। অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—আমি জ্ঞানের পাথেয় পেতে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে স্নেহের বর পেলাম কেমন ক'রে! এর একটিমাত্র উত্তর আছে: আমি তাঁদের সত্যই ভালোবেসেছিলাম ব'লে। প্রাণেই প্রাণ জাগে, প্রেমেই প্রেম। এ-কাড়াকাড়ি হানাহানি দলাদলি দ্বেষাদ্বেষির জগতে এখনো যে মানুষ আনন্দ পায়, তার একটি মুখ্য কারণ—আমার মনে হয়—মহাজনরা এ-জগতে আজও নেমে আসেন। এ হিরো-ওয়ার্শিপ নয়—নিছক সত্য কথন—কোদালকে কোদাল ব'লে বাস্তববাদী হওয়া নয়, তারাকে তারা ব'লে চিনে আনন্দবাদী ভালোবাসা। ভগবান সর্বত্রই বিরাজ করেন, কিন্তু "ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা" বলতেন পরমহংসদেব। আমি "ভক্তের" সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই "মহাজনের"—কারণ তাঁদের

মধ্যে দিয়েই পূর্ণিমা প্রকাশ হয় মহত্বের। তাই তাঁদের প্রত্যেককে লক্ষ্য ক'রে বলা চলে :

নয় এ-জীবন মায়াকানন, আনন্দ নয় ভ্রান্তি :
তুমি আছ তাই ব্যথায়ও বিছায় গভীর শান্তি।
অশ্রুমেঘও তোমায় চিনি'
হয় পলকে সৌদামিনী
তোমার উষায় নিশার বুকেও জাগে সোনার কান্তি
বাধাও সোপান হয় বিকাশের, দুঃখে নামে শান্তি।

ইতি। শ্রাবণস্য প্রথম দিবসে, ১৩৮২

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তীর্থংকর লিখেছিলাম নিছক মনের আনন্দে। তখন একবারও ভাবিনি এ লেখা এত আদর পাবে—শুধু বাংলায় নয়—বাংলার বাইরেও। এর গুজরাতি অনুবাদ "তীর্থসলিল"-এর অনুবাদক নগীনদাস পারেখকে এজন্যে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। সম্ভবত বইটির ইংরাজি তর্জমাও শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে।

বইটি ভারতের নানা সভায় আদর পেয়েছে ব'লেই দায়িত্বও বাড়ল। এ-সংস্করণে অনেক কিছু নতুন জিনিষ রইল : এক, রোলাঁর কয়েকটি চিঠি। দুই, রাসেলের সম্বন্ধেও কিছু নতুন কথা। তিন, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণে তাঁর আস্তিক রূপের সম্বন্ধে কিছু দেওয়া হ'ল সব শেষে। চার, শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি নতুন চিঠি। শ্রীঅরবিন্দের চিঠিগুলির বাংলা তর্জমাও দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তবে তাতে করে বইটির কায়া অত্যধিক পুষ্টিলাভ করবে ভেবেই বিরত হ'লাম। একেই অনেক পৃষ্ঠা বেড়ে গেছে।

আর, বইখানির ভাষা আদ্যন্ত বহু যত্নে পরিমার্জিত করবার চেষ্টা করেছি। বাংলা ভাষার অদ্ভুত প্রাণশক্তি : প্রতি দিনেই এর গতি মেজাজ ও রূপ বদলাচ্ছে প্রকাশশক্তিও বাড়ছে। রাসেলের **Freeman's Worship**-এর

কিয়দংশের কাব্যানুবাদ করতে গিয়ে একথা যেন ফের নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছি।

"তীর্থংকর" নামটি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি। আমাকে কয়েকটি জৈন ভদ্রলোক জানিয়েছেন যে "তীর্থংকর" নাম দেওয়া চলে না শুধু খ্যাতিমানকে—তার জন্যে চাই অন্য—ভাগবতী সিদ্ধি। আমার বক্তব্য এই যে, "তীর্থংকর" নামটি আমি "তীর্থ যে করে সে" এই অর্থেই নিয়েছিলাম—বইটির বর্ণিত মানুষগুলিকে তীর্থংকর উপাধি দেবার উদ্দেশ্য ছিল না। নামটি দ্বিতীয় সংস্করণে বদ্‌লে দিয়ে "তীর্থযাত্রী" করতে পারতাম, কিন্তু তীর্থংকর নামটির মধ্যে যে সাঙ্গীতিক ধ্বনি আছে তাকে ছাড়তে মন রাজি হ'ল না কিছুতে। এজন্যে জৈন বন্ধুদের কাছে করযোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি। অনুরোধ রইল তাঁরা যেন বিশ্বাস করেন আমার কথা: কারণ এ ওকালতি বা ওজর নয়। একটি পুরানো শব্দকে নতুন অর্থে ব্যবহার করা অশাস্ত্রীয় নয়—ভাষার শক্তি বাড়ানোর এ একটি সর্বগ্রাহ্য কুলীন রীতি। ইতি—

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

শ্রীদিলীপকুমার রায়
বৈশাখ ১৩৫১, এপ্রিল ১৯৪৪

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমার বয়স তখন তের। নির্মলদা' দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পড়তে। পড়তে না পড়তে বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ওলট-পালট হ'য়ে গেল। কিন্তু তবু থেকে থেকে প্রশ্ন জাগত—শ্রীম যা যা লিখেছিলেন ঠাকুর সত্যি সত্যি তাই বলেছিলেন তো, না এর মধ্যে অনেক কিছু বানানো? নির্মলদা' শুনে বললেন: "ছি ছিঃ, এমন সন্দেহ করতে আছে? শ্রীম পরম ভক্ত—সত্যনিষ্ঠ সাধুপুরুষ। তার উপর অসামান্য তাঁর স্মৃতিশক্তি। ঠাকুরের কথা তিনি যেমন যেমন শুনতেন তেম্‌নি তেম্‌নি টুকে রাখতেন তাঁর ডায়ারিতে—প্রত্যহ।" তবু মন মানে না। দেখিই না। শেষে হঠাৎ গেলাম তাঁর ওখানে একদিন সকালে। তিনি আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতেন একটি দোতলা বাড়িতে—আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

বেশ মনে পড়ে সেই অবিস্মরণীয় সকালটির কথা যেদিন আমি প্রথম দেখি শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে। সে কি ভুলবার? সেই সুন্দর কান্তি: গৌরবর্ণ, শ্বেতশ্মশ্রু,

আয়ত ভাবে-ভরা নয়ন, প্রেমাশ্রুজলে যেন সর্বদাই চিক চিক করছে। স্বরও কী স্নিগ্ধ! "মহাপুরুষ!"—বলল আমার উচ্ছ্বাসী বালক-মন।

তিনি কোমল কণ্ঠে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম পিতৃদেবের নাম।

"অ্যাঁ! তুমি ডি এল রায়ের ছেলে?" বললেন তিনি সাগ্রহে। "ধন্য ধন্য। এসো বাবা, বোসো—না এখানে—বোসো কাছ ঘেঁসে। এসো।"

সলজ্জে বসলাম তাঁর তক্তাপোষে তাঁর পাশে। আমার মাথায় কপালে গালে হাত বুলিয়ে তাঁর সে কত আদর! আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইলাম। তিনি খানিক স্নেহনেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইলেন তারপর বললেনঃ "তা বাবা, আমার কাছে কেন এলে বলো তো?"

আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে ব'ললামঃ ঠাকুরের কথা শুনতে—আর যদি আপনি দয়া ক'রে দেখান তবে আপনার ডায়রিগুলি দেখতে যাতে ঠাকুরের কথা লেখা আছে।

তাঁর গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেনঃ "প্রভাস! ও প্রভাস! শোন্ শোন্, ছুটে আয়। দেখরে দেখ্—এ-দুধের ছেলে আমার কাছে এসেছে কিনা ঠাকুরের কথা শুনতে! কী কাণ্ড!" ব'লেই আমার দিকে ফিরেঃ "দেখ দেখ, বাবা! দেখ্, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!"

তাকিয়ে আমি বিস্ময়ে নির্বাক্! সত্যিই তো ওঁর দেহ কাঁপছে, আনন্দের বেগে, হাতের প্রতি রোম খাড়া হ'য়ে উঠেছে, চোখে জল! স্তম্ভিত হ'য়ে ভাবতে লাগলাম—"কী গুরুভক্তি। আহা, যদি আমার কখনো গুরুলাভ হয় এমন ভক্তি কি আমার হবে? ভিতর থেকে কে ধম্‌কে উঠলঃ "দূর! ভক্তি এত সোজা নাকি? না, চেষ্টা ক'রে হয়? ভক্তি হল জন্মসিদ্ধ। তাছাড়া তোর হবে ভক্তি—যার মন সন্দেহে তর্কে অবিশ্বাসে ভরা!"

মনটা ম্লান হ'য়ে গেল—চোখে জল আসে আর কি—এমন সময়ে চমক ভাঙলঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ আমার কোলে সন্তর্পণে রাখলেন তাঁর গুরুর কথামৃত—মানে ডায়রি। মরক্কো বাঁধাই, ঝকঝক করছে বাইরে—আর ভিতরেঃ অমৃতও বটে রত্নও বটে—যে কত অন্ধকার জীবনকে দিয়েছে আলো, তপ্ত প্রাণকে দিয়েছে অশোক সান্ত্বনা!

প্রণাম করলাম জগতের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবনীকারকে।

তিনি বললেনঃ "রোসো বাবা। তোমাকে একটি কথা বলি? রাখবে?

"কথা!" আমি বাঙ্মূঢ় হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম।

"শোনো বাবা! ধন্য তুমি এমন পিতা পেয়েছ। আমাকে কথা দাও তুমি তোমার পিতৃদেবের কথাবার্তা টুকে রাখবে—টুকরো কথা, রসাল কথা, ভাবের কথা—যা কিছু তোমার মনে হবে যত্ন করে রাখবার ম'ত। কেমন?"

আমি যন্ত্রবৎ মাথা নেড়ে জানালাম—আচ্ছা। তিনি বললেন: "আর শুধু তোমার বাবারই বা কেন বলছি? যখনি তুমি কোন মহাপুরুষের কথা শুনবে—টুকে রাখবে যা কিছু তোমার মনে ধরবে, কেমন বাবা?"

স্নেহ যেন ঝরছিল তাঁর কণ্ঠে। আমি জানি না কেন তিনি আচম্‌কা এহেন অদ্ভুত উপরোধ করলেন—একটি তের বছরের বালককে। হিরো-ওয়ার্শিপ যাদের স্বধর্ম তারা পরস্পরকে দেখতে না দেখতে চিনতে পারে নাকি? বলতে পারি না। শুধু এইটুকু আমি বলতে পারি যে, তাঁর উপদেশ আমি ভুলি নি। দুঃখের বিষয়, পিতৃদেবের কিছু কিছু বাণী যা যা আমি একটি মরক্কো বাঁধানো খাতায় টুকে রেখেছিলাম—সে-খাতাটি তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পরে হারিয়ে যায়। কিন্তু তার পরে যত্ন ক'রে লিখে রেখেছি নানা সজ্জনের, মহাপুরুষের কথা বাণী ভাব চিন্তা—অবশ্য যতটা পেরেছি আমার স্মৃতিশক্তির জোরে।

তীর্থংকরের আদিম প্রেরণার কথা এতদিন বলি নি কেন না তীর্থংকরের এত আদর হবে আমি মনে করি নি সত্যিই। তাই এ-ভূমিকাটি তীর্থংকরের আমেরিকান সংস্করণের ভূমিকা থেকে তর্জমা ক'রে দিলাম। ইতি—

শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি

জানুয়ারি, ১৯৫০

To avoid the company of fools,
To be in communion with the sages,
To render honour to that which merits honour,
is a great blessedness.

MAHAMANGALA SUTTA

মূর্খ-সঙ্গ বর্জন করি'
চির-বরেণ্য তর্পণ করি···

—মহামঙ্গল সুত্ত

He who knows how to find instructor for himself arrives at the supreme mastery ··· ···
He who loves to ask extends knowledge...
But whoever considers only his personal opinion becomes constantly narrower than he was.

TSU KING

যে
দিশা চায় দুরাশায় জীবনপথে
সে
ধূলিকায় তারা পায় তীর্থ-ব্রতে।
যে
আপনার ঝঙ্কার গায় স্বরহীন
সে
আপনার কারাগার রচে দিন দিন।

—ৎসু কিং

মহাভারত ঃ

সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্বং বলবতাং শুচিঃ
সর্বং বলবতাং ধর্ম্যং সর্বং বলবতাং স্বকম্ ॥

(অনুশাসন পর্ব)

বলবানের পথ্য সবি হয়,
বলবানের অশুচি কি বা আছে ?
বলবানের ধর্ম অক্ষয়,
বলবানের সকলি ভবে সাজে।

রোমা রোলাঁ

(জন্ম—১৮৬৬)

উৎসর্গ

শ্রী জঁা এর্বেয়ার

(Jean Herbert)

আন্তর্জাতিক সংঘের প্রতিনিধি

বন্ধুবরেষু,

আঁধার যখন ঘিরে ছিল ঘন হ'য়ে,
সুষমার বাণী মনে হ'ত—শুধু ফাঁকি :
তুমি, ওগো গুণী, সাধিতে অপরাজয়ে
আলোকের সুর কালোর আড়ালে থাকি'

নববর্ষ, ১৩৫১ }

গুণমুগ্ধ
দিলীপ

Qui brisera les idoles ? Qui ouvrira les yeux à leurs sectateurs fanatiques ? Qui leur fera comprendre qu'aucun Dieu de leur esprit, religieux on laïque, n'a le droit de s'imposer par la force aux autres hommes, même s'il semble le meilleur, ni de les mépriser ?

ROMAIN ROLLAND

মিথ্যা প্রতিমা ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার আজ করিবে কা'রা ?
মায়া-উচ্ছ্বাসী অন্ধ মুগ্ধ বাসনাজালে
আজো যারা কাঁদে লক্ষ্যহারা
কে বলো তাদের শোনাবে মুক্তিগান সুন্দর দীপ্ততালে :
"নাহি হেন কোনো দেবতা
আচার-মন্ত্র-বারতা
বাহুবলে পারে করিতে যে অধিকার
বৈজয়ন্তী অন্তরমন্দির
অপমান করি' মানবের আত্মার
অচলায়তন রচিতে যে পারে অসহায় বন্দীর।"

রোমা রোলাঁ

Romain Rolland :

"La seule vraie morale, selon la vie vraie, serait une morale d'harmonie. Mais la société humaine n'a jamais connu jusqu'à présent qu'une morale d'oppression et de renoncement—tempérée par le mensonge".

Annette et Sylvie

"সত্য জীবনের কাছে একটিমাত্র সত্য নীতি আছে : সুষমার নীতি। কিন্তু মানবসমাজ আজ পর্যন্ত কেবল অত্যাচার ও ত্যাগকে মেনে এসেছে নীতি ব'লে —যদিও এ-নীতিকে সে মিথ্যার ময়ান দিয়ে খানিকটা মোলায়েম ক'রে নিয়েছে।"

রোলাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা ও চিঠিপত্র সুরু হয় ১৯১৯ সালে—ফরাসী ভাষায় সবই। প্রতিবার দেখা হ'লেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আমি তখনি তখনি বাংলায় টুকে রাখতাম। পরে এসব রিপোর্ট ইংরেজিতে তর্জমা ক'রে তাঁকে পাঠাই ১৯২৮ সালে, জুলাইয়ে। রোলাঁ আমার অনুরোধে অবিলম্বে এগুলি স্বহস্তে সংশোধন ক'রে প্রকাশ করবার অনুমতি দেন। সংশোধনগুলি তিনি করেন ফরাসী ভাষায়—এখানে দেওয়া হ'ল বাংলা তর্জমা। বলা বাহুল্য, তাঁর অনুপম সুন্দর ভাষা ও ব্যাখ্যার লালিত্য ও দীপ্তির অনেকখানিই খোয়া গেছে এ-তর্জমায়। তাঁর একটি চিঠির তর্জমা দেই গোড়াতেই—কেন না তাতে ক'রে খানিকটা বিশদ হবে তাঁর বক্তব্য ও ভাবধারা। এ-চিঠিটিও আমি তাঁকে পাঠাই ১৯৩০ সালের মে মাসে। তিনি সামান্যই বদল ক'রে আমাকে প্রকাশ করবার অনুমতি দেন।

ভিল্‌ন্যভ স্থইজর্লণ্ড

২৮-৮-১৯২৮

প্রিয় দিলীপকুমার,

যে-কথোপকথনগুলি তুমি আমাকে পাঠিয়েছিলে ফেরৎ পাঠাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার যে-কথোপকথন হয়েছিল সেটি কী সুন্দর।

তোমার রিপোর্টের স্থানে স্থানে আমি কিছু সংশোধন করেছি যেখানে যেখানে তুমি আমার বক্তব্য ঠিকমতন ধরতে পারো নি। আশা করি তুমি আমার করলিপিতে সংশোধনগুলি পড়তে পারবে।

আর একটু সুবোধ্য হবার জন্যে এ চিঠিতে আরো দুএকটা কথা বলা দরকার মনে করছি।

প্রথম কথা, টলস্টয়কে আমি টুর্গেনিভের বহু ঊর্ধ্বে মনে করি। শুধু আমি ব'লে নয়, খুব কম ফরাসিই এক নিশ্বাসে এদের দুজনের নাম করবেন—টলস্টয়, যাঁকে বলা চলে প্রকৃতির এক প্রকাণ্ড শক্তিপ্রপাত যিনি "যুদ্ধ ও শান্তি" উপন্যাসের স্রষ্টা, আর টুর্গেনিভ যাঁকে বলা যেতে পারে বড় জোর "চমৎকার শিল্পী"—এঁরা দুজনে আলাদা জগতের বাসিন্দা।

দ্বিতীয় কথা, প্রগতি সম্বন্ধে আমার ভাবধারাকে তুমি যেন একটু বেশি দুঃখ-বাদের রঙে রঙিয়ে তুলেছ। আমার ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে কিন্তু, যে আমি

পাশ্চাত্য হ'য়েও প্রগতির চল্‌তি বুলি বিনা চল্‌তে পারি—আর হিন্দু হ'য়েও কিনা এতে তোমাকে বাজে!

যাই হোক আমার বলার কথা এই যে, প্রগতি-তান্ত্রিক হওয়ার প্রয়োজন আমার নেই, কেন না আমার বিশ্বাস বর্তমানের মধ্যেই চিরন্তন সত্য স্পন্দিত। মুক্তি নেই কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে, রয়েছে সাক্ষাৎ বর্তমানের অন্তরে। আর প্রত্যেককেই খুঁজতে হবে তার নিজের মুক্তি নিজের চরম সিদ্ধি। নিখিল মানব বিধৃত রয়েছে প্রতি মানুষের মধ্যে ঠিক যেমন শাশ্বত চেতনা জ্বলছে প্রতি মুহূর্তের শিখায়। এই জন্যেই প্রগতির তর্ককে আমি খুব গুরুতর মনে করতে পারিনে।

আমার সন্দিগ্ধতা ও অবিশ্বাস তোমাকে বেজেছে কিন্তু খৃষ্টের অন্তিম মুহূর্তের কথাগুলি সম্বন্ধে আমার মন্তব্যে সান্দিগ্ধতা বা অবিশ্বাসের আমেজ কোথায়? ক্রুসে প্রাণত্যাগ করবার প্রাক্‌-মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন: "Eli, Eli, lama Sabac-tani?" *কি না "পিতা, পিতা, আমাকে তুমি কেন ত্যাগ করলে?"* খৃষ্টের এই মর্মান্তিক কান্না কল্পনায় যতবার শুনি ততবার আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করতে থাকে। এ-বেদনায় তুমি অবিশ্বাস বা সন্দিগ্ধতার ছোঁয়াচ পেলে কোথায়? এই আকাশের নিচে যত দুর্ঘটনা ঘটেছে খৃষ্টের নিরাশা বোধহয় তাদের মধ্যে সবার চেয়ে শোকাবহ। ভাবো তো, এহেন দেবতুল্য মানুষ, সাহসে অমর যার আত্মা, সে কি না মানুষের জন্যে নিজেকে বলি দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে তার নিজের বাণীমন্ত্রে আস্থা হারিয়ে বসল! হারালো কেন? কারণ মানুষের পরিবেশে যার আবির্ভাব তাকে মানুষের বেদনার গহ্বরে তো নামতেই হবে, মানুষের অবমাননা ও স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় তো পৌঁছতে হবে। জগতে এর চেয়ে ব্যথাবহ তথা মহিমময় দৃশ্য কি আর কিছু হ'তে পারে?

কিন্তু এজন্যে আমি তো এমন কিছু দেখতে পাইনে যার জন্যে বলব হার মেনেছি। জীবনসংগ্রাম থেকে নিরস্ত হবার কথা আমার মনেও হয় না।

বরঞ্চ উল্‌টো: আমার "বিশ্বাসের ট্রাজিডি" নাট্যাবলির প্রতি নায়ককে এবং আমার "মহৎ জীবনী" গুলির প্রতি চরিত্রকে জগতের চোখে পরাস্ত ছাড়া আর কী বলা যাবে? কিন্তু তবু তাদের ঐ একই বাণী:

"J'ai devancé la victoire, mais je vaincrai :"

জয় আসবে—আমার মৃত্যুর পরে—কী আসে যায়, যখন জানি যে আমার বিশ্বাস সত্য?

আমি অন্তত লিখি তাদেরি জন্যে যারা নিজেদেরকে আহুতি দিতে পারে

বেদনার, বিশ্বাসের অগ্নিহোত্রে—এমন কোনো বিশ্বাস যাকে তারা ভালোবাসে কিন্তু কোনো অলীক আশার মোহে নয়, কোনো আশু জয়ন্তীর জন্যেও নয়! আমি চাই তাদের যারা তাদের সমসাময়িকদের কতখানি হারিয়ে দিল সে মাপজোপ নিয়েও মাথা ঘামায় না।

মায়া-র প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ১৮৯৬ সালে যে প্রথম বক্তৃতা দেন সেটি পড়বে। জগতের দুঃখ নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার কী যে মেলে—তাঁর বীর্যসাধনার সঙ্গেও! য়ুরোপে চিরদিনই এই ভাবের একদল ভাবুক কাজ ক'রে এসেছে যদিও এদিক দিয়ে ভারত য়ুরোপকে অনেক সময়েই ভুল বুঝেছে, যেমন য়ুরোপও ভুল বুঝেছে ভারতকে।

তৃতীয় কথা, শিল্প সম্বন্ধে তোমার কথোপকথনেও আমি কিছু কলম চালিয়েছি দেখতে পাবে। এ বিষয়ে আরো একটু বলবার আছে।

অকৃত্রিম শিল্পীর জীবনকে আমার কখনই মনে হয় নি আত্মাভিমানী সুখের সাধনা। আমি যে জানি যে, য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সবাই (যেমন ধরো মাইকেল এঞ্জেলো, বীটোভ্‌ন্, রেমব্রাণ্ট) খৃষ্টের মতনই ছিলেন "Hommes de Doulcur" বেদনাসম্ভব। এমন কি, বোধ হয় এ-ও বলা চলে যে প্রকৃত প্রতিভাকে আগে যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা, সন্দেহ ও সর্বজনীন ভুল-বোঝার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে। টলস্টয় আরো বেশিদূর যেতেন: আমাকে তিনি যে-চিঠি লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন যে খাঁটি শিল্পীর সঙ্গে মেকি শিল্পীর তফাৎ এইখানেই। "Qu'ils doivent sacrifier ā leur foi, ā leur art leur bonheur terréstre"—অর্থাৎ শিল্পীকে তার বিশ্বাসের জন্যে, তার শিল্পের জন্যে ছাড়তে হবে ঐহিক সুখশান্তি। এই জন্যেই খাঁটি শিল্পীর জীবন বেশির ভাগ মানুষের কাছে দুঃসহ মনে হয়—সে-জীবনের মূল কথা যে ত্যাগ, হবে না? শিল্পীর উপজীব্য হ'ল তার আন্তর আনন্দ, তার সৃজনী প্রতিভা—এ নইলে কি সে এক মুহূর্তও বাঁচে?—শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে যে। ওথেলো দেখে শ্রীমতী মালহ্বিদার মন অতটা বিচলিত হয়েছিল ভাবতে তোমার আশ্চর্য লাগল, কিন্তু জানো কি সফোক্লিসের কঠোর বিয়োগনাট্য "ইডিপাস" দেখে এই হৃদয়হীন বিলাসী পারিসের দর্শকরা ঠিক অমনিই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল? বেদনা গভীর হ'তে হ'তে এমন একটা পরিণতি নেয় যখন সে তীব্র আনন্দ হ'য়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের প্রতি বড় কবিই একথা মানেন। কাজেই এ-ধরণের মিস্‌টিসিস্‌মকে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য বলা চলে না। এর সঙ্গে চাই শুধু সর্বগৌরবা সুষমা—যিনি মহৎ শিল্পের স্বভাব-সহচরী। বীটোভ্‌নের শেষ জীবনে তাঁর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত,

কিম্বা ধরো ওয়াগনারের পার্সিফালের দীর্ঘনিশ্বাস, আত্মার এই অসহ্য বেদনায় মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে। তবে যে-জীবন অপরের জন্যে নিজেকেও আহুতি দেয় তার গরিমার স্বর্গীয় তৃপ্তি হ'ল তাদের জন্যে যাদের আছে আরো গভীর অনুভব-সম্পদ। এ সব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মানুষ বেরিয়ে আসে যেমন আসে ইস্পাত আগুনের মধ্যে দিয়ে—এরই নাম তো পাবন-শুদ্ধি। আমাদের আত্মিক শক্তি সম্বন্ধে কোনো সংশয় রেখো না—এই শক্তিই যে সব বড় সৃষ্টির, সব বড় কর্মের মূলে। আমাদের সব আগে চাই এই শক্তি : একথা শুধু যে বীটোভ্‌ন্‌ বলেছিলেন তাই নয় বিবেকানন্দেরও ঐ বাণী। বিনা শক্তি কোনো বড কিছুই হবার জো নেই : শক্তি থাকলে নিস্তেজ সন্তান অসম্ভব।

সস্নেহে তোমার করপীড়ন করি। ইতি।

স্নেহাসক্ত

রোমা রোলাঁ

১৯২০ সালে জুলাই মাসে আমার রোলাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা; সুইজর্লণ্ডের ছবির মতন একটি গ্রামে—শূনেকে। সেবারে তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ কথাবার্তাই হয় হিন্দুসঙ্গীত নিয়ে। তিনি আমাকে শোনাতেন পিয়ানো, আমি তাঁকে শোনাতাম হিন্দুসঙ্গীত। হিন্দুসঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি কিছু জানতেন। বলতেন আমাকে যে, খুব ভালো লাগে তাঁর হিন্দুসঙ্গীতের বিকাশধারা। বলতেন যে, আমাদের সঙ্গীতের আদর য়ুরোপে হবেই হবে। তাই প্রায় আমাকে বলতেন আমাদের নানা গানের স্বরলিপি য়ুরোপে বিশদ ব্যাখ্যা সমেত প্রচার করতে। প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে খুব তর্ক বাধত। আমি বলতাম আমাদের সঙ্গীতের যথার্থ আদর য়ুরোপে হবার কথা নয়, কেন না আমাদের সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকলার জন্যে য়ুরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞদের কান তৈরিই নয়। তিনি আমাকে পরে ৩১-৭-২২ তারিখের একটি চিঠিতে লেখেন : "তোমার ও-মতের সঙ্গে আমার আদৌ সায় নেই যে, কোনো লোক হিন্দুসঙ্গীত (বা অন্য কোনো উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত) বুঝতে পারবে না যদি না সে ঐ সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ হয়। আমি মনে করি যে, শ্রেষ্ঠ শিল্প অনভিজ্ঞকেও স্পর্শ করবেই করবে। পুরোপুরি না হ'তে পারে, নিবিড়ভাবেও হয়ত নয়—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে একটা সত্য সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকবেই থাকবে যে, সব মানুষেরই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাবে—কমবেশি। 'এই নাও, এ যে আমার প্রাণের রক্ত, এতে যেন

সবাইয়ের ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটে'—বলেছিলেন খৃষ্ট সে কবে! বলবে কি—খৃষ্ট মরেছিলেন শুধু জনকয়েক খৃষ্টানকে খৃষ্টানির পাঠ দিতে? একজন মস্ত শিল্পী ব্যথা বইবে, স্বপ্ন দেখবে, সৃষ্টি করবে শুধু জনকয়েক দীক্ষিত শিষ্যের জন্যে—এই কি চাও তুমি? সত্য গানের আলো পড়ে মন্ত্রের মতন—যেখানে বিধাতা চান।—আমাদের কাজ নয় অধিকারী নির্বাচন: আমাদের কাজ—গান গেয়ে যাওয়া।"

অতুলপ্রসাদের বাউল মনে পড়ে:

মিছে তুই ভাবিস মন,
(তুই) গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন।
পাখিরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে
(ওরে) নাই বা যদি কেহ শোনে—(তুই) গেয়ে যা গান অকারণ।

তবু এখানে রোলাঁর সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া কঠিন। কারণ বড় শিল্পের রসবোধ খানিকটা নির্ভর করে বৈ কি গ্রহীতার গ্রহিষ্ণুতা ও সৌকুমার্যের উপর। মহৎ শিল্পের মহত্তম আবেদনটুকু বুঝতে হ'লে চেতনার খানিকটা বিকাশ তো চাই-ই। তবে রোলাঁর ও-কথা সত্য যে, স্রষ্টা সৃষ্টি করবে গ্রহীতার গ্রহণ-নিরপেক্ষ হ'য়ে—অধিকারী-বিচারের ভার তার নয়, তার কাজ নিজের প্রেরণাকে পূর্ণ মূর্তি দেওয়া। এ হ'ল লাখ কথার এক কথা। এ-সম্পর্কে রোলাঁর আরো কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন আমাকে: "যে-সুন্দর গানগুলি তুমি আমার কাছে গেয়েছিলে তাতে ক'রে আমি যেন আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম যে, তোমাদের ও আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে ব্যবধান কত কম—তোমরা যত বেশি মনে করো ততটা তো নয়ই। আমার মনে হয় যে তোমরা—তুমি, রবীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী—অনেক সময়েই এ-ব্যবধানকে একটু বেশি বড় ক'রে দেখ, য়ুরোপীয়দের পক্ষে তোমাদের গানে সাড়া দেওয়ার বাধাও তাই তোমাদের কাছে এমন দুর্লঙ্ঘ্য ঠেকে। য়ুরোপীয়দের সাঙ্গীতিক গ্রহিষ্ণুতাকে তোমরা বিচার করো ইংরাজ ও মার্কিনদের নমুনা দেখে—সঙ্গীতানুরাগীদের মধ্যে যাদের স্থান এ-জগতে সবার নিচে। যদি তুমি ফ্রান্স বা জর্মনির সঙ্গীতজ্ঞদের সংস্পর্শে আসতে—রুষদের তো কথাই নেই—তাহ'লে দেখতে পেতে তারা তোমাদের গানের সৌন্দর্যে কত সহজে সাড়া দেয়। একথা মানি যে, অনেক কিছুই তারা ধরতে পারবে না (যেমন একজন ফরাসী যতই শেক্ষপীয়র-ভক্ত হোক না কেন, তাঁকে সে-ভাবে বুঝতে পারবে না যে-ভাবে পারে ইংরাজ) কিন্তু তোমাদের সঙ্গীতের গভীর বিশ্বজনীন রসের আবেদন আমাদের কাছেও না থেকেই পারে না জেনো। এই আর্য-য়ুরোপীয় পরিবারের একই কুলজী—

এদের ঠাঁই ঠাঁই করার পাপ ধুয়ে মুছে যাক—এসো আমরা চেষ্টা করি ফের ভাই ভাই হ'তে—তাহ'লে সে-মিলন হবে দেবভোগ্য।"

১৯২২ সালের আগস্টে আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম সুইজর্লণ্ডের লুগানো সহরে "আন্তর্জাতিক নারীজাতির শান্তি ও স্বাধীনতা সঙ্ঘে" সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা দিতে তথা গান গাইতে।

সে-বক্তৃতায় আমি যা বলেছিলাম তার সার মর্ম এই যে, ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এযাবৎ হ'য়ে এসেছে রাগসঙ্গীতে—আর এ-সঙ্গীতে শিল্পী পদে পদে স্রষ্টা—তানে আলাপে চালে চলনে তিনি প্রতি ঠমকে রসসৃষ্টি করেন রাগ বজায় রেখে। এই সৃষ্টিতেই তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার সার্থকতা। সেই সঙ্গে প্রসঙ্গত আমি বলেছিলাম —পরে রোলাঁকে লিখেওছিলাম—যে, য়ুরোপীয় সঙ্গীতে হার্মনির বিকাশ হয়েছে অনেকটা মেলডির অঙ্গহানি ক'রে। তবে এর ক্ষতিপূরণ মিলেছে স্বরসঙ্গতিতে—হার্মনিতে।

একথার উত্তরে রোলাঁ আমাকে পরে লিখেছিলেন: "একথা তো মানতেই হবে যে যে-সঙ্গীতকলার ভিত্তি হার্মনি, তার মেলডিকে অনেকখানি ক্ষতি সইতেই হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে শুধু মেলডিই যার উপজীব্য তাকেও অনেকখানি আনন্দ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে হয়—কি না, স্বরসঙ্গতির আনন্দ। প্রতি শিল্পকে গোড়ায় একটা বাছাই ক'রে নিতেই হয় যার ফলে সে কিছু পায়—কিছু ছাড়ে। এ-চুক্তিতে যা সে ছাড়ল তার কাছে সেইটা চাওয়াই অসঙ্গত।"

রোলাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ১৯২২ আগস্টের ১৬ই ও ১৭ই তারিখে তাঁর সুইস কুটিরে। সে কথোপকথনের রিপোর্ট আমি তখনি লিখে রাখি। সে অনুলিপির সামান্যই সংশোধন করেছি এখানে:—

দুবৎসর বাদে রোলাঁর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে যা যা কথাবার্তা হ'ল লিখে রাখার জন্যে কলম তো ধরেছি। জানি হাজার সত্যনিষ্ঠ হবার চেষ্টা থাকলেও একজন কখনই আর একজনের ভাবধারা হুবহু ধরতে পারে না: নিজের মতন ক'রে নেয় তাকে। তবু যতটা পারি রোলাঁর মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে লিখে যাব—নিজের মতামতকে রাখব পিছনে। পারব কি না জানি না, তবে আদর্শটা মনের প্রদীপে জ্বালিয়ে রাখা ভালো সব সময়েই।

রোলাঁর মতামত ব্যাখ্যার আগে, যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, তাঁদের জন্যে এ-অসামান্য মানুষটির একটু বিবরণ দিই। য়ুরোপে অনেক খ্যাতনামা

সমালোচকের বিশ্বাস যে, মানবচরিত্রের বিকাশের ইতিহাসে রোলাঁর চরিত্র অতি অপরূপ। শুধু এত বড় সাহিত্যিক ব'লেই নয়, এত বড় হৃদয়ের সঙ্গে এতখানি বিদ্যা, ভাবুকতা ও সংস্কৃতির যোগাযোগ এ-জগতে বিরল। রোলাঁ সঙ্গীতের, চিত্রবিদ্যার ও ভাস্কর্যের একজন প্রথম শ্রেণীর সমজদার। পারিসে যখন "য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাস" সম্বন্ধে তিনি ক্লাসে বক্তৃতা দিতেন, শুনতে নানা স্থান থেকে শ্রোতা আসত। সঙ্গীতের এতবড় উদার সমালোচক জগতে খুবই কম। ইনি একজন উচ্চদরের পিয়ানিষ্ট। অনেকের বিশ্বাস যে, এযুগের একটি বড় উপন্যাস হচ্ছে এঁর বিশ্ববিশ্রুত 'জঁা ক্রিস্তফ'। কিন্তু রোলাঁ মানুষটি তাঁর লেখার চেয়ে অনেক বড়। শিল্পকলা, সেবা ও বিশ্বমানবের প্রতি উজ্জ্বল বিশ্বাসের এ-উদ্গাতাকে স্বদেশদ্রোহী অপবাদ পর্যন্ত সইতে হয়েছে, ছোটখাট নির্যাতনের তো কথাই নেই। কলাবিৎরা সচরাচর সংসার থেকে একটু দূরে থাকেন ব'লে অপবাদ আছে—এ-অপবাদের যে ভিত্তি নেই, এমন কথাও বলা চলে না। কিন্তু টলস্টয় যেমনভাবে এর সমাধান করতে চেষ্টা করেছিলেন—অর্থাৎ জীবন থেকে শিল্পকে আত্মসর্বস্ব ব'লে ছেঁটে দিয়ে —রোলাঁ সে পথ মাড়ান নি। তিনি জনহিত ও শিল্পচর্চা দুই-ই ক'রে এসেছেন বরাবর। যথা, নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকা রেড্ ক্রসের জন্য দান—যদিও তখন এঁর অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। শিল্প এঁর কাছে অপরিহার্য ছিল চিরদিনই। রোলাঁ লিখছেন :—

"J' aimais l'art avec passion ; depuis l'enfance je me nourrissais d'art, surtout de musique ; je n'aurais pu m'en passer ; je puis dire que la musique me semblait un aliment aussi indispensable à ma vie que le pain".

অর্থাৎ "আমি কলাকে ভালোবেসে এসেছি প্রাণমনের সমস্ত আবেগ দিয়ে। শৈশব থেকেই আমি কলার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে এসেছি—বিশেষত সঙ্গীত। এ-পাথেয় বিনা জীবন-পথে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'ত। এমন কি, আমি বলতে পারি যে, সঙ্গীত আমার কাছে আহারের চেয়ে কম অপরিহার্য ব'লে মনে হ'ত না।" রোলাঁর জীবন আমাদের দেশের লোকের জানা উচিত। সম্প্রতি এঁর অনেকগুলি জীবন-চরিত প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান লেখক ও মনীষী Stephan Zweig-এর জীবনীই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ। তিনি ভূমিকায় এক স্থানে যা লিখেছেন তার ভাবার্থ এই :—"রোলাঁর সঙ্গে পরিচয় কেবল যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ তা নয়, বহু মহত্তর লোকের ক্ষেত্রেও তাই। * * য়ুরোপে এ-যুগে যে কোনও

লোক এমন শুভ্র, ঋজু, পবিত্র সাধকের জীবন যাপন কর্তে পারে, এ একটা মস্ত আশার কথা।" প্রসঙ্গত মনে হ'ল, য়ুরোপের অপর মহাপ্রাণ মনীষী বার্টরাণ্ড রাসেলের কথা। তিনি আমাকে কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন "রোলাঁ! I admire him profoundly!"

রোলাঁ তাঁর পাঠাগারে ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত বইয়ের ফরাসি অনুবাদ দেখালেন। বললাম: "আপনি যে ভারতীয় দর্শনাদির খবর রাখেন এ বড় আনন্দের কথা—বিশেষত আমাদের কাছে—যেহেতু হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে লোকে বিশেষ কিছু জানে না, জানে কেবল বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে। কারণ হয়ত এই যে, হিন্দুধর্ম চিরকালই বহির্মুখ হ'তে নারাজ হ'য়ে এসেছে, বৌদ্ধধর্ম ছিল মিশনারি।"

রোলাঁ বললেন যে, ভারতীয় দর্শন, চিন্তা ও শিল্প তাঁর অত্যন্ত ভালো লাগে। ভারতীয়দের সংশ্রবও তাঁকে গভীর তৃপ্তি দেয়।

শিল্পীদের আত্মপরতা সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করতে বললেন: "কেন? শিল্পীকে কি অনেক সময়েই শিল্পের জন্য অনেক ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে দেখা যায় না?"

"কিন্তু জগতের দুঃখ-কষ্টের মাঝখানে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য ও অনাসক্তি কি অনেক সময়ে ভাববিলাসতার ও সৌখিনিয়ানার কোঠায় গিয়ে পড়ে না? মানুষের দুঃখ-, কষ্টে অনেক সময়েই সে সাড়া দেয় না—যেন দিতে পারে না ব'লেই নয় কি?"

রোলাঁ বললেন: "তুমি কি মনে করো জগতের দুঃখ-লাঘবে শিল্পীর সৃষ্টির মূল্য কম? আমি এক সময়ে গরিব ছিলাম, থিয়েটারে বহুদূরের গ্যালারিতে ছাড়া যেতে পারতাম না। তখন কি স্বচক্ষে দেখিনি—সমস্ত দিন শ্রমের পর শ্রান্ত, ক্লিষ্ট দীন-দুঃখীরা সঙ্গীতে কী নিবিড় আনন্দ পেয়ে থাকে? বীটোভ্নের একটা সিম্ফনির দাম একটা মস্ত সামাজিক সংস্কারের চেয়ে কি একটুও কম মনে করো তুমি? তাছাড়া, সমাজের উন্নত অবস্থায় শিল্পের যে দাম, মানুষের দুঃখ-কষ্টের বাহুল্যে শিল্পের দাম তার চেয়ে কোন মতেই কম নয়, বরং বেশি। কারণ, বহির্জগতে মানুষের দুঃখ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে অন্তর্জগতের সান্ত্বনার দামও যে বেড়ে ওঠে—নয় কি? একটা দৃষ্টান্ত দিই: জারের সময়ে রাজতন্ত্রের অমানুষিক অত্যাচারে রুষদের খেলনা, কারুশিল্প, লোকসঙ্গীত প্রভৃতির উৎস যেন আরও ফুটে উঠেছিল—লোপ পায় নি। কারণ, এ-সময়ে বাইরের চাপে মানুষের অদম্য আত্মা নিজের সৃষ্টি দিয়ে তার গুরুভার লাঘব করতে চাইত। তাছাড়া, একজন লোক তো জগতের সব কিছুর ভার নিতে পারে না। তুমি কিছু একা নাবিক বণিক কৃষকদের সব কাজ ক'রে সমাজের সব কিছুর চৌকিদারি করতে পারো না। শিল্পী যা পারে, সে কেবল তারই

ছাঁচে ঢালাই হয়েছে। বীটোভন্‌ যদি মানুষের দুঃখ-কষ্টের সমস্যায় ম্রিয়মাণ হয়ে আসতেন আমার মতামত জিজ্ঞাসা করতে, তাহ'লে আমি তাঁকে বলতাম: 'দোহাই তোমার, তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামিওনা। মানুষের জীবন ক্ষুদ্র। তোমার যা দেবার আছে দিয়ে যাও। আর, দেরি কোরো না, কারণ, তোমার আকস্মিক মরণে জগতের যা ক্ষতি হবে, সে ক্ষতি আর কাউকে দিয়েই পূর্ণ হবার নয়—তুমি যেটা পারবে তা আর কেউই পারবে না যে।' সব লোকের ক্ষেত্রেই একথা সমান খাটে।"

"কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে, শিল্পের চর্চা বিষয়ে গরীব-দুঃখীরও একটা বক্তব্য আছে? তারা যদি বলে—কেন তারা সমাজের এই বৈষম্যের ব্যবস্থায় সায় দেবে যার বিধানে কেবল জনকতক লোক এই শিল্পবিলাসে গা ঢেলে দেবে—বাকি সবাই উদয়াস্ত খেটে এদের সুখসুবিধার জোগান দেবে? তারা যদি বলে—তারা চায় সুবিচার—সমান সুযোগ?"

"অবশ্য। যে-সমাজের অত্যাচারে শত-শত প্রতিভা সুযোগ পুষ্টি ও অবসর অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে, সে-সমাজের একটা আমূল ঢেলে-সাজানো তারা দাবি করতে পারে বৈকি। আর সেজন্যে প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীই করুক না সহযোগ—কেবল তার সৃষ্টির কাজ ছেড়ে নয়। একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর—Carrière—বলতেন যে, সমাজের যে-কোনো অত্যাচার বা গ্লানি তাঁর সৌন্দর্যবোধকে আঘাত করে। কোনো বড় শিল্পী মানুষের এমন কোনো ব্যবস্থায় আহত বোধ না ক'রে থাকতে পারে না যার ভিত্তি হল বৈষম্য ও অবিচার। কারণ, তার সৃষ্টির প্রেরণা হচ্ছে ঐক্যের অনুভূতিতে—আর অবিচার ও অত্যাচারের মূল হ'ল অনৈক্য। তাই অবিচার, পীড়ন, নিষ্ঠুরতা এমন কুৎসিত ব'লেই তাকে না বেজে পারে না।"

"আপনার এ-কথাটি বড় ভালো লাগল মসিয়ে রোঁলা! মনে পড়ে য়েট্‌স্‌ তাঁর Rose in the Heart নামে অনুপম কবিতাটিতেও বলেছেন এই কথাই:

"All things uncomely and broken
all things worn-out and old;
The cry of a child by the roadway,
the creak of a lumbering cart,
The heavy steps of the ploughman
splashing the wintry mould;
Are wronging your image that blossoms
a rose in the deeps of my heart."

দীর্ণ যত কিছু শীর্ণ পাণ্ডুর, জীর্ণ জরাভারে যন্ত্রণায়,
ক্লান্ত শকটের আর্তনাদ, পথে শিশুর ক্রন্দন ব্যথা-উছল,
হলীর মন্থর চরণভারে যত পঙ্ক ধূলি ওঠে তুহিনকায়,
সকলি আবিলায় প্রতিমা তব—যাহা গহন প্রাণে ফোটে আলোকমল।

"য়েট্‌স্ ঠিকই বলেছেন—আমাদের নীতির মূলে সৌন্দর্যের প্রবর্তনা কত ভাবেই যে প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করছে একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। হয়েছে কি, ব্যাধি নিয়ে তো মতভেদ নেই—কিন্তু শিল্পীকে এজন্যে কী চিকিৎসা করতে বলো তুমি? প্রত্যেক মানুষকে আত্মোৎকর্ষের সুযোগ ও অবকাশ দেওয়া সমাজের কর্তব্য—বটেই তো। কিন্তু এ-কর্তব্যের বিধান দেওয়া যত সহজ তার পথ খুঁজে পাওয়া তত সহজ নয়, উপায় কী বলো? তাই খতিয়ে প্রত্যেকের কাছে সমস্যাটা আসে ব্যক্তিগত হ'য়েই: অর্থাৎ কী উপায়ে আমরা সমাজ-হিতের সেরা ব্যবস্থা করতে পারি—মানুষের সবচেয়ে সেবা করতে পারি, এই না? এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে, শিক্ষার প্রথম কর্তব্য হ'ল তার আত্মার বাণীকে রূপ দেওয়া—তার ধ্যানের প্রতিমাকে বাইরে ফুটিয়ে তোলা। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাতে মনোনিবেশের যদি তার সময় থাকে, করুক না—যেমন গেটে করতেন: তিনি যে-সময়ে সৃষ্টির প্রেরণা পেতেন না, সে-সময়টা তিনি থাকতেন রকমারি সামাজিক কাজ নিয়ে। কিন্তু যখন সৃষ্টির আলো জ্ব'লে উঠত তাঁর মনের দীপে তখন তার ডাক সর্বেসর্বা হবে না তো হবে কার?"

"কিন্তু এ-আলোয় ক'জনের আঁধার দূর হবে? দু'চারজনের বৈ তো নয়।"

"তা কেন? তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার। অল্পশিক্ষিত ও শিক্ষিতম্মন্য —এই দুই শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে উচ্চ শিল্প কাঁপন জাগায় না। কারণ একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কলের-ম'ত-শিক্ষার চাপে তাদের হৃদয়ে রসের উৎস যায় শুকিয়ে। কিন্তু অশিক্ষিত ও সত্যকার উচ্চশিক্ষিতের মনে শিল্প সর্বদাই আদর পায় আশ্রয় পায় যদিও তারা একে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। তবু অশিক্ষিতের মনেও যে শিল্পানুরাগের বীজ উপ্ত, এই কথাটা ভুললে চলবে না। আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। আমি তখন নিতান্ত নিকৃষ্ট সঙ্গীত ভালোবাসতাম; কিন্তু তাকে সেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সিংহাসনেই বসিয়েছিলাম, যার পূজা আমি পরে করতে শিখি। কিন্তু বলো দেখি, অশিক্ষিত অবস্থায় যে-সঙ্গীতকে বরণ করেছিলাম, তাকে সেলামি দিত কে? আমার সুন্দরের কল্পনাই তো। ঠিক তেমনি, অশিক্ষিতেরা হয়ত কোন্ শিল্পের কী মূল্য অনুশীলন বিনা ঠাহর করতে পারবে না; কিন্তু সেটা

এজন্যে নয় যে তাদের হৃদয়ে শিল্পপ্রীতি নেই—এইজন্যে যে, জনসাধারণে বড় শিল্পকে চেনবার সাধনা করেনি। উচ্চশিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই শ্রেণীর লোকই শিল্পের পূজারী—কেবল অল্পশিক্ষিতরা হ'ল অরসিক। আমরা শিল্পকে দুটো বিভিন্ন দিক থেকে দেখি। নীট্‌শের L' Origine de la Tragédie বইখানি ভারি সুন্দর; তাতে দেখতে পাবে, তিনি দুটি অতিমানুষ এঁকেছেন, আপলোনারিয়ান (ওরফে আপলোর ভক্ত সম্প্রদায়: এরা বিচার, বিবেক, স্থৈর্য, বুদ্ধির দিক দিয়ে জীবনকে ভোগ করেন) আর দাইয়োনিসিয়ান ওরফে দায়োনিস্যসের চেলা: এরা জীবনকে মানুষের আদিম সংরাগ—passion দিয়ে ভোগ করেন। (এ স্থলে রোলাঁ les forces de la terre কথার ব্যবহার করেছিলেন।) এঁরা দুজনেই ভুল। জীবনে এই দুই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য চাই। অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিতই শিল্প থেকে আপলোনারিয়ান ঢঙে রস খোঁজেন। অশিক্ষিতেরা হ'ল দাইয়োনিসিয়ান। মানুষের হৃদয়ে শিল্পের প্রকৃত রসোপভোগ কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন সে বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে হৃদয়াবেগ ও প্রাণতারুণ্যের সামঞ্জস্য করতে শিখবে।"

"এ সামঞ্জস্যের পথ, পদ্ধতি কী?"

"সংসারে সব গরিষ্ঠ কলাবিতের মধ্যেই এক সহজবোধ থাকে দেখতে পাবে। বীটোভ্‌নের রচনার মধ্যে মানব-হৃদয়ের আদিম আবেগের সঙ্গে মানব-মনের বুদ্ধির আবেদন ফুটে উঠেছে এক পরম সমন্বয়ে। সাধারণ মানুষের আবেগ-উৎস বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়েই আসে সচরাচর। কিন্তু বড় শিল্পী তাঁর আবেগ-প্রবণতা তাজা রাখেন শেষ পর্যন্ত, কেন না আবেগের এই চিরনবীনতা, সতেজতা হ'ল তাঁর শিল্প-বৃত্তির আদিম প্রবর্তনা। ওয়াগনার তাঁর বিখ্যাত পার্সিফাল অপেরা লিখেছিলেন ৬৩ বৎসর বয়সে, কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বয়সের বার্ধক্যে তাঁর হৃদয়ের বার্ধক্য আসে নি।"

"কিন্তু এই ওয়াগনারকে কি টলস্টয় নিন্দা করেন নি চতুর্থ শ্রেণীর শিল্পী ব'লে?"

রোলাঁ চিন্তিত সুরে বললেন: "টলস্টয়ের বেলা হয়েছিল কি জানো? তাঁর চরিত্রের মধ্যে স্বতোবিরোধ ছিল বড় বেশি। তাই এক একটা উচ্ছ্বাস বা স্বপ্নের ঢেউ আসত আর তাঁকে কোথায় যে নিয়ে যেত—আর তখন এই ধরণের বাড়াবাড়ি তাঁকে পেয়ে বসত। ধরো না কেন, মানবহিতৈষণার শুভবুদ্ধির ঝোঁকে একবার তিনি এম্‌নিধারা গায়ের জোরেই ব'লে বসেছিলেন যে গ্রহতারাদের গতিবিধি মেপেজুপে হবে কী—যাতে দুঃখীর দুঃখমোচন হয় শুধু সেই কাজ ছাড়া আর সব কাজই হ'ল অপকর্ম। এরূপ অশ্রদ্ধেয় কথা যে টলস্টয় বলতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁর

মধ্যে দাইয়োনিসিয়ান মনোবৃত্তিগুলি সময়ে-সময়ে একটু বেশি হানা দিত। তাই শিল্প-সম্বন্ধে তাঁর মতামতকে বেশি আমল দিলে ভুল হবে।"

"কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে, অনেক সময়ে আমরা শিল্পকে বড় ব'লে মনে করি শিল্পের প্রতি কোনো স্বাভাবিক অনুরাগের দরুণ নয়,—এর মূলে আমাদের *সুখ সুবিধার ইশারা রয়েছে ব'লে? কারণ, শিল্পচর্চার জীবনটা মোটের উপর সুখেই কাটে না কি?"*

"এ নিয়ে আমি বড় মাথা ঘামাই না। প্রথমত, শিল্পের যে আনন্দ, তার একটা পরম সার্থকতা আছেই। মানুষের জীবনে পরসেবার আনন্দের সার্থকতাই যে চরম বা একমাত্র সত্য তা নয়। এমন কি, আমাদের দাইয়োনিসিয়ান মূল সংরাগগুলিকেও অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। তাতেও জীবনে অসম্পূর্ণতা আসে। দ্বিতীয়ত, জীবনে কোনও ব্যক্তিগত গভীর আনন্দই সর্ববিচ্ছিন্ন নয়। জীবন বড় বিচিত্র দিলীপ, যাতে আমার আনন্দ তাতে সকলের না হোক, আরও অনেকের আনন্দ। জীবনের হাজারো অনৈক্যের মধ্যে তাই না বাজে মিলনের সুর!"

"আপনি কি তাহ'লে বলবেন যে আনন্দই পথের দিশা?"

"নয়? তোমাদের শাস্ত্রেও কি বলে না যে, জৈবজগৎ আনন্দ-সম্ভব? অবশ্য আনন্দ বলতে আমি সুখ বলছি না—স্বস্তি ও শান্তি, সুখ ও আনন্দ এদের ছন্দই আলাদা। সব বড় আনন্দের মূলেই থাকে অনাসক্তি নির্বাসনা। যে-আনন্দের জন্যে কাড়াকাড়ি দরকার সে তো আনন্দ নয়—আনন্দের ব্যভিচার। শিল্পের আনন্দ বড় তো এইজন্যেই যে তার মধ্যে নেই কাড়াকাড়ি—নেই গৃধ্নু তার ভাব। সবাইয়ের কাছেই তার দুয়ার খোলা—তার মূলে আছে দান—সে বিলিয়ে দেয়, সঞ্চয় করে না—চায় না ছুঁৎমার্গ। এই শ্রেণীর আনন্দের ছোঁয়াচেও আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়—নৈতিকতার উপদেশ না দিয়েও জীবনে আস্থা ফিরিয়ে আনে। কেমন জানো? Malwida von Meysenbug ব'লে আমার এক বান্ধবী এক সময়ে শোকে শোকে দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিলেন। এ সময়ে তিনি শেক্ষপীয়রের ওথেলো অভিনয় দেখে এত আনন্দ পেয়েছিলেন যে তাঁর বিশ্বাস আসে যে এ জীবনের দাম আছে। অথচ ওথেলোতে কোনো বড় কথাই তো নেই।"

১৭-৮-২২

আজ আবার রোলাঁর ওখানে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় বললাম: "আপনি মানবতান্ত্রিক। আপনার কি মনে হয় যে, মানবতন্ত্রবাদের দ্রুত প্রচার হচ্ছে?"

রোলাঁ বললেন : "লক্ষণ দেখি না তো।"

একটু আশ্চর্য লাগল, বললাম : "কিন্তু এ-বিষয়ে জগতে মানুষের মন ক্রমে ক্রমে উদারও কি হচ্ছে না?"

রোলাঁ সদুঃখে ঘাড় নেড়ে বললেন : "তা-ই বা কই? খাঁটি মানব-তান্ত্রিক খুবই কম। এমন মানবতন্ত্রবাদী বা শান্তিবাদী আছে, যারা অপরকে যুদ্ধ-বিগ্রহ হ'তে নিবৃত্ত হ'তে খুব গম্ভীরভাবে উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজেদের দেশ আক্রান্ত হ'লে বলে —স্বদেশ ও স্বজনকে আগে রক্ষা করাই চাই : যেমন সুইডেন বা নরওয়ের অনেক যুদ্ধ-বিরোধীর দল।"

"কিন্তু এটা তো বড়ই নিরাশার কথা যে, মানুষ একটা আইডিয়ার জন্য প্রাণপাত করছে, অথচ সে-আইডিয়ার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না।"

"তুমি কী বলতে চাও? এ-জগৎ প্রগতিশীল, একথা তো বলা যায় না। বরং উল্টো : ইতিহাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, মানুষ ওঠে, আবার পড়ে। সম্প্রতি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা নানা অতিকায় জন্তুর ছবি পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায় যে সে-জাত এ-কলায় অত্যন্ত সংস্কৃত ছিল। কিন্তু তার পর হঠাৎ কোনও কারণে এই সংস্কৃতি লুপ্ত হ'য়ে যায়। পরে যারা এল, তাদের সুরু করতে হ'ল ফের বর্বরতা থেকে। উঠতে হ'ল ধীরে ধীরে। তবে এর মধ্যেও কি এই মহিমা নেই যে, মানুষের অন্তরাত্মা তার পাশবিক বাসনা, অন্ধ অজ্ঞতা ও লক্ষ ক্ষুদ্রতার চাপে বারবার পড়েছে, কিন্তু বারবার উঠছে। এই মহাযুদ্ধের বিরাট ধ্বংসে কোন্ হৃদয়বান লোক না ব্যথা পেয়েছে? হত্যার তাণ্ডবলীলায় আমরা কত অমূল্য সম্পদ যে হেলায় হারিয়েছি তার কি ঠিকানা আছে? কিন্তু তবু মানুষ আবার উঠবে। শেষে কী হবে কে বলতে পারে? কিন্তু পরিণাম ভেবেই বা কী হবে? যেটুকু পারি করি এসো।"

"কিন্তু মানুষের ভবিষ্যতে যদি আস্থাই না রইল, তবে কোন্ তাগিদে কোমর বাঁধব?"

রোলাঁ হাসলেন করুণ হাসি, বললেন : "মানুষের ভবিষ্যতে সরলভাবে বিশ্বাস বজায় রাখতে পারলে হয়ত কাজ বেশি হয়। কিন্তু তারই বা পরিমাণ কতটুকু? এমন কি মহাপুরুষদের জন্মের জন্যেই বা ক'টা লোক আজ প্রেরণা পাচ্ছে? বুদ্ধ বা খৃষ্টকে আজ কজন সত্যি বিশ্বাস করে?"

"কিন্তু তাঁরা যে একটা আলোক পেয়েছিলেন, একথা কি আপনি অস্বীকার করেন?"

"তাই বা কে জানে? খৃষ্টের মনে কী দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এসেছিল, তার তো কোনও সঠিক্ খবরই আমরা জানি না—বিশেষ যখন দেখি যে, মৃত্যুলগ্নে খৃষ্টের শেষকথা হ'ল: 'ঈশ্বর কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?'"

"তাহ'লে আপনি কী বলতে চান?"

"শুধু বলি, অন্যায় অবিচার অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি এসো, পরে যা হবার হবে। আমি একটা ধ্রুব ব'লে বুঝি, কারণ আমার অন্তর আমাকে বলে যে, মানুষের দুঃখমোচন একটা সৃষ্টি। আমাদের বিকাশের যত বাধা তাদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যেই তো আমরা জন্মেছি।"

"কিন্তু যদি কাজই না এগুলো, তবে সন্দেহ যায় কেমন ক'রে, পথের পাথেয়ই বা পাই কোত্থেকে?"

"কাজ এগুচ্ছে ব'লেই বা তুমি কী বলতে চাও? আমরা কোথায় চলেছি কেউ কি জানে—জানতে পারে? ধরো, সমাজের যে-সব অবিচার, অত্যাচার আমরা আজ দেখছি, তার প্রতিকার যদি আজই আমাদের সাধ্যায়ত্ত হয়, ধরো ক'রে ফেলা গেছে। চুকে গেল। কিন্তু তারপর? তুমি কি বলতে চাও যে, আজ আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিকও যতরকম অবিচার অত্যাচারের নাগাল পেয়েছেন, তাদের আমূল নিরাকরণ হ'লেই আমাদের কাজ ফুরিয়ে যাবে? অসম্ভব। এ-সৃষ্টির শেষ কোথায়? আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু জানা, আরও জানা, আরও; অসাম্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, আরও যুদ্ধ করা। প্রগতি? জগতের দুঃখ-কষ্টের নির্বাসন? এ কি কখনো হবে?—বিশেষত যখন দেখি যে, কোটি কোটি ক্ষুদ্র প্রাণী পশু কীট পতঙ্গের মরণেই আমাদের জীবনযাত্রা সম্ভব হচ্ছে! হয়ত যন্ত্রণার খানিকটা লাঘব হবে পরে। কিন্তু দুঃখের সমাধান হবেই হবে, একথা কে বলতে পারে? তাই আমি মনে করি, আমরা যতটুকু পারি, এসো ততটুকু তো করি—ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ফল কী? সেবা, সঙ্গীত, কাব্য—এতে আনন্দ পাই, এসো চর্চা করি। জ্ঞানে তৃপ্তি পাই, এসো জানি। এর বেশি কী-ই বা করতে পারি? মানুষের সভ্যতা যদি বরাবর প্রগতিশীল হ'ত তবে আজ মানুষ উঠত কোন্ গৌরবের শিখরে ভাবো দেখি! কিন্তু নিয়তির অন্ধ নিয়মের দুর্বোধ্য অপচয়ের ফলে যুগযুগ-সঞ্চিত সম্পদ লুটোয় ধুলোয়—নিষ্ঠুর ভূমিকম্পে মণিপ্রাসাদ ভেঙেচুরে একাকার হ'য়ে যায়। আবার গড়ি: এক হাতে চোখের জল মুছে আবার হাসির আনন্দের জয়-গান গাই। কেন? না, জীবনের মূল ছন্দই হ'ল গঠনের। তাই আমার মনে হয়, প্রগতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে, চেষ্টার

গরিমাই আসল—সাধনার মন্ত্রই আমাদের বুকের নিশ্বাস। তাছাড়া মানুষ কিসের খোঁজে চলেছে ও কেন বাঁচতে চায়? আমার মনে হয় আজকাল যে, সে তার নিজের জন্যেও বাঁচে না, অপরের জন্যেও গড়ে না—সে এমন একটা কিছু চায়, যেটা তার নিজের সব কিছুর চেয়ে বড়—এমন একটা কিছু, যার আভাস্ মেলে জীবনের কোনো কোনো পুণ্য প্রকাশলগ্নে।"

* * *

কথায় কথায় বললাম: "টুর্গেনিভকে আপনার কেমন মনে হয়?"

"টুর্গেনিভ ছিলেন একজন মস্ত শিল্পী। চমৎকার তাঁর লিপিভঙ্গিমা।"

"আপনার কি মনে হয়, শিল্পী হিসেবে তিনি টলস্টয়ের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর?"

"তা বলা শক্ত। টুর্গেনিভের মনটা ছিল আমাদের মনের খুব কাছে। টলস্টয়ের মন বেশি রুখ। টলস্টয়ের ক্ষমতা টুর্গেনিভের চেয়ে ঢের বেশি,—তাঁর গভীরতাও ঢের বেশি, বলবারও ছিল অজস্র। সর্বোপরি তাঁর প্রতিভা ছিল বিরাট—এত বিরাট যে, তাঁর প্রবল দানবীয় দৈহিক আকাঙ্ক্ষাকেও জয় ক'রে সে শিল্পে উঠল মহিমময় হ'য়ে। তিনি ছিলেন বিরাট পুরুষ: টুর্গেনিভ—চমৎকার, বিরাট নন।"

"টুর্গেনিভ কিন্তু মনে-প্রাণে শিল্পী ছিলেন। তাঁর Memoirs of a Revolutionist-এ ক্রপটকিন এক জায়গায় লিখছেন যে, টুর্গেনিভ তাঁকে একদিন বলেছিলেন যে, তাঁর Fathers and Children-এর নায়ক Bazarov-কে মেরে ফেলবার সময় তিনি কী কান্না যে কেঁদেছিলেন!"

"বড় শিল্পীর ক্ষেত্রে এটা প্রায়ই হয়। বাল্‌জাক—তাঁর লেখা তুমি কিছু পড়েছ কি?"

"না।"

"তিনি একদিন তাঁর এক বন্ধুকে রাস্তায় দেখে মহা উত্তেজিতভাবে, সম্ভাষণ পর্যন্ত ভুলে গিয়ে, প্রথম কথা বলেন: 'অমুক (তিনি তখন একখানি উপন্যাস লিখতে ব্যস্ত ছিলেন, তার একটি চরিত্র) মারা গেছে (Il est mort)'।"

"বাল্‌জাকের একটা ছোট জীবনীতে পড়েছি, তিনি নাকি অসাধারণ খাটতেন। তাঁর সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?"

"বাল্‌জাক ছিলেন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অসামান্য। কিন্তু তিনি লিপিভঙ্গি নিয়ে বড় মাথা ঘামাতেন না। তাঁর বলবার প্রেরণাই তাঁকে দুর্নিবার বেগে ঠেলে নিয়ে যেত। তাই তিনি সমাজে যখন লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতেন তখনও প্রায়ই মনোজগতে থাকতেন কোথায় যে—! বাইরের কোনও ঘটনাই তাঁর মানস।

প্রতিমাকে স্পর্শ করত না। লিখে যেতেন তিনি অদম্য উৎসাহে। জোলা ছিলেন ঠিক উল্টো—তিনি রোজ ৩০-৩২ পাতা ক'রে লিখতেন নিয়মমত। বাল্‌জাক একবার অবিশ্রাম বাইশ-তেইশ ঘণ্টা লিখে একটি উপন্যাস শেষ করেন। অদ্ভুত লোক!"

"অনেক বড় শিল্পীকে অনেক সময়ে এরকম একটা প্রেরণা নিয়ে লিখতে দেখা যায় যে, তাঁরা কিভাবে শেষ করবেন তা প্রথম থেকে মোটেই ভেবে স্বরু করেন না। রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর নিজের লেখার সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, তিনি যখন কোনো উপন্যাস স্বরু করেন, শেষ কি হবে মোটেই ভাবেন না—এমন কি জানেনও না।"

"আমি জানি যে, এমন অনেক বড় শিল্পী আছেন যাঁরা উপসংহার **dénoument**কে মোটেই প্রয়োজনীয় মনে করেন না। তাঁরা যে টাইপ বা নমুনা দেখাবার জন্যে কলম ধরেন সেটা ঠিকমত দেখান হ'লেই খুশী: যেমন মলিয়ের। তিনি একটু বেশি যেতেন—বলতেন যে, **dénoument** নিয়ে মাথা ঘামাবার মোটেই দরকার নেই।"

একজন বিশ্ববিখ্যাত বেলজিয়ান লেখকের কথা উঠল।

"আমার কাছে তিনি মৃত।"

"মানে?"

"তিনি ছিলেন একজন ভালো শিল্পী, কিন্তু সমাজ ও ফ্যাশনে তিনি ডুবেছেন। ভাবো কুৎসা যাদের মূলধন সেই সব কাগজে তিনি মিসটিসিস্‌ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন মোটা দক্ষিণার জন্যে! বলে: ঈশ্বর ও শয়তানকে একসঙ্গে খুশী করা চলে না। ফ্যাশনের তরল তরঙ্গে গা-ভাসান দিলে মিস্‌টিক হওয়া সাজে না। তাছাড়া হয়েছে কি, বাজে সব স্ত্রীলোক নিয়েই আজকাল তাঁর কারবার। এতে অন্তরের সার যায় নিঃশেষ হ'য়ে। বড় শিল্প তৈরি হয় আমাদের শ্রেষ্ঠ ধন দিয়ে—সার দিয়ে: বাজে কাজে আসল বিকিয়ে শুধু উদ্বৃত্তটুকু দিয়ে যা গড়া যায় তা কখনো সত্য স্বষ্টির কোঠায় পড়ে না। *জীবন দিয়ে তবে জীবন গড়া যায়—প্রাণ দিয়ে প্রাণ।*"

রোলাঁকে চোখে না দেখলে বোঝা যায় না মানুষটি কী একলা! সঙ্গের মধ্যেও নিঃসঙ্গ অথচ কোন্ স্বপ্ন যে তাঁর চোখে—চোখে নয়—প্রাণে। নৈলে কি তিনি বলতে পারতেন এমন সুরে:

"Non, nous ne verrons pas de nos yeux la Terre Promise. Mais n'est ce pas beaucoup déjà de savoir oú elle est et l'en montrer la route?"

রোমা রোলাঁ

দেখব না ভাই আমরা কভু
সব-পেয়েছির দেশ চোখে, যে পুরায় মনোরথ।
ধন্য মানি—যদি জানি
কোথায় সে-দেশ, বলতে পারি : "ঐ দেখ তার পথ।"

*　　　　*　　　　*

স্থইজর্লণ্ড, ২৫-১০-২৭

ঠিক পাঁচ বৎসর বাদে। রোলাঁর চেহারার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি, কেবল তাঁর স্বভাব-পাণ্ডুর আনন যেন একটু বেশি পাণ্ডুর মনে হ'ল। কিন্তু সেই সৌম্য হাসি, সেই উদ্ভাসিত স্বাগত সম্ভাষণ।

রোলাঁর হ্রদতটবর্তী ছোট কুটিরখানি হেমন্তের সোনার আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছে।

আমরা একত্রে মধ্যাহ্নভোজনে বসেছি : রোলাঁ, তাঁর অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা, তাঁর বোন মাদেলিন ও আমি।

কথায় কথায় রোলাঁকে বললাম : "যদি আপনি আমাদের দেশে একবার আসতেন তো বেশ হ'ত।"

রোলাঁ ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন : "সে কি আর হবে?"

"হবে না কেন?"

"সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আমাকে কত কাজে যে ব্যস্ত থাকতে হয়।"

"আপাতত কি কাজে ব্যস্ত আছেন?"

"কাজ কি একটা দিলীপ?—আমি সচরাচর এক সঙ্গে অনেকগুলি কাজ নিয়ে থাকি।"

"যথা?"

"আমার L'âme Enchantée-র শেষ খণ্ড, এক। বীটোভ্‌নের সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি বড় বই লেখা, দুই। য়ুরোপের নানা লেখকের নানারকম ছোটখাট অনুরোধ রাখা, তিন—"

"অনুরোধ রাখা মানে?"

"এমন অনেক লোকের অনুরোধই আমাকে রাখতে হয় যার ভার অপরের নেওয়া উচিত ছিল। ধরো আমেরিকায় সাকো ও ভাঞ্জেটির প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাকে খুব একটি তিক্ত প্রবন্ধ লিখতে হ'ল। বলতে গেলে এ ঠিক আমার কাজ

নয়। তবে যখন বেশির ভাগ লেখক আত্মসর্বস্ব হ'য়ে ওঠে তখন বাকি লোকের ঘাড়েই তো পড়বে প্রায়শ্চিত্তের ভার।"

"মিথ্যা সাক্ষী সাজিয়ে সাকো ও ভাঞ্জেটির প্রাণদণ্ড দিয়ে সভ্য-জগতে আমেরিকার যে ক্ষতি ও দুর্নাম হ'ল—"

"এখন এ-ক্ষতি ও দুর্নাম হওয়ারও হয়ত কিছু দরকার ছিল।"

"কি রকম?"

"আমেরিকান জাতির ঘুমঘোর একটু কাটে বা! হয়ত একটু তাড়াতাড়ি বুঝতে সুরু করল তাদের কতটা অধঃপতন হয়েছে যার ফলে এমন বিচারের ব্যঙ্গ অভিনয় সম্ভব হ'ল।"

"আর কী কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন এখন?"

ঐ যে বললাম, কাজ কি একটা? ধরো, তোমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটা মস্ত বই লেখবার যোগাড়-যন্ত্র করছি। এর উপাদান-সংগ্রহ করতে তো বড় কম খাটতে হচ্ছে না। প্রায় ত্রিশ বত্রিশখানা মস্ত মস্ত ইংরেজী বই এসে হাজির। এসব পড়তে আবার মাদলিনের শরণাপন্ন হ'তে হবে, আমি তো ইংরেজি জানিনে।"

উৎসাহিত হ'য়ে বললাম: "এ ইচ্ছে আবার কবে হ'ল আপনার?"

শ্রীমতী মাদেলিন বললেন: "ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের একটি বই থেকে এ-সম্বন্ধে কিছু প'ড়ে আমি রোমাকে অনুবাদ করে শোনাই। সেই থেকে ও ভারি উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে আরো জানবার জন্যে।"

রোলাঁ বললেন: হাঁ। কারণ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বইয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসায় য়ুরোপ ও আমেরিকার একদল লোক খুবই রাগ করে। আমি তাদের প্রতিবাদে একটা বই লিখব ঠিক করেছি।"

"বিবেকানন্দের সম্বন্ধে আপনি এত উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন কী ক'রে?"

"হব না? তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে যে ফুটে উঠেছে দীপ্ত তেজ, গভীর আত্মমর্যাদা। মানুষের দেবত্বে এহেন বিশ্বাস কি মানুষের একটা মস্ত সম্পদ নয়? তবে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক জিনিষ য়ুরোপে লিখতে হ'লে খুব সাবধানেই লিখতে হবে। নইলে তাঁর অনেক বাণীই য়ুরোপীয়ের কাছে অগ্রাহ্য হবে।"

"কেন?"

"একটা প্রধান কারণ এই [illegible] অনেকে হিন্দুধর্মের গভীরতম তত্ত্বগুলিতে এমন বাজে ভড়ঙের মধ্য দিয়ে বিকৃত [illegible] ক'রে য়ুরোপের বাজারে সস্তা দামে বিকোতে বসেছে

যে তাতে করে য়ুরোপের চোখে হিন্দুধর্মের অগৌরব রটবার ভয় সমূহ। তা ছাড়া এর ফলে এশিয়াকে খাটো প্রতিপন্ন করা অনেকটা সহজ হ'য়ে ওঠেও বটে। কারণ একথা বলাই বাহুল্য যে, এ জন্যে আধুনিক আত্মসর্বস্ব সঙ্কীর্ণ য়ুরোপীয়দের মনে এক দিক দিয়ে আনন্দ হবারই কথা।"

"কিন্তু আশ্চর্য এই মসিয়ে রোলাঁ, যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মহত্ত্ব আপনি এত দূরে থেকেও এভাবে এত সহজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন যে ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয় যে একটা কত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা সেটা আজ পর্যন্ত আমরাই, অর্থাৎ ভারতীয়েরাই পুরোপুরি উপলব্ধি করিনি।"

রোলাঁ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন: "আমি এ-কথায় তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ সায় দেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে বর্তমান ভারতের মস্ত একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এ বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নেই, য়ুরোপে এঁদের প্রভাবে আজ ভাঁটা পড়লেও কাল ফের জোয়ার আসবেই। তা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পড়তে পড়তে বিস্মিত হ'তে হয়। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে দিলীপ, টলস্টয় তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পরম বন্ধু পল বিরুকফ ও আরো অনেক সাহিত্যিক এখনও বিবেকানন্দের নাম জপ করেন। বিশেষ ক'রে রুষদেশে এমন আরও অনেক লোক আছেন।"

"এঁরা বিবেকানন্দের দ্বারা এতটা প্রভাবিত তা আমি জানতাম না, তবে টলস্টয় যে শেষ-জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এটুকু জানি। কারণ আমার এক বাঙালি বন্ধু তাঁকে শেষজীবনে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' বইখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প'ড়ে টলস্টয় তাঁকে লেখেন যে, এ-যুগের মানুষ নিষ্কাম আধ্যাত্মিক চিন্তায় এর চেয়ে ঊর্ধ্বে কখনো উঠেছে কি না সন্দেহ।"

রোলাঁ ব্যস্ত হ'য়ে বললেন: "দিলীপ, তোমার সেই বন্ধুটিকে টলস্টয়ের সে

চিঠিটা ১৮৯৬ সালের অক্টোবরে লেখা হয়। যথা:

Dear sir,

I received your letter and the book and thank you very much for both. The book is most remarkable and I have received much instruction from it……

So far humanity has frequently gone backwards from the true and lofty and clear conception of the principle of life, but never surpassed it.

Yours etc.,
Leo Tolstoi.

চিঠিটির একটি নকল আমাকে পাঠাতে বলতে পারো? আমি শীঘ্রই এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখব কি না।"

"বেশ, আমি তাঁকে লিখে দেব।"

"ভুলো না কিন্তু—জরুরি।"

"না, না, নিশ্চিন্ত থাকুন।"

হঠাৎ রোলাঁ যেন আবার নিজের মনেই বলতে সুরু ক'রে দিলেন: "বিবেকানন্দের লেখার মধ্যে কী তেজ, কী শক্তি-গৌরব, কী সাধন-প্রতিভা! এত অল্প বয়সের মধ্যে একটা মানুষ এত বড় একটা কীর্তি রেখে যেতে পারে ভাবতে সত্যিই সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে আসে। আর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবলেও অবাক্ হ'তে হয় যে এ-দিগ্‌বিজয়ীকে এক আঁচড়েই তিনি চিনেছিলেন।"

আবার একটু থেমে: "কী বিরাট প্রাণ! দুঃখীর জন্যে কী নিবিড় ব্যথা! পতিতের জন্যে কী অনুকম্পা! বিবেকানন্দের জীবনের এই ট্রাজিডিটি আমার কাছে মহনীয় মনে হয় যে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মুমুক্ষু হ'য়েও বাইরের জীবনের দাবির জন্যে সে-মোক্ষকেও করেছিলেন নামঞ্জুর।"

শ্রীমতী মাদেলিন বললেন: "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কিন্তু এ-দ্বন্দ্ব ছিল না।"

রোলাঁ বললেন: "না। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক দিকে প্রকাণ্ড মানুষ হ'লেও ব্যবহারিক জীবনে বিবেকানন্দের পূর্ণতা পান নি।"

আমি বললাম: "আপনি কি মনে করেন যে য়ুরোপে বিবেকানন্দের বাণীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল?"

রোলাঁ বললেন: "নিশ্চয়—তবে শুধু সভ্য শিক্ষিত সুকুমার-হৃদয় মানুষের মধ্যে। তাঁর অখণ্ড আত্মনির্ভর ও মানুষের মধ্যে দেবত্বে বিশ্বাস সব দেশের সুকুমার-হৃদয় মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতেই সাড়া তুলতে বাধ্য। তাঁর কথা যেন তীরের মত একেবারে সোজা গিয়ে হৃদয়ে বেঁধে। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি ভালো বই লেখার সঙ্কল্প করেছি। কেবল মুস্কিল হচ্ছে এই যে এত বেশি উপাদান জড়ো হয়েছে যে সব প'ড়ে ওঠা কঠিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোন্ বাণীটি আপনাকে সবচেয়ে স্পর্শ করেছে?"

"তাঁর বিশ্বাসের উদারতা—সর্বজনীনতা, বিশ্বভৌমিকতা। যে-মানুষ একেবারে নিরক্ষর, যে-মানুষ ব্যবহারিক বুদ্ধিতে অসামান্য নয়, সে-মানুষ কেমন ক'রে আধ্যাত্মিক জগতে এই সার্ব-ধর্মিকতার বাণী শুনতে পেল? এইখানেই না তিনি বিরাট।"

"শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Synthesis of Yoga বইটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে লিখেছেন যে এহেন মহাশক্তিমান্ যোগী মহাযোগীদের মধ্যেও বিরল—Who took the kingdom of heaven by storm."

"সে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

* * *

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে বসলাম গিয়ে সবাই মিলে রোলাঁর লাইব্রেরি ঘরে। কফি খাওয়া সারা হ'লে রোলাঁ কয়েকটি বীটোভ্নেন্ সনাটা শোনালেন তাঁর সুন্দর পিয়ানোয়। তারপরে বললেন: "এবার তুমি একটু গান শোনাবে না?"

গাইলাম স্বরচিত একটি কীর্তনাঙ্গ গান:

"কুসুমের বুকে ঝরে যে সুবাস কুসুম তারে না দেখিতে পায়!
অসীমের ছায়া প্রতিফলি' নিধি অসীমেরই বাণী নিতি শুধায়!
কার লাগি' অলি ফাগুনে উছসি'
উতলা—গোপন সুরভি পরশি'
নিয়ত আকুল বাসনা বরষি' গাহে কার স্মৃতি মলয় বায়?
কম্প্র নিশীথে অম্বর তলে
চাঁদিমা তারায় কার দীপ জ্বলে?
ঊষালোকে কার শুভ্রতা ঝলে কাহারে সকলে বরিতে চায়?
যুগ যুগ ধরি' নভোনীলে বলো
কার মহিমার স্তব উচ্ছল?
নদ নদী গিরি-নির্ঝর কলতানে কাহার বা মিলনে ধায়?
তরু লতা তৃণে কার পরিমল
অণুতে অণুতে চিরচঞ্চল?
লুটায়ে কাহার ছায়া-অঞ্চল ধূসরিমা প্রিয়ব্যথা জাগায়?
ফুটিবে না যদি শূন্যতা মাঝে
কেন নিতি নব সুন্দর সাজে
নিখিলে তোমার কিংকিণি বাজে আলেয়ার মোহমায়া বিছায়?
অন্তরে রাজো তবু অন্তর চাহে সে-বারতা ভুলিতে হায়!"

তারপর গাইলাম—"কিসের শোক করিস ভাই
আবার তোরা মানুষ হ।"

"সুন্দর", রোলাঁ বললেন, "কিন্তু দিলীপ, তোমার একটা মস্ত কাজ করবার আছে। সেটা তুমি কেন করছ না? তোমাকে কতবার বলেছি।"

"কি?"

"এ সব গানের স্বরলিপি য়ুরোপে প্রচার করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমাদের সঙ্গীত থেকে অনেক কিছু আমাদের শিখবার আছে। পারিসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পত্রিকায় কেন তুমি তোমাদের রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে স্বরলিপি, প্রবন্ধ, ব্যাখ্যা প্রকাশ করছ না?"

আমি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললাম: "সত্যি বলতে কি, মসিয়ে রোলাঁ, আমি এতদিন য়ুরোপে আমাদের গানের সওদা করবার কোনও সত্য প্রেরণাই অনুভব করি নি, কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে য়ুরোপ কখনই আমাদের সঙ্গীতের ধারাটি ঠিকমত গ্রহণ করতে পারবে না।"

"কিন্তু দিলীপ, তাতে কী যায় আসে বলো দেখি? এ সংসারে যার যতটুকু সৃষ্টি-প্রতিভা আছে তার পক্ষে সব চেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে সেই প্রতিভার রসধারা দিয়ে মানুষের হৃদয়ের মাটিকে উর্বর ক'রে রেখে যাবার চেষ্টা করা—বীজ বপন ক'রে যাওয়া। বাকিটুকু তো আমাদের উপর নির্ভর করে না। কোন্ বীজের অঙ্কুরে কী ফসল ফলবে সেটা তো কৃষাণ আগে থাকতে জানতে পারে না—সে-তত্ত্ব জানেন কেবল তিনি, যিনি সব বীজের স্রষ্টা। তাই তোমাদের সঙ্গীতকে কী ভাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় সেটা নির্দেশ করবার তুমি কে? তোমার কাজ শুধু —তোমার যেটুকু দেবার আছে সেটুকু দুহাতে বিলিয়ে যাওয়া। যোগ্য-অযোগ্য-বিচারের ভার তোমার নয়।"

"কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের নিজস্ব বাণীটি য়ুরোপ ঠিকম'ত নিতে পারবে কি?"

"প্রতি ললিত সৃষ্টির কোন্ বাণীটি যে তার নিজস্ব একথা কি স্রষ্টা নিজেই বলতে পারেন? আমার জন ক্রিস্টফার হাজারো লোককে হাজারো ভাবে স্পর্শ করেছে। সে সবের কোনোটিই আমি যা ভেবে বইটি লিখেছিলাম ঠিক তার সাড়া নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? আমি তো মনে করি যে, এতে ক'রে শুধু প্রমাণ হ'ল—স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি বড়। শুধু অন্ধ স্রষ্টাই এতে ক্ষুব্ধ হ'তে পারেন—সত্য স্রষ্টা খুশীই হবেন। তাই এ-সব সাত-পাঁচ চিন্তা কেন বলো তো? তোমাদের সঙ্গীতের বীজে য়ুরোপের মাটিতে যে-ফলফুল ফলবে তার সৌরভ ও আস্বাদ একরকম, আর এ-বীজে তোমাদের মাটিতে যে-ফসল ফলে তার গন্ধ ও রস অন্য রকম। কিন্তু

সেইখানেই তো শিল্পের গরিমা যে তার বীজ কখন যে কি ভাবে ফসল ফলায় আগে থাকতে কেউ জানতেই পারে না—ব'লে দেবে কেমন ক'রে শুনি ?"

কুণ্ঠিত হ'য়ে বললাম: "এবার য়ুরোপে ভ্রমণের ফলে আমার মতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক বিষয়ে আপনার মতে আমাকে সায় দিতে হ'ল। কারণ এবার চাক্ষুষ করেছি যে, য়ুরোপের সুকুমারহৃদয়ে মানুষের মনে আমাদের সঙ্গীত অনেক ক্ষেত্রেই একটা বিচিত্র সাড়া তোলে। তাই এখন থেকে আমি য়ুরোপের পত্রিকাদিতে আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখব ভাবছি। কেবল আমার মনে মাঝে মাঝে সংশয় জাগে—স্বরলিপির মাধ্যস্থ্যে এ-প্রচারে উলটো উৎপত্তি হবে না তো ?"

"আমি বুঝেছি কোথায় তোমার খটকা। কারণ স্বরলিপি করার মধ্যে যে অনেক বিপদ আছে, সে আমিও হাড়ে হাড়ে জানি। কিন্তু এ ভিন্ন অন্য উপায় যখন নেই তখন স্বরলিপির শরণাপন্ন না হ'য়ে গতি কী বলো ?—একেবারে কিছুই না পাওয়ার চেয়ে অল্প-স্বল্প পাওয়াও তো ভালো ?"

"কিন্তু যদি এর ফলে ধরুন উল্‌টো বোঝেন সবাই—তাহলে ? আমাদের রাগসঙ্গীতের একটা মস্ত মহিমা যে তার স্বাধীনতায় ও তান-বিস্তারে। স্বরলিপি করলেই তার স্বভাব-স্বচ্ছন্দতার হানি হবে না কি ? আর তা যদি হয় তাহ'লে তাতে ক'রে আমাদের উচ্চসঙ্গীত সম্বন্ধে সাধারণের মনে একটা ভুল ধারণাই বদ্ধমূল হ'য়ে যেতে পারে না কি ?"

রোলাঁ ঘাড় নেড়ে বললেন: "একথা শুধু যে তোমাদের গানের ক্ষেত্রেই খাটে তাই নয়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের—বিশেষতঃ মেলডির ধারা পর্যালোচনা করলে একথা আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করা যায়। স্বরলিপির একটা মস্ত অসুবিধে সত্যিই ঐখানে যে, তাতে করে সুরের পাখিকে খাঁচায় পোরার মতন শাস্তি দেওয়া হয়। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারদের রচনাও আজকাল তাই আমাদের কানে এত শীঘ্র সেকেলে ঠেকে। মানুষের মন নিত্য চায় নূতনকে—নৈলে তার মুক্তি নেই। মনে আছে, বীটোভ্‌নের সনাটা আমার আগে কি রকম ভালো লাগত। কিন্তু এ বছর বীটোভ্‌নের শতবার্ষিকী শ্রাদ্ধবাসরে দেখা গেল যে তাঁর অমর রচনাও আমাদের কাছে কত নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে।"

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: "বলেন কি! তাহ'লে কি বলতে হবে যে স্বরলিপি করার কোনো সার্থকতা নেই ?"

"না—তা নয়—স্বরলিপিতে সঙ্গীতানুরাগীর সহজবোধকে এগিয়ে দেওয়া সুসাধ্য হ'য়ে ওঠে বৈকি। কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি শোনো।

"এবার য়ুরোপের সর্বত্র বীটোভ্‌নের শতবার্ষিকী স্মৃতিবাসরে যেটা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ল সেটা এই যে তাঁর সঙ্গীতের আবেদনের পরিধি আশাতীত রকম বেড়ে গেছে। অর্থাৎ কিনা, বীটোভ্‌নের সঙ্গীতে সুকুমারমতিরা আর সে-নিবিড় আনন্দ না পেলেও জনসাধারণ পাচ্ছে। অর্থাৎ কিনা জনসাধারণের রসজ্ঞতা বেড়েছে ক্রমাগত বীটোভ্‌নের সঙ্গীত শুনে শুনে—যেটা স্বরলিপি না থাকলে হ'তে পারত না। প্রতি সঙ্গীতকার বা ললিতকলার স্রষ্টার সম্বন্ধেই ঐ কথা। প্রথমে সে-সৃষ্টি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।"

"কিন্তু বীটোভ্‌ন যদি সঙ্গীতরসজ্ঞদের সভায় ইতিমধ্যেই সেকেলে মতন হ'য়ে গিয়ে থাকেন তবে তাতে ক'রে কি তাঁর মহিমাকে প্রকারান্তরে খানিকটা অস্বীকারই করা হ'ল না?"

"তা কেন? বীটোভ্‌ন মানুষকে এগিয়ে দিয়েছেন এ ভুললে তো চলবে না। তিনি না জন্মালে তাঁর পরবর্তীদের জন্মানো সম্ভব হ'ত না। তাছাড়া ক্রমশ তাঁর প্রতিভা যে বহু মানবের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে এটা কি মস্ত লাভ নয়?"

"কিন্তু ললিত সৃষ্টির দরকষায় সেইটেই কি সবচেয়ে বড় কথা মসিয়ে রোলাঁ? প্রতি প্রতিভা গ্রহীতার গ্রহণ-অনুপাতেই আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে একথা যদি সত্য হয়, তাহলে অরসিকের চেয়ে সুরসিকের তারিফের মূল্য কি ঢের বেড়ে যায় না? তাই বীটোভ্‌নের যদি আজকের সঙ্গীতরসজ্ঞের কাছে অনাদৃত হ'য়ে থাকেন তবে শুধু জনসাধারণের কাছে আদর পাওয়ায় কি তাঁর সে-ক্ষতির পূরণ হ'তে পারে?"

"তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ?"

বললাম: "সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে হয়ত বোঝাতে পারব। ধরুন একজন গেটের কাছে শেক্ষপীয়রের সমাদর কি সহস্র রাম শ্যাম যদু হরির কাছে সমাদরের চেয়ে মূল্যবান নয়? রসগ্রহণে স্রষ্টার পরম আবেদনটি কার কাছে? রসজ্ঞ গ্রহীতার গভীর আনন্দ ও দরদের কাছেই তো? এক কথায়, কোনো বড় শিল্পী যদি রসজ্ঞের মনে আজও তেমন সাড়া না তুলতে পারেন তবে জনসাধারণের মাঝে তাঁর প্রভাব বেশি ব্যাপক হয়েছে এতে সান্ত্বনা কোথায়?"

রোলাঁ বললেন: "এবার বুঝেছি। আর এ-বৎসরে বীটোভ্‌নের শতবার্ষিকী উৎসবে একথা যে আমার মনেও উদয় হয়নি তা নয়। কিন্তু কি জানো? আমার মনে হয় এখানে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের একটু প্রভেদ আছে, তাই ঠিক তুলনা করা মুস্কিল।"

"প্রভেদ বলতে কী বুঝছেন আপনি?"

"সঙ্গীত তার বিশুদ্ধ আবেদনটি নিয়ে একেবার সোজা গিয়ে আমাদের মরমে পশে। সাহিত্য তার বাণী আমাদের গ্রহীতা মনটির কাছে পৌঁছে দেয় বুদ্ধি ও চিন্তার মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তবে। তাই সাহিত্যের আবেদন সঙ্গীতের মতন ব্যাপক হ'তে পারে না বটে, কিন্তু উল্‌টো দিকে যে বেশি স্থায়ী হয় একথা ভুললেও তো চলবে না।"

"আপনার একথাটি চিন্তনীয়। কেবল আমাদের সঙ্গীতের সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ খাটে কি না সন্দেহ। আমি বার বার দেখেছি যে, একটি পুরাতন রাগ হাজার বার শুনলেও আমাদের সঙ্গীতরসিক তা থেকে নিত্য নূতন তৃপ্তি পান। আমাদের দেশে এদিকে সূক্ষ্মবিকাশ এত উঁচুতে উঠেছে যে ওস্তাদিসঙ্গীতে এক একজন গায়ক গায়িকা অনেক সময়ে মাত্র কয়েকটি রাগের চর্চা করেন। কাশীর সরস্বতীবাঈ শুধু ভৈরবীই গাইতেন, আর একজন শুধু আজীবন মালকোষই গেয়েছে, আর একজন হয়ত জয়জয়ন্তী। লোকে বলে অমুক ওস্তাদ কানাড়ার ঘর, অমুক তোড়ির ঘর, অমুক খাম্বাজের ঘর ইত্যাদি। কিন্তু সঙ্গীতবোদ্ধা এখনো এতে ক্লান্ত হন নি বা এরকম বিশেষজ্ঞের সমাদর করতে কুণ্ঠিত হন নি। এটা আমার শোনা কথা নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। আমাদের বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ গুণী রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের একটি ভৈরবী টপ্পা আমি অন্তত একশবার শুনেছি, কিন্তু আজ অবধি কখনো আমার কানে পুরোনো ঠেকে নি। তাই আমি এবার য়ুরোপে আমার নানান আসরেই বলেছি যে, আমাদের রাগের এই নিত্য নতুন বৈচিত্র্য-সম্ভার যোগানোর জন্যেই সে এখনো পুরোনো হয় নি। একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন না?"

"কেন করব না? কিন্তু তার কারণ বোধ হয় যেকথা এখুনি বললাম—অর্থাৎ তোমাদের রাগরাগিণীকে স্বরলিপির পিঞ্জরে আটকে রেখে তার পাখাকে নিস্তেজ ক'রে দেওয়া হয় নি। আমাদের লোক-সঙ্গীতের সম্বন্ধে আলোচনা করলে একথা আরও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। দেখনা কেন—আজকের দিনে নতুন লোক-সঙ্গীত য়ুরোপে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কেন? কারণ স্বরলিপির জাদুঘরে শ্রেষ্ঠ লোক-সঙ্গীত শুধু কৌতূহলের সামগ্রী হ'য়ে দাঁড়াল। স্বরলিপির মানেই তো লঘুগতি স্বরকে বাঁধাধরা লেখামাফিক গাওয়ানো? এখন যে-ই গানকে একথা বলা হ'ল, সে-ই তার সাবলীল গতিচ্ছন্দের পায়ে পরানো হ'ল বেড়ি। এইজন্যই স্বরলিপির নিগড়ে লোক-সঙ্গীত দেখতে দেখতে পুরানো হ'য়ে যায়। **Elle perd toute sa fraîcheur.**"

খুশী হ'য়ে বললাম: "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের গানের বিকাশের কোন্ ধারাটি বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি ঠিক এই কথাই একাধিক বার বলেছি—কিন্তু স্বরলিপির এ-বিপদের দিকটা কখনো এভাবে ভেবে দেখি নি। তবে গানকে অনড় অচল ক'রে গাইলে সে শীঘ্রই একঘেয়ে হ'য়ে যায়—তাকে লীলায়িত ক'রে গাইলে সে বেশি দিন জীবন্ত থাকে এই কথা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার যত মতভেদ, যা খানিক আগে আপনাকে বলছিলাম।—তাই হঠাৎ আপনার এ-মতটি শুনে আমি ভারি খুশী হয়েছি। শুধু জিজ্ঞাসা করি, যে তাহলে কি বলতে হবে স্বরলিপি করাটা মোটের উপর বাঞ্ছনীয় নয়?"

"তা বলা চলে না। অন্তত আমাদের হার্মনির বিচিত্র ও বিরাট ইমারত যে স্বরলিপির ভিতের উপরই দাঁড়িয়ে একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া—খানিক আগে যা বলছিলাম—কোনো সুর স্বরলিপি করা মাত্র স্রষ্টার মন ছাড়া পেয়ে ফের চঞ্চল হ'য়ে ওঠে নতুন সৃষ্টির জন্যে।"

"ঠিক্ ধরতে পারছি নে।"

"একটা সুর যে-মুহূর্তে স্বরলিপি করা হ'ল সে-মুহূর্তে সেটার প্রকাশ পূর্ণ হ'ল তো? এখন, স্রষ্টার পক্ষে তার অনুভূতির বা প্রেরণার পূর্ণ প্রকাশ হচ্ছে একটা মস্ত জিনিষ—কেননা কেবল তাতে ক'রেই তার মন ছাড়া পায়, ও সে নতুন সৃষ্টির জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। একটা প্রেরণাকে যতদিন না রূপ দেওয়া যায় ততদিন সে স্রষ্টাকে নিষ্কৃতি দেয় না। কিন্তু যে-মুহূর্তে সে আমাদের মগ্নচৈতন্য (subconscious) থেকে এসে জাগ্রত চৈতন্যের (conscious) মধ্যে ধরা দেয় সে-মুহূর্তে স্রষ্টার মনটি পূর্ণ স্বস্তি পায়। অথচ সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টা নিজের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি দরদ হারায়, ফলে নতুন সৃষ্টির জন্যে ব্যগ্র না হ'য়েই পারে না। কাজেই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপিকে বলা চলে—গানের মুক্তিদাতা। অন্তত য়ুরোপে হার্মনির অসম্ভব প্রগতির জন্যে স্বরলিপির কাছে ঋণ স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। তাই স্বরলিপির সাহায্যে সৃষ্ট সুরকে তাড়াতাড়ি পুরোনো ক'রে ফেলা হ'লেও বলা চলে যে, এই স্বরলিপির পথেই স্রষ্টার মন শিখল গড়তে—অপ্রকাশকে করল প্রকাশ। স্বরলিপি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে য়ুরোপীয় হার্মনির সঙ্গীতের বিকাশ কি রকম ছুটে চলেছে, তা থেকে কি একথা প্রমাণ হয় না?

"তাছাড়া ভালো জিনিষের সঙ্গে ক্রমাগত পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা যে লোকের রুচিকে উন্নত করার প্রকৃষ্ট পন্থা একথাও মানতেই হবে। স্বরলিপির সাহায্যেই রূপকার তার ধ্যানশ্রুতিকে লোকের চোখে হুবহু ফুটিয়ে তুললেন। এটা একটা

মস্ত লাভ বৈ কি। তবে দুঃখ এই যে, কিছু পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু হারাতেও হয়ই। এটা না হ'লে ভালো হ'ত, কিন্তু জীবনের প্রতি আগমনীর উল্টো পিঠে লেখা বিদায়, উপায় কি বলো!—তবু তোমাদের স্বরবিহারের (improvisation) সহজাত ক্ষমতাটি হারালে আমি সেটা মোটের উপর অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় ব'লে মনে করব।" একটু থেমে চিন্তিত স্বরে: "অথচ, স্বরলিপির বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিপদটির সম্ভাবনার প্রতি অন্ধ হ'য়ে থাকাও কঠিন। তবে হয়ত চেষ্টা করলে এ-বিপদকে এড়ানো অসম্ভব হবে না।"

"আপনার এ কথাগুলি আমার ভারি ভালো লাগল। শ্রীঅরবিন্দ, রাসেল ও রবীন্দ্রনাথের মতন আপনিও আমাদের চিন্তাধারাকে নতুন নতুন পথের সন্ধান এনে দিয়ে থাকেন। কিন্তু সে যাই হোক, মোটের উপর যে আপনি আমাদের গানের সুরবিহারের (improvisation) ক্ষমতাটিকে বজায় রাখবার পক্ষপাতি এতে আমি ভারি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছি। কারণ আমি বারবার অনুভব করেছি যে আমাদের রাগ-সঙ্গীতের প্রাণটুকু ওস্তাদের পালোয়ানির চাপে রুদ্ধশ্বাস হ'য়েও যে আজ মরে নি—তার কারণ রাগ-সঙ্গীতের বিকাশধারার মধ্যে একটা কিছু বড় সত্য আছেই। এবার য়ুরোপে নানাজাতীয় সঙ্গীত-রসিকদের আসরে গানটান গেয়ে আমার এ-বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে, রাগ-সঙ্গীতের জগৎকে এখনো কিছু দেবার আছে।"

"এখানে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, দিলীপ। তাই আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি যেন তোমরা তোমাদের সঙ্গীতের বিকাশধারায় ভারতীয় গানের সুরবিহারেরর ক্ষমতাটিকে না খুইয়ে বসো।" ব'লে একটু থেমে বললেন: "কিন্তু এটাও ভুলো না যে নতুনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এটা কঠিন হ'য়ে উঠবেই।"

"কেন?"

"বলি শোনো। সে-দিন স্পেন দেশের একটি সঙ্গীতকারের সঙ্গে সঙ্গীতে ঠিক তাদের এই সুরবিহারের ক্ষমতা সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল। জানো বোধ হয় যে তাদের দেশেও সুন্দরভাবে লীলায়িত ক'রে গান গাওয়ার রীতি আজো জীবন্ত। কিন্তু স্বরলিপি, বাঁধাধরা শিক্ষাপদ্ধতি, স্কুল কলেজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুরের নিত্য নব উদ্ভাবনী শক্তি ঢিমিয়ে পড়ছে। তিনি তাই ভারি চিন্তিত ও বিমর্ষ। অথচ স্বরলিপি, স্কুল কলেজ প্রভৃতিকে বর্তমানের যুগধর্ম বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না—অসাধ্য তার স্রোতকে ঠেকানো। তাই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা

করছিলেন, কী করা যায়? আমার মনে হয় এদিক দিয়ে তাঁদের সঙ্গে তোমাদের সমস্যার মিল আছে।

"তাছাড়া তোমাদের সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যটি বজায় রাখা তোমাদের কর্তব্য আরও এইজন্যে যে বৈসাদৃশ্যের (unlike) অভিঘাতে জাতির ও মানুষের উভয়েরই প্রতিভা দীপ্ততর হ'য়ে ওঠে। তাই তোমাদের সঙ্গীতের স্পর্শ থেকে লাভ করা আমাদের পক্ষে খুবই সম্ভব। বর্তমানে য়ুরোপীয় হার্মনির বিকাশ এত জটিল হ'য়ে উঠেছে যে, আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গীতকারেরা আর এগুতে পারছেন না। এমন কি স্ত্রাভিনস্কির প্রতিভাও ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে একটা স্রোতোহীন অবস্থায় পড়েছে মনে হয়। অথচ আমাদের সঙ্গীত-প্রতিভার ও উদ্ভাবনী শক্তিধারার প্রবাহকে কোনো না কোনো নতুন প্রণালী খুঁজতেই হবে। আমরা হাতড়াচ্ছি, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাদের সঙ্গীত থেকে একটা নতুন আইডিয়া পাওয়া আমার মোটেই অসম্ভব মনে হয় না। সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের সঙ্গীতের মূল ধারাটি খুইয়ে বসো তবে ক্ষতি আমাদেরো।"*

* * *

রোলাঁর সঙ্গে বাইরে বাগানে একটু পায়চারি করতে বেরুলাম। কথায় কথায় বললাম: "মসিয়ে রোলাঁ, খানিক আগে আপনি বলছিলেন যে বীটোভ্‌ন্ আজকের দিনে সঙ্গীতরসজ্ঞদের কাছে সেকেলে হ'য়ে পড়ছেন। কিন্তু শেক্ষপীয়র তো একটুও সেকেলে হন নি?"

"একটুও সেকেলে হন নি বলাটা হচ্ছে গায়ের জোরের কথা। বর্তমান য়ুরোপের সুধীসমাজে কি শেক্ষপীয়রের আদর বার্ণার্ড শর মতন ব্যাপক? শেক্ষপীয়র আজও সত্যি সত্যি জীবন্ত—শুধু অল্প সংখ্যক রসগ্রাহীর মধ্যে।"

"বিরাট প্রতিভা যে চিরন্তন এ-রটনা কি তাহ'লে কথার-কথা?"

"ঠিক তা নয়, যেহেতু এ-সম্বন্ধে সমস্যাটি ঠিক্ আদর্শগত নয়—অনেকটা ব্যবহারিক।"

"তার মানে?"

"জীবনে নানান কাজ, কর্তব্য, দায়িত্ব ও ব্যস্ততার মাঝে কম লোকেই তাদের ভিতরকার রসবোধের ঠিকমত অনুশীলন করবার সময় পায়। ফলে, বর্তমানের

* ভিয়েনার একজন অপেরা গায়িকাও একবার আমায় একথা বলেছিলেন, আমাদের সঙ্গীত থেকে এই নতুন আলো পাবার সম্ভাবনা আছে এ তাঁরও মনে হয়, আরো অনেকে এ-আশা পোষণ করেন দেখেছি।

প্রত্যক্ষ দাবি-দাওয়া ছেড়ে অতীতের গৌরবকে পূর্ণভাবে অনুভব করবার জন্যে যে-কল্পনা দরকার সে-কল্পনা তাদের মধ্যে স্ফূর্তি পায় না। কিন্তু সমাজে শিক্ষিতদের মধ্যে অবসর ও সুশিক্ষার গুণে মূল চাহিদাগুলি বদলে দিলে যে আমাদের কল্পনার এ-দৈন্য ঘুচবে এটা আশা করা অসঙ্গত নয়। তাই বড় প্রতিভা আসলে চিরন্তন —সকলেরই কাছে; কেবল কার্যক্ষেত্রে অবান্তর কারণে এ-উপলব্ধি ব্যাপক হ'য়ে উঠতে বাধা পায়।"

"কিন্তু তাহ'লে বীটোভ্‌ন্ কেন আজকের সঙ্গীত-রসিকদের কাছে জীবন্ত নন বলছিলেন?"

"একেবারে জীবন্ত নন তো বলি নি। কিন্তু—ঐ যে বললাম—এ-বিষয়ে সাহিত্যের কাছে সঙ্গীতকে একটু হার মানতেই হয়—উপায় কি? ব্যাপারটাকে একটু অন্য দিক থেকেও দেখা যেতে পারে—যে-কথাটার উল্লেখ করেছি এর আগে। অর্থাৎ—বীটোভ্‌নের রসসৃষ্টি রসিকের কাছে আর ততটা দামী না হলেও— সাধারণের মনকে টানে এর মধ্যে একটা ক্ষতিপূরণ আছেই। কারণ ব্যাপকভাবে মানুষের রুচিকে গ'ড়ে তোলা যে কম কথা নয় এ কে না স্বীকার করবে?"

একটু থেমে: "সব বড় রূপকারকেই তাই নমস্য বলা চলে—যেহেতু আমাদের মনের শিখরলোকে তাঁদের আলো জ্বলে ব'লেই আমরা নিচু দিকে না চেয়ে উঁচু দিকে চাই—তা সে দুদণ্ডের জন্যেই হোক্ বা জীবনভোরই হোক। এক কথায়, মানুষের বিকাশ কোন্ দিকে হওয়া বাঞ্ছনীয় সে-সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের চোখ কখনই ফুটত না যদি আমাদের মগ্নচৈতন্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষের আদর্শ না আলো ধরত।"

"কিন্তু সাধারণ মানুষ তো কই এসব আদর্শের প্রভাবে খুব বেশি এগুচ্ছে ব'লে মনে হয় না। অবশ্য আশা আমরা করতে পারি, ক'রেও থাকি, কিন্তু বাস্তব তো সাধারণের দীনতার সাক্ষ্যই দিয়ে এসেছে চিরকাল।"

"তা তো বটেই। সাধারণ—অর্থাৎ বেশির ভাগ লোক—সাধারণ ব'লেই যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসাধারণ হ'য়ে ওঠেন এ তো একটা অতি পুরানো সত্য।"

"তাহ'লে কি বলতে চান যে সাধারণ মানুষ এগুবে না?"

"এগুবে না কেন? কিন্তু যতই এগোক না কেন অসাধারণ চিরকালই আরো ঢের এগিয়ে থাকবে। অর্থাৎ সাধারণ কখনও দৌড়ে অসাধারণের উপর টেক্কা দিতে পারবে না, সাধারণ ও অসাধারণের মধ্যে যে-তফাৎ সেটা চিরকাল থাকবেই। কেন না সাম্য তো সৃষ্টির মূল ধর্ম নয়—বৈষম্যেই জগৎ বিধৃত।"

"এতে কি অনেকটা আমাদের অধিকারিভেদের সমর্থনই করা হ'ল না।"

"তাই কী ? তুমি বলতে চাও সব মানুষের চেতনা বা গ্রহণশক্তি এক স্তরের ? একাকার সাম্যের উপর কোনো মহৎ সভ্যতা আমি তো কল্পনা করতে পারি না। তাই তোমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলাম সে অসাধারণ মানুষ সাধারণকে বুঝবে কিন্তু সাধারণ মানুষ কোনোদিনো অসাধারণকে বুঝতে পারবে না: হয় তাকে দেবতা করবে, না হয় দেবে ক্রসে ঝুলিয়ে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও বার বার এই সাক্ষ্যই দিয়ে এসেছে! সহৃদয় সাম্যবাদীরা বার বার চেষ্টা করেছে—মহৎ মানুষের উঁচু মাথাকে বিপ্লবে কেটেছেঁটে বামন করে দিতে—কিন্তু তার পরেই আবার একটা নতুন ভূমিকম্প এসে গড়ল পাষাণ, গজালো পাহাড়—বৈষম্য আবার তুলল মাথা। তাই মহৎ মানুষ ও ছোট মানুষের মধ্যে যে একটা গভীর ব্যবধান থাকবেই এ সত্য গায়ের জোরে নামঞ্জুর ক'রে কোনও স্থায়ী সমাজই দাঁড়াতে পারে না। মানুষ যে সকলেই সমান এর চেয়ে অসার কথা মানুষ বোধ হয় আর কখনো উচ্চারণ করে নি।"

"কথাটি ঠিক মসিয়ে রোলাঁ। তবু সহৃদয়তা ও করুণা যদি বড় গুণ হয় তবে এতে দুঃখও হয়ই। কারণ যদি এই কথাই চরম সত্য হয়—তবে ছোট মানুষেরই বা সান্ত্বনা কোথায়, আর বিশ্বপ্রেমিকেরই বা ভরসা কোন্‌খানে ?"

"ছোট মানুষের ক্ষুদ্রতার জন্যে মহৎ মানুষের পক্ষে ব্যথা বোধ করা স্বাভাবিক হ'লেও বড় না হওয়ার দরুণ যে ছোটরা মরমে ম'রে থাকে এ কথা সত্য নয় দিলীপ। অবশ্য বড়কে যে ছোট কখনও হিংসা করে না তা বলি না। কিন্তু সেটা সে সচরাচর ক'রে থাকে—হয় কুশিক্ষার গুণে, না হয় উৎপীড়নের ফলে। এ দুয়েরই প্রতিষেধক আছে। এ-প্রতিষেধের' চেষ্টা করা মহৎ মানুষের একটা মহৎ কর্তব্যও বটে। কিন্তু তাই ব'লে বড়র মাথা টেনে তাকে ছোট ক'রে দেওয়ার প্রবণতাটা কিছু আনন্দের বা আশার কথা হতে পারে না।"

"কিন্তু ছোট মানুষ বড় হচ্ছে না এজন্যে মহৎ মানুষের ব্যথা ও পদে পদে আশাভঙ্গের সান্ত্বনা কোথায়—এ-প্রশ্নের উত্তর কই ?"

"মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেবল একটা আশা মহৎ মানুষ পোষণ করতে পারে: যে, ছোট মানুষের মনেও বুদ্ধ, খৃষ্ট, সেণ্ট ফ্রান্সিস, নিউটন, শেক্ষপীয়র প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা নিহিত সম্ভ্রম আজো বদ্ধমূল। কেননা এই শ্রদ্ধাই দেখিয়ে দেয় যে সর্বসাধারণের মধ্যেও কোথাও না- কোথাও একটা দেবত্বের প্রেরণা আছে। বাস্তবিক মহামানবত্বের মধ্যে যে একটা সত্য মহিমা আছে তার আভাষ পাওয়া যায়

কেবল এই সত্যটি থেকে যে সাধারণের মনের মধ্যে অসাধারণের প্রতি নিহিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা বিশ্বজনীন।"

"কিন্তু ধরুন লেনিন যে বলছেন—সব মানুষকেই এখনি শিক্ষার ফলে বড় ক'রে তোলা যায়, তার কি?"

"লেনিন নিজেই তো তাঁর বাণীকে অপ্রমাণ করেছেন।"

আশ্চর্য লাগল, বললাম : "কি রকম?"

"লেনিন তাঁর মহত্ত্ব ও গরিমার সাক্ষ্যে কি এই কথাই প্রমাণ করেন নি যে লক্ষ লক্ষ ছোট মানুষ তাঁর কথায় কান দিয়েছে শুধু এই জন্যে যে তিনি একজন মহৎমানুষ ছিলেন? কাজেই দেখ, 'individu' (ব্যক্তি) বড় নয়, collectivité-ই (সমষ্টি) বড়'—একথাও আমল পেয়েছে শুধু এইজন্যে যে এ-মন্ত্রের উদ্‌গাতা ছিলেন একজন মস্ত পুরোহিত। অর্থাৎ লেনিন যদি লেনিন না হ'তেন তাহ'লে তাঁর কথায় কান দিয়ে সাধারণ মানুষ কখনও নিজের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে মাথা ঘামাত না।"

"প্রিন্স ক্রপটকিনও একথা বার বার বলেছেন তাঁর নানা বইয়েই যে, দুর্গতকে আত্মপ্রত্যয় দেবে প্রথমটায় উন্নত মানুষ। কিন্তু রুষদেশ যে বলছে সবাই সমান—"

"সেটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কম্যুনিস্টরাও অসামান্য লোকের সহায়তার কাছেই হাত পেতেছেন একথা ভুলো না। তাই মুখে তারা যাই বলুক না কেন, কাজে তাদের স্বীকার করতেই হয়েছে যে শক্তিমান মানুষের সাধনা বিনা কোন সমাজ-সংস্কারই সম্ভব নয়। কাজেই রুষ গভর্মেণ্টের কার্যক্ষেত্রে হারমানার দরুণ এ-কথা বোধ হয় আজ বলা চলে যে, কোনো মহৎ জাতীয় সাধনাই ফলপ্রসূ হ'তে পারে না যদি জাতীয় প্রচেষ্টায় ব্যক্তিকে যথাসম্ভব বড় হবার সর্বাঙ্গীন সুযোগ দেওয়া না হয়। একটি ফুল লক্ষ পাতাকে সার্থক করে। পাতা যদি ফুলকে ঈর্ষা ক'রে তাকে পাতার পংক্তিতে বসাতে চায় তাহ'লেই সর্বনাশ।"

"কিন্তু তাহ'লে রুষদেশের নবতন্ত্র কি ব্যর্থ হবে মনে করেন আপনি?"

"না। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে রুষদেশ যে একটা বিরাট চেষ্টা করেছে তার জন্য এমন উদ্ধত কে আছে যে মাথা নত করতে অপমান বোধ করবে? রুষদেশ যে একটা মস্ত সত্যের সন্ধান পেয়েছে সেকথা নিরপেক্ষ চিন্তাশীল মানুষ ক্রমেই স্বীকার করছে। বল্‌শেভিস্‌মের বিপক্ষে যে যা-ই বলুক না কেন, ক্রমশ সবাইকে মানতে হচ্ছে যে, আজকের দিনে য়ুরোপের মধ্যে রুষদেশ একটা মস্ত সমাজ-সাধনার লীলাক্ষেত্র—নব অভ্যুদয়ের অগ্রচ্ছটা! তাই তারা বলছে

যে, মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে বিপ্লব এনে মানুষকে দেবে বদলে।"

চিন্তিত স্বরে বললাম: "কিন্তু এ কি হবে মসিয়ে রোলাঁ? মানুষ নিজে না বদলালে তার সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে কোনো বদল কি টিকবে? শ্রীঅরবিন্দের সাধনা অন্তত ঠিক উল্টো দিকে। তিনি বলেন, আগে আত্ম-উদ্ধার করতে হবে তারপর বিশ্ব-উদ্ধার। বলেন যে, আত্মা না জাগলে সমাজ ঘুমবেই—কারণ অন্তরে সূর্যোদয় না হ'লে বাইরে রাত পোহাতে পারে না।"

বিদায়ের সময় এলো। রোলাঁ আমার সঙ্গে স্টীমার ঘাট পর্যন্ত এসে "A l'année prochaine" (আসছে বছর ফের দেখা হবে) ব'লে বিদায় নিলেন।

সারা পথ এ-তেজস্বী ও কোমল মানুষটির স্নিগ্ধ হাসি ও বেদনাভরা চোখ দুটির কথা মনে ঘোরাফেরা করতে থাকে এত! মনে পড়ে কেবলই তাঁর একটি জীবনমন্ত্র:

"Il n'est pas pour l'âme nue ni Occident ni Orient : ce sont des vêtements. Le monde est sa maison. Et sa maison, étant de tous, est à tous."

প্রাচী ও প্রতীচী, স্বজাতি বিজাতি—আত্মার তরে নয়:
চিরদিন যে সে বিবসন শিশু—এ সবি মায়ার বেশ।
বিশ্বভুবনে পাতিল যে ঘর, তার চিরপরিচয়—
'নিখিল-নগর-নাগরিক': তার কোথা আপনার দেশ?

রোলাঁর পত্র
(ফরাসী থেকে অনূদিত)
সোমবার ২০শে মার্চ ১৯২২
সুইজর্লণ্ড

প্রিয় দিলীপকুমার রায়,

তোমার চিঠির ঔদার্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। (Votre généreuse lettre m'a touché) তাই আমি পিঠ পিঠ উত্তর দিচ্ছি যদিও যত বড় চিঠি লিখলে আমার সাধ মিটত তত বড় চিঠি লেখা এখন সম্ভব নয়—যেহেতু আমার হাতে এখন সময় কম।

তোমার অন্তর্দ্বন্দ্ব আমি বেশ বুঝতে পারছি। এ-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে আমাকেও যেতে হয়েছিল কিনা। তাই তো আমি টলস্টয়কে লিখেছিলাম আমার কৈশোরে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা আমার এখন থিতিয়ে এসেছে (mes troubles sont apaisés): বিশেষ ক'রে গত কয় বছর ধ'রে আমাকে যেসব পরীক্ষা, নিঃসঙ্গতা ও কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে তার ফলে যেসব সমস্যাকে আগে মনে হ'ত প্রহেলিকা সেসব একটু যেন স্বচ্ছ হ'য়ে এসেছে আমার চোখে।

তুমি লিখেছ টলস্টয়ের "আত্মকাহিনী" প'ড়ে তুমি মুগ্ধ হয়েছ। মুগ্ধ হবার কথা বৈকি। সংসারে শোকতাপ নিয়ে টলস্টয়ের দুঃখদুশ্চিন্তা মর্মস্পর্শী (Ses angoisses en face de la misère du monde sont poignantes) কিন্তু তবু একথা বলতেই হবে যে দিশারি হিসেবে টলস্টয় বড় সুবিধের নন। তাঁর অশান্ত প্রতিভা কোনোদিনই পারেনি এমন পথ খুঁজে বার করতে যেপথে চলা সম্ভব। তাঁর সৌভ্রাত্রের মূলে যে-অনুকম্পা ছিল তাঁর ফলে হ'ল কি, তিনি শিল্প ও বিজ্ঞানকে দূষলেন। কেন? না, তারা দু'চারজন ভাগ্যবানের একচেটে সম্পত্তি। [কিন্তু দূষলে হবে কি, টলস্টয় আমরণ তাঁর শিল্পের সুখসুবিধার অধিকার ভোগ ক'রে এসেছেন—না ক'রে তাঁর উপায় ছিল না। প্রতিদিন সকালে তিনি তাঁর শিল্পকলার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন—কিন্তু যেন একান্তে, সলজ্জে। অথচ যদি তিনি জগতের চিত্তজয় না করতেন তাঁর মহান শিল্পকলার গুণে, তাহ'লে তাঁর নৈতিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তার এত প্রচার হ'ত না দিকে দিকে]।* তাছাড়া তাঁর বিশ্বপ্রাণতা তাঁর বিশেষ কাজে আসেনি—তাতে ক'রে কারুর কোনো জ্বালা-যন্ত্রণারই উপশম হয়নি: হয়েছিল শুধু তাঁর নিজের দুঃখ দুশ্চিন্তার বৃদ্ধি। আমরা সত্যি কী চাই সেটা সব আগে জানতে হয়: তারপরে যা আমরা চাই তা করতে হয়।

শুধু যে টলস্টয়ের পরিবেশ তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের জন্যে দায়িক ছিল একথা বললে সবটুকু বলা হবে না—তাঁর স্ত্রী পুত্র পরিবারকেও চলে না এজন্যে দায়িক করা—যদিও তিনি তাদের ঘাড়েই চাপিয়েছেন সব দোষ: আসলে তিনি নিজেই ছিলেন এজন্যে সবচেয়ে অপরাধী। তিনি গোঁ ধরলেন যে তাকেই গ্রহণ করবেন সত্য ব'লে যার বিরোধী ছিল তাঁর গহন প্রাণ-সংস্কার (Il s'obstinait à vouloir une vérité qu'au fond son instinct combattait)। তাঁর প্রাণসংস্কারের

* এই বন্ধনীর অংশটি রোলাঁ লিখে দেন তাঁর আগের চিঠির তিনটি লাইনের বদলে। তাঁর শেষ পত্র দ্রষ্টব্য—৩. ৬. ৩০ তারিখের।

ভুল হয়নি, কারণ যাকে তিনি সত্য ব'লে বরণ করতে চেয়েছিলেন সে-ই ছিল আংশিক, অসম্পূর্ণ।

টলস্টয় (এবং আরও অনেকের) সব চেয়ে দারুণ ভুল—সব কিছুকেই অতি সরল দাঁড় করাতে চাওয়া, মানব-চরিত্রকে নির্বিশেষ এক ছাঁচে ঢালাই করতে যাওয়া। বস্তুত প্রতি মানুষই হচ্ছে অনেকগুলি মানুষের সমষ্টি, কিম্বা বলা যেতে পারে—নানা-স্তর-বিহারী একটি মানুষ—কি না ধ্বনিসম্পাত। হয়েছে কি, আমাদের বিচারী বুদ্ধি সভ্য মানুষের মধ্যে একটা দুরন্ত চিত্তবিকারে ফেঁপে উঠেছে —সে আজ চাইছে কি ? না, আমাদের চরিত্রের সমৃদ্ধিকে ন্যায়-শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞা, উপপ্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তের মতন সরল, সুবোধ্য ও পরিচ্ছিন্ন ক'রে দাঁড় করাতে। (La raison raisonnante, qui est devenue chez l'Homme civilisé une sorte de manie tyrannique, veut que nous ramenions notre riche complexité à une formule claire et simple, nette et abstrait, comme un syllogisme) যারা গড়পড়তা, তাদের ক্ষেত্রে এ সম্ভব হ'তে পারে, কেন না তাদের প্রাণের পুঁজি কম ব'লেই আত্মসঙ্কোচে তারা তেমন দুঃখ পায় না। কিন্তু সত্যিই প্রাণবন্ত যারা তাদের এভাবে অঙ্গহানি করলে তারা শুনবে কেন—যখন এর ফলে আসে তাদের মধ্যে সাংঘাতিক ব্যাধি, বিশৃঙ্খলা। স্বভাবকে টিপে মারতে চাইলে সেও তার শোধ তোলে। ফলে সমস্ত মানুষটা হ'য়ে দাঁড়ায় অসুখী, অশান্ত, সদা-অতৃপ্ত—চিত্ত বিক্ষেপের ও নিরাশার খেলার পুতুল।

আমাদের মধ্যে যেসব বড় বড় প্রাণদায়িনী শক্তির ক্রিয়া চলছে তাদের খণ্ডিত করতে নেই। বরং আরো সজাগ থাকতে হয় যাতে ক'রে তাদের বিকাশ হ'তে পারে স্বাস্থ্যের দিকে। আর সব আগে চিনতে শেখা চাই আমাদের স্বভাবের মূল ধারাগুলিকে। সব প্রথমে :

১। সামাজিক মানুষ—যে-মানুষ মানবসমাজের বাসিন্দা—তার কি কি কর্তব্য আছে সকলের প্রতি, কি কি নৈতিক তাগিদ আছে তার পিছনে।

২। স্বতন্ত্র মানুষ—কি তার চাহিদা, কি তার করণীয়—তার অন্তরাত্মার দিক থেকে।

এদের মধ্যে কেউই কেউ-কেটা নয়। মতিভ্রম ঘটে যখন একে বলি দেই ওর কাছে। প্রত্যেককেই দিতে হবে যা তার প্রাপ্য।

এ নিশ্চয় জেনো যে তোমার মধ্যে যে-শিল্পপ্রতিভা আছে তার প্রতি তোমার কর্তব্য আছে—আর সে-কর্তব্য দান বা সেবার চেয়ে কম জরুরি নয়। কারণ

আমাদের কর্তব্য শুধু আজকের মানুষের কাছে নয়—যারা আমাদের প্রতিবেশী—আমাদের কর্তব্য আছে সার্বকালীন মানুষের কাছে : যে-দুর্দম মানুষ তার জৈবধর্মের অসূর্যলোক থেকে ব্যথিত হ'য়ে যুগ যুগ ধ'রে উঠতে চাইছে আলোর পানে। সেই নিত্যকালের মানুষের মহিমামূল্য কোথায় ?—তার আত্মজয়ে (…l'Homme de toujours,—celue qui, sorti des bas-fonds de l'animalité, monte opiniâtrement depuis des milliers d'ans vers la lumière. Et ce qui fait le prix de cet Homme éternel, c'est sa conquête de l'Esprit) বিদ্বান্ মানুষ, চিন্তাশীল মানুষ, শিল্পী মানুষ—প্রত্যেকেরই প্রচেষ্টা এসে মিলেছে এই বিজয়-অভিযানে। এ-মিলিত চেষ্টায় যে যোগ দিল না—কর্তব্যে সে বিমুখ হ'ল বলতেই হবে—তা যত মহৎই কেন তার উদ্দেশ্য হোক না।

খতিয়ে এটা দাঁড়ায় সৌষম্যের সমস্যা। আমাদেরকে পেতে হবে সেই পূর্ণ সুষমাকে যেখানে আমাদের বিচিত্র কণ্ঠস্বরের ঘটল সুমিলন। এ সমস্যার সমাধান হয়ত গুণীর কাছে তত কঠিন নয় যত কঠিন আর সবার কাছে : কারণ তার স্বাভাবিক সংস্কারই তাকে শিখিয়ে দেয় বুনতে, মেলাতে : যেমন জ্ঞানবৃদ্ধ হেরাক্লিটাস বলেছিলেন সবচেয়ে সুন্দর সুষমার উদ্ভব বিস্বর থেকে (car son instinct natif lui enseignc à tresser, comme dit le vieil Héraclite : "des dissonances mêmes la plus belle harmonie".) এ সমাধান ভারতের সন্তানের কাছে আরো সহজ হবার কথা—কারণ ভারতের সনাতন ভাবধারা সুষমিত জ্ঞানের রহস্যকে যেমন চেনে তেমন চেনে না য়ুরোপের ভাবধারা।

আমাদের প্রত্যেককেই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তার স্বভাবের সমতায়—বেসুরের মধ্যে নিজের সুরটি খুঁজে নিয়ে। কারণ প্রতি মানুষই একটি অদ্বিতীয় বিকাশ। জীবনের ধর্ম হ'ল এই স্বকীয় বিকাশটিকে জীবনে উপলব্ধি করা। যে করেছে এ-উপলব্ধি সার্থক তারই বাঁচা : কারণ সে-ই হয়ে উঠল যা তার হবার কথা। বলতে কি পৃথিবীতে আনন্দ তো এরই নাম।

স্নেহাসক্ত

রোমাঁ রোলাঁ

বুধবার, ২৯শে নভেম্বর, ১৯২২
ভিলন্যভ, ভিলা ওলগা
সুইজর্লণ্ড

প্রিয় বন্ধু,

নেপ্‌ল্‌স থেকে তুমি যে সুন্দর চিঠি লিখেছ প'ড়ে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। আমার খেদ রইল যে তুমি য়ুরোপ থেকে এযাত্রা চ'লে গেলে। আমার আশা ছিল তোমার সঙ্গে শীতকালে হয়ত ফের দেখা হবে। তোমার সঙ্গে আরো কত কথাবার্তা কইবার ইচ্ছা ছিল যে! বিশেষ ক'রে আমাদের একই বান্ধবী সুরেলা দেবীর চর্চায়।...

না, য়ুরোপের ও এশিয়ার সঙ্গীতের মধ্যে কোনো দুস্তর ব্যবধান নেই। একই মানুষের অন্তরাত্মা (এক হ'য়েও যে বহু) চেয়েছে উভয়ত্র অসীম অধরা জীবনকে ধরতে তার শত ভুজে। ঠিক যেন বহু শাখান্বিত বনস্পতির মতন (C'est le même Homme, dont l'âme une et multiple, come un chêne touffu, cherche avec ses cent bras a étreindre l'innombrable, l'insaisissable Vie) আমি গোটা বনস্পতিটাকেই ভালোবাসি, শ্রবণ ভ'রে শুনতে চাই তার সমগ্র গভীর মর্মরধ্বনি।

প্রতি জাতিকে তার গরিষ্ঠ মানুষের কষ্টিপাথরে তুমি যাচাই করতে চাও: এতো খুব ভালো কথা। কর্নেই-এর একটি চরিত্র বলছে:

রোমেরে পাবেনা রোম নগরীতে আর
যেথা আমি সেথা বাজে তার ঝঙ্কার।

প্রতি জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে জাতি জন্মপরিগ্রহ করে—তার ক্ষণায়ু বাস্তবতার রূপ নিয়ে নয়—তার যুগ যুগান্তরীণ গভীরতার রূপ নিয়ে। এখানে একটা কথা বলি—যদিও কথাটা হয়ত তোমার কাছে দুঃখাবহ মনে হবে: কোনো জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা তারা তার জনসাধারণের নমুনা নয়—আজকের দিনের অবস্থারও নয়, ভবিষ্যতের কোনো পরিণত অবস্থারও নয়। প্রতি জাতির সত্তার গহনতলে যে অনাহূত শক্তি, যে-মহান সম্ভাবনা বিরাজ করছে তারাই তার শ্রেষ্ঠদের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে—যদিও এ সম্ভাবনার পরম পরিণতির জন্যে যে-শক্তির দরকার, সে-শক্তি হয়ত গোটা জাতিটা কোনোদিনই পাবে না। এমনিই হয়ে এসেছে—হবেও বরাবর। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বরেণ্য মানুষ চিরদিনই তাঁদের আশপাশের জনতাকে ছাড়িয়ে যাবেন, জ্ঞানে থাকবেন বহু শতাব্দী এগিয়ে! তাঁরা

এ জনতাকে বুঝতে পারবেন—এমনকি ভালোবাসতেও। (ভালোবাসাই চাই) কিন্তু এ-জনতা কোনোদিনো তাঁদেরকে বুঝতে বা ভালোবাসতে পারবে না তাঁদের স্বরূপটিকে চিনে। হয় সে তাঁদের নিয়ে হাসাহাসি করবে—কখনো বা দেবে ক্রুসে ঝুলিয়ে—নয় করবে তাঁদের জয়ধ্বনি—বসাবে তাঁদের সেই দেবাসনে যে-আসন তাঁরা পেতে পারেন না। এতে বিমর্ষ হওয়া তোমার উচিত নয়। ভারতের গভীর প্রজ্ঞা কবে টের পেয়েছে যারা জন্মায় একই যুগে তারাও আন্তর বিকাশে সমবয়সী নয়। কেউ কেউ যে বয়সে জন্মায়—সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আবার কারুর কারুর আবির্ভাব হয় যাঁরা কোনো বিশেষ যুগে জন্মাবার মুহূর্ত থেকে উত্তীর্ণ হন সুদূর ভবিষ্যতের পারে। জ্ঞানবৃদ্ধ হেরাক্লিটাসের ভাষায়—মানুষে মানুষে এইসব পার্থক্য এমন কি বিসম্বাদও সুষমার পূর্ণায়ত সৌন্দর্যের জনয়িতা।

এসো, শুনি আমরা সেই পূর্ণ ধ্বনিসঙ্গত। বর্তমান হ'ল একটি চলন্ত স্বরসঙ্গতি—কটু, সমৃদ্ধ ও নিষ্ঠুর—কিন্তু সে গ'লে গেল ব'লে—ধ্বনিসঙ্গতের পরের অধ্যায়ে। আমরা প্রত্যেকে যে আমাদের নিজের নিজের করণীয়টুকু নির্বাহ করতে পারি নিখুঁতভাবে, ঐকান্তিক ভাবে, শুদ্ধাচারে। আর যাঁরা শ্রেষ্ঠ বা গভীরতম ভূমিকার ভার নেবেন যদি এমনই হয় যে অপরে তাঁদের ভুল বুঝল তবে তাও শোচনীয় ব'লে মনে করার কোনো কারণ নেই: কেননা তাঁদের ক্ষতিপূরণ করেন ভাগ্যদেবতা এক অপরূপ সঙ্গীতের পরমানন্দ বহন ক'রে এনে। সমাজ যদি তাঁদের 'পরে অবিচার করে—কী যায় আসে? সমাজ তো তাঁদের বিচারক নয়। বিচারক শুধু একজন—জীবনসঙ্গীতের সেই অলক্ষ্য নিয়ামক।

এ শীতকালটা আমি ভিলন্যভেই কাটাব মনে করছি। আমার কুটিরটির চারদিকেই আজ তুষারের শুভ্রতা। কিন্তু কী যে সুন্দর দেখতে! তুষারের উত্তরীয়ের নিচে আন্তর জীবন কুসুমিত হ'য়ে ওঠে। না, পারিসের অভাব আমি একটুও বোধ করি না। তবে যে অল্প দুচারজন বন্ধু আছে তারা দূরে এজন্যে একটু দুঃখ হয় বৈকি—তুমি তাদেরই দলে।

স্নেহাসক্ত

রোমা রোলাঁ

বুধবার, ১লা অক্টোবর, ১৯২৪
সুইজর্লণ্ড

প্রিয় বন্ধু আমার,

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যা লিখেছ—তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ—"আর্য" পাঠিয়েছ সেজন্যেও। তোমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার পুরোপুরি মিল আছে। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমি খুব কমই জানি—কিন্তু যতটুকু জেনেছি তা থেকে চিনতে পেরেছি তাঁকে জগতের একজন ঊর্ধ্বতম আধ্যাত্মিক শক্তিধর পুরুষ ব'লে।

য়ুরোপীয়দের মধ্যে আমি খানিকটা একলা বৈ কি। বিশেষ ক'রে ভারতের ভাবধারা সম্বন্ধে আমার ধারণা নিয়ে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই অন্ধভাবে বলে রোখালো সুরে: "এশিয়া হ'ল এশিয়া, আর য়ুরোপ হ'ল য়ুরোপ।" ফ্রান্সের একজন খ্যাতনামা দেশধ্বজ···সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে, 'একজন লোক ষড়যন্ত্র করছে পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের হাতে সঁপে দেবার। ইনি স্বতই আমাকেই চিহ্নিত করেছেন এ দলের দলপতি ব'লে।···এঁরা বলেন ক্রমাগত এই একটি কথা: যে, য়ুরোপের কাছে এশিয়ার ভাবধারা অস্পৃশ্য···এ শুধু ইংরাজ ও ফরাসীদের মত নয়—রুষদেরও এই মত—যেমন ম্যাক্সিম গর্কি—যাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ আছে। কয়েকবার আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তাঁকে বোঝাতে পারি নি। কালই তাঁর এক চিঠি পেলাম তিনি লিখেছেন: "যদি আমি প্রার্থনা করতে পারতাম তবে আমার প্রার্থনা হ'ত: 'হে ভগবান আমাদের রক্ষা কোরো ভারত ও চীনের বিষময় ভাবধারা থেকে।"

কিন্তু কী জানে তারা এ-ভাবধারার? ভারতের যা কিছু শুনেছে তারা—শুধু বৌদ্ধধর্ম মারফৎ। আর তারই বা কতটুকু জানে শুনি?

এখন শোনো আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা। "আর্য"-তে (ষষ্ঠ সংখ্যায়) দেখেছি শ্রীঅরবিন্দ ব্যাখ্যা করছেন এই তিনটি শ্লোকের (ঈশোপনিষৎ-পুস্তক দ্রষ্টব্য):

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

(যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তারা অন্ধ তমসার মধ্যে প্রবেশ করে—তার চেয়েও বেশি তমসার মধ্যে প্রবেশ করে তারা যারা শুধুই বিদ্যার চর্চায় নিরত।)

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥

(যাঁরা আমাদের কাছে তৎ-কে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের কাছে আমরা শুনেছি যে বিদ্যার পথে যা আসে তা এক, অবিদ্যার পথে যা আসে তা আর।)

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

(যিনি তৎ-কে জানেন সেই এক ব'লে যার মধ্যে দুই-ই আছে—বিদ্যা তথা অবিদ্যা, তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করেন ও বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ করেন।)

এখানে কী দেখছি আমি? যা আমি লিখে রেখেছিলাম বিশবৎসর বয়সে (শুধু আমারই জন্যে) আমার "Credo quia Verum"-এ। কেবল, অবশ্য, হিন্দুদের নামগন্ধ আমার চিন্তায় প্রবেশ করে নি—যেহেতু তখন আমি জানতামই না যে এ ধরনের চিন্তা ভারতে থাকতে পারে: আমি সে সময়ে শুধু প্রকাশ করেছিলাম যা ছিল আমার মনের অতলে। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা বেশি সমৃদ্ধ বৈ কি, উপনিষদের মন্ত্র প্রকাশেও বিশ বছরের ফরাসী কিশোরের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ—বটেই তো। আমার বলবার উদ্দেশ্য—আমার চিন্তার ধারা ছিল এ চিন্তাধারার থেকে অভিন্ন: একেবারে এক আবিষ্কার—অক্ষরে অক্ষরে।

এখন দেখ, আমি হচ্ছি ফ্রান্সের অধিবাসী—ফ্রান্সের কেন্দ্রে আমার জন্ম এক অতি কুলীন ফরাসী পরিবারে। আমার বিশ বছর বয়সে ভারতের ধর্ম বা দর্শনের সঙ্গে কোনো পরিচয়ই ছিল না। এমন কি আমি সে-সব য়ুরোপীয় দার্শনিকের ভাবধারারও খবর রাখতাম না যাঁরা ভারতের ভাবধারার স্পর্শ বা সুরভি পেয়েছিলেন—যেমন শোপেনহর। অতএব বলতেই হবে যে পাশ্চাত্যের আর্যসন্তান ও প্রাচ্যের আর্যসন্তান—এদের মধ্যে কোনো সহজ আত্মিক মিল আছে (Il faut donc qu'il puisse avoir une parenté directe entre un Aryen d'Occident et un Aryen d'Orient.) আর আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বন্ধু রায়, যে একদা আমি হিমালয়ের গা বেয়ে নেমেছিলাম আর্য দিগ্বিজয়ীদের সঙ্গে। আমার ধমনীতে বইছে তাঁদেরই রক্ত।

আমার আশা আছে এবার হয়ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হবে—তিনি স্পেন থেকে বেরুতে যাচ্ছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। অ্যাণ্ড্রুজও নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে যাবে।

আমার খুবই ইচ্ছা আছে ভারতবর্ষে একবার যাওয়ার। হয়ত এবার ১৯২৫ এর হেমন্তকালে যাওয়া হ'তেও পারে—আমার বোনের সঙ্গে।

স্নেহাসক্ত
রোমা রোলাঁ

৩রা জুন, ১৯৩০

প্রিয় দিলীপকুমার রায়,

তোমার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। কিছুই বদলাবার নেই শুধু তিনটি লাইন ছাড়া (টলস্টয়ের সম্বন্ধে আমার ২০-৩-২২ তারিখের চিঠির অনুবাদ)…আমার মনে পড়ছে না আমি ঠিক কী লিখেছিলাম, কেবল আমার বক্তব্য ছিল—টলস্টয় আমরণ তাঁর শিল্পের সুখসুবিধার অধিকার ভোগ করেছেন—না ক'রে পারেন নি।*

গান্ধীজীর কথাবার্তার যে অনুলিপি তুমি দিয়েছ আমার কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মনে হ'ল। কিন্তু তুমি তাঁকে ঠিক জবাবটি দিতে পারলে না। তাঁকে তোমার বলা উচিত ছিল :

"মানুষ চিরদিনই চলেছে প্রাণের অভিযানে। বুদ্ধির রথীরা চলে আগেভাগে—পথ-প্রদর্শক তাঁরাই। তাঁরাই সেই পথ কাটেন যে পথে পরে সবাই চলবে—একদিন। কাজেই যদি বলি যে, শ্রেষ্ঠরা আগুয়ান ব'লেই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাহলে ভুল বলা হবে। আর তাকে বলব অসার জননায়ক যে ধ্বজাবাহীদের বলে পিছিয়ে চলতে মন্থরগতিদের সঙ্গে।"

অত্যন্ত স্নেহাসক্ত
রোমা রোলাঁ

ভিলন্যুভ, সুইজর্লণ্ড
২৮শে জুন, ১৯৩৩

প্রিয় বন্ধু,

আমি বড়ই তৃপ্ত হয়েছি শ্রীমার কাছ থেকে তাঁর কথোপকথন পেয়ে। তিনি নিজে হাতে সই ক'রে যে বইখানি আমাকে উপহার পাঠিয়েছেন এতে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমার অনুরোধ রইল তুমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাবে।†

এ-ধন্যবাদের তুমি নিজেও সরীক: কারণ তোমার জন্যেই পেয়েছি আমি এমন উপহার।…বইখানি পড়তে পড়তে আমি তাঁর স্বচ্ছ ও দৃঢ় বুদ্ধির বহু প্রশংসা করেছি শ্রদ্ধার সঙ্গে। ভাষার উপর এ-কর্তৃত্ব বিরল। তুমি ভাগ্যবান যে এমন

* টলস্টয়ের সম্বন্ধে চিঠি দ্রষ্টব্য—বন্ধনীর অংশ।

† মা'র সঙ্গে আমাদের কথোপকথনের ফরাসী সংস্করণ: "Entretiens Avec La Me`re."

দুটি বিশাল প্রাণের ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছ—যাঁদের মিলনের ফলে ফলেছে এমন সমৃদ্ধ ও নিখুঁৎ সুষমা। (J'ai lu le livre avec beaucoup d'admiration pour cette lucide et ferme intèlligence, qui possède une rare maîtrise de l'expression. Vous êtes heureux d'être sous l'égide de deux grands esprits, dont l'union forme une riche et parfaite harmonie).

আমি আমার উপন্যাস **L'AME ENCHANTEE**'-র শেষ খণ্ডগুলি লিখে শেষ করেছি (একে উপন্যাস না ব'লে এখনকার ইতিহাস বলাই ভালো)। বইটি এই সামনের হেমন্তে বেরুবে।

তোমার
রোমা রোলাঁ

(এর পরে রোলাঁর আর কোনো চিঠি আমি পাই নি)

মহাত্মা গান্ধি

(জন্ম—১৮৬৯)

I believe that my life, my reason, my light, is given me exclusively for the enlightenment of my fellow-beings. I believe that my knowledge of the truth is a talent which is lent me for this object : that this talent is a fire which is a fire only when it is being consumed. I believe that the only meaning of my life is that I should live it only by the light within me, and should hold that light on high before men that they may see it.

TOLSTOY

প্রাণ মন আলো মোর—আমি জানি পেয়েছি সকলি
জীবনের তীর্থপথে সহযাত্রীদের সেবা তরে।
মোর সত্যসিদ্ধি তাই শক্তি সম বরিল আমারে।
প্রতিভা আমার লভে অগ্নিবাণী যবে আপনারে
আহুতি দিয়া সে জ্বলে। আমি মানি—আমার জীবন
কৃতার্থ হয় সে যবে অন্তরের ধ্রুবতারা-ডাকে
চলে চিরলক্ষ্যপথে। তাই গূঢ় প্রার্থনা আমার :
মোর মন্ত্রমণি যেন শিরোমণি হ'য়ে উর্ধ্বে জ্বলে
সবার নয়নপথে—না রহে সে ম্লান অচেতন।

টলস্টয়

উৎসর্গ

শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক

বন্ধুবরেষু,

স্বপনের আভা অঙ্গে তোমার ঝরে,
অজাত আশার ছন্দ সে বহি' আনে
প্রীতিসুন্দর তব অন্তর ভরে,
রাত্রিরে কবে তীর্থযাত্রী মানে!

নববর্ষ, ১৩৫১

গুণমুগ্ধ
দিলীপ

MAHATMA GANDHI:

"I have been experimenting with my self and my friends by introducing religion into politics. Let me explain what I mean by religion. It is not the Hindu religion, which I certainly prize above all other religions, but the religion that transcends Hinduism, which changes one's very nature, which counts no cost too great in order to find full expression and which leaves the soul utterly restless until it has found itself, known its Maker and appreciated the true correspondence between the Maker and itself."

"কিছুদিন থেকে রাষ্ট্রনীতির মধ্যে ধর্মকে টেনে এনে আমি আমার বন্ধুদের তথা নিজের উপর দিয়ে পরখ করছি। ধর্ম বলতে আমি কী বুঝি? হিন্দু ধর্ম না—যদিও হিন্দুধর্মকে অন্য সব ধর্মের চেয়েই আমি আদরণীয় মনে করি। কিন্তু এখানে ধর্ম বলতে আমার মনে আসছে সেই তপস্যার কথা যার ফলে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিটাই যায় বদলে—যে পূর্ণ প্রকাশের জন্যে আমরা সব মূল্যই দিতে রাজি—যে আমাদের আত্মাকে শান্তি দেয় না যতদিন না আমরা জানি আমাদের স্বরূপকে, চিনি আমাদের স্রজনকর্তাকে—ধরতে পারি তাঁর সঙ্গে আমাদের সারূপ্যের হদিশটি কোথায়।"

মহাত্মার সঙ্গে এ-কথাবার্তা হয়েছিল ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে। আমি সেগুলির অনুলিপি রেখেছিলাম তখনি তখনি। ১৯২৯শে এগুলি তাঁকে পাঠাই প্রকাশ করবার অনুমতি চেয়ে। তিনি এগুলি প'ড়ে আমাকে লেখেন এগুলি তাঁর কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক ("interesting") লেগেছে এবং তিনি যতদূর সম্ভব কম সংশোধন ক'রে ফেরৎ পাঠালেন ("with thc fewest possible alterations") : কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, মাত্র দুএকটি ছত্রে তিনি কলম চালিয়েছিলেন। এই নিরভিমানিতার গুণেই আজ তিনি সবার হৃদয় জয় করেছেন। নৈলে কি আর তিনি আমাকে লিখতেন (২০-৯-১৯২৭ সালে—তখন আমি ভিয়েনায় ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি—তাঁকে লিখেছিলাম ফের ওদেশে আসতে) :

"প্রিয় বন্ধু,

ওদেশে আমার যে নামডাক হয়েছে সত্যিই আমি তার অযোগ্য। আমার প্রায়ই মনে হয় যে যদি আমি ফের য়ুরোপে কিম্বা আমেরিকায় যাই তাহ'লে আমার সম্বন্ধে তাদের যেসব মস্ত মস্ত ধারণা আছে সব যাবে ধ্ব'সে—ভাঙবে তাদের ভুল। বিশ্বাস কোরো যে আমি শিষ্টসম্মত বিনয় প্রকাশ করতে এসব বলছি না : বলছি কেননা আমার সত্যিই এই রকম মনে হয়।

ইতি।

গান্ধি"

মহাত্মাজির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা—১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে—পুনায়। সেখানকার সাস্থন হাঁসপাতালে তিনি তখন শুয়ে—সবে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস কাটাকুটির পর। তখনো তিনি ধরতে গেলে জেলে—কেন না জেল থেকেই তাঁকে হাঁসপাতালে পাঠানো হয়। তবে সে সময়ে তিনি অসুস্থ ব'লে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা সহজেই তাঁর দর্শনের অনুমতি পেত।

সকাল বেলা। আকাশে সকালের সোনা ছড়িয়ে গেছে।

মহাত্মাজি বালিশের স্তূপের উপর আসীন—অর্ধশয়ান বলাই ভালো। ঘরে তাঁর সেক্রেটারি মহাদেও দেশাই, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর এক কন্যা, এক তামিল বক্তা, আরো কে কে। মহাত্মাজি হাসিমুখে আলাপ করছেন তাদের সঙ্গে। মনটা

ভ'রে গেল তাঁর হাসি দেখে। বয়স্কের মুখে এরকম শিশুসরল হাসি দেখার সৌভাগ্য জীবনে কমই হয়। জহরলাল তাঁর আত্ম-জীবনীতে মিথ্যা বলেননি যে মহাত্মাজির হাসি দেখবার সৌভাগ্য যার হয় নি সে জানে না মহাত্মাজি কি-বস্তু।

* * *

তাঁকে প্রণাম ক'রে বললাম : "বাঙ্গালোর থেকে পুনা এসেছি শুধু আপনাকে দর্শন করতে।"

মহাত্মাজি হেসে বললেন : "Oh, that is kind of you indeed !"

তাঁর পাশেই বসিয়ে নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

নাম শুনেই শ্রীমতী সরোজিনীসম্ভবা ব'লে উঠলেন : "ও! তুমি সেই গাইয়ে দিলীপ রায়, না?—যে য়ুরোপে ঘুরে ঘুরে গান শিখছিল ওদেশের হার্মনি এদেশের মেলডিতে আমদানি করতে?"

"ইংলণ্ডে ও জর্মনিতে আমি ওদেশের সঙ্গীত সামান্য একটু আধটু শিখেছি বটে", আমি বললাম কায়দাদুরস্ত বিনয়বচনে, "তবে আমাদের সঙ্গীতে ওদের হার্মনি আমদানি করবার কোনো দুরভিসন্ধিই আমার ছিল না কোনোদিন।"

"কিন্তু তুমি যে গাইয়ে একথা তুমি ফাঁস ক'রে ফেলেছ বন্ধু", মহাত্মাজি ব'লে উঠলেন, "কাজেই বলো এখন—এহেন এক রুগ্ন বেচারিকে তুমি কয়েকটা গান গেয়ে শোনাবে কি না। আমার ঔৎসুক্য ঐখানেই।"

"আপনাকে গান শোনাবার সৌভাগ্য আমার যে হবে এ আমি ভাবি নি মহাত্মাজি। আমি আমার তম্বুরা নিয়ে আসব কখন বলুন—বিকেলে?"

"বিকেলে এলে চমৎকার হবে—ওহো রোসো", ব'লে মহাত্মাজি ঘরের ইংরাজ নার্সকে জিজ্ঞাসা করলেন : "আমার এ-বন্ধুটি যদি বিকেলে এখানে একটু গান করেন তাহ'লে এখানকার অন্য সব রোগীদের অসুবিধা হবে কি?"

শ্বেতাঙ্গিনী হাসিমুখে বললেন : "একটুও না মিস্টার গান্ধি। তুমি যত ইচ্ছে গান শুনতে পারো।"

মহাত্মাজি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে বললেন : "তাহ'লে আজই বিকেলে—ধরো পাঁচটায়, কেমন?"

"নিশ্চয় মহাত্মাজি—কেবল ক্ষমা করবেন, একটা প্রশ্ন—গান আপনি সত্যি ভালোবাসেন তো?"

"গান ভালোবাসে না কে?—আমি গানভক্ত ছেলেবেলা থেকে—বিশেষত ভজন। তবে তোমাকে ব'লে রাখা ভালো গানের সমজদার যাকে বলে তা আমি

নই—মানে গানের টেকনিকের আমি কোন ধারই ধারি না। তবে সেজন্যে যে আমি খুব আত্মগ্লানি বোধ করি এ-ও বলতে পারি নে। গান আমার হৃদয় স্পর্শ করে—ব্যস আর কী চাই ? কী বলো ?”

“কিন্তু গানের টেকনিক জানলে কি গানের প্রতি ভালোবাসা আরো বাড়ে না ?”

“হবে। তবে আমি এ ধরণের বিশেষজ্ঞ হবার জন্যে খুব ব্যস্ত নই। গান থেকে আমি চাই প্রেরণা পেতে, আনন্দ পেতে। এ যদি আমি পাই তাহ’লেই আমি খুশী।

“আমার আজও মনে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় এমনি এক হাসপাতালের কথা। সেখানে ব্যাণ্ডেজবাঁধা অবস্থায় যখন আমি প’ড়ে, তখন আমার অনুরোধে আমারই এক বন্ধুর মেয়ে প্রায়ই আমাকে গেয়ে শোনাতেন ওদের বিখ্যাত একটি ভজন: **‘Lead kindly light’**, সে গানে আমার সমস্ত অঙ্গের বেদনা ও তাপ যেন জল হ’য়ে যেত। সে-মেয়েটির কাছে আমি কত যে কৃতজ্ঞ!—এবার কী বলবে তুমি ? আরো প্রমাণ চাই আমি গান ভালোবাসি কি না ?”

ঘরে হাসির কলরোল উঠল।

* * *

ছিলাম এক মারাঠি প্রফেসরের বাড়ী। সেখানে সারাদিন কারুর সঙ্গে ভালো ক’রে কথাবার্তা কইতে পারিনি। কেবলই মনে হচ্ছিল শ্রীঅরবিন্দ তর্পণে রবীন্দ্রনাথের

> অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার
> দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
> সেই রুদ্রদূতে বলো কোন্ রাজা কবে
> পারে শাস্তি দিতে! বন্ধনশৃঙ্খল তার
> চরণবন্দনা করি’ করে নমস্কার,
> কারাগার করে অভ্যর্থনা।

বোধ হয় মহাত্মাজি তখন জেলে ব’লেই এ লাইনগুলি ভুলতে পারছিলাম না।

অপরাহ্ণের স্বর্ণরাগ ঘরে বিছিয়ে গেছে। মহাত্মাজির চরণপ্রান্তে গিয়ে বসলাম তম্বুরা হাতে। গাইলাম মীরাবাইয়ের গান:

> ম্যনে চাকর রাখো জী।
> চাকর রহস্যুঁ বাগ লগাস্যুঁ নিত উঠ দরসন পাস্যুঁ।
> বৃন্দাবনকী কুঞ্জগলিনমে তেরী লীলা গাস্যু ॥

হরে হরে সব বন বনাউ বিচ বিচ রাখৗ বারি
সামরিয়াকে দরসন পাউ পহির কুসুমমি সারী ॥
জোগী আয়া জোগ করণকুঁ তপকরণে সন্ন্যাসী।
হরী ভজনকো সাধু আয়া বৃন্দাবনকে বাসী।
মীরাকে প্রভু গহির গম্ভীরা হৃদয় রহোজী ধীরা।
আধি রাত প্রভু দরসন দৈহেঁ প্রেমনদীকে তীরা।

মহাত্মাজির চোখে জল চিকচিক ক'রে ওঠে। নিশ্চুপ!…আমার দিকে চেয়ে মহাত্মা হাসেন সেই হাসি যে

Cleanse us from the ire of creed or class,
The anger of the idle kings :
Sow in our souls like living grass
The laughter of all lowly things.*

মহাত্মাজিই প্রথম কথা ক'ন :

"মীরার ভজন! সুন্দর না হ'য়ে পারে?"

"আপনারা নিশ্চয় গুজরাতে মীরার ভজন প্রায়ই শোনেন?"

"মীরার অনেক গানের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে—আমার সাবরমতী আশ্রমে গাওয়া হয় মাঝে মাঝেই। এমন অনাবিল আনন্দ খুব কম গানেই মেলে।"

এত ভালো লাগল……হিন্দি ভাষায় মীরা ও কবিরের ভজনের তুলনা কোথায়? বললাম: "মীরার গানের বিশেষত্ব কোন্‌খানে আপনার মনে হয়?"

"কোন্‌খানে? তার অকৃত্রিমতায়—আর কোথায় বলো? মেকির ঝুটোর নামগন্ধও নেই মীরার উচ্ছ্বাসে। মীরা গান গেয়ে গেছেন না গেয়ে থাকতে পারেননি ব'লেই। সোজা হৃদয় থেকে উঠেছে স্বভাব-উৎসের মতন—পড়েছে ফেটে। যশের মোহ বা পাঁচজনের বাহবা তো এ-গানের লক্ষ্য ছিল না—যেমন থাকে অনেক চারণ-চারণীর গানে। ঐখানেই না তার আবেদন—যা কখনো পুরানো হবার নয়।"

"আমাদের এমন সুন্দর গান আমাদের শিক্ষায় সংস্কৃতিতে আজ অবধি ঠাঁই পেয়েছে কত কম!"

"সে কথা ঠিক", মহাত্মাজি বললেন, "আর এ কি কম দুঃখের কথা? জাগার সময়ও এসেছে এখন। কারণ যদি জনসাধারণের অনাদর ঔদাসীন্যের ফলে

* **Chesterton.**

এ-গানের মরণদশা ঘনিয়ে আসে তাহ'লে সে দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না। একথা আমি বারবারই বলেছি।"

মহাদেও দেশাই বললেন: "সত্যি, একথা উনি প্রায়ই ব'লে থাকেন।"

বললাম: "একথা শুনে এত ভালো লাগল মহাত্মাজি যে কী বলব? কারণ —কিছু মনে করবেন না—আমার কেমন যেন ধারণা ছিল যে, আপনার কঠোর জীবনসাধনায় কারুকলার কোনো স্থানই নেই। বলতে কি, আমার অনেক সময়েই ভয় হয়েছে যে আপনি সঙ্গীতের প্রতি বিরূপ।"

"বিরূপ! বিরূপ!! আর সঙ্গীতের প্রতি!!!" মহাত্মাজি ব'লে উঠলেন। আমি একটু যেন লজ্জাই পেলাম—এতটা খোলাখুলি কথা না বললেই হ'ত হয়ত।

কিন্তু মহাত্মাজির মুখে বরাভয়ের স্মিতহাসি ফুটে ওঠে তক্ষনি: "না না তোমার কোনো অপরাধই হয় নি দিলীপ। আমি জানি—বুঝি-ও—কেন এমনতর কথা রটে আমার সম্বন্ধে—তবে কী করব বলো? আমার সম্বন্ধে এত রকমের উদ্ভট ধারণা আকাশে বাতাসে চারিয়ে গেছে যে এখন আর কোনো উপায়ই নেই।"

কেউ কেউ একটু হাসলেন।

"কিন্তু এসব রটনার ফলে হয়েছে এই যে আমার প্রিয় বন্ধুরাও হাসেন যখন আমি বলি যে আমি নিজেকে সত্যিই একজন শিল্পী মনে করি। তারা ভাবে এরকম ঠাট্টা আমার মুখ দিয়ে কমই বেরিয়েছে।"

সবাই এবার আরো হেসে ওঠে।

"আমিও যে একথায় হাসছি এতে দোষ ধরবেন না মহাত্মাজি," বললাম আমি, "কিন্তু এ-ও কি হ'তে পারে না যে, আপনার কৃচ্ছ্র সাধনার দরুণই এধরণের ধারণা পাঁচজনের মনে আজ বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে? কারণ সত্যি, পাঁচজনকে খুব দোষ দেওয়াও তো যায় কি যদি তারা কৃচ্ছ্র বা সন্ন্যাসের সঙ্গে শিল্পপ্রীতিকে এক ক'রে দেখতে না পারে?"

"কিন্তু কেন তারা বুঝবে না যে সন্ন্যাসই হ'ল জীবনের সবচেয়ে বড় শিল্প?"

"সন্ন্যাস—শিল্প?"

"নয়? শিল্প আসলে কী? না, সরল সুষমা, বটে তো? আর সন্ন্যাস কী? না, সরলতম সুষমাকে প্রতিদিনের জীবনে পরম সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তোলা—সব চোখ-ধাঁধানো কৃত্রিমতা ও ভান বাদ দিয়ে প্রতি পদে খাঁটি থাকার সাধনা। তাই

তো আমি প্রায়ই বলি যে সাঁচ্চা সন্ন্যাসী শুধু যে শিল্পের সাধনা করে তা-ই নয়—তার জীবনটাই একটা অখণ্ড শিল্পকারু।”

মহাত্মাজির কণ্ঠস্বরে আবেগের ঈষদুত্তাপ ফুটে ওঠে: “ভাবতে পারো, এ-ই যার মত তাকে কিনা লোকে বলে সঙ্গীতের প্রতি বিরূপ—শুধু এই কারণে যে সে স্বভাব-সন্ন্যাসী!—আমি হলাম কি না সঙ্গীতবিমুখ—যে-আমি ভারতের ধর্মজীবন ও সঙ্গীতকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখার কথা ভাবতেও পারি না! এর পরে কী-ই বা বলব বলো দেখি?” মহাত্মাজির মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে।

“কিন্তু তাহ'লে আপনাকে সবাই সঙ্গীতশিল্পবিমুখ মনে করল কী অপরাধে?”

“কিছু হয়ত আছে অপরাধ”, মহাত্মাজি ফের হাসেন অল্প, “একটা সম্ভবত এই যে, জীবনে অনেক কিছু শিল্প ব'লে শিরোপা পায় যাদের মধ্যে আমি কোনো মহিমাই দেখতে পাই নে। এর মানে অবশ্য এই যে, আমার মনের প্রাণের মূল চাহিদাগুলিই আলাদা—my values are different: যেমন ধরো আমি তাকে মহৎ শিল্প বলি না যার কদর শুধুই বিশেষজ্ঞদের কাছে—অর্থাৎ টেকনিকের অন্ধি-সন্ধি না জানলে যার কোনো মাথামুণ্ডুই পাওয়া যায় না। আমি মনে করি যে মহৎ শিল্পের আবেদন ঠিক প্রকৃতির সৌন্দর্যের মতন বিশ্বজনীন! চুলচেরা বিচার নিয়ে মাথা বকানোর নামই যে শিল্পবোধ এ আমি ভাবতেই পারি নে। খাঁটি রসবোধের সঙ্গে সমজদারিয়ানা বা ভানটানের চেকনাইয়ের কোনো সম্বন্ধই নেই। তার ভূষণ হবে সরল—তার প্রকাশ হবে সহজ—ঐ যে বললাম ঠিক প্রকৃতির প্রাঞ্জল ভাষার মতন।”

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম: “কিন্তু—শুনতে পাই আপনি নাকি আপনার ঘরে ছবিটবি টাঙানোর বিরোধী? এ-ও কি নিন্দুকের অপবাদ?”

“না”, মহাত্মাজি মৃদু হাসেন আবার, “আর আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে হয়ত আমার বন্ধুরা অনেকে এই জন্যেই ধ'রে নেন যে আমি অন্তরে অন্তরে শিল্পবিমুখ।”

“কিন্তু দেয়ালে ছবি টাঙানোয় আপনার আপত্তি কি?”

“কেন টাঙাব বলো দেখি—যখন দেয়াল আমরা তুলেছি শুধু আশ্রয় পেতে, বাসা বাঁধতে? দেয়ালের আসল যে-সার্থকতা তা ছাড়া অন্য সার্থকতা তাকে দিতে যাওয়াই বা কেন—এভাবে কোমর বেঁধে? যারা এ চায় করুক না কেন—তাদের ভালো লাগে, ছবিতে ছবিতে দেয়াল ফেলুক না ছেয়ে—আমি তো মানা করছি

না। কেবল আমার নিজের প্রেরণার জন্যে ছবির আমার কোনো দরকার নেই—ব্যস্‌ চুকে গেল।* প্রকৃতিই আমার কাছে যথেষ্ট।"

মহাত্মাজি একটু থেমে বললেন: "তারাভরা আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে কতদিন এ-জ্যোতি-রহস্যের অতল বিস্ময়ে আমি ডুবে গেছি—কখনো চোখ ক্লান্ত হয় নি। প্রান্তর, কান্তার, গিরি, নদী, সাগর, পর্বত এ সব কি নেই—এ সব থেকে যখনই চেয়েছি মেটেনি কি আমার সৌন্দর্যের ক্ষুধা? তারাজাগা আকাশ, মহান্‌ সমুদ্র, স্বপ্নালু শৈলমালা এদের গানে মনে প্রাণে যে-শিহরণ জাগে তার সঙ্গে কি কোনো ছবির শিহরণের তুলনা হ'তে পারে কখনো? অস্তগোধূলির বিদায়াভা, উদয়গোধূলির হাস্যচ্ছটার কাছাকাছিও কোনো বর্ণসম্পদ কি কোনো পার্থিব তুলির থাকতে পারে কখনো?"

"না দিলীপ", বললেন মহাত্মাজি, "প্রকৃতি থাকুন আমার বেঁচে—আর কোনো প্রেরণাই আমার চাই না। আজো তাঁর রহস্যভাণ্ডার আমার কাছে তেম্‌নি অফুরন্ত, আনন্দময়, স্বপ্নভরা। মানুষের ছেলেমানুষি কারুকলার কী দরকার আমার? ভগবানের শিল্পকারুর গভীর রহস্যের পাশে মানুষের সৃষ্টি আমার কাছে লাগে রঙচঙে খেল্‌না। তাই বলো দেখি, আজকের দিনে যে সব রঙিনিয়ানা শিল্পের ঠাটঠমকে চলেছে শোভাযাত্রায়—তাদের মধ্যে এমন কী আছে যা আমাদের মন ভোলাতে পারে বিশেষ যখন দেখছি প্রকৃতি তাঁর অফুরন্ত সৌন্দর্য-সমারোহ নিয়ে আমাদের চিত্তরঞ্জন করবার জন্যে সর্বদাই হাত বাড়িয়ে?"

মহাত্মাজির মতামত জানতেই আমি গিয়েছিলাম—তাঁর কাছে যা কিছু শিখবার আছে শিখতেই—তর্ক করতে নয়। কাজেই তাঁর সঙ্গে অমিলের দিকটায় জোর না দিয়ে মিলের দিকটায়ই জোর দিলাম, বললাম: "আপনি প্রকৃতিকে শিল্পিরাণী বলছেন এতে কে না সায় দেবে আপনার সঙ্গে? তাঁর ঐশ্বর্য তাঁর আনন্দের সঙ্গে মানুষের সাজসরঞ্জামের তুলনাই বা হবে কী ক'রে বলুন? তা ছাড়া যে-সব রঙিনিয়ানা সমজদারিয়ানা আপনার ভালো লাগে না, সে-সব যে আসলে অসার এ-ও কে না মানবে? আমারও তো কতদিনই মনে হয়েছে যে, শিল্পীর আত্মপ্রসাদ বড় সর্বনেশে, তার প্ররোচনাতেই মন বলে যে, শিল্প জীবনের চেয়েও বড়।"

"বটেই তো," মহাত্মাজি বললেন খুশী হ'য়ে, "যতরকম শিল্প আছে জড়ো ক'রে

* Only I do not need them *for my inspiration*—সংশোধনে মহাত্মাজি নিজে হাতে লিখেছিলেন শেষ তিনটি শব্দ।

তাদের ঠিক দিলেও তারা জীবনের মহিমার কাছেও আসতে পারে নি কোনোদিন—পারবেও না। মহৎ জীবনের পটভূমিকা না থাকলে এই তথাকথিত মহৎ শিল্প তুমি ফলিয়ে তুলবে কোথায় শুনি? শিল্পকে উচ্ছ্বাসের আকাশে তুললে হবে কি যদি এসবের ফলে জীবন ক্রমশই বামন অবতার হ'য়ে উঠে? শিল্প হ'ল জীবনের নিহিতার্থ, সৃষ্টির মুকুটমণি, বেঁচে থাকার মূল হেতু—এধরণের কথা শুনলে না হেসে থাকতে পারা যায়?"

ঘরের মধ্যে সবাই চুপ।

"শিল্প জীবনের চেয়ে বড়!" মহাত্মাজির কণ্ঠে ঈষৎ ব্যঙ্গের রঙ ধরে: "যেন এ-ধরণের গালভরা বুলির চেকনাইয়ে মন ভরে কখনো! যেন কোনো একটামাত্র বাঁধাধরা পথে আত্মার মুক্তি মিলতে পারে! শিল্প সম্বন্ধে এই ধরণের হসনীয় দাবি করলে তবেই আমি বলি যে ওতে আমি নেই। কারণ আমার কাছে সবচেয়ে বড় শিল্পী সে-ই যে সবচেয়ে মহৎ জীবন যাপন করে। আমি নামঞ্জুর করি শিল্পকে না—শিল্পের এই ধরণের গুমরকে, আত্মম্ভরিতাকে। তাই তো বলছিলাম তোমাকে যে, আমার জীবনের মূল চাহিদাগুলিই আলাদা—এর বেশি না।"

মহাদেও দেশাই আমাকে সহাস্যে বললেন: "তোমার কথাবার্তা শুনেই বুঝি রোলাঁ মহাত্মাজির শিল্পমত সম্বন্ধে ঐসব কথা লিখেছেন তাঁর গান্ধি-জীবনীতে?"

"তা হবে কেমন ক'রে? আমি কি শিল্পকলা সম্বন্ধে মহাত্মাজির মতামত জানতাম?" ব'লে মহাত্মাজিকে বললাম: "আপনার হয়ত শুনে ভাল লাগবে মহাত্মাজি যে এবিষয়ে রোলাঁ আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তাঁর বিখ্যাত **Jean Christophe** উপন্যাসে তিনি বারবার বলেছেন এই একই কথা যে জীবন তার সব প্রকাশকেই ছাড়িয়ে যায়।"

"ঠিক কথা", মহাত্মাজির কণ্ঠস্বরে প্রসন্নতার রেশ, "আমার কাছে জীবন চিরদিনই এক মহারহস্য, দেবতার পরম দান। এহেন বিচিত্র সৃষ্টিকে ঠিক দেখা কি সম্ভব—যদি একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে দেখতে যাও? সেইজন্যেই আমি বলি এত জোর ক'রে যে, সবচেয়ে বড় শিল্পী তিনিই যিনি সবচেয়ে বড় জীবন-যাপন করেন।"

সেদিন ক্রমাগতই মনে ঘুরছিল মহাত্মাজির গুরু টলস্টয়ের নানা কথা তাঁর **What is Art** বইটিতে। তিনি একবার একটি নাটিকার মহলায় গিয়ে ক্লিষ্ট হ'য়ে

ফিরে (হায় রে, যদি আজকালকার টকি দেখতেন হয়ত আত্মহত্যা করতেন।) এসে লেখেন :

"শুধু যে এতে বিপুল পরিশ্রম তাই নয়—এধরণের শিল্পের জন্যে নটনটীদের সমস্ত জীবন যায় নষ্ট হ'য়ে। শত শত লোক আশৈশব শেখে হয় হাতপা ছোঁড়া (এদের বলা হয় নাচিয়ে), না হয় কণ্ঠকসরৎ বা যন্ত্রতাণ্ডব (এদের নাম—গাইয়ে-বাজিয়ে), নৈলে হয়ত বা রঙচঙ দিয়ে হাজারো মূর্তি আঁকা (এদের নাম চিত্র), না হয় শব্দ নিয়ে ভেল্কিবাজি (এদের নাম কবি)। ফলে হয় কি, এইসব লোক—অনেক সময়ে এরা বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি নিয়েই জন্মায় কিন্তু—তাদের একপেশো উদ্ভট পেশাদারির ফলে হ'য়ে দাঁড়ায় অমানুষ, জীবনে সব সার্থক কাজেরই অর্থবোধ খুইয়ে শেখে শুধু হাতপা, জিভ বা আঙুল নিয়ে নানা রকম চাতুরী খেলতে।

"এইসব শিল্পীরা—সাম্প্রদায়িকদের মতন—নিন্দার আনন্দে পরস্পরকে নামঞ্জুর করতে করতে নিজেরাও লোপ পায়।···কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যে-শিল্প মানুষের কাছে এত বেশি ত্যাগ ও নিষ্ঠা দাবি করছে, যে তার জীবনকে দিল বামন ক'রে, প্রেমকে করল অপমান সে-শিল্পের শুধু যে কোনো নামনিশানা নেই তাই নয়, সে আলাদা আলাদা পূজারীর কাছে এমন আলাদা আলাদা মূর্তি ধরে যে বোঝা ভার হ'য়ে ওঠে কেন এই কিম্ভূতকিমাকার বস্তুর জন্যে মানুষকে এতশত ছাড়তে হবে, সইতে হবে, সাধনা করতে হবে।"

মহাত্মাজির সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রাসাদে—৪ঠা নভেম্বর ১৯২৪ : বিকেলবেলা।

নামজাদা সবাই হাজির : দেশবন্ধু, কেলকার, তুলসীচরণ, শেরওয়ানি, জয়াকার, শরৎ বসু, রাজগোপালাচারী, আবুল কলম আজাদ আরো কত অধিনায়ক যে—!

ঘরে ঢুকে মহাত্মাজিকে প্রণাম করতেই তিনি হেসে বললেন : "তোমার দুর্ধর্ষ তম্বুরাটি কোথায় ?" (Where is your instrument of torture ?)

আমি বললাম : "ওটাকে রেখে এসেছি, মা ভৈঃ। আগে নেতারা তো আপনাকে রেহাই দিন।"

মহাত্মাজি হেসে বললেন : "আচ্ছা," দেশবন্ধুর দিকে ফিরে : "তুমি তাহ'লে দিলীপের জেলর হ'তে রাজি তো ? দেখো, আমাকে গান না শুনিয়ে যেন না পালায়।"

আমি বললাম : "সে-দুর্ভাবনা করবেন না। মেরে না তাড়ালে গান না শুনিয়ে আমি নড়ছি নে।"

*　　　　*　　　　*

অতঃপর কংগ্রেসের প্রোগ্রাম নিয়ে তুমুল তর্ক। সে-সময়ের ভিতরকার কথা খবরের কাগজে বেরুত না। প্রায় সবাই খদ্দরের বিপক্ষে—স্বচক্ষে দেখলাম, স্বকর্ণে শুনলাম।

একজন বললেন: "আমি খদ্দর পরি কেন জানেন মহাত্মাজি?"

মহাত্মাজি হেসে বললেন: "নিশ্চয়ই খদ্দরে শ্রদ্ধার জন্যে নয়?"

তিনি হেসে বললেন: "না—আমি খদ্দর পরি শুধু এইজন্যে যে খদ্দর প'রে কাউন্সিলে গেলে সাহেবরা ভারি চটে।"

(মনে পড়ল দ্বিজেন্দ্রলালের "আমরা বিলাত ফের্তা ক'ভাই"—যে, "আমরা বিলাত ফের্তা কটায় দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই, আমাদের সাহেব যদিও দেবতা তবু ঐ সাহেবগুলোই চটাই।")

মহাত্মাজি একগাল হেসে বললেন: "তোমার মতন আর একজন বীরপুরুষ বলেছিলেন: মহাত্মাজি আমি তোমার কাছে মিলের কাপড় প'রে আসি তোমাকে শায়েস্তা করতে, আর সাহেবদের শায়েস্তা করি তাদের কাছে খদ্দর প'রে গিয়ে।"

সবাই খুব একগাল হাসলেন।

দেশবন্ধু কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে বললেন: "মহাত্মাজি, এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা গরম ক'রে দেবেন না দোহাই আপনার। আমাদের দফা সারবে (জয়াকরের প্যানে চেয়ে): "এই একগুঁয়ে মারাঠা—আর—"

মহাত্মাজি টপ ক'রে বললেন: "আমি তো?"

সবাই হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লেন।

দেখলাম সেদিন মহাত্মাজির আশ্চর্য আত্মসংযম। প্রায় সবাই খদ্দরের বিপক্ষে—সবাই তারস্বরে চীৎকার করছেন—কেউ কারুর চেয়ে কম যান না—কারুর সঙ্গে কারুর মিলের চিহ্নও নেই—চারদিকে চলেছে "বাক্যের ঝড় তর্কের ধুলি"—একা মহাত্মাজি ব'সে নির্বাত সন্ধ্যার হ্রদের মতন শান্ত—তুফানের নামগন্ধও নেই—হাসিতে উজ্জ্বল, সংযমে স্নিগ্ধ, রহস্যে মধুর, যুক্তিতে প্রাঞ্জল। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, শেষটায় সবাইকে টানলেন দলে। অমন যে তেজস্বী দেশবন্ধু তাঁহাকেও গ্রহণ করতে হ'ল খদ্দর।

জীবনের অশেষ অভিশাপের মধ্যে এক পরম বর যে মৃত্যু, সেদিন বুঝলাম—যখন সে-তর্কেরও এল মৃত্যুলগ্ন।

ঘরের মধ্যে শান্তি ফের নিটোল হ'য়ে উঠল। মহাত্মাজি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "এবার ?"

"কিন্তু" বললাম একটু ইতস্তত ক'রে, "আপনার কি এ-কুরুক্ষেত্রের পরেও ক্লান্ত লাগছে না ?"

"লাগছে ব'লেই তো তোমাকে গাইতে হবে।"

আমি গাইলাম কবীরের একটি বিখ্যাত গান:

জিনকে হৃদিমে সিরি রাম বসে
উন সাধন ঔর কিয়ে ন কিয়ে।
জিন সন্তচরণরজকো পরসা
উন তীরথনীর পিয়ে ন পিয়ে॥
সব ভূত দয়া জিনকে চিতমে
উন কোটন দান দিয়ে ন দিয়ে।
নিত রামরূপ জো ধ্যান ধরে
উন রাম নামন লিয়ে ন লিয়ে॥

"আপনাকে আমি একটি চিঠি প'ড়ে শোনাতে চাই মহাত্মাজি।"

"কার ?"

"রোলাঁর। তাঁকে আমি পাঠিয়েছিলাম পুনায় আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তা। তার উত্তরে তিনি আমাকে জানিয়েছেন—এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য।"

"তাই না কি ? পড়ো পড়ো।—না না, আমি মোটেই তেমন ক্লান্ত বোধ করছি না।"

মহাত্মাজি একটা প্রকাণ্ড খাটে শুয়ে—আমি পাশে ব'সে পড়লাম:

"প্রিয় দিলীপকুমার, বম্বে থেকে তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলে তার জন্যে তোমাকে আমার সস্নেহ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহাত্মাজির কাছে আমার সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছ তার জন্যেও তুমি আমার ধন্যবাদ নেবে। তার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সম্ভবত আমি ওর অনুবাদ ছাপব কোনো ফরাসী পত্রিকায়—অবশ্য আমার নিজের প্রসঙ্গটুকু বাদ দিয়ে। শিল্পকলা বিষয়ে ওঁর ভাবধারা জানা খুবই দরকার—আর তুমিই সব প্রথম এ সব গোচর করলে সবাইকে। কেবল আমার আফশোষ হয় এইজন্যে যে, মহাত্মা তাঁর নিজের শিল্পমন্ত্রটি খুলে বলতে বলতে বলেন নি। ধরো, যেখানে তিনি তারকা-খচিত আকাশ সম্বন্ধে তাঁর মনোজ্ঞ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সেখানে ঠিক তার পরেই যদি তিনি বলতেন: 'কিন্তু

তা ব'লে আমি ভারতীয় চিত্রকলা ও স্থাপত্যের কম অনুরাগী নই'—তাহ'লে কী খুশীই যে হতাম আমরা! কিন্তু তিনি তারকা-খচিত আকাশের কথা ব'লেই থেমে গেলেন। অবশ্য একথা কে না মানবে যে প্রকৃতিই এদিকে সবচেয়ে বড় শিল্পী। কেবল আমরা মহাত্মার মতন মস্ত মানুষের কাছে আশা করি যে, প্রকৃতিস্তবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলবেন এই ধরণের কোনো কথা: 'মানুষও যে প্রকৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে রেখা-রঙ-ধ্বনি-চিন্তায় সৌন্দর্যের পূজারী হ'য়ে ওঠে।' তাঁর কথাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যে, প্রকৃতি বা প্রকৃতির অন্তর্লীন দিব্য সত্যের সাম্‌নে তিনি শুধু চান নিষ্ক্রিয় প্রেমিক হ'য়ে থাকতে। কিন্তু যদি ভগবান আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে থাকেন তাহ'লে কি নিজের নিজের শক্তি-অনুসারে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য নয় সেই পরম-সৌন্দর্যনিয়ন্তার প্রতিচ্ছবি হ'য়ে ফুটে উঠতে চেষ্টা করা?

"তোমার কথোপকথনের একজায়গায় মনে হ'ল যে শিল্পকলা সম্বন্ধে মহাত্মাজির মতামত নিয়ে আমি যা লিখেছি তাতে মহাত্মাজি ও তাঁর বন্ধুরা একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছেন। আমি এবিষয়ে নিজের কোন মন্তব্য প্রকাশ করেছি ব'লে তো কই আমার মনে পড়ছে না! কিন্তু যদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি আমার বইয়ে এসম্বন্ধে কোনো ভুলচুক ক'রে থাকি, কিম্বা অজ্ঞাতসারে তাঁর অপ্রীতিকর কোনো কিছু ব'লে থাকি তাহ'লে সেজন্যে আমার চেয়ে বেশি খেদ কার? তবে যতই তাঁকে আমি সম্মান করি না কেন, যতই কেননা তাঁকে ভালোবাসি, আমি একজন য়ুরোপীয় তো বটে—আমার পক্ষে এশিয়ার এহেন মহাপ্রাণ মানুষকে ভুলবোঝা তো খুবই স্বাভাবিক। আমার একমাত্র সাফাই এই যে কোনো প্রাণবন্ত মহিমার তলস্পর্শ করবার ঔৎসুক্যে আমি কখনো আত্মাদরকে প্রশ্রয় দিইনে। আমি শুধু চাই যে আমার ভুল তিনি দেখিয়ে দিন, আমি শুধ্‌রে নেব।

"১৯২২শে যখন মহাত্মাজির জেল হ'ল ছ'বছর তখন কোনো য়ুরোপীয় এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি এতে তোমার বেজেছে। তুমি বিস্মিত হয়েছ। কিন্তু তুমি কি খবর রাখো যে মহাত্মাজিকে যে য়ুরোপ এত বেশি ভুল বোঝে তার জন্যে সবচেয়ে দায়িক তোমরা নিজে! তোমাদের কেউ বা বললেন যে গান্ধি এক অতি অদ্ভুত উদ্‌ভট ছায়ামূর্তি, তিনি বুদ্ধিশুদ্ধির ধারপাশ দিয়েও যান না: কেউ বা বললেন যে, তিনি ভিতরে ভিতরে বলশেভিক, অহিংসার ঝাণ্ডা উড়োচ্ছেন শুধু ওতে ক'রে কাজ হাসিল হয় বলে। ফলে লোকের ধাঁধা লাগল বা: "গান্ধি! কী ব্যাপার!" শুধু কি এই? 'শান্তি-ও-স্বাধীনতার-জন্যে-গঠিত-আন্তর্জাতিক-নারী-

সঙ্ঘ' মহাত্মাজির কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে লেখালিখি করবে ব'লে স্থির করেছে, হঠাৎ এল একদল ভারতীয় মহিলার তীব্র প্রতিবাদ। তাঁরা লিখলেন কী জানো?—যে, গান্ধি ভিতরে ভিতরে হিংসাতান্ত্রিক।...এঁদের নাম আমি তোমাকে দিতে পারছিনে, তুটি কারণে: (১) দেবার কোনো এক্তিয়ার নেই আমার; (২) এঁরা অন্য অন্য ভারতীয়দের ক্রোধভাজন হোন এ আমি চাইনে—সেটা মহাত্মাজির বাণীর বা ইচ্ছার সঙ্গে খাপ খাবে না ব'লেও বটে। আমাদের কাছে তোমার মতন লোকের মারফৎ তো সব খবর আসে না—এমন লোক যাদের মধ্যে দেশভক্তির সঙ্গে রয়েছে সত্যনিষ্ঠা।

"কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবতে গেলেই দেখা যায় যে, জগতের পনের আনা মানুষ যে-সব হীনাদপিহীন পাপের চাপে আজ কাৎরাচ্ছে ভারতবর্ষ আসলে সেই যন্ত্রণারই অংশীদার। তাছাড়া য়ুরোপেও তেজস্বী মানুষেরা এধরণের সমবেদনা প্রকাশ করলেও তার প্রচার হয় না। আর সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ঘরের তুঃখপরিধি ডিঙিয়ে বাইরে পৌঁছয় না। এসব বুঝে একটু দরদী হ'য়ে তবে বিচার করতে হয়।

"আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা করো তবে আমি অকপটে বলতে পারি প্রিয়বন্ধু, যে আমাদের দেশকে বা য়ুরোপকে আমি অন্য দেশের থেকে আলাদা চোখে দেখিনে। আমি মনে করি আমার ভাই নয় কে? কার বেদনা আমাকে সহোদরের বেদনার মতন না বাজবে? যে-কোনো জাতির মহৎ ভাবধারা আমার কাছে চিরপরিচিতের ম'তই মনে হয়। বিশ্বের কোথায় নেই আমার ঘর? বিস্ময়ের যদি কিছু থাকে তবে সে এই যে, এশিয়ায় ও য়ুরোপে বেশির ভাগ নরনারী অন্তরে অন্তরে সমস্ত জগতের সঙ্গে এই গভীর ঐক্য বোধ করে না।

"করে না—একথা না মেনে উপায় নেই, যেজন্যে আমার স্বদেশীরা আমার প্রতি বিরূপ। তাদের চোখে সত্যিই আমি একজন বিদেশী—যেহেতু আমার ছোট্ট স্বদেশের গণ্ডির মধ্যে আমি নিজেকে আটকে রাখতে নারাজ। এইজন্যেই আমার জীবনে এসেছে সবচেয়ে বেশি তুঃখ, সবচেয়ে বেশি বেদনা।"

ব'লে থেমে আমি মহাত্মাজিকে বললাম: "রোলাঁ তাঁর একটি বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন এই কথাগুলি:

Je me suis trouvé depuis up an, bien riche en ennemis. Je tiens à leur dire ceci : ils peuvent me haïr, ils ne parviendront pas à m'apprendre la haine......Ma tâche est de dire ce que je crois juste et humain. Que cela plaise ou que cela irrite, cela ne me regarde plus. Je sais que les paroles dites font

ellesmême leur chemin. Je les sème dans la terre ensanglantée. J'ai confiance. La moisson lèvera.' "

(আমি গত বৎসরে টের পেয়েছি যে আমার শত্রু অগুন্তি। তাদেরকে আমার বলবার কথা শুধু এই : 'আমাকে তোমরা বিষচক্ষে দেখতে পারো, কিন্তু তোমাদেরকে আমি কখনো বিষচক্ষে দেখব না—ও-বিদ্যাটি তোমরা পারবে না আমাকে শেখাতে।'...আমার মন্ত্র হচ্ছে—আমি বলবই যা বলা আমি উচিত মনে করি, মানবতার যোগ্য মনে করি—এ-বলায় অপরে খুশী হ'ল কি রাগ করল কী আসে যায়? আমি যে জানি—প্রতি সত্যবাণী তার নিজের পথ কেটে বেরিয়ে যায়। রক্ত-উর্বর মাটিতে আমি বুনি এর বীজ; আমার মন যে বলে—ফলবে, ফসল ফলবে।)

একথাগুলির ইংরাজী অনুবাদ ক'রে মহাত্মাজিকে শোনালাম, তারপর ফের পড়তে লাগলাম রোলাঁর পত্র :

"আমার শুধু এই কামনা যেন আমার জীবনের দুঃখব্যথার ফলে এর পরে মানুষের জীবনযাত্রা একটুও অন্তত সুখের হয়, যেন মিলনের পথে পরস্পরকে বুঝতে পারার পথে চলা তাদের পক্ষে একটুও সহজ হ'য়ে আসে।

"মহাত্মা গান্ধি সম্বন্ধে হয়ত আমার নানা লেখাই তোমার চোখে প'ড়ে থাকবে। তবু আমি তোমাকে পাঠালাম আমার গান্ধিজীবনী। অগুন্তি লোক পড়েছে বইটি। যদিও সমালোচকেরা আমার সম্বন্ধে জোট বেঁধে চুপ ক'রে রইলেন—যেমন তাঁরা বরাবরই ক'রে থাকেন—তবু এ-বইটির অনেকগুলি সংস্করণ হ'য়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আর অনেক দেশধ্বজের মনে লেগেছে বেশ একটু ধাক্কা।

"আশা করি তোমার সাঙ্গীতিক অভিযানে তুমি চলেছ একটানা। ছেড়ো না এ-সাধনা। কারণ এ বড় সুন্দর কাজ—আর তোমার দ্বারাই হবে এ-কাজ।

"আবার দেখা হবে প্রিয়বন্ধু! আমি তোমাকে প্রায়ই লিখি না বটে, কিন্তু যখন লিখি, লিখি অনেক কিছুই।

"আমার স্নেহসম্ভাষণ জেনো।

রোমা রোলাঁ"

মহাত্মাজি বললেন : "কিন্তু আমি তো তোমাকে বলি নি যে, শিল্পকলার চর্চা আর না হোক। এমন কথা আমি বলতেই পারি নে। মানুষের রুচি, মত, মেজাজ রকমারি। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে, আমি নিজে চিত্রকলার মতন

শিল্পের পক্ষপাতী নই—ওকে আমার দরকার নেই আমার ‘নিজের’ প্রেরণার জন্যে। আমি যথেষ্ট তৃপ্তি পাই তারাভরা আকাশের দৃশ্যে। সম্ভবত য়ুরোপের পক্ষে ছবি দরকার: তাদের তো নেই আমাদের আকাশ।”

“কিন্তু যদি তাদের আকাশ প্রায়ই মেঘলা না থাকত তাহ’লে কি তারা চিত্রানুরাগী হ’ত না বলতে চান আপনি?”

“ঠিক তাও বলি নে। তাদের চিত্র-প্রীতির অন্য কারণও থাকতে পারে বৈকি। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমি নিজে ছবির কোনো প্রয়োজনই বোধ করি নে। তাছাড়া চিত্রচর্চা করার মতন অবস্থাও আমার নয়।”

আমি নাছোড়বন্দ: “কিন্তু যদি ধরুন আপনার অবস্থা খুব ভালো হ’ত—যদি আপনি ধনী হ’তেন?”

মহাত্মাজি অগত্যা বললেন: “এবিষয়ে আমার নিজের রুচি নিয়ে যদি তোমার এতই মাথাব্যথা থাকে তাহ’লে শোনো: ছবিতে আমি তেমন সাড়া দিতে পারি নে। তাই আমি কাউকেই অনুরোধ করি না যে আমার ঘরের দেয়ালে ছবি সাজাও।” ব’লে একটু হেসে বললেন: “কিন্তু হয়েছে কি, আমি যে দেয়ালও চাই নে। দেয়াল-তোলা গণ্ডি থেকে যে অহরহ চায় নিষ্কৃতি সে কেন চাইবে দেয়ালকে সাজিয়ে তুলতে? আমি যে স্বভাবেই ঘরছাড়া—বুঝতে পারছ কি কী বলতে চাইছি আমি?”

বললাম: “বুঝেছি, কেবল তবু জানতে ইচ্ছে হয় যে যদি সবাই ছবি ছেড়ে বনে জঙ্গলে দৌড় দিত তাহ’লে কি সেটা ভালো হ’ত?”

“সেটা নির্ভর করে তাদের মন মেজাজ রুচি মতিগতির উপর। আমি তোমাকে বলতে চেয়েছি যে প্রকৃতিকে যদি সাথী পাই তাহ’লে অন্য কোনো সৌন্দর্যকে না হ’লেও আমার চলে। তবে অন্যে যদি সত্যি বিশ্বাস করে যে ছবির মতন শিল্প মানবজাতির পক্ষে শুভ—বেশ কথা। কেবল আমি বলি যে, শিল্পের নামে আত্মপ্রসাদ ও আত্মবঞ্চনাকে প্রশ্রয় দিও না—মনে রেখো যে, সমস্ত মানুষের প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। তোমার শিল্প যে-পরিমাণে জন-সাধারণের কাছে আসবে সেই পরিমাণে সে শুভ। যে-পরিমাণে আসবে না সেই পরিমাণে মন্দ।”

“কিন্তু ধরুন জনসাধারণ যদি এখনি কোনো শিল্পের কদর না বোঝে? অনেক শিল্পের উচ্চতম বিকাশ বুঝতে কি অন্তত খানিকটা শিক্ষা ও সংস্কৃতি থাকার দরকার করে না?”

“শিক্ষা ও সংস্কৃতি বলতে তুমি ঠিক কী বুঝছ?”

"বিশেষজ্ঞতা ব'লে কিছুই কি নেই? অনেক সময়ে কি দেখা যায় না যে মন খানিকটা পরিশীলিত না হ'লে অনেক সুকুমার শিল্পের মধ্যে রস পায় না?"

"না। বিশেষজ্ঞতায় আমার আস্থা নেই। খাঁটি শিল্প সবাইকেই রস দেবে।"*

আমার মনে পড়ল "What is Art"-এ টলস্টয়ের বিখ্যাত উক্তি: "ধর্মবুদ্ধি আজকের দিনে মানুষকে চালাচ্ছে তার অজ্ঞাতসারে—যেদিন মানুষ এ-বুদ্ধিকে উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে অঙ্গীকার করবে সেদিন নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্যে একরকম শিল্প ও উচ্চশ্রেণীর মানুষের জন্যে আর একরকম শিল্প—এ-ব্যবস্থা থাকবে না; থাকবে কেবল একশ্রেণীর শিল্প—যার মূলমন্ত্র হবে সৌভ্রাত্র্য বিশ্বজনীন।

"যে-ই এ হবে সে-ই শিল্প হবে যা সে ছিল ও যা তার হওয়া উচিত; অর্থাৎ ঐক্য ও আনন্দ-মন্ত্রী।"

* * *

যা হোক মহাত্মাজির নিজের মতামত ভালো ক'রে জানতে চেয়ে আমি বললাম: "আপনি শিল্পের বিশেষজ্ঞতার বিরোধী কেন?"

"আমি তোমাকে একটি পাল্টা প্রশ্ন করব: তুমি শিল্পের বিশ্বজনীনতার বিরোধী কেন? শিল্প কেন জনসাধারণের ব্যাপক সাড়া চাইবে না? কেন তার ধমনীতে জনসাধারণের প্রাণের রক্ত বইবে না? সরলভাবে দেখলে কি বোঝা যায় না যে, শিল্পের প্রসূতি হ'ল প্রকৃতি? কাজেই প্রসূতি যখন কার্পণ্য করে না তখন সন্তান কেন করবে? প্রকৃতি কবে বলেছে যে তার সম্পদ মাত্র দুচারজনের বিলাসবস্তু হ'য়ে থাকবে—বাকি সব লক্ষ লক্ষ নরনারী থাকবে অস্পৃশ্যদের মতন বাইরে—অনাদরে? শিল্পী কেন নিজের একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখবে? জনমনের প্রাণের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সে বাঁচে কখনো? আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারি না যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মানবজাতির চাহিদা যদি শিল্পকে উদ্বুদ্ধ না করে তবে তার মানবজন্ম, রক্তশুদ্ধি হবে কী করে?"

"আপনার কথাগুলি খুবই চিন্তনীয় মহাত্মাজি, কিন্তু সব শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যই কি খানিকটা শ্রেষ্ঠ ভাবধারার মতন নয়? শ্রেষ্ঠ ভাবধারা কি সবাই বোঝে, না, অদূর ভবিষ্যতে বুঝবে এমন ভরসা করা চলে? কাজেই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সবাই এখনি এখনি বুঝুক আর যা তারা না বুঝবে তাই বাতিল করা হোক এ-ব্যবস্থা হ'লে কি তাতে ভালো হবে জগতের?"

---

* আমার অনুলিপিতে ছিল: "A great work of art should appeal to all..—মহাত্মাজি স্বহস্তে great কথাটি কেটে real কথাটি বসিয়ে দেন।

"আমার কিন্তু মনে হয় যে শ্রেষ্ঠ ভাবধারা দর্শন বা ধর্মের গরিষ্ঠ বাণী সবাইকেই উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে। অন্তত আমি তো সে-ধরণের বিশেজ্ঞতায় মুগ্ধ হ'তে পারি নে যার অর্থ ব্যঞ্জনা দু-চারজন ছাড়া সবাইয়ের কাছে হেঁয়ালি। এর একমাত্র ফল হয় দেখতে পাই যে, শিল্পীদের মাথা গরম হ'য়ে ওঠে—সবার প্রতি দরদের বদলে তাদের মনে জন্মায় সবার প্রতি অবজ্ঞা। এভাবে যে-শিল্প মানুষকে ভাই ভাই না ক'রে ঠাঁই ঠাঁই করে তার মহিমা কোন্‌খানে বলো দেখি?"

মহাত্মাজি একটু থেমে ব'লে চললেন: "শেষটায় যে এ-ই হবে ভাবতেও বাজে না কি? মানুষ তার নিজের সংস্কৃতিকে করে তুলবে তার অহং-এর ইন্ধন? সে অন্য সবাইকে নিজের চেয়ে ছোট ভেবে বলবে হঠ্‌ যাও? য়ুরোপের দিকে একবার চোখ চেয়ে দেখ দেখি; সেখানে নভচারীরা ঝঙ্কার দিয়ে ছাড়া কথা বলেন না: কী? না, তাঁদের প্রত্যেকের শিল্পকলাই হ'ল ভগবানের সুয়োরাণী। ফলে হয় কি? না, প্রতি শিল্পীই গ'ড়ে তোলেন এক এক দল—সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়—যার বাইরে কেউ তাঁদের শিল্পকীর্তির না খুঁজে পায় মাথা, না মুণ্ডু। তুমি কি সত্যি মনে করো যে, যে-সমাজে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আলস্য গ্লানি ও অজ্ঞানের অন্ধকারে জীবন্মৃতের মতন রয়েছে সে-সমাজে এ-ধরণের সৌখিনিয়ানা ক'রে সময় নষ্ট করা ভালো? এর চেয়ে দুঃখীর দুঃখ দূর করার জন্যে তাদের মঙ্গলের জন্যে জীবন উৎসর্গ করা কি ভালো নয়—যে পৃথিবীর প্রতি স্তর আজো মানুষের চোখের জলে সিক্ত সেখানে প্রতি মানুষেরই কি কর্তব্য নয় তার প্রাণের দরদ নিয়ে অপরের অশ্রু মুছিয়ে দেওয়া!"

মনে পড়ল বিশ্বপ্রেমিক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্রপটকিনের "বহুজনহিতায়, বহুজন-সুখায়" নিজের বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে সাইবিরিয়ায় কারাবরণ। তাঁর অনুপম "Memoirs of a Revolutionist" এ লিখেছিলেন তিনি—সে কবে:

"But what right had I to these higher joys, when all round me was nothing but misery and struggle for a mouldy bit of bread?—when whatsoever I should spend to enable me to live in the world of higher emotions must needs be taken away from the mouths of those who grew the wheat and had not bread enough for their children?···The masses want to know···They are ready to widen their knowledge: only give it to them. Give them the means of getting leisure. This is the direction in which, and these are the people for whom, I must

work. All those sonorous phrases about making mankind progress, while at the same time the progress-makers stand aloof from those whom they pretend to push onwards, are mere sophisms made up by minds anxious to shake of a fretting contradiction."

অর্থাৎ "উচ্চতর আনন্দলোকে বাস করবার আমার কী অধিকার—যখন আমার চতুর্দিকে দুমুঠো অন্নের জন্যে হাহাকর?—যখন দেখছি যে নিরন্নদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তবে আমাকে উচ্চতর আবেগলোকে বাস করার শুল্ক আদায় করতে হচ্ছে?…এই সব অনশনক্লিষ্টেরা জানতে চায়, চায় তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে। দাও তাদের এ-জ্ঞান। দাও তাদের একটু অবসর। অন্তত আমাকে তো ওই দিকেই কাজ করতে হবে—এই সব লোকেরি জন্যে। মানুষের প্রগতি সম্বন্ধে মস্ত মস্ত গালভরা বুলি শুনতে পাই বটে কিন্তু কাজে দেখতে পাই কি? না, যাদের এগিয়ে দিতে হবে প্রগতির ধ্বজাবাহীরা তাদের কাছ থেকেই থাকেন দূরে দূরে। মানুষের মন এই অসঙ্গতিতে অস্বস্তি বোধ করে ব'লেই এই ধরণের মিথ্যাচারের সৃষ্টি।"

মহাজনের তুচ্ছ কথাও শ্রবণীয়। তাই এর পরে মহাত্মাজির সঙ্গে যে সব খুচরো আলাপ হয়েছিল বলি স্বচ্ছন্দচিত্তে, বিনা অনুতাপে। বোধহয় ১৯২৫ কিম্বা ১৯২৬ সালে আমি বরোদায় ফৈয়স খাঁর কাছে ঊনচল্লিশ টাকা খরচ ক'রে দুখানি মাত্র গান শিখে বিষণ্ণ মনে যাই আমেদাবাদে বন্ধুবর বিখ্যাত বস্ত্রবণিক আম্বালাল সারাভাইয়ের অতিথি হ'য়ে। তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে মহাত্মাজির কাছে একদিন সকালে। মহাত্মাজি চরকা কাটছেন দেখে মনটা আরো খারাপ হ'য়ে গেল। আম্বালাল বললেন: "দিলীপ, এবার চলো আমার মিলে। সারাদিন মহাত্মাজি যে সুতোটুকু চরকায় কাটছেন তার হাজারগুণ সুতো আমার মিলে কি ভাবে এক সেকেণ্ডে কাটা হয় স্বচক্ষে দেখবে চলো। শুনে মনটা আরও যেন খারাপ হ'ল। মহাত্মাজির কত অমূল্য সময় যায় এধরণের অর্থহীন কর্মে!

আম্বালালের সে-আক্ষেপ ভুলব না: "মহাত্মাজি যখন অর্থনীতি নিয়ে কথা বলেন তখনই আমার সব চেয়ে দুঃখ হয়। যে যেটা জানে না সেটা নিয়েই মাথা ঘামাবে কেন বলো দেখি?"

আমি চুপ ক'রে রইলাম: চরকায় আমি বিশ্বাস করতে না পারলেও মহাত্মাজিকে সমালোচনা করতে মন চাইত না।

আম্বালাল হেসে হঠাৎ বললেন: "জানো? এখানে চরকা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ আমার কাছে আসে—মহাত্মাজি আমাকেই করেন পরীক্ষক। আমি মহাত্মাজিকে বলেছিলাম একদিন: 'মহাত্মাজি দেখুন এই ছেলেটিকে আমি নম্বর দিয়েছি গোল্লা।'

মহাত্মাজি বললেন: 'লিখতে পারেনি বুঝি কিছুই?'

আমি বললাম: 'না লিখেছে বেশ ভালোই, তবে লিখেছে একটা সর্বনেশে কথা: যে, আপনি না কি একজন প্রথম শ্রেণীর অর্থনীতিক।' মহাত্মাজি যা হাসলেন!'

মনে পড়ে জহরলালের কথা: মহাত্মাজির হাসি—শিশুর হাসি।

মহাত্মাজি নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর আশ্রমে গান করতে সেদিন সন্ধ্যায়।

প্রার্থনার পরে খোলা মাঠে করলাম মীরাবাই ও কবীরের গান।

এর পরে মহাত্মাজির সঙ্গে আর দেখা হয় নি আমার পণ্ডিচেরি-প্রয়াণের আগে। ১৯২৮ সালে আমি পণ্ডিচেরি যাই, সেখানে মহাত্মাজির দু-একটি চিঠি পেয়েছিলাম মাত্র। একটিতে তিনি আমার গানের সম্বন্ধে কিছু লেখেন। তাতে মনে হয় মহাত্মাজি ভজন গান সত্যিই ভালোবাসেন। যারা গানবাজনা ভালোবাসা বলতে বোঝে বিশেষজ্ঞতার ওপর-চালাকি তাদের সঙ্গে আমার মতে কোনোদিনই মেলেনি। মহাত্মাজি যে ভজনে মুগ্ধ হন এইটিই বড় কথা।

১৯৩৮ সালে মার্চ মাসে মহাত্মাজি যখন কলকাতায় ছিলেন শ্রীশরৎ বসুর বাড়িতে, ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই আমি কলকাতা পৌঁছি। দেখা করতেই মহাত্মাজি কী যে খুসি। সেই চিরপরিচিত প্রাণখোলা হাসি।

"গান শোনাচ্ছ কবে?"

"আজ্ঞাবহ।"

"আজ সন্ধ্যায়, প্রার্থনার পরে—ছাদে?"

"জো হুকুম।"

বন্ধুবর শ্রীধরণীকুমার বসুর মেয়ে উমা (হাসি) আমার কাছে তখন রোজ গান শেখে। নিয়ে গেলাম তাকেও। মহাত্মাজি তার মুখে মীরাবাইয়ের "মেরে তো গিরিধর গোপাল" গানটি শুনে এত খুসি যে তাকে উপাধি দিলেন "নাইটিঙ্গেল" স্বহস্তে লিখে। এখানে আর একটা প্রমাণ পেলাম যে যারা বলে মহাত্মাজি গান ভালোবাসেন না তারা ভ্রান্ত। মহাত্মাজি মিষ্টকণ্ঠে আবেগপূর্ণ ভজনে সত্যিই মুগ্ধ হন, না হ'লে হাসিকে এত আদর করতেন না। তারপরে

আর একদিন গেছি, উমাকে ঘরে না এনে ছাদেই রেখে এসেছি। মহাত্মাজি বললেন: "একি! নাইটিঙ্গেলকে আনো নি যে?"

হাসিকে ডাক দিলাম। মহাত্মাজি কি বলেছেন তাকে ব'লে মহাত্মাজিকে বললাম: "ও তো ভারি খুশী।"

"কেন?"

"আপনি ওকে নাইটিঙ্গেল ব'লে ডেকেছেন কি না।"

"ডাকব না? I will always call her the Nightingale." (আমি ওকে চিরকাল বুলবুল ব'লে ডাকব)।

ঘরে হাসির সাড়া প'ড়ে গেল।

বললাম: "সুতরাং আপনাকে ও বুলবুলেরই গান শোনাবে আজ। কিন্তু বাংলায়।"

মহাত্মাজি বললেন: "তথাস্তু।"

আমি বললাম: "গানটির ইংরাজী অনুবাদ করেছি অবাঙালিদের জন্যে, শুনুন আগে:

My soul of Nightingale ! on dreams of rose
Wing to the wonderland of blue, where flows
The melody of star-flute's invitation:
'Forget the case for a domeless destination.'
Hark, Light sings there in wistful love : 'Home, home!
Come to thy nest in day-tide's ebb, O come !'
Haste to the friend so far, yet near and tender,
Pledged to thy song-heart's cry of self surrender."

* * *

প্রার্থনার পরে হাসি প্রথমে গাইল মীরার "মেরে গিরিধর গোপাল"—তারপর গাইল:

বুলবুল্ মন ফুলসুরে ভেসে
চল্ নীল মঞ্জিল উদ্দেশ্যে
অম্বর বাঁশরী
ঐ ডাকে: "আয়,
পিঞ্জর পাসরি'
চল্ অ-ধরায়"

ঐ শোন্ আলো গায় ভালোবেসে :
"ফিরে আয়, নীড়ে আয় দিন শেষে"।
চল্ দূর বন্ধুর উদ্দেশ্যে
চির চরণের শরণের রেশে।

শরৎ বাবুর ছাদটি কী যে চমৎকার! বাঁকা চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় মনের মধ্যেও অপরূপ স্নিগ্ধতা গেছে বিছিয়ে। সামনে মহাত্মাজি। একজন পড়লেন গীতার কয়েকটি শ্লোক। তার মধ্যে ছিল মনে পড়ে :

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।

মহাত্মাজির সামনে ব'সে এ-শ্লোকটি শুনতে না শুনতে ভেসে উঠল তাঁরই ছবি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীলের একটি কথা মহাত্মাজি সম্বন্ধে বলেছিলেন আমাকে ১৯২৪ সালে বাঙ্গালোরে : "অকুতোভয়"।

গানটির রেশও ওঠে কানে রণিয়ে :

"পিঞ্জর পাসরি' চল্ অ-ধরায়।"

মহাত্মাজির মধ্যে এই বৈরাগ্যের ভাব, এই পারলৌকিকতার প্রবণতা—other-worldliness—সেদিন গান ও গীতাপাঠের আবহের মধ্যে দিয়ে যেমন ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম তেমন আর কখনো করি নি। গীতার আরও একটি শ্লোক :

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ—

যাকে না পারে কেউ উদ্বিগ্ন করতে, যে লোককেও দেয় না কোনো উদ্বেগ—কত সত্য :

গান শেষ হ'লে মহাত্মাজি ঘরে উঠে গেলেন। আমরা কয়েকজন মাত্র গেলাম সঙ্গে।

ব'সে প্রশ্ন করলাম : "হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্পর্কে কী মনে হয় আপনার?"

"আমি কী করতে পারি বলো—এক চেষ্টা করা ছাড়া?"

"কংগ্রেস—"

"কংগ্রেসের পথ তো সুগম নয়। দেশে তাকে নিজের প্রতিষ্ঠা আনতে হবে অথচ পিছনে শুধু যে বাহুবল নেই তাই নয়—বাহুবল এতটুকু মানলেও তাকে হ'তে হবে সত্যভ্রষ্ট।"

"কিন্তু আপনাকে যখন সবাই বিশ্বাস করে তখন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কি না এসে পারে? আর ঐ পথেই হয়ত আসবে হিন্দু-মুসলমান মিলন?"

মহাত্মাজি করুণ হেসে বললেন: "কঠিন দিলীপ! মুসলমানকে হিন্দু বিশ্বাস করে না, হিন্দুকে মুসলমান বিশ্বাস করে না। বাইরের অনুশাসনে কি হবে বলো, যদি ভিতরটা আগে না ঠিক হয়? আর আমার বিশ্বাস করার কথা বলছ, কিন্তু এটা জেনো যে নিজের শক্তির সম্বন্ধে আমার কোনো ভুল ধারণাই নেই"—(I have no illusions about my own power)।

পথে আসতে আসতে কেবলই মনে পড়ছিল মহাত্মাজির শেষ কথাগুলি। এর মধ্যে কারুণ্য আছে কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর ভাষার হৃদয়াবেগের স্বচ্ছ সরলতা। এরই গুণে বুঝি তিনি এত সহজে অপরের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেন!

শুনেছি এ-ধরণের কথা তো বহুবারই—কিন্তু এভাবে উপলব্ধি করা—মহাত্মাজির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে তাঁর আত্মশক্তিদৈন্যের স্বীকৃতি শুনে তারই আলোয় তাঁর ঔদার্যের স্নিগ্ধ মহিমা প্রত্যক্ষ করা—এ-দিনটিও আমার জীবনে স্মরণীয় দিন হ'য়ে থাকবে।

এর পরে কাশ্মীরে যাই ১৯৩৮শের অক্টোবরে। মহাত্মাজি তখন পেশোয়ারে। আমি তাঁকে পত্র লিখি যে, আমার বোন মায়ার হঠাৎ স্বামিবিয়োগ হওয়ায় আমি কাশ্মীরে এসেছি তাকে নিয়ে। সঙ্গে আছে উমা—তাঁর ভাষায় "নাইটিঙ্গেল"। পেশোয়ারে যেতে চাই মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা করতে—যদি মহাত্মাজির আমাদের মনে থাকে…ইত্যাদি।

মহাত্মাজি আমাকে তার করেন ও সঙ্গে সঙ্গে লেখেন (১৭. ১০. ৩৮) একটি পোষ্ট কার্ডে:

"I may forget Uma, the Nightingale, though that seems improbable, but how could I forget you?……I am sorry for your brother-in-law's death. My love and sympathy for your sister." (আমি উমা বুলবুলকে ভুললেও ভুলতে পারি হয়ত কিন্তু তোমাকে ভুলব কী ক'রে? তোমার ভগিনীপতির মৃত্যুর জন্যে আমি দুঃখ বোধ করছি—তোমার বোনকে আমার সস্নেহ সহানুভূতি জানাবে।)

পেশোয়ারে গিয়ে আমরা উঠলাম বন্ধুবর শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ি। প্রথম দিন গেলাম মহাত্মাজির ওখানে মায়াকে ও এক আত্মীয়কে নিয়ে—কারণ উমারা সবাই গেল খাইবার পাস দেখতে। মহাত্মাজিকে দর্শন করতে না গিয়ে

ওরা খাইবার পাসের মতন অসুন্দর এক গিরিবর্ত্ম দেখতে গেল এতে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম—কিন্তু সবাইয়ের রুচি সমান নয়। সচরাচর মানুষ তীর্থের চেয়ে ঢের বেশি ভালোবাসে উত্তেজনা।

মহাত্মাজি তখন "সীমান্ত গান্ধি" আবদুল গফুর খাঁর পল্লীনিবাসে বন্ধুর অতিথি—পেশোয়ার থেকে চব্বিশ মাইল দূরে উৎমানজই গ্রামে।

গেলাম মোটরযোগে—সেখানে। এবার শুধু মহাত্মাজির জন্যেই নয়—মহাপ্রাণ আবদুল গফুর খাঁকে দর্শন করবার আগ্রহ কম ছিল না। একেই তো এযুগে এহেন মহৎ সত্যনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ তেজস্বী মানুষ বিরল, তার উপর দুই "মহাত্মা"কে একসঙ্গে দেখার কথা কল্পনা ক'রেও মনটা উঠেছিল দুলে। সত্যি বলতে কি, শ্রীনগর থেকে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে রৌদ্রে ধূলায় পাহাড়ি পথে আসতে আমি রাজি হ'তাম না যদি এদের দর্শনের লোভ না থাকত, যদিও জানতাম—দেখা না-ও হ'তে পারে। কিন্তু বড় লাভের লোভ বড় লোভ, তার জন্যে দুঃখও সয়। দেখা হ'তেও তো পারে দৈবযোগে!

মুখে চোখে তেজস্বিতার দৃপ্তি, সুশ্রী, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, স্বল্পশ্মশ্রু—বর্ণে রাঙা আভার ছোপ, মুখে স্নিগ্ধ মৃদু হাসি—আবদুল গফুর খাঁকে কী যে ভালো লেগে গেল! মানুষের আন্তর সম্পদ সব সময়েই কিছু আভা হ'য়ে মুখে ফুটে ওঠে না। খাঁ সাহেবকে আরো ভালো লাগল বোধ হয় এইজন্যেই—তাঁর মুখে লেগেছিল অন্তরের স্বচ্ছতার দীপ্তি, তেজস্বিতার বর্ণাঢ্যতা। আচরণও যে কী সুন্দর—যেমন সহজ, তেমনি স্নিগ্ধ, অথচ কোনো বাহুল্যই নেই। মুসলমানী আদবকায়দার আতিশয্য নেই, আছে শুধু তার নিখুঁৎ শালীনতা।

সাদরে বসালেন। আলাপ সুরু হ'ল। মহাত্মাজি তখন স্নান করছিলেন, তাই আরো সুযোগ মিলল নিরালা আলাপের। কত কথাই যে বললেন—সে সব লেখার স্থান এ নয়—অন্যত্র লেখার ইচ্ছা রইল। এখানে কেবল বলি তাঁর একটি কথা। কথাবার্তা হ'ল অবশ্য হিন্দিতেই।

শুধালাম: "খাঁ সাহেব আপনার মতন এমন মানুষই তো আমাদের চাই—যাঁদের মধ্যে রয়েছে প্রেমের সঙ্গে সত্যের যোগ। আপনি মিল ক'রে দিন হিন্দু-মুসলমানের। নইলে ভারতবর্ষের গতি কী হবে?"

খাঁ সাহেব মৃদু হাসলেন: "আমি কী করব বলুন? মিল হয় তখনই যখন অন্তরে আসে নির্ভর—যখন মানুষ প্রেমের মন্ত্রকে দলের মন্ত্রের চেয়ে বড় ব'লে মানে। ভিতরে প্রীতির ভিৎ পাকা না হ'লে বাইরের মিলনের ইমারৎ তো

তাসের ঘর—হিন্দু-মুসলমান যতদিন না আচারগত ধর্মের চেয়ে অন্তরগত মৈত্রীকে বড় ক'রে দেখবে ততদিন হ'তে পারে শুধু সুবিধের সন্ধি, সৌভ্রাত্রের রাখীবন্ধন নয়।"

"ঐ মহাত্মাজি!" মায়া ব'লে উঠল।

উঠে দাঁড়ালাম সবাই।

একগাল হেসে মহাত্মাজি ইঙ্গিত করলেন বসতে। মুখে খুশীর কী যে দীপ্তি!

ওমা, মহাত্মাজি মাস দুই হ'ল মৌনী। কথাটিও কইবেন না। প্রায় ব'সে পড়লাম।

একটি কাগজ কলম টেনে নিলেন।

আমি বললাম: "আমরা বড়ই বিপন্নবোধ করছি মহাত্মাজি—কথা বলেন না কতদিন?"

মহাত্মাজি হেসে লিখলেন: "দু'মাস ধ'রে বলছি না—এতে শুধু যে আমারই ভালো হয়েছে তাই নয়—অপরেরও মঙ্গল।" (My silence is good for me and certainly good for everybody else.)

সেক্রেটারি লেখাটি চেঁচিয়ে পড়ে শোনালেন সবাইকে। ঘরে খুব হাসির ধুম প'ড়ে গেল।

হাসি থামলে মায়াকে দেখিয়ে বললাম: "আমার বোন—মায়া—হয়ত মনে আছে—সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ওর শ্বশুর?"

মহাত্মাজি ঘাড় নেড়ে লিখলেন: "I had your sister on my lap for ten minutes at her house, when Sir Surendranath died." (তোমার বোন দশ মিনিট ধরে আমার কোলে ছিল—যখন সার সুরেন্দ্রনাথ মারা যান।)

তারপরই মহাত্মাজি কাগজে লিখে প্রশ্ন করলেন: "Why have you not brought the Nightingale?" (বুলবুলকে আনো নি কেন?)

পরদিন আমরা সবাই মিলে গেলাম। মহাত্মাজিকে প্রণাম করতেই, মহাত্মাজি আমার ভাগনি এষার দিকে তাকালেন। আমি বললাম: "এরই কথা আপনি লিখেছিলেন আপনার পোষ্টকার্ডে। ও আপনাকে ওর নাচ দেখাবেই পণ ক'রে এসেছে।"

মহাত্মাজি ঘাড় নেড়ে খুব হাসলেন।

আমি বললাম হেসে: "এতে আপনি খুশী, না অখুশী, মহাত্মাজি?"

মহাত্মাজি কাগজে লিখলেন: "গীতার ভাষায় বলতে গেলে—আমার হওয়া উচিত না খুশী, না অখুশী।" (In the language of the "Gita I should be neither glad nor sorry.)

আমি বললাম: "কিন্তু হৃদয়ের ভাষায়? (But in the language of the heart?)

মহাত্মাজি তৎক্ষণাৎ লিখলেন সরসর ক'রে: The heart has no language, is speaks to the heart." (হৃদয়ের কোনো ভাষা নেই, সে শুধু কথা কয় হৃদয়ের সঙ্গে।)

প্রথমে উমা ও আমি ডুয়েটে গাইলাম মীরাবাইয়ের "চাকর রাখো জি।" তারপরে এষা নাচল, সঙ্গে উমা গাইল:

আজ সখী স্থন বাজত বাঁসরিয়া
নির্মল নীরে যমুনাতীরে গাবত সাঁবরিয়া।
মুকুট উজালা গল বনমালা চরণন নূপরিয়া
বৃন্দাবনমে ফুলকুঞ্জনমে নাচত নটবরিয়া।
সুন্দর শ্যামল মরুপথপুষ্পল আবত নিরঝরিয়া।
চন্দনগন্ধা নন্দনছন্দা প্রেমী মন হরিয়া।

বিদায় নেবার সময়ে মহাত্মাজি কাগজে লিখলেন: "Do you want me to say 'many thanks'? It looks so utterly ridiculous. But if you want the ridiculous you may have them." (তোমরা কি চাও যে আমি বলি বহু ধন্যবাদ? এক্ষেত্রে ধন্যবাদজ্ঞাপন যে কী হসনীয়! তবে যদি তোমরা হসনীয়কেই চাও—তবে নাও।)

ঘর শুদ্ধ সবাই ফের হেসে ওঠে।

When you do laugh, each tear-dewed petal swings
With the far sky-radiant lilt: your magic heart
To our earth-caged life would ever impart
Love's limpid light: soul's vision of aerial wings.

তুমি যবে হাসো—প্রতি শিশির-অশ্রুল ফুলদল
গগন-ভাস্বর ছন্দে দুলে ওঠে: অন্তর তোমার
পৃথী-পিঞ্জরিত প্রাণে আনে প্রেম-নীলিমা উজ্জ্বল:
তোমার আত্মার স্বপ্ন—অনন্তের পাখার ঝঙ্কার।

*　　　　*　　　　*

পেশোয়ারে মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা ১৯৩৮ সালে। তারপর দেখা—১৯৪৭-এ —দিল্লিতে, প্রায় দশ বৎসর বাদে। আজ তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। কেবল তাঁর স্বহস্তে লেখা অনেকগুলি চিঠি আমার কাছে আছে। তার মধ্যে থেকে কয়েকটি তীর্থংকরের তৃতীয় সংস্করণে ছাপতে দিচ্ছি এ-চিঠিগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর নিরভিমান স্নেহশীলতা ফুটে উঠেছে ব'লে। আমার সৌভাগ্যবশে আমি তাঁর স্নেহ পেয়েছিলাম। সে-স্নেহের মূল্য আমার কাছে আরো বেশি এইজন্যে যে, আমাকে তিনি স্নেহ করেছিলেন জেনেও যে আমি তাঁকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিক ব'লে মনে করতাম না—এমন কি আক্ষেপই করতাম তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসর তাঁর নেতৃত্বে দেশের সমূহ ক্ষতি হয়েছে ব'লে। এ-ও তিনি জানতেন যে, তাঁকে আমি সদাশয়, সজ্জন মহৎ মানুষ ব'লেই শ্রদ্ধা করতাম —বড় দেশনায়ক, ভাবুক বা দার্শনিক ব'লে নয়। তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে অবশ্য আমি অনেক কিছুই শিখেছি—যেজন্যে তাঁর কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু তাঁর শেষজীবনের রাষ্ট্রনৈতিক নায়কত্বের দরুণ আমার মন ক্রমশঃ তাঁর প্রতি এতই বিরূপ হ'য়ে উঠেছিল যে, যদিও তিনি আমার মন টানতেন তবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত আমার ভয় করত। একথাও তিনি জানতেন। জানতেন তাঁর চরকা, সেকেলিয়ানা, অহিংসা, প্রার্থনাসভায় জোর ক'রে উদার হবার চেষ্টা, হিন্দিভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ক'রে দাঁড় করানোর অন্যায় আন্দোলন—এ সমস্তই আমাকে ব্যথিত ক'রে তুলত, আমার মনে হ'ত তিনি দূরদর্শী নন, তাঁর বুদ্ধিও স্তিমিত হ'য়ে আসছে দিনে দিনে। তাঁকে সমালোচনা করা শোভন হবে না—নানা কারণে, এ-সময়ে তাঁকে সমালোচনা করলে কুফলই বেশি ফলবে ব'লে ভয় হয়। তবু যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত অনৈক্যের উল্লেখ করলাম তাঁর মনুষ্যত্বের মহনীয় দিকটাই ফোটাতে—মানে তাঁর মহত্ত্বকে আমি কী চোখে দেখেছিলাম। আরো একটি কারণে এসব কথা খোলাখুলি বলা বাঞ্ছনীয়। সেটা এই যে, তাঁর ব্যক্তিরূপের এই জাদুশক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, মতের গভীর অনৈক্য সত্ত্বেও তিনি মানুষকে কাছে টানতে পারতেন। নৈলে আমার মতন অসহিষ্ণু মানুষের পক্ষে তাঁর দৃষ্টি ও মনোভঙ্গিম লোককে ভালোবাসা তো দূরের কথা—শ্রদ্ধা করাও অসম্ভব হ'ত। তাঁকে আমি ভালোবেসেছিলাম আন্তরিক। কিন্তু সেইজন্যেই দুঃখ হ'ত দেখে যে দেশকে তিনি ভুল পথে চালাচ্ছেন। আরো বেশি আক্ষেপ হ'ত এইজন্যে যে তাঁর একরোখা দীক্ষা দেশের

সমূহ ক্ষতি সাধন করা সত্বেও কেউ প্রকাশ্যে একটা মৃদু প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে সাহস করে না। কি কি বিষয়ে তাঁর নীতি আমাদের দেশের ক্ষতি করেছে দৃষ্টান্ত দিয়ে খোলাখুলি দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করত আমার অনেক সময়েই, কিন্তু গুরুদেব চাইতেন না আমরা রাজনীতি সম্বন্ধে বেশি লেখালেখি করি—কেন না তাতে আমাদের সাধনার ক্ষতি বৈ লাভ নেই। সেই জন্যেই আমি চুপ ক'রে থাকতাম, যদিও তাঁকে একাধিক পত্রে জানিয়েছিলাম তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের গোড়াকার গরমিল। তাঁর যে-চিঠিগুলি ছাপতে দিচ্ছি তা থেকে এ-অমিলের কিছু আভাস পাওয়া যাবে। মূল চিঠিগুলি ইংরাজিতে লেখা: তীর্থংকরের ইংরাজী অনুবাদ Among the Great-এ যেগুলি ছাপা হয়েছে এবৎসর (১৯৪৯) আমেরিকায়—বইটির তৃতীয় সংস্করণে। তাই মূল চিঠিগুলি এখানে না দিয়ে শুধু বাংলা তর্জমা দিয়েই ক্ষান্ত হ'লাম।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪শের একটি চিঠিতে:

"প্রিয় দিলীপ,

আমার ভারি কষ্ট হয়েছিল যে, পণ্ডিচেরীতে গিয়েও তোমাদের কারুর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হ'ল না। আম্বালাল সারাভাই আমাকে মাত্র কাল দিলেন তোমার অক্টোবর মাসে লেখা চিঠি। হয়েছিল কি, সে-চিঠিটা ভারতীর (আম্বালালের দ্বিতীয় কন্যা) সঙ্গে অক্সফোর্ডে উধাও হয়েছিল। তোমার বইটি পেয়েই আমি সেসম্বন্ধে তোমাকে লিখেছিলাম। আশা করি পেয়েছ?* যখনি তোমার আমাকে লিখতে ইচ্ছা হবে নিশ্চয়ই লিখো, কেমন? আমি খুশী হয়েছি যে হা—ওখানে গেছে। সে কি মদ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে?

তোমার (আন্তরিক) এম কে গান্ধি।"

১৯৩৪ সালের ৮ই এপ্রিলের একটি পত্রে তিনি লেখেন:

"প্রিয় দিলীপ,

তুমি আমার চিঠি পাও নি? সে কি? তোমার চিঠি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে আমি তোমাকে লিখেছিলাম—আর বেশ বড় চিঠি। তোমার 'অনামী'-র পাতা উল্টে পাল্টে দেখেছি। কিন্তু আমার মনে হ'ল সবচেয়ে সুবিচার হবে যদি আমি বইটিকে মহাদেওকে (দেশাই) পাঠিয়ে দিই। সে বাংলা জানে তার উপর নিজে কবি—যা আমি নই। কিন্তু তাব'লে কি তোমার লেখা আমি না প'ড়ে পারি—তুমি যাই লেখো না কেন! (But that does not prevent

* এ-চিঠিটি পথভ্রষ্ট হয়েছিল—আমার হাতে পৌঁছায় নি।

me from reading whatever you write.) তোমাদের আশ্রমের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে যা যা লিখেছ পড়লাম আমি সাগ্রহে। পণ্ডিচেরি গিয়ে হা—একেবারে আলাদা মানুষ হ'য়ে গিয়েছে শুনেও খুব ভালো লাগল। আমাকে তার কবিতা পাঠালে খুশী হব! আশা করি তুমি ভালো আছ ও এখনও গানটান করো? তোমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। তাদের গান শুনতে শুনতে আমার কেবলই মনে হয় তোমার সুন্দর ভজনের কথা—যা তুমি প্রায়ই গেয়ে শোনাতে আমাকে।

তোমার (আন্তরিক) এম কে গান্ধি।"

১৯৩৬ সালে আমি মহাত্মাজিকে পাঠাই শ্রীমতী রাহানা তায়েবজির একটি চিঠি।* সেই সঙ্গে লিখি যে, এ-চিঠিতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে-প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে সে-সম্বন্ধে তিনি কিছু মন্তব্য প্রকাশ করলে ভালো হয় কেন না এ-সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মন্তব্য সমেত তাঁরো মন্তব্য আমি প্রকাশ করতে চাই। আমি তাঁকে আরো লিখেছিলাম যে, কৃষ্ণ গীতায় অহিংসা মন্ত্রের পাঠ দিয়েছেন—মহাত্মাজি এ-মত আমাদের কাছে এতই অদ্ভুত লাগে যে মনে হয় বুঝি আমরা তাঁর মতামত ঠিক ধরতে পারছি না—তাই যদি এ-নিয়ে তিনি কিছু আলোচনা করেন তবে সব দিক দিয়েই ভালো হয়। কিন্তু মহাত্মাজি আমার—পাতা ফাঁদে পা দিলেন না কিছুতেই, লিখলেন ১৭ই জুন ১৯৩৬-এ:

প্রিয় দিলীপ,

মহাদেও আমাকে তোমার চিঠিপত্র মাত্র কাল পাঠিয়েছে। রাহানার সঙ্গে তোমার পত্রালাপ খুব উপভোগ্য। কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব যে-ধারণা আছে তা নিয়ে আলোচনা নাই করলাম। কী দরকার? আমার মনে হয় যে এসব আলোচনা ছাপলে যা ছিল ঝাপসা তা হ'য়ে দাঁড়াবে আরো গোলমেলে। (My opinion, however, is that the publication of the correspondence will make confusion worse confounded) তোমার আশার সঙ্গে আমার আশার সুর মিলল: মানে আমিও আশা করি একদিন ফের আমাদের দেখা হবে। তখনই কৃষ্ণ ও অন্য অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা ক'রে

* এ চিঠিগুলি পরে আমার "সূর্যমুখী" পুস্তকে ছাপা হয় (আর্য পাবলিশিং হাউস, ৬৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতায়—নব প্রকাশিত)

লাভ হবে—যে সব আলোচনায় আমাদের উভয়েরি ঔৎসুক্য আছে। আর, বলাই বেশি, আবার তোমার গান শুনতে আমার সাধ যায়। স্নেহ নিও।"

এম কে গান্ধি।

১৭ই জুন ১৯৪৫ সালের পত্রেঃ

"প্রিয় দিলীপ,

তোমার চিঠি পেয়ে ভারি লোভ হচ্ছে। তোমার কণ্ঠস্বরের স্মৃতিই আমাকে লুব্ধ করছে। কিন্তু সে লোভ আমাকে সংবরণ করতেই হবে। আমি যে অপরিসর ও সঙ্কীর্ণ পথের পথিক সেই পথেই আমাকে চলতে হবে নিজের ধারণা অনুসারে। (I must resist all temptation and keep to the strait and narrow path as conceived by me.)

আমি তোমাকে হিন্দিতে লিখতাম—যেমন আমি সচরাচর লিখে থাকি আজকাল—কিন্তু লিখলাম না কেন তুমি সহজেই বুঝবে (I forbear for obvious reasons)

স্নেহ নিও। বাপু।"

মহাত্মাজি "obvious reasons" বলতে ঠিক কী বুঝেছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেওয়া হয় নি। তবে আমার মনে হয় হিন্দিকে আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্র-ভাষা করার জন্যে তাঁর প্রচেষ্টায় যে আমাদের মতের আদৌ সায় ছিল না এ তিনি টের পেয়েছিলেন কানাঘুষোয়। আমি প্রায়ই অকুণ্ঠে নানা লোকের কাছে বলতাম কি না যে, আমাদের স্কুল কলেজে হিন্দিভাষা যদি সে-স্থান অধিকার করি যে-স্থান আজ পেয়েছে ইংরাজি তাহ'লে তাতে ক'রে হবে আমাদের মহতী বিনষ্টি। তাছাড়া ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার শক্তিসামর্থ্য হিন্দির চেয়ে ঢের বেশি—কাজেই ডিমক্রাসির গোড়াকার কথা যদি হয় গুণমূল্যের স্বীকৃতি তাহ'লে উচ্চবিকশিত বাংলাভাষাকে পাশ কাটিয়ে অবিকশিত হিন্দিভাষাকে অঙ্গীকার করব কী দুঃখে? সর্বোপরি ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ, এখানে একটিমাত্র ভারতীয় ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা ক'রে দাঁড় করানোর স্বপক্ষে কোন ধ্রুব যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। উৎকট রোগের জন্যে সরল ঔষধের নির্দেশ দিলে তাতে ক'রে হয় শুধু বেচারী ঔষধেরি উপর অবিচার। হিন্দিভাষার সে-শক্তি নেই যে-শক্তি রাষ্ট্রভাষার থাকা দরকার। যেটুকু অল্প প্রাণশক্তি তার আছে সে মারা যাবে এত দায়িত্বের ভার বহন করতে বাধ্য হ'লে।

কিন্তু তাঁর কাছে থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলাম যার মূল্য অন্য সব চিঠির চেয়ে

বেশি। সে-চিঠিটি উদ্ধৃত করার আগে একটু ভূমিকা করতে হবে। আমি তাঁকে একটি দীর্ঘপত্র লিখেছিলাম জানিয়ে যে গীতা সম্বন্ধে তিনি আদ্যন্ত ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন—গায়ের জোরেই বলব—যেহেতু কৃষ্ণ যুদ্ধ করো বলতে আদৌ অহিংস আধ্যাত্মিক যুদ্ধ বোঝেন নি। উদাহরণতঃ উদ্যোগ পর্বে এ-মহাদিশারি যুধিষ্ঠিরকে বড় গলা ক'রেই বলেছেন যে দুর্যোধনের "মতি বৈরাশ্রিতা" কাজেই সে দুর্মতি ও বধ্য। ব'লে শেষে আরও জোর দিয়ে বলেছেন :

"বধ্যঃ সর্প ইবানার্থঃ সর্বলোকস্য দুর্মতিঃ
জহ্যেনং ত্বমমিত্রঘ্ন না রাজন্ বিচিকিৎসিথাঃ" ॥

অর্থাৎ "দুর্মতি অনার্য যারা তারা সর্বলোকেরই বধ্য। কাজেই হে শত্রুঘ্ন রাজন! তুমি ওদের বধ করতে কুন্ঠিত হয়ো না।" আরো নানা কথাই তাঁকে এ-চিঠিতে লিখেছিলাম : যথা, রাজনীতিতে প্রতিবাদমূলক কি পরের পাপক্ষালনার্থে (vicarious) উপবাস, চরকামন্ত্র ইত্যাদিও আমাদের দেশের ক্ষতি করেছে সমূহ—মানুষের স্বচ্ছ বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দিয়ে। অনুরোধ করেছিলাম আমি সবিনয়ে যে, যদি মহাত্মাজি অন্তত কিছুদিনের জন্যেও রাজনীতি ছেড়ে কোনো সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নেন অন্তদৃষ্টি অর্জন করতে চেয়ে তাহ'লে বড় ভালো হয়। মহাত্মাজি উপনিষৎ ভালোবাসেন, তাতেই বলেছে যে অবিদ্যার অন্তরে যাদের অধিষ্ঠান তাদের দ্বারা চালিত হ'লে মানুষের অবস্থা হয় "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধা"—অন্ধচালিত অন্ধের ম'ত। কাজ যদি সত্যি করতে হয়—তাহলে আগে অর্জন করা চাই স্বচ্ছ দৃষ্টি ও শুদ্ধ বুদ্ধি। আর স্বচ্ছ দৃষ্টি ও শুদ্ধ বুদ্ধির আবির্ভাব হয় তখনই যখন মানুষের আত্মাভিমান বিলুপ্ত হয়। তাই—লিখেছিলাম আমি—মহাত্মাজির সব আগে দরকার আত্মদীক্ষার আলোয় আত্মাভিমানের উচ্ছেদ। আত্মাভিমান বলতে আমি কি বুঝেছি ব্যাখ্যা করতে আমি শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম :*

"জগতে আমরা কর্ম করে থাকি অহংতা-প্রণোদিত হ'য়ে। যে-বিশ্বজনীন শক্তিরা আমাদের মধ্যে ক্রিয়মান আমরা তাদেরকে মনে ক'রে থাকি আমাদের স্বকীয়।...জ্ঞান আমাদের এই বোধ এনে দেয় যে আত্মাভিমান একটি যন্ত্রমাত্র। ...মানবিক অহংতা (egoism) যখন উপলব্ধি করে যে তার ইচ্ছা একটি যন্ত্রমাত্র, তার জ্ঞান অজ্ঞানেরই সামিল তথা ছেলেমানুষি, তার শক্তি শিশুর অবোধ অন্বেষণ,

* "In the world we act with the sense of egoism..." The Four Aids. Chapter I. Synthesis of Yoga.

তার ধর্ম আত্মম্ভরী অশুচিতা—যখন সে শেখে নিজেকে উপরওলার হাতে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে—কেবল তখনই পায় সে মুক্তি।"

এ-উদ্ধৃতির শেষে লিখেছিলাম আমি: যখন আপনার সন্ন্যাসে এত গভীর আস্থা—(আপনি আমাকেই তো বলেছিলেন ১৯২৪ সালে যে, 'asceticism is the highest art' মনে আছে?)—তখন আত্মবোধের জন্য একটু সাধনা করলেনই বা কিছুদিন? অন্তত সন্ন্যাসে ব্রহ্মনির্বাণের পথ তো খোলা।

এ চিঠির উত্তরে তিনি রাগ করেন নি—কারণ যাই হোক—লিখেছিলেন ১৬ই জুলাই ১৯৩৪ তারিখ:

" প্রিয় দিলীপ,

তোমার চিঠিপত্র পেলাম। চিঠিটা আমার হস্তগত হয়েছে মাত্র কাল। সেটা গিয়েছিল প্রথমে বম্বেতে আর সেখানে ভ্রমক্রমে আটক পড়েছিল এতদিন।

"আমার দ্বিধাভাব মূলগত (My difficulty is fundamental) আমার মনে হয় না যে নৈষ্কর্ম্যের চেয়ে আমার এখনকার কর্ম আত্মবোধ কি ব্রহ্মনির্বাণের কিছু কম অনুকূল (I do not believe that my present activity is less conducive to self-realisation or merger in the Divine that abstention would be) সন্ন্যাস মানে নয় সর্বপ্রকার বাহ্য কর্মত্যাগ। সন্ন্যাস বলতে আমি বুঝি সেই সব মানসিক বা দৈহিক কর্মত্যাগ যাদের বলা যেতে পারে স্বার্থকেন্দ্রিক। আমার যদি এ-প্রত্যয় আসত যে কর্মত্যাগই আমার পক্ষে শ্রেয় তাহ'লে আমি এক্ষনি নৈষ্কর্ম্য অবলম্বন করতাম।

তোমার (আন্তরিক) এম কে গান্ধি।"

* * *

গান্ধিজির সঙ্গে দেখা হ'ল যেন আকস্মিক। কী ভাবে—বলি।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল তখন আমরা খুবই উৎফুল্ল হয়েছিলাম যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল ঠিক শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে—যাঁর সেবায় তাঁর শিষ্য আমরা জীবন উৎসর্গ করেছি। আনন্দের আতিশয্যে মহাত্মাজিকে প্রায় লিখি আর কি এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘ বাণী উদ্ধৃত ক'রে যেটি ত্রিচিনপল্লী রেডিওতে পড়া হয়েছিল। তাতে এক জায়গায় অরবিন্দ বলেছিলেন:* ভারতের স্বাধীনতা এল যে ঠিক তার নিজের জন্মদিনে

* "**August 15th is my own birthday and it is naturally gratifying to me that it should have assumed this vast significance. I take this coincidence,**

এ-যোগাযোগকে তিনি 'দৈবাৎ' বলে গণ্য করেন না—তাঁর জীবনসাধনার ভাগবত অনুমোদন ও পাঞ্জা ব'লেই অঙ্গীকার করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখিনি, কেন না যদিও আমি জানতাম মহাত্মাজি শ্রীঅরবিন্দকে গভীর শ্রদ্ধা করেন তবুও মনে হ'ল—তিনি তো আর ঠিক আধ্যাত্মিক সাধক নন—একজন সদাশয় মহাকর্মীমাত্র—কাজেই শ্রীঅরবিন্দের এ-অধ্যাত্ম-দৃষ্টিলব্ধ বাণীতে হয়ত সায় দেবেন না—সুতরাং কাজ কি অত্যধিক আশা ক'রে? কিন্তু তবুও মহাত্মাজির ব্যক্তিরূপ আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করত, তাই থেকে থেকে সাধ জাগত এ-নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা খোলাখুলি আলোচনা করবার। কেননা তিনি অধ্যাত্মবিদ্যার মর্মজ্ঞ না হ'লেও আত্মিক তত্ত্বে শ্রদ্ধালু তো—তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের মধ্যে কয়েকজনকে পাঠিয়েও ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের শরণাপন্ন হ'তে। এছাড়া আরো একটি কারণে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা আমার প্রবল হয়েছিল। আমি বন্দেমাতরমের একটি কোরাসের উপযোগী সুর দিয়েছিলাম। আকাশে বাতাসে তখন গুজব—জহরলাল বন্দেমাতরম্‌কে পাশ কাটিয়ে "জনগণমনঅধিনায়ক" গানটিকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নিজে অঙ্গীকার করেছেন ও করাতে চেয়েছেন দেশবাসীকে। বন্দেমাতরমের এই অবমাননায় আমরা সবাই গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গান্ধিজিকে আমার সুরটি শোনালে তিনি সানন্দে বন্দেমাতরমের সপক্ষে রায় দেবেনই দেবেন—আর তাহ'লে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে সব চেয়ে সহজে—কেননা এসব ক্ষেত্রে যে কর্তার ইচ্ছায়ই কর্ম হবে এ-সম্বন্ধে আমাদের কারুর মনেই এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা হয় কী ক'রে এই হ'ল প্রশ্ন। হঠাৎ একটা যোগাযোগ হ'য়ে গেল। হ'ল কি, আমাকে ১৯৪৭-এর অক্টোবরে যেতে হয়েছিল আমেদাবাদে বন্ধুবর আম্বালাল সারাভাইয়ের কন্যা ভারতীর বিবাহে—ভারতীর সনির্বন্ধ অনুরোধে। সেখান থেকে আমি দিল্লীতে মহাত্মাজিকে তার করি যে আমি লক্ষ্ণৌ যাবার পথে দিল্লীতে একদিন থাকব। কাজেই ২৮শে তারিখের সন্ধ্যায় তাঁর প্রার্থনা সভায় গাইতে দিন না বন্দেমাতরম্‌ ও ইকবালের বিখ্যাত "সারে জহাঁসে আচ্ছা"* এই দুটি গান আমার নিজের দেওয়া সুরে। কিন্তু ২৮শে সন্ধ্যায় যখন আমাদের

not as a fortuitous accident, but as the sanction and seal of the Divine Force that guides my steps on the work with which I began life, the beginning of its full fruition…" (Message of Sri Aurobindo and the Mother, P. 5.)

* এ দুটির আমার দেওয়া সুর এ বৎসর "সুরবিহার" নামক স্বরলিপি পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে ছাপা হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে অন্য অন্য গানের স্বরলিপির সঙ্গে।

পুষ্পক রথ দিল্লীতে অবতরণ করল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে—কাজেই সেদিন প্রার্থনা সভায় যাওয়া হ'ল না। বির্লা হাউসে টেলিফোন করলাম। মহাত্মাজি আমাকে বললেন ২৯শে সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

* * *

২৯শে অক্টোবরে সকাল দশটায় যখন আমি বির্লা হৌসে পৌছলাম তখন কিন্তু আমার মনে আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক গভীর অস্বস্তির ভাব: কি জানি মহাত্মাজি কী ভাবে গ্রহণ করবেন আমাকে! হয়ত গান দুটি শুনতেই চাইবেন না। হয়ত বীতস্পৃহ সৌজন্যসহকারে আমাকে ডিসমিশ করে দেবেন! কারণ তাঁর সম্বন্ধে আমার মনোভাব যে এই দশবৎসরে অনেকখানি বদলে গেছে একথাটাও হয়ত সাতখানা হ'য়ে তাঁর কানে গিয়ে পৌছেছে—কে জানে? সর্বোপরি যাঁকে বহুলোক বরণ ক'রে নিয়েছে দেশের অভ্রান্ত পার্থসারথী ব'লে তাঁর নায়কতাকে আমি মনে করি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর—এতে তাঁর মন আমার প্রতি অপ্রসন্ন না হওয়াই তো অকল্পনীয়। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এমনো মনে হল—কাজ নেই দেখা ক'রে—যেখানে দানে ও গ্রহণে সহজ সানন্দ মনোভাবেরই গেছে নড়চড় হ'য়ে সেখানে কথা কইব কোন্ ভিত্তির প'রে ভর ক'রে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে না করতে আমার সব দ্বিধাসঙ্কোচ উবে গেল। সেই স্নিগ্ধ নির্মল হাসি যা আমি চিরদিনই ভালোবেসে এসেছি! দশবৎসরে কই সে-হাসির মাধুর্য এতটুকু কমে নি! জহরলালের আত্মজীবনীতে লেখা একটা কথা মনে পড়ল আবার: মহাত্মাজিকে তারা জানে না যারা দেখে নি তাঁর খোলা হাসি। আর তিনি জানতেন সে হাসির প্রয়োগকৌশল—যেমন জানে যাদুকর তার যাদুদণ্ডের। আমি নয়ন ভ'রে দেখলাম এ-বিচিত্র মানুষটিকে। আগের চেয়ে একটু বয়োঃবৃদ্ধি হয়েছে বৈ কি' কিন্তু তবু তাঁর সর্ব অঙ্গে সে কী স্নিগ্ধ শুচি স্বাস্থ্যের দীপ্তি! মুখে সমুজ্জ্বল সেই বিস্ময়কর চুম্বকশক্তি যার নামকরণ হয় না··· ভঙ্গিতে সেই সদাসজাগ ঔৎসুক্য—যে আসে তারই সম্বন্ধে···কণ্ঠস্বরে সেই অনাড়ম্বর স্বাগত-সম্ভাষণ···চোখে সেই স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাসের আলো! অজাতশত্রু উপাধি দিতে ইচ্ছা হয়—অথচ···হায়রে—!

একটি তরুণী তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আমাকে দেখে তিনি উঠে বসলেন। আমি যখন প্রণাম করলাম তখন অস্বস্তির চিহ্নও নেই আমার মনে। এমন কি এমনও মনে হ'ল যে রাজনীতিতে তিনি ভুল পথে দেশকে চালাচ্ছেন

তাতেই বা কী যায় আসে? আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন ক'রে অনুভব করলাম তাঁর ব্যক্তিরূপের সেই অনির্ণেয় যাদুকরী বিভুতিকে যা এখনও সমানই অটুট রয়েছে।

কথায় কথায় বললাম: "আমার তীর্থংকরে ও Among the Great-এ আপনার কথোপকথন ছাপতে যে আপনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন এজন্যে আপনাকে মুখে ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি যদিও দেওয়া উচিত ছিল কারণ বইটি বাইরে যে খ্যাতিলাভ করেছে—"

মহাত্মাজি টপ্ ক'রে বললেন: "তার জন্য আমার এই বিপুলাকায় চেহারা দায়ী বলতে চাচ্ছ তো? থাক্।" ব'লেই সে কী হাসি শিশুর ম'ত!

মহাত্মাজি বলেছিলেন ইংরাজিতে: "Do you insinuate that it was *my* gaint frame which did the trick?" এভাবে যে তিনি insinuate ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করবেন আমি ভাবতেই পারি নি। তাই কী বলব ভেবে পেলাম না যখন তিনি নিজের রসিকতায় ঠিক আগেরই মত সরলভাবে আহ্লাদে অষ্টাশি-খানা হ'য়ে উঠলেন।

আমি তাঁর সংক্রামক হাসিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্রেফ ভুলে গেলাম যা যা বলব ভেবে এসেছিলাম। আমাদের হাসি থামলে মহাত্মাজি চোখ মিটমিট ক'রে কৌতুক ভঙ্গিতেই বললেন, যদিও খুব স্নিগ্ধ স্বরে: "তোমার বইটি খ্যাতি লাভ করেছে ও-লেখার মূল্য আছে ব'লে—ওতে আমার কথা আছে ব'লে না।

এবার আমার মুখ ফুটলো, বললাম: কিন্তু এবার আপনিই নম্রতার ভঙ্গি করছেন বাপুজি, বেচারি দিলীপ না। কারণ এটুকু জানবার মত কল্পনাশক্তি অন্তত আপনার আছে যে আপনি হচ্ছেন এমন গান যার সঙ্গে জড়িত হ'লে যে-কোন সুরই উঠবে মহিমময় হ'য়ে।

মহাত্মাজিও ছাড়বার পাত্র নন, বললেন তৎক্ষণাৎ: ভুল হ'ল ফের। কারণ তুমি তোমার সুরেই বসাবার জন্যেই আমাকে গান বানিয়েছ, আমাকে উস্কে দিয়ে গাইয়ে নিয়েছ গান, শিল্প, সন্ন্যাস—আরো কত কি সম্বন্ধে ভগবানই জানেন—কারণ আমি সব ভুলে ব'সে আছি।"

হেসে উঠলাম বটে তাঁর হাসির সঙ্গে যোগ দিয়ে কিন্তু মনে মনে একটু বিস্মিত না হ'য়েও পারলাম না। সমর্সেট মম্ তাঁর নানা গল্পে একটি প্রতিপাদ্য নানা ভাবে প্রমাণ করেছেন, যে মানুষ প্রকৃতিতে অপরিমেয়—incalculable: আজ সে যা

করছে কাল হয়ত ঠিক তার উল্টো গাইবে, বহুদিন ধ'রে যা অভ্যাস ক'রে এসেছে হয়ত কোনো একটি দুর্বোধ্য কারণে হঠাৎ দেখল সে-অভ্যাসের ছায়াও মাড়ায় না ...ইত্যাদি। মহাত্মাজির মধ্যে বিশেষ ক'রেই ছিল এই অপরিমেয়তা—কখন যে তিনি কী ক'রে বসেন—কেউ তার হদিশ দিতে পারত না—না তাঁর বন্ধুবর্গ না আত্মীয়স্বজন—এমন কি তাঁর প্রিয়তম শিষ্যরাও না। মনে হ'ল এই জন্যেই মানুষটি আমাদের যুগপৎ অভিভূত করে ও নিরাশা আনে।

কিন্তু এ তাঁর চরিত্রের একটি দিক—নিরাশ্বাসের দিক। আর একটি দিক আছে সে ঠিক এর উল্টো—সে হ'ল তাঁর একান্ত মানবিক দিক—ভরসা দিতেই তাঁর বিকাশ। যাঁরা গড়পড়তা নন তাঁরা যখন সরলভাবে (noblesse oblige ঢঙে নয় অবশ্য) গড়পড়তাদের স্তরে নেমে এসে তাদের সঙ্গে সমান সমান ভাবে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে থাকেন তাল না কেটে—তখন মন কেমন যেন পুলকিত হ'য়ে ওঠে। মহৎ মানুষকে অতিমানব ব'লে মনে করা স্বাভাবিক ব'লেই মন আশ্বস্ত হ'য়ে ব'লে ওঠে সোচ্ছ্বাসে—"Oh he is so human!" মহাত্মাজি যতই কৌপীন পরুন, ছাগদুগ্ধ পান করুন, কি তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুরে বেড়ান না কেন, তাঁর সংস্পর্শে এলে কারুরি মনে করবার পথ থাকে না যে মানুষটি সাধারণ গড়পড়তা। অথচ তবুও যখন তিনি হাসিগল্প করেন তখন একবারো মনে হয় না তিনি গড়পড়তা ছাড়া আর কিছু। দুঃখ এই যে, সেদিন তাঁর এই রসাল মানবিকতার স্বতোবিরোধসঙ্কুল সূক্ষ্ম স্বাদ চেখে চেখে ভোগ করার সময় ছিল না। মহাত্মাজি বললেন তাঁকে অবিলম্বেই যেতে হবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে—সাংবাদিকের দুষ্পাচ্য ভাষায়—কাশ্মীরের "পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে। কী করি? অগত্যা জিজ্ঞাসা করলাম সোজাসুজিই: "আজ সন্ধ্যায় আপনার প্রার্থনা-সভায় বন্দেমাতরম্ ও সারে জহাঁসে আচ্ছা গান দুটি—"

মহাত্মাজি বাধা দিয়ে বললেন: "জানি। তোমার আমেদাবাদ থেকে তার যথাসময়েই পেয়েছিলাম। কিন্তু তার উত্তর দিলে তুমি পেতে না ব'লেই দিই নি। মুস্কিল হয়েছে কি জানো? আমার প্রার্থনা-সভায় তো ভজন ছাড়া অন্য কোনো গান গাওয়া হয় না।" ব'লেই ফের হাল্কা সুরে: "তাই তো কাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় আমি প্রার্থনা করছিলাম: 'হে রাম! যেন ঠিক এই সময়ে দিলীপের অভ্যুদয় না হয়'!" ব'লেই ফের হেসে কুটি কুটি।

মনে মনে তাঁকে সাধুবাদ না দিয়ে পারলাম না—কেমন সুন্দর ক'রে আমাকে 'না' বললেন, অথচ আমার মনে আঘাত না দিয়ে! তবু একটু নিরাশ হ'তে হ'ল

বৈ কি। শেষে দুর্গা ব'লে ব'লে ফেললাম: "আচ্ছা ধরুন, যদি এখনই গাই গান দুটি?"

"এখানে?"

"হ্যাঁ। মিনিট দশেকের মামলা বৈ তো নয়।"

তাঁর মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠল: "তাহ'লে চমৎকার হবে। কেবল একটি সর্ত আছে: আমি শুয়ে শুয়ে শুনব। হয়েছে কি, আমার পায়ে মালিশ করা এখনো শেষ হয় নি কি না।"

"আপনার কথাও থাকল আমার কথাও থাকল," বললাম আমি খুশী হ'য়ে। তারপর গাইলাম—প্রথমে "বন্দে মাতরম্", পরে "সারে জহাঁসে আচ্ছা"।

তিনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। মনে আমার আনন্দ বিছিয়ে গেল গাইতে গাইতে। এমন শ্রোতা পেলে আনন্দ না হবে কার? গায়কের কাছে আদর্শ শ্রোতা—তৃষিতের কাছে নির্মল জল!

গানের শেষে তিনি প্রসন্নমুখে বললেন: "তোমার কণ্ঠস্বর আরো ভালো হয়েছে। তোমার গলার জোয়ারিতে ঐশ্বর্য তো বরাবরই ছিল। কিন্তু তোমার এখনকার কণ্ঠে কী একটা নতুন স্পন্দন ফুটে উঠেছে—বিশেষ খাদের পর্দায়।" ব'লেই আমার দিকে সোজা তাকিয়ে হেসে: "আর তুমি দেখতেও কি ঠিক তেমনি রইলে—দশবছর আগে তোমাকে যেমনটি দেখেছিলাম—বয়সের ছাপ পড়ে নি তোমার মুখে।" বলেই তাঁর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে: "কিন্তু আজকে সন্ধ্যায় আমার প্রার্থনা-সভায় আসছ তো?"

"আমি তো আগেই চেয়েছি অনুমতি—আসবার।"

"কিন্তু সে তো বন্দেমাতরম্ গাইতে চেয়ে। আমি চাই তোমার অপূর্ব ভজন শুনতে। কতদিন আমি তোমার গান শুনতে পাই নি, ভাবো তো!"

"আর আমিও কতদিন গান শোনাব ব'লে আপনার ওপর চড়াও হইনি, ভাবুন তো!"

আমরা হেসে উঠলাম, ঘরের মধ্যে আরো যে দুটি তরুণী ছিলেন তাঁরাও সে-হাসিতে যোগ দিলেন।

* * *

প্রার্থনা-সভা বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। আমি পৌঁছলাম মিনিট দশেক আগে। অস্তসূর্যের সোনার আলো তখন সবুজ মাঠে বিছিয়ে গেছে। মাঠের একধারে একটি ছোট বেদীর মতন। বেদীর উপরে মাইক্রোফোন। সিঁড়ির নিচেই আমি

বসলাম হার্মোনিয়ম নিয়ে দুটি লোক লেখনী হাতে মুখিয়ে—মহাত্মাজির বক্তৃতার অনুলিপি নেবেই নেবে। ওদিকে মাইক্রোফোনের তার গিয়ে পৌঁছেছে নেপথ্যের একটি রেডিও গ্রহণীর সঙ্গে। শুনলাম এই গ্রহণীর বাণীই রাতে বেতারযোগে ফের বাজানো হয় লক্ষ লক্ষ লোকের জন্যে। আমি খুব মন দিয়ে দেখছিলাম প্রার্থনা-সভায় আগত শ্রোতাদেরকে। আমার সেই প্রথম প্রার্থনাসভায় আসা। তাই বোধহয় রীতিম'ত কৌতূহল উঠল জেগে। আমি মনে মনে গেঁথে নিতে লাগলাম পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি খুঁটিনাটি—যা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি খুঁটিয়ে শুনি—খুঁটিয়ে দেখবার কোনো ঔৎসুক্যই সচরাচর বোধ করি না।

মহিলা ও শিশুর দল বসেছে সবার সামনে—মাটিতে একটি সতরঞ্চির উপরে। তারপরে বিশৃঙ্খলভাবে আসীন : যুবক, বৃদ্ধ, বালক, শ্রমিক, সাংবাদিকেরা, বণিকেরা, সৈনিকেরা ও সবশেষে সেই বেকার 'হুজুগে' অনামীরা যাদেরকে অদ্যাবধি কোনো আইন কানুন পারে নি দাবিয়ে রাখতে। তারা শুধু উশখুশ করছে—এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—কখন্ লগ্ন আসবে চেঁচিয়ে বাজিমাৎ করবার: "গান্ধিজিকি জয়"! গান্ধিজির আবির্ভাব যতই আসন্ন হচ্ছে ততই এদের দুর্ধর্ষ চাঞ্চল্য উঠেছে বেড়ে!

সহসা জনতা-সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে—স্থির হ্রদের বুক যেন ওঠে বাতাস উঠলে। অম্নি সবাই যুগপৎ ফিরে তাকায় একদৃষ্টে বির্লা হৌসের দিকে: "ঐ ঐ মহাত্মাজি—ঐতো!—ঐ বির্লা হৌসের ওপাশের সরু লাল রাস্তায়—দুপাশে দুটি মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে!" তিনি একটু কাছে এসে পৌঁছতেই সবাই একযোগে উঠে দাঁড়ালো: "গান্ধিজিকি জয়"!

* * *

কিন্তু গান্ধিজির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের আবহের মধ্যে কি একটা অস্বস্তির ভাব উঠল জেগে যাকে নাম দেওয়া ভার। আমার মনে কেন জানি না সে অস্বস্তিটা দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠল: মনে প'ড়ে গেল আমাদের আশ্রমের অনেক বৎসর আগে একজনের হয়েছিল একটি ধ্যানদর্শন—যাকে ইংরাজিতে বলে vision: দর্শনটি পরে গ'ড়ে-তোলা নয়—বহুদিন আগে আমাদের বিখ্যাত উপেনদা সেটি লিপিবদ্ধ ক'রে ছাপিয়েছিলেন।* কিন্তু আমি আশ্রমেও এ-দর্শনটির কথা শুনেছিলাম। দর্শনটি এই:

একটি সভা আহূত হয়েছে—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে। একজন জাতীয় মহানায়ক সেখানে এলেন শাদা খদ্দর প'রে। হঠাৎ একটা গুলি। মানুষটি

* উনপঞ্চাশী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীঅরবিন্দের সে-যুগের সতীর্থ)

প'ড়ে গেলেন। কেন জানিনা এই দর্শনটির কথা কেবলই ফিরে ফিরে মনে হ'তে লাগল প্রার্থনাসভায় শ্রোতাদের মধ্যে যতই বাড়তে লাগল রুদ্ধ ক্ষোভ। এ-রুদ্ধ ক্ষোভের স্পন্দন পরের দিন আরো যেন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল—কিন্তু সে-কথা যথাস্থানে।

গান্ধিজি বেদীর উপরে আসন গ্রহণ ক'রে ইঙ্গিত করলেন তাঁর পার্শ্বচারিণী তরুণী দুটিকে। তারা অমনি একের পর এক যন্ত্রবৎ আবৃত্তি ক'রে চলল গীতা কোরান প্রভৃতি। রামনামও হ'ল বৈকি। কিন্তু যেই কোরান পড়া সুরু হ'ল দেখলাম সভার মধ্যে বাতাস যেন আরো গাঢ় হ'য়ে এলো—স্পষ্ট অনুভব করলাম একটা ক্ষোভ ঘনিয়ে উঠছে বহু শ্রোতার মনে—বিশেষ ক'রে শিখদের মধ্যে। তাদের মধ্যে কয়েকজন জোরে ঘাড় নেড়েই মাথা হেঁট করল। সাম্‌নের সারিতে আরো কয়েকজন যুগপৎ হেটমুণ্ড হ'য়ে পড়ল। মনে হ'ল কানে আঙুল দেওয়া অত্যন্ত অসভ্যতা হবে ব'লেই বুঝি তারা নম্রশীর্ষ হ'য়েই ক্ষান্ত হ'ল। দেখতে দেখতে আমার মনের মধ্যে সব আলো নিভে গেল মুহূর্তে। এরই নাম প্রার্থনা সভা—যেখানে হবে হরিগুণগান! মনে পড়ল গীতার শেষে কৃষ্ণের উপদেশ অর্জুনকে: ইদংতে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন—ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।"*

আমার মনে বিষাদ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠল দেখতে দেখতে। এখানে কী গাইব ভগবানের গান—যেখানে লোকে এসেছে মনে ক্ষোভ পুষে? ভারত কখনো বলে নি জোর ক'রে ধর্মের কথা শোনাও। শ্রীঅরবিন্দের কাছেও শুনেছি বারবারই এই কথা যে ভগবান বাধ্য করেন না কাউকে সাধু হ'তে, শুনেছি—তিনি আমাদের সহযোগের অপেক্ষা রাখেন, শুনেছি—ভগবান পথ দেখান বটে কিন্তু মেরে চালান না—"The Divine can lead but does not drive".

মহাত্মাজি আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আমি কবীরের একটি বিখ্যাত ভজন—"অগন না দহে পবন ন মগনে তস্কর পাস ন আওয়ে"—গাইলাম মূল হিন্দিতেই। এর বাংলা অনুবাদ:

দহে না যে অনলে—মজে না যে পবনে
পারে না শত্রু যারে হরিতে
কভু আর।

* নাই তপস্যা: ভক্তি যাহার—অসূয়া করে যে প্রাণে আমারে,
চায় না শুনিতে ধর্মের কথা—বোলো না গীতার কথা তাহারে।

তারি মধু-নাম করে সম্বল জীবনে
সে বিনা কে আছে মন ভরিতে
সুধাসার ?
আমার তো কেহ নাই—শুধু সে মুরারি :
সকল ধনের ধন জানি তায়—
অতুলন !
যে-সুখ সে পায় যে সে-চরণপূজারী
সে-সুখ পেয়েছে কবে কে কোথায়—
কে সুজন ?
যুগে যুগে তারি লাগি' বৈরাগী বসুধায়
যোগি-মুনি-মহাজন-চিত্ত—
চিরদিন !
ধ্যান তার প্রাণে যার—নামগান রসনায়
মরণো চরণে তার ভৃত্য—
পরাধীন।
গাহিল কবীর : "ওরে বাসনায়-অন্ধ !
অন্তরে দেখনা বিচারি' :
জয় কার ?—
তোর ঘরে ধন-জন মায়া অফুরন্ত
আমার—একান্ত মুরারি :
আমি তার।

গান শেষ হবার পরে মহাত্মাজি মাইক্রোফোনের সামনে হিন্দিতে সুরু করলেন তাঁর প্রাত্যহিক বক্তৃতা।—কিন্তু একী কাণ্ড!—গানের সম্বন্ধে মন্তব্য না ক'রে হঠাৎ তিনি পড়লেন গায়ককে দিয়ে—নিতে তার পরিচয়! (তিনি যা যা বলেছিলেন সেদিন সন্ধ্যায় ফের রেডিওতে শুনেছিলাম মন দিয়ে। কাজেই আরো সুবিধা হ'ল টুকে নেবার) মহাত্মাজি বললেন :

"তোমরা একটি অতি মধুর ভজন শুনলে। কিন্তু যিনি ভজনটি গাইলেন তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের কিছু জানা দরকার। তাঁর নাম—দিলীপকুমার রায়। তেইশ বৎসর আগে যখন আমি পুনার হাঁসপাতালে ছিলাম তখন তিনি তাম্বুরার সঙ্গতে আমাকে দুটি ভজন শুনিয়েছিলেন। সে গান দুটি শুনে আমার শরীরের জ্বালা

জুড়িয়ে গিয়েছিল। আজই সকালে তিনি আমার কাছে এসে দুটি জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছিলেন তাঁর নিজের-দেওয়া সুরে: 'বন্দেমাতরম্' ও 'সারে জহাঁসে আচ্ছা।' গান দুটি আমার বিশেষ ভালো লেগেছিল—বিশেষ ক'রে বন্দেমাতরম্। আমার মনে হ'ল তাঁর দেওয়া সুরটি এ-অপূর্ব জাতীয় সঙ্গীতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়েছে। তিনি সংসারাশ্রম ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁর গুরু ঋষি অরবিন্দের যোগাশ্রমে, তাঁর যা কিছু ছিল সেখানে সব সমর্পণ করে। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সম্বন্ধেও তোমাদের এই কথাটি জানাতে চাই যে সেখানে বর্ণ জাতি বা ধর্মের কোনো বিচার নেই। সেখানে সবাই অন্তর্মুখী জীবন যাপন করে—শিল্প, দর্শন, ছবি, কাব্য, গান প্রভৃতি নিয়ে। একথা আমি শুনেছিলাম আমার বন্ধু স্বর্গত সার আকবর হায়দারীর কাছে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি প্রতি বৎসর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে একবার ক'রে যান যেমন লোকে যায় তীর্থযাত্রায়। দিলীপকুমার লায়েক গুরুর লায়েক শিষ্য তাই তাঁর নেই কোনো সঙ্কীর্ণ সংস্কার—বর্ণের জাতির বা দলাদলির। আশ্রমে তিনি গান সাহিত্য ধর্মের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। গানের সমজদার বলতে যা বোঝায় আমি তা নই। তবু আমি বেশ জোর ক'রেই বলতে পারি যে তাঁর মতন কণ্ঠস্বর খুব কমই মেলে এদেশে—শুধু এদেশে কেন সারা জগতেও এমন গভীর উদাত্ত ও মধুর কণ্ঠ বিরল। আজ আমার কানে তাঁর কণ্ঠ যেন আরো মধুর ও সমৃদ্ধ লাগল। কিন্তু এখন মন দাও—যে-গানটি শুনলে তার তাৎপর্যের দিকে। তোমরা বেশ গভীর ভাবে প্রণিধান করো গানটির বাণী কী। কবীর বলেছেন যে ধনী যাঁরা তাঁদের জগতে সবই থাকতে পারে—ধন জন মান মহিমা ধুমধাম—অথচ সব থেকেও তাঁরা সেই অকিঞ্চনের চেয়েও অকিঞ্চন যার আছে সেই সবার বড়ো সম্পত্তি—ভগবান্। এ-ভগবানের আমরা হাজারো নামকরণ করি শুধু চুটিয়ে বাদ বিসম্বাদ করতে। এ-গানের মন্ত্রের কাছে যদি তোমরা দীক্ষা নাও তাহ'লে তোমরা সেই সব কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাবে যারা সৌভ্রাত্রের শান্তি ও সুখের সুষমাকে উৎসন্ন করে। বলে তিনি কাশ্মীরে পাকিস্তানের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধের উল্লেখ ক'রে অনেক মন্তব্যই প্রকাশ করলেন—সেসব এখানে অবান্তর ব'লে উদ্ধৃত করলাম না—আরো এই কারণে যে, তাঁর বক্তৃতার এ-অংশটুকু Delhi Diary—পুস্তকে খুব বিশদভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—যদিও শ্রীঅরবিন্দ ও আশ্রম সম্বন্ধে তাঁর উক্তিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে—বোধহয় ধর্মালোচনা কলিযুগের প্রার্থনাসভায় খানিকটা নিষ্প্রয়োজন ব'লে। যাই হোক্ মহাত্মাজি সবশেষে

বললেন: "এইমাত্র যে-ভজনটি তোমরা শুনলে তার মূল বাণীটি মনে গেঁথে নেবে: যে, আমরা সেই একই ঈশ্বরের সন্তান—যে-নাম দিয়েই আমরা তাঁকে পূজা করি না কেন।"

সভাভঙ্গের পরে তাঁকে আমি যখন আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম তখন মহাত্মাজি আমার পানে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন: "কালও তুমি প্রার্থনা-সভায় আসছ তো?"

আমি বিষণ্ণকণ্ঠে বললাম: "আসতাম তো পরমানন্দেই, বাপুজি! কিন্তু—হয়েছে কি, কাল ভোরেই আমার উড়ে যাবার কথা—লক্ষ্ণৌয়ে আমার বন্ধুরা ধরেছেন। এমন কি আমার সীট পর্যন্ত রিজার্ভ করা হ'য়ে গেছে।"

মহাত্মাজি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন: "একে দুঃসংবাদই বলব। কারণ আমি চেয়েছিলাম তোমার মুখে 'হম ঐসে দেশকে বাসী হৈঁ' গানটি শুনতে যেটি তুমি সুচেতাকে শিখিয়েছিলে।*

অগত্যা হেসে বললাম: "তাহ'লে কাল লক্ষ্ণৌ নাই গেলাম। আপনাকে তো আর 'না' বলা চলে না।"

মহাত্মাজি খুশী হ'য়ে একগাল হেসে বললেন: "আমাদের মতন লোককে এই ভাবেই শায়েস্তা করতে হয়। (That's the stuff to give to the likes of us.)"

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

দিল্লিতে এর পর প্রায় এক সপ্তাহ থাকতে হ'ল—মহাত্মাজিকে আরো দুদিন গান শোনালাম।

পরদিন সকালে সেই বাঙালি রিপোর্টারটি আমার কাছে এসে হাজির। তার মুখে শুনলাম যে মহাত্মাজির বক্তৃতার রিপোর্ট সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁকে দেয়—তিনি স্বয়ং দেখে দেন কোথাও ভুলচুক আছে কি না। "কাল রাতে তাঁকে রিপোর্টটি দিতেই," বললেন ভদ্রলোক, "মহাত্মাজি বললেন আমাকে ধমকে: 'এ কী করেছ?

* সুচেতা কৃপালানি—আচার্য কৃপালানির স্ত্রী। সুচেতা দেবী আমাকে বলেছিলেন যে এ-গানটি মহাত্মাজির একটি বিশেষ প্রিয় গান এবং এ গানটি ছাপিয়ে তিনি হরিজনদের জন্যে কিছু চাঁদাও তুলেছিলেন। গানটি আমি গ্রামোফোনে দিয়েছি কিন্তু মহাত্মাজির দেহরক্ষার পর রেকর্ডটি আমি পাই, তাই তাঁকে পাঠাতে পারি নি।

শুধু শ্রীঅরবিন্দ? আমি যে বলেছিলাম ঋষি অরবিন্দ। ব'লেই নিজে হাতে শ্রী কেটে ঋষি বসিয়ে দিলেন।"

মন আমার আর্দ্র হ'য়ে উঠল। কারণ মহাত্মাজি শ্রীঅরবিন্দকে মনে মনে ভক্তি করেন জানলেও তাঁকে ঋষি ব'লে বরণ ক'রে এভাবে ভক্তি করেন এ আমি ভাবতে পারি নি। কেবল এই আক্ষেপটি তখন আমার হয়েছিল যে, শ্রীঅরবিন্দ কী বস্তু যদি জহরলাল একটু বুঝতেন। দুঃখ এই জন্যে যে, যে লোক ভারতকে আবিষ্কার ক'রে তার খবর দিতে উদ্যত হয় বই লিখে সে যদি জানত যে ভারতকে আবিষ্কার করা উদ্ভট হ'য়ে ওঠে নাস্তিক কি অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) হ'য়ে! মহাত্মাজিকে যেকথা লিখেছিলাম—'একটু সাধনা ক'রে দেখুন' সেকথা জওহরলালকে লিখতে ভরসা পাই নি—কারণ জানতাম জওহরলাল যোগসাধনা করার কথা মনে ভাবতেও পারবেন না। তবে সময়ে সময়ে এখনো মনে হয় যে আস্তিকবাদ ও আধ্যাত্মিকতার শুধু ভ্রষ্টরূপকে দেখে তার সম্বন্ধে অবিচার না ক'রে যদি তিনি হাতে কলমে কিছু সাধনা ক'রে জানতেন তার অন্তঃসার। মনে হয় তাঁকে লিখে অনুরোধ করি একটি সুফি চতুষ্পদীর কথায় কান দিতে (সংস্কৃত উদ্ধৃত করতে ভরসা হয় না ব'লে):

ক্যা ফল মিলতা হৈ বীজ বোকর্ দেখো।
পানে কি অগর হওয়স্ হৈ তো খোকর্ দেখো
মৈ ক্যা অর্জ করূ কে ইস্‌মে ক্যা লজ্‌জৎ হৈ
এক মর্তবা তুম্ কিসিকে হোকর দেখো॥

বীজ বুনি' ফলে সে কেমন ফল বুনিয়া তাহারে দেখা চাই।
লভিতে জীবনে চাও যদি—আগে হারাও যা আছে আপনার।
নিষ্কামতার মাঝে কোন্ সুখ? মিনতি আমার শোনো ভাই:
আপনারে করি' নিবেদন চাও আস্বাদ সেই অসীমার।

কিন্তু য়ুরোপই যার ধ্যান, বিজ্ঞান যার জ্ঞান, সে ভারতের দীক্ষা নেবে কেন?

* * *

পরদিন—৩০শে অক্টোবর—আমি প্রায় স' পাঁচটায় পৌঁছলাম বির্লা হৌসে। ভিড় সেদিন একটু বেশি দেখলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি সবাই কেমন যেন চঞ্চল, উদ্বিগ্ন। জিজ্ঞাসা করতেই সোৎসাহ ব্যাখ্যান: "ঐ যে ঐ শিখটা না? ঐ শাদাদাড়ি- ঐটাই গোলমাল করছে, ব'লে পাঠিয়েছে যে যেখানে শ্রোতাদের মধ্যে

সাড়ে পনর আনা হিন্দু সেখানে কোরান পড়া অসহ্য—সবারি কাছে।” “কাজেই মশায়” বললেন সংবাদদাতা, “মনে হয় না গান্ধিজি আজ প্রার্থনাসভায় প্রার্থনা করবেন আর।” কিন্তু বচনে শিখ ভদ্রলোককে 'ঐটা' বলা সত্ত্বেও তাঁর মুখে দেখলাম প্রসন্নতা উপছে পড়ছে।

যাই হোক্ আমি ভালো ক'রে দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে উঠতেই যে-শিখ ভদ্রলোকের দিকে আমার সংবাদদাতা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিলেন তার সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। আর হ'তে না হ'তে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল আমার কাছে তার দিগ্‌গজ পাগড়ি ও দেড়গজি দাড়ি নিয়ে, মাথা নেড়ে তারস্বরেই বলল, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে: “সাধুজি! আপনি ঠিক বিচার করুন—মিনতি করি। বলুন ন্যায্য কথা: যারা আমাদের হত্যা করেছে, ঘর পুড়িয়েছে, এমন কি মেয়েদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে বেইজ্জৎ করেছে তাদের কোরানের কলমা আমাদের কানে শুনতে হবে—প্রাণে জপতে হবে? একি জুলুম নয়? হুঁঃ। এসব শোনা আমাদের পক্ষে হারাম—”

আমি বাধা দিয়ে বললাম: “ধীরে বন্ধু ধীরে। এখানে এসে আপনি এরকম বায়না করতে পারেন না।”

“বাহানা ক্যা? এখানে আমরা এসেছি মহাত্মাজির বাণী শুনতে, কোরানকে কুর্নিশ করতে নয়। হুঁঃ।”

“কিন্তু কোরানে আপনার যখন এতই আপত্তি তখন এখানে এলেন কী দুঃখে—বিশেষ জেনে শুনে যে মহাত্মাজি এখানে নিয়মিত কোরান পড়ান? যাই হোক গোল করবেন না, বসুন—তাঁকে আসতে দিন। এ-সভায় বিচারের ভার তাঁর—আমার নয়, মনে রাখবেন।” ব'লে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললাম নরম সুরে: “আমি ভগবানের নাম গান করব—তা তো আপনি শুনবেন?

“বেশক্—মানে যদি শুধু আপনি মুসলমান ভগবানের নাম না নেন। হুঁঃ।”

আমি না হেসে পারলাম না। বললাম: “কিন্তু বন্ধু, ভগবান তো শুনেছি একটিই।”

“জানি। কিন্তু শয়তান—বহুৎ— যাদের ওরা পূজা করে। হুঁঃ।”

এর পরে কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম: “শান্ত হোন, আমি কৃষ্ণের ভজন করব।”

“মহশাল্লা। কৃষ্ণ তো খাঁটি ভগবান্—শুনব না তাঁর গান? ক্যা?”

বলতে বলতে মহাত্মাজির উদয় অদূরে। সবাই উঠল দাঁড়িয়ে: “গান্ধিজি কি জয়!”

শিখ ভদ্রলোক "বিমনায়মান" হয়ে তাঁর আসনে ফিরে গিয়ে আসীন হলেন।"

* * *

আমি এসেছিলাম গাইতে:

হম্ ঐসে দেশকে বাসী হৈঁ—জহা শোক নহী ঔর আহ নহী।

জহাঁ মোহ নহী ঔর তাপ নহী—জাহা ভরম নহী ঔর চাহ নহী।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই জন্যে যে, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন যুগধর্মের প্রভাব একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারি না। একথা সত্য যে, প্রতি যুগেই এমন অনেক ভাবধারা থাকে যা ভ্রান্ত—আমাদের যুগে যেমন নাস্তিকতা-বাদ বা রাষ্ট্রবাদ। (এরা উপকার কিছু করে না বলি না—লীলাময়ের এম্‌নিই লীলা যে তিনি বেঠিক পথেও চালান ঠিক ঠিকানার দিশা গভীর করতে) কিন্তু তবু গোটাকতক প্রভাব আছে এম্‌নি জোরালো যে তাদের প্রভাবের কাটান আছে কি না মন ভেবেই পায় না তা বিচার করবে কী? এ-সবের মধ্যে একটি দিকপাল হলেন বাস্তবতা—রিয়ালিস্‌ম। স্বপ্ন বাস্তবতার চেয়ে কম সত্য নয় একথা কবি মাত্রেই জানে—না জানলে সে আর যাই হোক না কেন কবি হ'ত না। কিন্তু তবু বাস্তবতা যখন অতিকায় মেঘ হ'য়ে স্বপ্নের আকাশে আলোর টুঁটি চেপে ধরে তখন স্বভাব-স্বপনীর পক্ষেও আলোক-প্রত্যয় বজায় রাখতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়। গান্ধিজির প্রার্থনা-সভায় কিছুরি অভাব ছিল না—না নীতিবাদের, না ঔদার্যের না মহৎ মানুষের উপস্থিতির, না সার্বজনীন শ্রদ্ধার—অভাব ছিল কেবল অন্নবস্ত্রের—অর্থাৎ ছিল না দুটি জিনিষ: শান্ত নিস্পৃহ মনোভাব ও পরমতসহিষ্ণুতা। এহেন সভায় আমাকে গাইতে হবে সে-কোন্ অভূতপূর্ব লোকের গান? না সেই লোকের যেখানে নিরন্তর ব'য়ে চলেছে প্রেমের গঙ্গা, যেখানে শুধু যে শোকতাপ ভুলভ্রান্তি মোহমায়ার চিহ্ন লেশ নেই তাই নয়—ফুটে উঠেছে প্রতি পুরবাসীর চোখে অভেদজ্ঞানের তৃতীয় দৃষ্টি। এককথায় এক অসম্ভাব্য অবাস্তব পরীকথা।

আর একটা কথা আমার কেবলই মনে হ'ত মহাত্মাজির প্রার্থনা-সভার আবহ দেখে। অথচ আশ্চর্য—মহাত্মাজির কি একবারো মনে হ'ত না—যা নিতান্ত অন্ধ ছাড়া সবাই এত পরিষ্কার দেখতে পেত? কথাটা এতই স্বতঃসিদ্ধবৎ যে বলাই বাহুল্য মনে হয় অথচ মহাত্মাজি কেন বুঝতেন না—মনে প্রশ্ন জাগত আমার ফিরে ফিরে! কেন তিনি দেখেও দেখতেন না যে শ্রোতারা প্রার্থনা সভায় এসেছে তাঁর ব্যক্তিরূপের টানে—তাঁর নীতিবাদের লোভে নয়? তাই সে-সময়ে দিল্লিবাসী সাড়ে-পনর আনা হিন্দু শ্রোতার কাছে কোরান ঠিক ঐ শিখের মতন হারাম না হ'লেও

তারা শুনত—না শুনলে গান্ধিজির কথা শুনতে পাবে না ব'লেই। মহাত্মাজি হয়ত ভাবতেন হয়রানকে কোরান-কাহিনী শোনান দরকার যেন তেন প্রকারেণ। কিম্বা হয়ত ভাবতেন ভগবানের নানা নামকে এক ভক্তির হাঁড়িতে সিদ্ধ ক'রে পরিবেষণ করলেই প্রতি নামার্থী বলবে—কী চমৎকার ভাতে-ভাত! ব্যঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে আমি একথা বলছি না। বলছি বড় দুঃখেই। কারণ মহাত্মাজি যদি বুঝতেন যেকথা ঐ শিখ বৃদ্ধ বলেছিলেন যে, তিনি জুলুম করছেন অনিচ্ছুকেও জবরদস্তি ক'রে কোরান শুনিয়ে তাকে বিশ্বপ্রেমিক তথা মুসলমানপ্রেমিক দাঁড় করাতে চেয়ে—তাহ'লে হয়ত তাঁর এমন শোচনীয় অকালমৃত্যু হ'ত না। কিন্তু যা বলছিলাম।

বলছিলাম যে, গান্ধিজি যতই বলুন না কেন সেকেলিয়ানার চতুর্বর্গদানশক্তির কথা, আমরা এযুগের মানুষ—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"বুদ্ধিযুগের সন্তান" (sons of an intellectual age)—সুতরাং খানিকটা রিয়ালিস্ট না হ'য়েই পারি না। তাই মনে করতে পারি না যে, এ-যুগেও মানুষের স্বভাব বদলানো যায় নীতিবাদের বক্তৃতা দিয়ে বা সেই দেশের গুণগান ক'রে যেখানে দুঃখ দৈন্যের চিহ্নলেশও নেই। মনে হ'ল এহেন সভায়—যেখানে অধিকাংশ শ্রোতাই ঐ শিখ বৃদ্ধের মনোভাবাপন্ন কী হবে গেয়ে এ-অসম্ভাব্য রূপকথার দেশের গুণগান? শুধু তাই নয়, আমার ভয় হল পাছে এ-সুফী গানটি শোনালে এখানকার অনেকের মনে এ সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে যায় যে মহাত্মাজি এ গানটি এত করে গাওয়াচ্ছেন কেবল মুসলমানদেরই গুণ-গান করতে।* তাছাড়া যেটা সবচেয়ে বড় কথা সেটা এই যে, মহাত্মাজির প্রার্থনা-সভায় এসে আমি যেন প্রায় শ্বাসকষ্ট বোধ করছিলাম। এধারে হিন্দু ওধারে মুসলমান—(armed neutrality-র আবহ—যার একটা মাত্র বিশেষণ মনে এল—"ঘোর")—এহেন পরিবেশে চড়াও হ'য়ে এসে গাইতে হবে আমাকে যে আমরা জনে জনে রাম ওরফে রহিমের সন্তান—অভেদরাজ্যের সহোদর সহোদরা!—বিশ্বাস? কিন্তু ঐতো বলছিলাম এযুগের মানুষ বুদ্ধির ঘোড়াকে একেবারে

* এ-আমার স্বকপোলকল্পিত নয়। প্রার্থনা সভায় আমি আমার এক প্রিয় বন্ধুকে আসতে নিমন্ত্রণ করি প্রথম দিন। তিনি বলেছিলেন করজোড়ে: "মাপ করবেন। আপনার গান আমি কত ভালবাসি আপনার কাছে অজানা নেই—আপনি আর যেখানেই গান করুন না আমি যাব—এমন কি নিমন্ত্রণ না পেলেও—কিন্তু মহাত্মাজির প্রার্থনাসভার ছায়া মাড়ানোও আমি হিন্দুর পক্ষে অন্যায় মনে করি। কারণ মহাত্মাজি চান না হিন্দুর মঙ্গল, চান শুধুই মুসলমানেরি উন্নতি। তিনি হিন্দুর কেউই নন—মুসলমানদের দরদী।" ইনি একজন মস্ত লোক ও মহাত্মাজির অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে—মহাত্মাজিকে বহু অর্থ চাঁদা দিয়ে এসেছেন যখন তখন—দুহাতে।

সরাসরি ডিঙিয়ে বিশ্বাসের ঘাস খেতে রাজি হবে ব'লে মনে করতে পারে শুধু তারাই যারা বাস্তববাদের ধারও ধারে না। কাজেই আমি মহাত্মাজির অনুরোধ সত্ত্বেও ধ'রে দিলাম আবুল হাফিজ জলন্ধরীর একটি গান যাকে আমার মনে হল এ-সভার সভাসদেরা অন্তত ব্যঙ্গ ব'লে ভুল করবেন না।

ওরে মন! প্রেমেরি কর্ না গুণগান।
অন্তরমন্দিরে বাজে তাঁর বাঁশরী,
স্বপন বিছায় তার-ঝঙ্কার-লহরী,
সে-রাগিণী বেসে ভালো প্রাণে তার জেলে আলো
তারেই বরণ কর্ যাচি' তার দীক্ষা।
অশোক অপরাজেয় অভয় যাহার গেহ
তারি সাধনায় প্রতি প্রেমের পরীক্ষা:
পেতে হবে তারি বরদান॥
কথা শোন! দে বিদায় যত অভিমান।

ওরে মন। প্রেমেরি কর না গুণগান।
বেদনা দেখায় পথ গভীর আঁধারে,
একথা ভুলিস কেন তুই বারে বারে?
হৃদয়-গহন তলে অলখ তপন ঝলে
তারি আবাহনে তুই কাট্ মায়াবন্ধন।
মেঘে যদি সে লুকায় জীবনে আঁধার ছায়,
সে উদিলে কাঁটাবন হয় ফুলনন্দন:
পেতে হবে তারি সন্ধান॥
কথা শোন্! দে বিদায় যত অভিমান।

ওরে মন! প্রেমেরি কর্ না গুণগান।
জপি' সে-অরুণ-নাম হোক তোর নিশি ভোর,
সব যায় যাক্—শুধু থাকে যেন প্রেম তোর,
জয়ে তোর পরাজয় পাছে হয়—জাগে ভয়
অবুঝ সকলি চেয়ে সকলি পাছে হারায়!
যায় ঐ ব'য়ে বেলা…শেষ হ'য়ে এলো খেলা

তারি অভিসারে চল্ বরি' তারি করুণায়,
পিছু-ডাকে না পাতিয়া কান॥
কথা শোন্! দে বিদায় যত অভিমান।

ওরে মন! প্রেমেরি কর্ না গুণগান।
ভারতজননী তোর কাঁদে দেখ্ বেদনায়!
নরনারী দিশাহারা কোথা পথ তমসায়!
মুরলী-ধরের বরে মুরলী উঠায়ে করে
তাঁরি সুরে সুর ওরে নে মিলায়ে গভীরে!
জাগিলে তুই রে মন, জাগিবে তিন ভুবন
প্রেমের পূজারী আছে যে যেথায় অচিরে
সাধিবে সুরেলা একতান॥
কথা শোন! দে বিদায় যত অভিমান।

কিন্তু এ-গানটি গাইতে গিয়েও যে মনে বিশেষ স্বস্তি পেলাম তাই বা কেমন ক'রে বলি? সান্ত্বনা ছিল বড় জোর এইটুকু যে, এ-গানের মূল প্রতিপাদ্য একটি অনবদ্য নীতিকথা ওরফে যদিবাদী ভবিষ্যদ্বাণী—অর্থাৎ আমরা যদি ভালো হই, যদি হই প্রেমময়, যদি মহত্ত্বের জন্যে প্রাণও বলি দিতে রাজি থাকি তা'হলে এই ধরাধামেই অবিলম্বে নেমে আসবে প্রেমের বৃন্দাবন। "বুদ্ধিযুগের সন্তান" হ'য়েও এ বাণীকে আমরা গ্রহণ করতে পারি মাত্র শুধু সম্ভাব্য ব'লে অবশ্যম্ভাবী ব'লে নয়। তবু এ-গানটি গাইতে গাইতেও মন আমার বিষাদে ছেয়ে গেল। বোধহয় সভার সমবেত বিষাদের আবহই এর কারণ। কিন্তু হেতু যাই হোক, গাইবার সময়েও আমার মনে ক্রমাগতই এই একটি প্রশ্ন উঠতে লাগল মাথা চাড়া দিয়ে: যে, মানুষের স্বভাবের যে-রূপান্তরের কথা প্রচার করছি আমরা গানের বাণীর মধ্যে দিয়ে সে-রূপান্তর কি এই ধরণের শিষ্ট কথা মিষ্ট সুরে বললেই সংঘটিত হবে—কিম্বা এই ধরণের নীতিভেদের প্রার্থনাসভায় বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে সুসাধ্যতর হবে? মনে বিষাদ এল ঘনিয়ে আরো এই জন্যে যে, আমরা কেউ জানি না কোন্ পথে হবে মানুষের এ-বোধোদয়। মনে হ'ল: মানুষ কী অসহায়! সামনে আসীন শিখদের বিষণ্ন মুখ দেখে মনে প্রশ্ন এল: ঐ তো এত প্রাণান্তিক দুঃখ পেয়েও তবু ওরা কি জানতে পেরেছে আজো—কেন এত দুঃখ এল ওদের জীবনে? আমরা কেউ কি

জানি কেন—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—মানুষকে আবহমানকাল চলতে হয়েছে—"সুখকে প্রাণের মূল্য দিয়ে কিনে?" মানুষ যতই কেন হাঁক ডাক করুক না যুক্তি, রাষ্ট্র, দর্শন বা শিল্প নিয়ে—তবু খতিয়ে তার স্বরূপটি কি? শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন এ-প্রশ্নের অপ্রতিবাদ্য উত্তর—সাবিত্রীতে:

পশু ও অর্ধেক দেব উভয়ের মাঝে সেতুসম,
স্বকীয় গরিমা, জীবনের লক্ষ্য তার জানে না সে।
নাই তার স্মৃতি—কেন তার অভ্যুদয়—কোথা হ'তে।
প্রত্যঙ্গের সাথে তার অন্তরাত্মা আজো যুধ্যমান
নিরস্ত শিখর তার পারে না চুম্বিতে নীলাম্বর
(কেন না) পাশব-পঙ্কিলতার গর্ভলীন বস্তুসত্তা তার।

মনে প্রশ্ন জাগল—এহেন মানুষকে বাঁচাবে কে? তারই মতন একজন নীতিবাদী মানুষ? হয়ত এমন কোনো প্রভাব এজগতে সক্রিয় হবে যার ফলে চিররুদ্ধ মুক্তিদ্বার খুলবে সব মানুষেরি জন্যে, কিন্তু তবু মনে পড়ে উপনিষদের সেই সনাতন তিরস্কার: অন্ধ কি অন্ধকে চালাতে পারে সত্যি? যে-মানুষ

বিশ্বের নিয়ন্তা হবে—পারে না নিজেরে নিয়ন্ত্রিতে
আত্মার তারণ চায়—পারে না রক্ষিতে স্বীয় প্রাণ,*

সে কি পারবে তার অন্ধকারের অজ্ঞান-শলাকা দিয়ে বিজ্ঞানতিমিরান্ধ মানুষের চোখ ফোটাতে? আন্তর শক্তির বিভূতিই যে অর্জন করেনি সে দেখাবে কিনা অঘটন ঘটনপটীয়সী চাতুরী? সঞ্চয়ই যার নেই সে রাতারাতি হ'য়ে উঠবে দানবীর!

চোখ বুঁজে বিশ্বাস আনার চেষ্টা ক'রে তবু গাইতে লাগলাম তারস্বরে: "তু হি উঠা লে সুন্দর মুরলী তু হী বন্ যা শ্যাম মুরারি"—

"মুরলীধরের বরে মুরলী উঠায়ে করে
তাঁরি সুরে সুর ওরে নে মিলায়ে গভীরে"—

কিন্তু সংশয়ী মন তো, মানবে কেন? মাথা নাড়বেই—জীবকোটি কি পারে ঈশ্বর-কোটির শিখরবিলাসী হ'তে? বাঁশি হাতে নিলেই কি বংশীধর হওয়া যায়? পরমহংসদেব বলতেন না—"লোকশিক্ষা দেবে? চাপরাশ পেয়েছ? আদেশ না পেলে তোমার কথা কে শুনবে? জোনাকি আলো দেয় না—শুধু দেখায় অন্ধকার কত গাঢ়!"

* **He would guide the world, himself he cannot guide.**
He would save his soul, his life he cannot save,
(Savitri···Sri Aurobindo, Bcok III. Canto IV.)

ভাবতে ভাবতে শেষ স্তবকে আশার চেয়ে বেদনার স্বরই বেজে উঠল আমার গানে—নৈলে হয়ত গানটির মধ্যে কোনো হৃদয়াবেগই ফুটে উঠত না—এককথায় গান-গাওয়া হ'ত ব্যর্থ। ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম এই ব'লে যে, "প্রভু, আলোর অঙ্গীকার যদি নাও আনতে পেরে থাকি—তবু জোনাকির মত অন্ধকার কত গাঢ় তারো তো একটু আভাস দেবার অধিকার দিলে গানের আবেগের মধ্যে দিয়ে!" ইংরাজিতে যাকে বলে: to be thankful for small mercies—আর কি!

* * *

মনে হ'ল: আমার নিগূঢ় বেদনা কেমন ক'রে গান্ধিজিকে স্পর্শ করেছে। কারণ গানের শেষে তাঁর কণ্ঠস্বর আরো ম্লান শোনালো যখন তিনি বললেন মাইক্রোফোন সামনে ধ'রে:

"তোমরা এইমাত্র শুনলে আর একটি অপূর্ব ভজন। যদিও গানের স্বরটি সহজ সরল কিন্তু প্রতিভাবান গায়কের অনুশীলিত কণ্ঠের গুণে গানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে একটি বিশেষ স্বকীয় মাধুর্য। গানটির মূল বাণী হ'ল এই যে সত্যিকারের ভক্ত তাঁর হৃদয়কে এমন একটি মন্দির ক'রে তুলবেন যেখানে ভগবানের সব আবির্ভাবই হ'য়ে উঠবে পূজ্য প্রতিমা…" ইত্যাদি।

কিন্তু প্রচারকের মুখে নেই কোনো আশার আলো—তার চেয়ে বেশি কে জানত যে খুব কম হৃদয়ই নিজেকে ভগবানের মন্দির ক'রে তুলতে পারে - শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

সভাভঙ্গ হ'লে আমি মহাত্মাজির সঙ্গ নিলাম তাঁর দুটি সহচারিণীর সাথে। সেই বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোক ছুটে এসে আমাকে প্রণামই ক'রে ফেললেন উৎসাহবশে। মহাত্মাজিকেও তিনি ধন্যবাদ দিলেন আমার গানের উল্লেখ ক'রে। মহাত্মাজি তাঁর দিকে খানিকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কিন্তু কোনো কথা বললেন না। তাঁর চোখের সেই বিষণ্ণ-ভর্ৎসনার মূক ভাষা ভুলব না কোনোদিনো।

আশেপাশের ভিড় কমলে মহাত্মাজি আমার দিকে ফিরে বললেন মৃদু অনুযোগের সুরে: "কিন্তু তুমি সে-গানটি গাইলে কই?"

আমি বললাম: "কিন্তু আপনি কি আন্দাজ করেন নি কেন গাইলাম না?"

মহাত্মাজি আমার কথার উত্তর না-দেওয়াতে আমি বলতে বাধ্য হ'লাম:

"সভার যে-মেজাজ দেখলাম তাতে মনে হ'ল ও-গানটি গেয়ে ফল হবে না—তাই এই নীতিবাদের গান ধরলাম।"

মহাত্মাজি তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে ভ্রূ উত্তোলন ক'রে বললেন হেসে: "আর সে-নীতির মর্ম বাণী আমি কেমন জাঁকিয়ে পেশ করলাম?"

আমরা ধীর মন্থর গতিতে চলছিলাম বির্লা হৌসের দিকে। মহাত্মাজি মাথা নিচু ক'রে একটু ভাবলেন, পরে আমার পানে ফিরে বললেন: "জানো? আমি এক দিক দিয়ে ধরতে গেলে খুশীই হয়েছি বলব যে আজ তুমি 'হম ঐসে দেশ.ক বাসী' গানটি গাওনি। কিন্তু আবার দুঃখও হচ্ছে যে তুমি কালই লক্ষ্ণৌ যাচ্ছ। আমার ও-গানটি আর শোনা হ'ল না তোমার মুখে।"

আমি হেসে বললাম: "আমার লক্ষ্ণৌ যাওয়া হ'ল না।"

মহাত্মাজি একগাল হেসে বললেন: "জানো—আমি সর্বান্তঃকরণেই চেয়েছিলাম যাতে তোমার লক্ষ্ণৌ যাওয়া না হয়?"

আমিও হাসলাম: "আর আমাদের দেশে কি তা ঘটতে পারে যা আপনি চান না?"

মহাত্মাজি মাটির দিকে চোখ রেখে বললেন: "ঠাট্টা ক'রে তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হ'ত?"

মহাত্মাজি আমার ঠাট্টায় ব্যথা পাবেন আমি ভাবিনি। তাই বললাম তাড়াতাড়ি: "আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে, আপনি আমার গান শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এতেই আমার সব ভেস্তে গেল। তাছাড়া আমাকে থাকতে হ'তই আপনাকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে।"

"কৃতজ্ঞতা?"

"বাঃ। গুরুদেব ও তাঁর আশ্রম সম্বন্ধে আপনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে যেসব কথা বললেন - তার জন্যে কৃতজ্ঞ না হ'য়ে আমি পারি?—তাছাড়া আমি আরো বেশি কৃতজ্ঞ বোধ করেছি এই কারণে যে আজকের দিনে যিনি ভারতের অধ্যাত্ম-রাজ্যের মুকুটমণি আপনি তাঁকে আপনার শ্রদ্ধার অর্ঘ দিলেন সেধে। তাঁকে আজো অনেকেই চেনে না—অথচ না জেনে সমালোচনা করে তাঁর সব কিছুকে — এজন্যে আমার মনে একটা দুঃখ আছে।"

মহাত্মাজির চোখে স্নেহ ঝরছিল। তিনি আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন: "কিন্তু এত মহৎ যিনি তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান না দিয়ে আমি পারি?

(But how could I have done otherwise—not to give one so great his bare due ?")

আমার মন আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে উঠল। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম, তিনি আশীর্বাদ করলেন।...কিন্তু সে-আনন্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে ছিল বিষাদ...গভীর বিষাদ...মনে পড়ল আমার সেই ধ্যানদর্শনের কথা...কেন ফিরে ফিরে এ-চিন্তা আমার মনে হানা দিচ্ছিল ? কেউ কি জানে কোন্ ঢেউ আসে কোত্থেকে, আর কেন ? শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় :

প্রজ্ঞার প্রোজ্জ্বল অবগুণ্ঠ তারে করে আকর্ষণ
শুধু দেখে নাই কভু আনন সে অবগুণ্ঠিতার :
বিরাট অজ্ঞান রহে ঘেরি, তার জ্ঞানের মণ্ডল।*

* * *

তার পরদিন যাওয়া হয় নি প্রার্থনা সভায়। তার পরদিন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনি আমাকে নিয়ে গেলেন, বললেন : "বাপুজি ঐ 'হম্ ঐসে দেশকে বাসী হৈঁ' গানটির কথা ফের বলছিলেন আমাকে। আজ ওগানটি গাইবেন কিন্তু।"

* * *

সভায় পৌঁছতেই সেই চিরন্তন শিখ ভদ্রলোক মহা উৎসাহে ছুটে এলেন ফের। তাঁর কম্প্লিমেণ্ট-বর্ষণ থামতে চায় না। জোর ক'রে বাধা দিয়ে বললাম : "কিন্তু আজ আবার গোলমাল করবেন না তো ?"

"না সাধুজি ! ওঃ কী গানই গাইলেন পরশুদিন...মহশাল্লা !"

অন্যসময়ে হ'লে হয়ত তাঁর উচ্ছ্বাসে সাড়া দিতাম। কিন্তু সেদিন আমার মনে তাঁর উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ কোনো দাগই কাটতে পারল না। আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লাম। মনে প্রশ্ন জাগল : এ-ধরণের উচ্ছ্বাসের মূল্য কতটুকুই বা ! যে-আত্মাভিমানের অসুর মানুষকে চোখ-বাঁধা বলদের ম'ত নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে...আজ আলো কাল ফের ছায়া...সবই অস্থির...

যে-আলো আনিল তার মর্ম—মন হারালো তাহারে !
শেখে যাহা কিছু—তূর্ণ হারায় সংশয়ে পুনরায় !

Wisdom attracts him with her luminous masks,
But never has he seen the face behind :
A giant ignorance surrounds his lore.
(Savitri Part I, Book III Canto IV.

সূর্য তার ভাবনার ছায়া—হেন হয় তার মনে…
পরক্ষণে সব ছায়া পুনরায়…সত্য কিছু নাই !*

* * *

গান্ধিজি তাঁর চিরাচরিত ঢঙে এসে বসলেন বেদীতে। ফের সেই কোরান গীতা প্রভৃতি…ফের সেই শ্রোতাদের শ্রবণবিমুখতা…মাথা হেঁট করা...মনেও ফের সেই একই বিষাদ এল ছেয়ে…

* * *

গান্ধিজি তাকালেন। আজ আর নিস্তার নেই। তাই খুব জোর ক'রে আশাশীল (optimist) হ'তে চেষ্টা ক'রে গাইলাম "হম ঐসে দেশকে বাসী"… নিরুপায়…

এমনি দেশের পুরবাসী আমি—নাই যেথা শোক নিরাশা ভাই !
নাই যেথা মোহ—ভ্রান্তি নাই—কি তাপ অশান্তি পিপাসা নাই।
প্রেমের গঙ্গা যেথা উচ্ছল,
চির আনন্দে জীবন উজল,
একই দৃষ্টিতে দেখি চলাচল—দিনরাত মাস বরষ তাই।
সকলেই যেথা না চাহিতে পায়,
বিনা মূলে যেথা সবি কেনা যায়,
একই আভা যেথা প্রতি মুখে ভায়—নাই অনটন, ভয়ের ঠাঁই।
স্বার্থের নাই যেথায় আসন,
বলে না কেহ : "এ পর—ও আপন",
নাই অভাজন—নাই মহাজন, আলো আছে—কালো দাহনা নাই।

কিন্তু গাইব কি ? আনন্দের গান কি কেউ গাইতে পারে যখন বিষাদ তার মনের সভাপতি ? বাঁচোয়া এই যে, সুরের একটা নিজস্ব আনন্দ আছে : শুধু তাকেই আঁকড়ে ধ'রে গাইতে গাইতে যাহোক তবু একটু প্রফুল্ল ভাবের রস আমদানি করা গেল। কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝলাম যে আমার গান সেদিন—

* The light his soul has brought his mind has lost ;
All he has learned is soon again in doubt ;
A sun to him seems the shadow of his thoughts,
Then all is shadow again and nothing is true.
(Savitri Part I, Book III, Canto IV)

যাকে বলে—জমেনি। এর আরো একটা কারণ—আমার ক্রমাগতই মনে হচ্ছিল গান গাইতে গাইতে যে, মহাত্মাজির সম্বন্ধে সাংবাদিক ধুমধাম প্রভৃতি থেকে তাঁর জীবনের মহাসাফল্যের যে-ছবিটি আমাদের কল্পনাপটে ফুটে ওঠে তার সঙ্গে বাস্তব মানুষটির মিল কতটুকুই বা! গাইতে গাইতে কেবলই মনে হচ্ছিল তাঁর দীর্ঘ-নিশ্বাস: "তুমি ঠাট্টা ক'রে যা বললে তা যদি সত্যি হ'ত!" কী গভীর ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে শুধু এই একটি স্বীকারোক্তির কারুণ্যের মধ্যে দিয়ে! জাতীয় জীবনে মহাত্মাজির মতন শক্তিমান্ আজ কে? অথচ নিজের শক্তির সামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের কী ধারণা? বস্তুত তিনি নিজের কর্মজীবনের অপরিমেয় ব্যথতা অন্তরে অন্তরে গভীরভাবে অনুভব করেছেন ব'লেই বুঝি এ৲ সব "পেয়েছির দেশের" কল্পনা তাঁকে এত আনন্দ দিয়েছে। ভাবতেই চমকে উঠলাম। তাই —তাই। ইউরেকা! এই জন্মেই তিনি এত ভালোবাসতেন এ অসম্ভব রাম-রাজ্যের রূপকথাকে—Utopia-কে গানের মধ্যে দিয়ে বরণ করতে। জর্মন সুরকার হ্বাগনার বলতেন: বাস্তবের যেখানে শেষ সেখানেই শিল্পের শুরু। তাই তো মানুষ যুগে যুগে সুন্দরকে এত ভাবে কল্পনা করেছে—বাস্তবে যা মেলে না তাকে অন্তত খানিকটাও পেতে—না-ধরার মধ্যে দিয়েও তাঁকে ছুঁতে। যাঁরা বলেন শিল্প হবে বাস্তব জীবনের নিখুঁত ছবি তাঁদের ভুল হয় এইখানেই। জীবনে যা পাই শুধু সেইটুকু শিল্পের উপজীব্য নয়—হ'তে পারে না। জীবন যা দেয় না, দিতে চায় না, দিতে পারে না শিল্প তার আভাস দেয় ব'লেই না তার এত আদর! ভিক্ষুকও চায় সম্রাটের গদিতে বসতে—অন্তত একদিনের জন্মেও। কিন্তু বাস্তবে তাকে কে বসতে দেবে সেখানে? তাই সে-বেচা র আবুহোসেনের কাহিনী প'ড়েই আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে যাকে হারুণ অল রসিদ একদিনের জন্মে সাম্রাজ্যের খলিফা করেছিলেন। মহাত্মাজি তাঁর কর্মজীবনে পারেন নি মানুষের ঐক্য আনতে সুষমা প্রতিষ্ঠিত করতে। পারবেন কেমন করে? নীতিবাদের সাধ্য কি—সে রামরাজ্যের গোড়াপত্তন করবে? যুক্তি শুধু যে মানুষকে চালাতে পারে না তাই নয়—যেসব শক্তি মানুষকে ভুলপথে চালায় মোহের বিকার এনে—তাদের ভালো ক'রে নিদানই পায় না সে-ধন্বন্তরী, তা চিকিৎসা করবে কোত্থেকে? তাই বুঝি এই পরিহাস—যেকথা সার সি পি রামস্বামী একবার লিখেছিলেন মহাত্মাজির ঔষধের ব্যর্থতা সম্বন্ধে বলেছিলেন: এযুগে ভারতে হিংসার যে-মহামারী এল মহাত্মাজির অহিংসার অনুপানে, সে-রকম ব্যাপক মহামারী কখনো কোনো দেশে প্লাবনের জলের মতন লক্ষ লক্ষ নরনারীকে এমন চক্ষের নিমেষে বাস্তুছাড়া করেছে

কি না সন্দেহ। সাধে কি মহাত্মাজি দুঃখ পেয়েছেন? আর তাঁর নিজের ব্যর্থতা তাঁর নিজের অন্তরে কতখানি হতাশার অন্ধকার এনে দিয়েছে আমাদের বহির্দৃষ্টি তার কতটুকু খবর রাখে?

গান শেষ হ'লে মহাত্মাজি আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখদুটির সেই উদাস বিষণ্ণ চাহনি আমি ভুলব না। অথচ তাঁরি উপরোধে এইমাত্র আমি গেয়েছি আনন্দের গান—আর সে যেমন তেমন আনন্দ নয়—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর নিখুঁত উপমচিত্র—উঃ! মহাত্মাজি তারপর ফের মন্তব্য করতে সুরু করলেন। বললেন অনেক কথা। সেসব কিন্তু আমি শুনিনি। আমি কেবল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। সে-মুখে আলোর ভরসার চিহ্নমাত্র নেই। অথচ সারা এশিয়ায় মহাত্মাজির তুল্য প্রভাবশালী লোক আর কে আছে— বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে?

"মানব-বাহন তাঁর পারেনি করিতে লক্ষ্যবেধ
তাই প্রতিহত বিভু সুপ্ত আজো তার বীজমাঝে,
আপনারি বিরচিত নামরূপে রহি' শৃঙ্খলিত"*

*　　　*　　　*

সভা ভাঙলে আমি তাঁর পিছু নিলাম ফের। ভিড় কমলে আমি তাঁকে মাঠের উপরেই প্রণাম করলাম। তাঁর বিষাদক্লান্ত চোখদুটির দিকে চাইতেই তিনি যেন জোর ক'রেই বললেন:

"চমৎকার গানটি"।

"আপনি এ-গানটি বিশেষ ভালোবাসেন—শুনেছি।"

তিনি উত্তর দিলেন না, শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর মুখে হাসি টেনে এনে বললেন: "এর পরে কবে গান শোনাচ্ছ? কাল?"

"এবার আমাকে মাফ করতেই হবে বাপুজি! আমি একদিনের জন্যে দিল্লি এসে রয়ে গেলাম প্রায় সাতদিন। কাল ভোরেই আমি কলকাতা রওনা হচ্ছি—আর দেরি করলে চলে না।"

* **Because the human instrument has failed,
The Godhead frustrate sleeps within its seed,
A spirit entangled in the forms it made**

(Savitri Book III, Canto IV)

মহাত্মাজি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল হাসি হেসে বললেন: "তাহ'লে নিরুপায়। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় আমার প্রার্থনা সভা ফাঁকা ফাঁকা লাগবে আমার কাছে।"

* * *

বির্লা হৌসের গেটের কাছে যখন এসে পৌছলাম তখন দৃষ্টি আমার ঝাপসা হ'য়ে গেছে চোখের জলে। কেন জানি না কেবলই মনে হ'তে লাগল এইই আমার শেষ দেখা মহাত্মাজির সঙ্গে। অথচ যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম তখন কী কুণ্ঠাই না আমার মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছিল! না হবে কেন? তাঁর ভাবধারা, নায়কতা, জাতীয় রোগনির্ণয় ও ঔষধবিধান এসব কিছুর সঙ্গেই আমার মনের এতটুকু মিল নেই। দেশে সভাসমিতিতে প্রায়ই জনে জনে দামামা বাজিয়ে যে-ঘোষণা রটাচ্ছে যে মহাত্মাজিই জাতির পিতা শুধু তাঁর তপস্যায়ই আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে—একথা কোনদিনই আমার মন গ্রহণ করেনি। বাংলার বিপ্লবী, তিলকের প্রবুদ্ধ নায়কতা, হাজার হাজার দেশসেবকের কারাবরণ, প্রাণবলিদান, স্বদেশীগান, বহুজনের সাধনায় কংগ্রেস গ'ড়ে ওঠা, সভাসমিতি, দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ, সুভাষচন্দ্রের দরুণ ইংরাজ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহভঙ্গ চারিয়ে যাওয়া, সর্বোপরি শ্রীঅরবিন্দের তপস্যা এসবই আমাদের দেশকে স্বাধীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। যে-সিদ্ধির জন্যে শত শত দেশনায়ক আপ্রাণ সাধনা করেছে, হাজার হাজার দেশসেবক ত্যাগ স্বীকার করেছে, লক্ষ লক্ষ নরনারী চোখের জল ফেলেছে সে সিদ্ধির সমস্ত গৌরব মাত্র একটি মানুষকে দেওয়া—এ ঘোর অবিচার ও অসত্য দর্শনে আমার মন ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে বহুদিন। মহাত্মাজিকে আমি ভালোবেসেছি, ভক্তি করেছি—কিন্তু মোহান্ধ হ'য়ে নয়—খোলা চোখে—তাঁর প্রচারিত অনেক নীতির ফল দেশের পক্ষে বিষময় হয়েছে মেনে নিয়ে তবে। অথচ তবু সেদিন বারবারই একটা কথা মনে হচ্ছিল: যে, মহাত্মাজি জানতেন আমি তাঁর অনুরাগী হ'লেও পার্ষদের মধ্যে পড়ি না—আমার স্বভাব মতিগতি রুচি আদর্শ সাধনা স্বধর্ম সবই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র। একথা সত্য যে, যাকে তিনি স্নেহ করেছেন তাকে নিজের মুঠোর মধ্যে আনতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি কোনোদিন। কিন্তু তবু তিনি জানতেন আমি একদা তাঁর প্রভাব-পরিধির মধ্যে প'ড়ে প্রায় তাঁর করতলগত হওয়া সত্ত্বেও যে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে গিয়েছি সে শুধু আমার নিজের ইচ্ছাবলে নয়—তাঁর চেয়ে বহুগুণ অধিক তপস্যা প্রভাব ও জ্ঞানমহিমার সান্নিধ্যবলে। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁর কোনো প্রয়োজনই ছিল না আমার প্রতি স্নেহশীল হবার। কিন্তু তিনি আমাকে ভিন্নরুচি ভিন্নপন্থী ভিন্নধর্মী এমন কি বেদরদী জেনেও কই তাঁর গভীর

নির্মল স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেন নি তো! আমার মতন একরোখা অসহিষ্ণু মানুষের পক্ষে-এদৃশ্য বড় আশ্চর্য, বড় সুন্দর, বড় মর্মস্পর্শী মনে হচ্ছিল। মনে মনে তাঁকে বারবার প্রণাম করেছিলাম যখন বিমানে তাঁর বিষন্ন স্নেহসজল চোখদুটির কথা মনে হচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল মানুষটির ব্যক্তিরূপের একটি অদ্ভুত স্বতোবিরোধের কথা: "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" বজ্রের চেয়ে কঠোর তবুও মৃদুল ফুলেরো চেয়ে।

* * *

কলকাতায় পৌঁছলাম ৫ই নভেম্বর, ১৯৪৭। পরের বছর (১৯৪৮) জানুয়ারি মাসে ৩০শে তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতা। বিষয়: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের মিল কোথায়? দ্বারভাঙ্গা বিলডিঙে মস্ত সভায় অগণ্য শ্রোতা। কথা ছিল: আমি আমার ছাত্রী মঞ্জু গুপ্তাকে নিয়ে গানও গাইব বক্তৃতাটিকে বিশদ করতে। সন্ধ্যা ৬টা হবে—আমি প্রথমে জর্মন সুরকার কুর্শমানের রচিত ঘুমপাড়ানি জর্মান গানটি গাইলাম মূল জর্মনে, তার শুধু প্রথম স্তবকটি দিচ্ছি:

So schlaf' in Ruh! so schalf' in Ruh!
Die Sterne leuchten hell und klar,
Es kommt von dort der Engel-schar
Die Auglein zu,
Mein Kindlein du!
Nun schlaf' und schlaf' und schlaf' in Ruh!

গানের শেষে আমি সবে বক্তৃতা সুরু করেছি, গান গেয়ে দৃষ্টান্ত দেবার আগে সাধ্যমত ব্যাখ্যা করছি—য়ুরোপের ঘুমপাড়ানি গানের সঙ্গে আমাদের ঘুমপাড়ানির তফাৎ ঠিক কোনখানে—ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছি—ভারতীয় প্রাণের চিরন্তন ক্ষুধা জগন্মাতার কোলে ঘুম যাওয়া, যেখানে য়ুরোপীয় গানে বড় জোর একটু স্বপ্ন আছে আকাশের কিন্তু জগত্তারিণীকে গর্ভধারিণীর পদবীতে টেনে নামিয়ে এনে উন্নত করার নেই কোনো অভীপ্সা যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তাঁর সাবিত্রীতে: A God come down and greater by his fall—এমন সময়ে নিদারুণ সংবাদ এলো: গান্ধিজিকে একটি হিন্দু হত্যা করেছে গুলি ক'রে।

সভাভঙ্গ হ'ল। একটি ছেলের হিস্টিরিয়া মতন হ'ল। অন্ধকার ছেয়ে এল সবার মনে। চমকে উঠলাম: এ-খবর আমার কাছে এল কখন? না, ঠিক যখন আমি জর্মন ঘুমপাড়ানি গানের সুরে গাইতে যাচ্ছি আমার বাংলা গান যার প্রথম স্তবকে শিশু বলছে মাকে:

ঘুম যাই মা…আজ ঘুম যাই মা !…
তোর বুকে আজকে ঘুম যাই মা ! ..
আমি আর কোথাও না চাই ঠাঁই মা !
শোন্, আর যা চাই—পেলেই হারাই…
তাই চাই—যেথা হারানো নাই ।

*　　　　*　　　　*

সেদিন রাত্রেই আমার জ্বর। স্বপ্নে শুনলাম মা-র উত্তর শিশুকে :

আয় রে আয়…কোলে আয় আয়…
ছেলে তো মা-র কোলেই ঘুমায় ।…
শোন, মা-ও চায়, শিশুকে চায়…
তাই ফিরাতে তাকে কাঁদায় !”

স্বপ্নে দেখেছি বার বার দুটি বিষণ্ণ চোখ…বড় ক্লান্ত, বড় উন্মুখ…মার কোলে ঘুম যেতে চায় সে! শেষ রাতে ঘুম ভাঙল যখন তখন আমার চোখে জল… কানে বাজছে: “শোন্ মা-ও চায়..শিশুকে চায়…তাই ফিরাতে তাকে কাঁদায় !”

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

(জন্ম—১৮৭৬)

The world that we must seek is a *world in which the* creative spirit is alive, in which life is *an adventure full of joy and hope, based rather upon the impulse to construct than* upon the desire to retain what we possess or to seize what is possessed by others. It must be a world in which affection has free play, in which love has been purged of the instinct for domination, in which cruelty and envy have been dispelled by happiness and the unfettered development of all the instincts that build up life and fill it with mental delights. Such a world is possible : it waits only for men to wish to creat it.

Russel.

"যে জগৎ আমরা চাই সেখানে সৃজনী প্রতিভা হবে জীবন্ত, যেখানে জীবন হবে আশা ও আনন্দের অভিযান - সেখানে আমরা গড়তেই চাইব, চাইব না তো যেটুকু আছে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে—বা অন্যের যা আছে কেড়ে নিতে। সে-জগতে ভালোবাসার লীলা হবে মুক্ত, প্রেমের থাকবে না আধিপত্যস্পৃহা নিষ্ঠুরতা ও ঈর্ষা মিলিয়ে যাবে সুখের আলোহাওয়ায়, প্রাণ-জাগানো প্রবৃত্তিগুলির বিকাশে জীবনে আন্তর আনন্দ উঠবে উচ্ছল হ'য়ে। এ-হেন জগৎ সৃষ্টি করা যায় সত্যিই—কেবল সে পথ চেয়ে আছে কবে মানুষ তাকে চাইবে।"

রাসেল

GOETHE :

"Vernuenft und Wissenschaft,
Des Menschen allerhoechste Kraft."

বিজ্ঞান আর বুদ্ধির দুই বিজয়ী পর্ণে নিত্য
কীর্তির চিরদীপ্ত আকাশে বিহরে মানবচিত্ত

উৎসর্গ

শ্রীগগনবিহারী মেতা

প্রীতিনিলয়েষু,

কত পূজারীরে করেছি বরণ প্রেমে

আমরা—অশ্রু-হাসির মন্ত্র মানি' :

সে-বরণে এল প্রাণ-মন্দিরে নেমে

তাদের দিশারি-দেবের দৈববাণী।

প্রীতিবদ্ধ

দিলীপ

নববর্ষ, ১৩৫১

মহামতি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় লুগানো সহরে—সুইজর্লণ্ডে—নারীজাতির আন্তর্জাতিক শান্তিসংঘে। সে-সভায় তিনি এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হ'য়ে চীন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। সে-বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমরা সকলেই—বিশেষ ক'রে চীনদের সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধায়। তাঁর Problem of China বইটিতে "Chinese and the Western Civilization"ব'লে একটি অধ্যায় আছে। তার শেষের কথাগুলি উদ্ধৃত করলে বোধহয় বোঝাতে পারব কেন তিনি আমাদের চিত্তহরণ করেছিলেন:

"চীনদেশে আমি গিয়েছিলাম শেখাতে, শিক্ষক হিসেবে। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে দেখি, আমার মনে শেখানোর কথা আর তেমন আসে না—ভাবতাম আমি বেশি ক'রে: ওদের কাছে আমার কী শেখার আছে।...ওরা সেসব গুণপনায় দক্ষ নয় যাদেরকে আমরা মনে করি মূল্যবান, অর্থাৎ—সমরে শক্তি ও বাণিজ্যে দুঃসাহস। কিন্তু যাঁরা জ্ঞান বা সৌন্দর্য বা জীবনের সহজ উপভোগকে বড় ক'রে দেখেন তাঁরা মদমত্ত, রণচণ্ড প্রতীচ্যে এসব তেমন ক'রে পাবেন না যেমন ক'রে পাবেন চীনদেশে। যদি আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কিছু চীনকে দিয়ে তার বদলে আমরা চীনের কাছে থেকে নিতে পারতাম তার উদার তিতিক্ষা (large tolerance) ও ধ্যানশীল চিত্তপ্রসাদ –কিন্তু সে-আশা দুরাশা!"

মনে আছে লুগানোতে আমরা অনেকে খুব বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তাঁর এই প্রাণের প্রসারে। অসামান্য রসিকতায়ও কম না। রবীন্দ্রনাথ আমাকে একবার বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে যে, রাসেলের সঙ্গে তাঁর যখন কেম্ব্রিজে দেখা হয় তখন তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন তাঁর শাণিত বিদ্রূপে। অমন ধারালো বিদ্রূপ তিনি ওদেশে শোনেননি কখনো। রাসেলের লেখার ছত্রে ছত্রে এই রসিকতার দীপ্তি আমাদের চমকে দিত: যেমন যখন তিনি হেসে লিখেছেন (দ্বিতীয় অধ্যায়): "চীনদেশে বর্ষায় শত্রুকে আক্রমণ করা নীতিবিগর্হিত। শুনেছি, উ-পেই-ফু একবার এ কাজটি ক'রে অজান্তে একটি যুদ্ধ জিতে ফেলেছিলেন। পরাজিত সেনাপতি এতে আপত্তি ক'রে পাঠালেন। কাজেই উ-পেই-ফুকে যুদ্ধের আগে যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে গিয়ে ফের আদ্যন্ত যুদ্ধ করতে হ'ল একটি নির্মল প্রভাতে।"

চৈনিকদের রাসেল এত বেশি ভালোবেসেছিলেন তার একটা কারণ তারা হাসতে জানে। তাঁর হাসি—সে একটা দর্শনীয় বস্তু।

শুধু এইজন্যেই যে আমরা রাসেলকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম তা নয়। তাঁর

কথাবার্তা ধরণধারণ সবই অতি সহজ সরল। এগুণটি এমন একটি মানবিক গুণ যাতে মন সহজেই মুগ্ধ হয়। কিন্তু এর ফলে যে-প্রীতি সে একটু অপলকা। রাসেলকে আমরা আরো শ্রদ্ধা করেছিলাম তাঁর চরিত্রে একটি আশ্চর্য স্বতোবিরোধ ছিল ব'লে। এর নাম মিস্‌টিসিসম। এ বিশেষ্যটির বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া ভার—তবে অতীন্দ্রিয় ভাবধারার ছোঁয়াচ তাঁর নানা লেখায় পাওয়া যায় বললে হয়ত বোঝানো যাবে আমার মূল বক্তব্যটি। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না একথার ভাষ্য হিসাবে।

উদ্ধৃতিটি দিচ্ছি তাঁরই অপরূপ ভাষায় (যার প্রকাশভঙ্গিতে ও ক্ষমতায় মুগ্ধ হ'য়ে অধ্যাপক লাস্কি তাঁকে জীবিত গদ্যলেখকদের মধ্যে সর্বপ্রধানদের মধ্যে আসন দিয়েছেন):

"It was on the Volga, in the summer of 1920, that I first realised how profound is the disease in our Western mentality, which the Bolsheviks are attempting to force upon an essentially Asiatic population, just as Japan and the West are doing in China. Our company were noisy, gay, quarrelsome, full of facile theories, with glib explanations of everything, persuaded that there is nothing they could not understand and no human destiny outside the purview of their system ·. I could not believe that happiness was to be brought to them by a gospel of industrialism and forced labour···. And at last I began to feel that all politics are inspired by a grinning devil, teaching the energetic and quickwitted to torture submissive populations for the profit of pocket or power or theory···. It was in this mood that I set out for China to seek a new hope."*

লুগানোতে নানাজাতির তরুণতরুণীরাই—রাসেলের মধ্যে এই মিস্‌টিক প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর এক ইংরাজ বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম অতীন্দ্রিয় অনুভব নাকি তাঁর প্রায়ই হ'ত। পরে রবীন্দ্রনাথও আমাকে বলেছিলেন যে একদিন কেম্ব্রিজে তিনি রাসেলের সঙ্গে হেঁটে চলেছিলেন কিংস্ কলেজের গির্জার

* রাসেল রুষদেশে প্রথম যান ঐ সালেই। জগতে যুদ্ধবিগ্রহের নিয়ন্তা যে-চণ্ড মনোবৃত্তি তার বিরুদ্ধে তাঁর উজ্জ্বল বুদ্ধি ও নির্ভীক বিনয়কে তিনি যেভাবে নিয়োগ ক'রে এসেছেন সত্য-সন্ধানের কাজে, তার পরিচয় পেতে হ'লে রুষ ও চীন সম্বন্ধে তাঁর বই দুটি প্রতি সন্ধানী চিন্তাশীলেরই পড়া চাই।

পাশ দিয়ে। সেখানে স্তোত্রগান হচ্ছিল। কবি তাঁকে বলেন: "চলুন না একটু শুনি গিয়ে।" তাতে রাসেল বলেন: "উঁহু। রঙচঙে সার্সির মধ্যে দিয়ে রকমারি আলো, ধূপদীপ, স্তবস্তুতি—ওসবে আমি নেই। শুনতে শুনতে কত কী ভাব আসে—মনে হয় ওরা চক্রান্ত ক'রে আমাকে দিয়ে আস্তিক্যের তরফে অনেক কিছু বলিয়ে নিতে চায় যা মানতে আমার বুদ্ধির মানা।" রবীন্দ্রনাথ রাসেলের একথাটি উদ্ধৃত ক'রে বলেছিলেন আমাকে যে রাসেলকে বুঝতে হ'লে সব আগে তাঁর এই বুদ্ধির গুরুবাদকে বুঝতে হবে। রোলাঁ রাসেলকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু রাসেলের নিজের মধ্যে এই যে একটি গভীর মিসটিক ভাব আছে রাসেল তাকে এত সন্দেহের চোখে দেখেন কেন এ-প্রশ্ন আমাকে করেছিলেন দু'-একবার। তখন আমি উত্তর দিতে পারিনি। আজ বুঝেছি কেন রাসেল চাইতেন না কোনরকম মিস্‌টিক প্রবণতা। একে মেনে নিলে তাঁর বুদ্ধিবাদের সোজা শড়ক অমন সোজা থাকত না। তবুও যে বুদ্ধিবাদের আত্মম্ভরিতা তাঁকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারেনি—তাঁর বুদ্ধির আপ্রাণ প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে তাঁর নানা চিন্তায়ই কবিত্ব ও স্বপ্ন ঝিকমিকিয়ে উঠেছে তার মূলে আছে তাঁর এই অন্তঃশীলা মিস্‌টিক ভাবধারা। এই মিস্‌টিক দৃষ্টিই আমাদের অনেককে গভীরভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু সে অন্য কথা। লুগানোয় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কথাই বলি।

আমরা একই হোটেলে ছিলাম—কাজেই নড়তে চড়তে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখাশুনা ও গল্পগুজব হ'ত বৈকি। একবার তাঁকে বলেছিলাম মনে আছে যে, তাঁর রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বলশেভিকরা বলে—ওসব ছেলেমানুষি—সৃষ্টি করতে হ'লে অতীতের অনেক কিছু আগাছাই নির্মূল করতে হবে। বিপ্লব বিনা মানুষের মুক্তি অসম্ভব। রাসেল তাতে বলেছিলেন যে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি শুধু আগাছাই জড়ো করেনি, ফুলও ফুটিয়েছে বহু। বিপ্লববাদের উন্মূলননীতিতে বিস্তর ফুলও মারা পড়ে আগাছার সঙ্গে, এই জন্যেই তিনি বিপ্লববাদের পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে অসহিষ্ণুতা ও যান্ত্রিক-মনোভাব (mechanistic outlook) সর্বনেশে। সে-সময়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করতেন যে রুষদেশই হ'চ্ছে নন্দনকাননের অগ্রদূত। আমরা অনেকেই ভাবতাম (সে-সময়ে) যে, রুষ উচ্চওরা বের ক'রে ফেলেছেন মানুষের পূর্ণমুক্তির পথ—শুধু এ বুর্জোয়া মনোবৃত্তি থেকে প্রলেটারিয়েট মনোবৃত্তিতে ঝাঁ ক'রে পৌছে গিয়ে। তাই সে-সময়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের অনেকেরই মতের অমিল হ'ত

বল্‌শেভিস্‌মকে নিয়ে। কিন্তু আজ—হিটলারের অভ্যুদয়ের পরে—আশা করি সবাইবুঝতে পেরেছেন যে রাসেলের তিতিক্ষা-প্রীতির মূলে ছিল গভীর ধ্যানচেতনা। এ-চেতনা না থাকলে তিনি নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও নাস্তিক বলশেভিকবাদের বিপক্ষে এমন ক'রে পারতেন না দাঁড়াতে তাঁর দীপ্ত প্রতিভার সমস্ত যুযুৎসু শক্তি নিয়ে।

তিনি লুগানো থেকে চ'লে গেলে আমি ইতালি ভিয়েনা ও প্রাগ হ'য়ে যখন বুদাপেস্তে আসি তখন তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পাই। ভিয়েনা থেকে আমি তাঁকে একটি দীর্ঘপত্র লিখেছিলাম—এপত্রটি তারই উত্তর। আমার প্রশ্ন ছিল:

ভারতবর্ষের মতন দেশে সঙ্গীতচর্চা আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় কি না? যেদেশে বেশির ভাগ লোক পরাধীনতার নানা দুঃখে দৈন্যে জর্জর সেখানে শিল্পচর্চার মতন সৌখিনিয়ানাকে সমর্থন করা চলে কি না। এ বিষয়ে টলস্টয়পন্থীদের শিল্পবিরাগের যুক্তিও উদ্ধৃত করেছিলাম উত্তরে রাসেল লেখেন (তারিখ: ১৮-১০-১৯২২)

"তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এ নিয়ে আমি কম ভাবিনি।"

সবদিক থেকে দেখে আমার মনে হয় যে আমি যদি তুমি হতাম তবে আমি সঙ্গীতেই আমার জীবন নিয়োগ করতাম—রাষ্ট্র নিয়ে কেবল ততটুকু কালক্ষেপ করতাম যতটুকু সঙ্গীতচর্চার পরেও সম্ভব। আমার মনে হয় না যে আমরা খতিয়ে বেশি কাজ করতে পারি, যদি আমরা আমাদের স্বভাবকে খুব বেশি লঙ্ঘন করি। আমি অনেক সময়ই দেখেছি যে, যারা তাদের স্বভাবের খুব প্রবল ও মূলগত কোনো আকাঙ্ক্ষাকে অন্য কোন উচ্চাশার পায়ে বলি দিয়েছে তারা শেষটায় এত গোঁড়া ও নিষ্করুণ হ'য়ে ওঠে যে তাদের দিয়ে ভালোর চেয়ে মন্দই হয় বেশি। আমি নিজে একটা রফামতন করেছি নিজের সঙ্গে: আমার অর্ধেক সময় দেই রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতিতে—বাকি অর্ধেক দেই সেই সব বিশুদ্ধ চিন্তার কাজে যা আমার প্রকৃতি ভালোবাসে।

এছাড়া আরো একটা দিকে থেকে দেখ ব্যাপারটাকে। ধরো কিছুকাল পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল। তুমি চাও তো যে সে স্বাধীন ভারতে এমন লোক থাকবে যারা একটা চমৎকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ'ড়ে তুলবে? কিন্তু তুলবে কে শুনি, যদি রাষ্ট্রচর্চা ছাড়া অন্য সব সাধনায় যারা সিদ্ধপুরুষ হ'তে পারত তারা ইতিমধ্যে তাদের প্রতিভাকে অনাদরে শুকিয়ে ফেলে থাকে?

প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় গিয়ে অবশ্য তোমার নিজের রুচি ও ঝোঁকের উপর। সঙ্গীত-প্রেম যদি তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষ হয়, তোমার ঐদিকেই যাওয়া উচিত তবে যদি মনে হয় রাষ্ট্রনীতি তোমাকে সঙ্গীতের অভাব বোধ করতে দেবে না, সে অন্য কথা। তুমি ছাড়া আর কেউ এই মূল প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারে না। আমি কেবল বলতে পারি এ, প্রশ্নটির উত্তর সম্বন্ধে মনস্থির হ'লে কিভাবে কাজ করা উচিত।

তোমার পক্ষে যে-সব যুক্তিতর্ক তুমি দিয়েছ সে সবই ভাববার কথা। তবে সব ভেবে আমার যা মনে হয় বললাম। ইতি

বার্ট্রাণ্ড রাসেল।"

তারপর আমি ভারতবর্ষে ফিরি ১৯২২-এর শেষে। মাঝে মাঝে তাঁকে চিঠিপত্র লিখতাম—সৌজন্যসুন্দর রাসেল উত্তর দিতেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায়। ১৯২৭শে আমি আমেরিকা ও ভিয়েনায় নিমন্ত্রণ পেয়ে ইংলণ্ডে হ'য়ে যাব ঠিক করি বিশেষ ক'রে রাসেলের সঙ্গেই দেখা করতে, যেহেতু শুনলাম তিনিও আমেরিকা যাচ্ছেন। (আমেরিকা যাওয়া আমার হয়নি কারণ অশান্তিময় য়ুরোপ এবার আমার একেবারেই ভালো লাগেনি।) লণ্ডনে পৌঁছে শুনি তিনি কর্ণওয়ালের একটি কুটিরে। তাঁকে লিখতেই তিনি সাদরে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন সেখানে। তাঁর বাসার কাছে একটা গ্রাম্য সরাইয়ে ছিলাম তিন দিন। রোজই যেতাম তাঁর কাছে। যা যা কথাবার্তা হ'ত লিখে রাখতাম রোজই। লণ্ডনে ফিরে যেসব টাইপ ক'রে তাঁকে পাঠাই প্রকাশ করবার অনুমতি চেয়ে। তিনি অতি সামান্যই সংশোধন ক'রে সেগুলি ফেরৎ পাঠান অনুমতি দিয়ে এখানে অবশ্য সেগুলির বাংলা অনুবাদই দেওয়া হ'ল।

২৬-৬-২৭

রাসেল নিজে এসে দোর খুলে দিলেন ও নির্মল হাসিতে তাঁর মুখচোখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। সেই পরিচিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—অথচ কি-একটা কারুণ্যে মধুর, স্নিগ্ধ।...

ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন আমাকে।

চারধারে বইটই ছড়ানো।

"খুব ব্যস্ত এখন ?"

"হাঁ, এখানে আমি আসিতো ছুটি নিতে নয়—লণ্ডনে যেসব কাজ অসমাপ্ত তাকে সমাপ্ত করতে। তাই লণ্ডনে থাকলে তোমাকে আমি বেশি সময় দিতে পারতাম। তবে আশা করি তুমি বুঝবে—"

"আপনাদের মতন লোকের সময়ে যদি এতটুকুও হস্তক্ষেপ করি তা'হলেও যে মনের মধ্যে বাধো বাধো ঠেকে। আমাকে আপনি রোজ তিন চার ঘণ্টা সময় আপনার সঙ্গে গল্পালাপ করতে দিয়েছেন এটা কি আমার কম লাভ? আমার এইতেই কুণ্ঠা হয়।"

"না না কুণ্ঠার কারণ নেই। আমি আরও একটু বেশি সময় বাইরের লোককে দিতে পারতাম হয়ত যদি আমার নানা লোককে চিঠি লিখতে না হ'ত।"

"আপনি খুব চিঠি লেখেন বুঝি?'

"নানারকম চিঠি লিখতে হয় বৈকি!"

"কতকগুলি ক'রে—রোজ?"

"গড়পড়তা দিনে ছসাতখানি ক'রে বড় চিঠি লিখতে হয়। তাছাড়া সপ্তাহের একটা দিন আমি শুধু চিঠি লেখাতেই নিয়োগ করি। সেদিন ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানার ধাক্কা তো বটেই, কম ক'রেও।"

"বলেন কি। ক্লান্তবোধ করেন না?"

"করলেই বা উপায় কি?"

"একজন সেক্রেটারি রাখেন না কেন?" ওয়েল্‌শ, শ,—"

"তাঁদের বইয়ের কাটতি কত। ওয়েল্‌সের এক একটি বই লক্ষাধিক গ্রাহক কেনে।"

"আর আপনার?"

রাসেল হাসলেন একটু: "আমার? আমার Educationএর উপর বইটি আজ অবধি সব চেয়ে বেশি বিক্রয় হ'য়েছে। কিন্তু ইংলণ্ডে সব শুদ্ধ ৩০০০।৪০০০ সংখ্যার বেশি বিক্রয় হয় নি। আমার সব বই থেকে যা আয় তাতে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয় মাত্র।"

বিস্ময় লাগল: "কিন্তু মিস্টার রাসেল, য়ুরোপে আপনার admirer এত বেশি"—

রাসেল হেসে বললেন; True, only their admiration does not come to seven and six (রাসেলের বইয়ের দাম সাধারণত সাত শিলিং ছ পেন্স)।

"তাহ'লে আপনি যে ছেলেপিলেদের স্কুল করছেন তার অর্থ—"

সেই জন্যই তো আমি আমেরিকায় যাচ্ছি—বক্তৃতা দিয়ে কিছু টাকা করতে।'*

* একজন আমেরিকা-ফেরত বন্ধুর মুখে শুনলাম এই Lecture-tour রাসেলের আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে, চার পাঁচ মাসে তিনি আড়াই লক্ষ ডলার পেয়েছেন।

"আপনার Education বইখানিতে আপনি মিস্ ম্যাকমিলানের একটি স্কুলের খুব প্রশংসা করেছিলেন, না ?"

হাঁ।"

"আপনার স্কুলটি কি সে আদর্শেই চালাবেন ?"

"না। কারণ যদিও সে স্কুলটি খুব ভালো বটে, কিন্তু সেরকম স্কুলকে ঠিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেদের উপযোগী বলা চলে না। কেননা এরকম নার্সারি স্কুল আসলে শ্রমিকদের জন্মেই।"

"আর—আপনার স্কুল ?"

"আমার স্কুল তাদের জন্যে যারা সন্তানদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে পারে।"

"আপনি কি মনে করেন যে স্কুলগুলিকে এভাবে আলাদা করা উচিত—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যে এক ব্যবস্থা দরিদ্রের জন্মে আর ?"

"না, করি না। কিন্তু কি জানো ? প্রাথমিক স্কুল চালানো এত ব্যয়সাধ্য যে কেবল গভর্নমেণ্টই এ ভার নিতে পারে। অন্তত আমার মতন সামান্য লোকের পক্ষে তা অসম্ভব।"

"কেন ? এরকম স্কুলের আয় থেকে কি স্কুল চলে না ?"

"যদি গরিবদের জন্যে হয় তাহ'লে চলে না। কাজেই সিদ্ধান্ত হয় অনেকটা এই রকম যে, যদি ধনী না হও তাহ'লে স্কুল করলে চালাতে হবে ধনীদেরই জন্যে।"

ব'লে রাসেল হাসতে লাগলেন। নিজের ঠাট্টা তামাসা তিনি নিজে বড় কম উপভোগ করেন না।

হাসি থামলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "তাই বুঝি আপনি আমেরিকায় টাকার চেষ্টার যাচ্ছেন।"

"হাঁ। নইলে সেদেশে কি মানুষ সাধ ক'রে যেতে চায় ?"

"কিন্তু গভর্মেণ্টের সাহায্য বিনা কি দরিদ্রদের স্কুল চালানো সম্ভব নয় ? ধরুন যদি দু-চারজন ধনীকে পাকড়াতে পারেন, যারা এ-রকম সৎকার্যে চাঁদা দিতে গররাজী নয় ?"

"কিন্তু ঐ গোড়ায়ই যে গলদ করলে: যদি তুমি ধনীদের কাছে হাত পাতো তাহ'লে তাদের নানারকম সর্তে যে তোমাকে সায় দিতেই হবে। অর্থাৎ কি পদ্ধতিতে স্কুল চালানো হবে সে সম্বন্ধেও তারা অনধিকার চর্চা করবেই করবে। আর তারা কী চাইবে বুঝতেই পারছ।"

"কিন্তু তারা ভালো জিনিষও তো চাইতে পারে ?"

রাসেল কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে বললেন : "এ ভরসা তোমায় আমি দিতে পারি যে ধনীরা আর যা-ই চাক্ না কেন, ভালো জিনিষ চাইবে না।"

আমরা হেসে উঠলাম। রাসেল বললেন : "তা ছাড়া ধনীরা আমাকে আপ্যায়িত করবার জন্যে তাদের টাকার ঝুলি ঝাড়বেই বা কেন বল—যখন আমি তাদের হৃদয়হীনতা ও পাশবিক নৃশংসতার সম্বন্ধে কখনো আমার বাক্-মধু ঝরাই নি!"

আবার হাসির সাড়া প'ড়ে গেল।

বললাম : "ওয়েলসের The Undying Fire বইখানিতে তিনিও লিখেছেন যে ধনীরা টাকা দিয়ে সাহায্য করতে এলে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এত হস্তক্ষেপ করে যে কোনও সত্যিকার উন্নতি অত্যন্ত দুরূহ হ'য়ে ওঠেই।"

"তাহ'লেই দেখছ তাদের কাছ থেকে মৌখিক ছাড়া অন্য কোন রকম সাহায্য আশা করা কি রকম বিড়ম্বনা। কাজেই শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করতে হ'লে গভর্মেণ্টের সঙ্গে প্রতিকূলতার লড়াই করা ছাড়া পথ নেই। আর এ সম্ভব হয়—কেবল লোকমতকে জোরালো ক'রে তুলে।"

হেসে বললাম : "মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনার ভরসা ত খুব আশাপ্রদ মনে হচ্ছেনা, মিষ্টার রাসেল। আপনার চীনসমস্যা বইখানিতেও আপনি একস্থলে এমনি কথাই লিখেছেন চীনাদের সম্বন্ধে যে, They have a touching belief in the efficacy of moral force. আর একস্থলে লিখেছেন যে, Human nature in the mass does as much good as it must and as much evil as it dares." (সাধারণ মানুষের প্রকৃতির ধর্মই এই যে সে যতটা পারে অপরের মন্দ করে ও কেবল ভালো করে যতটুকু না করলেই নয়।)

"আমি বলেছিলাম Human nature in nations, না ?"

"না আপনি লিখেছেন Human nature in the mass—অন্তত আমার যতদূর মনে পড়ছে।"*

রাসেল শুধু একটু হাসলেন।

আমি বললাম : "কিন্তু মানব-প্রকৃতির মূল প্রবণতাটি যদি ভালোর দিকে

* "They (the Chinese) have not yet grasped that men's morals in the mass are the same everywhere : they do as much harm as they dare, and as much good as they must," (THE PROBLEM OF CHINA…Chapter IV.)

ব'লে আপনি বিশ্বাসই না করেন তবে সামাজিক সংস্কার চালালেই বা ফল কি, আর শিক্ষার ফলে মানুষকে টেনে তোলার আশার ভিত্তিই বা কোথায়?"

"কি জানো? আমার মনে হয় যে মানব-প্রকৃতির মূল-প্রবণতাটি আসলে ঠিক ভালোও না, মন্দও না। আসলে মানুষকে বাঁচবার জন্যে অহঙ্কারী ও স্বার্থপর হ'তেই হয়। ফলে তাকে কতকগুলি নীতির আশ্রয় নিতে হয় যে-সব নীতির ফলে তার বাঁচার সম্ভাবনা বাড়ে। সমাজ বা শিক্ষার সংস্কার যদি এই কয়েকটা মোটা নীতির সঙ্গে বাদ না সাধে তাহ'লে লোকমতকে দিয়ে কতকটা কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এইমাত্র।"

আহারের ঘণ্টা পড়ল।

* * *

রাসেল বসলেন আমার বাঁয়ে, তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে জন্ ডাইনে, তাঁর স্ত্রী, মিসেস ডোড়া রাসেল জনের পরে, তিন বছরের মেয়ে কেট বসল আমার ঠিক সামনে, তার পাশে ওদের গভর্ণেস—একটি তেইশ চব্বিশ বছরের ফরাসী তন্বী।

রাসেল সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় ক'রে দিলেন। যথারীতি কর-মর্দন পর্বের পর জন্‌কে বললেন: "মিস্টার রায়—একজন ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক জনি।"

জন আমার দিকে যেভাবে চাইল তার মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন আস্তাজ্ঞে-হোক জাতীয় কোনো মনোভাবের যে লেশও ছিল না একথা জোর ক'রেই বলা যেতে পারে।

আমি তার উদ্বেগ দূর করতে তাড়াতাড়ি বললাম: "ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে কিছু জানো কি?"

জন্ তৎক্ষণাৎ বলল: "জানি বই কি। দেখ না আমার মাথায় কি-রকম একটি পালক জ্বল্-জ্বল্ করছে—রেড-ইণ্ডিয়ানরা—"

রাসেল বললেন: "তোমার একটু চুক হ'ল জন্। মাথায় পালক পরে যারা তারা হ'ল রেড ইণ্ডিয়ান। মিস্টার রায় আসছেন তাদের দেশ থেকে নয়, তিনি আসছেন এশিয়া থেকে। যাদের মতন ক'রে তুমি পালক পরেছ তারা থাকে আমেরিকায়। বুঝলে?"

জন্ সন্দিগ্ধ আপত্তির সুর ধরে: "কিন্তু-রেড-ইণ্ডিয়ানরা কি করতে আমেরিকায় থাকবে শুনি? তাদের ইণ্ডিয়ায়ই তো থাকা উচিৎ!"

তার যুক্তির সারবত্তা মঞ্জুর ক'রে রাসেল হেসে বললেন: "তোমার আপত্তি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাপারটাকে একটু অন্য দিক থেকেও দেখা যেতে

পারে! দেখ না কেন—মিস্টার রায়কে তো ঠিক 'রেড' বলাও চলে না? তাহ'লে তিনি কেমন ক'রে রেড ইণ্ডিয়ান হ'তে পারেন?"

তর্ক-শাস্ত্রের নিয়মকানুনের প্রতি স্বচ্ছন্দ ঔদাসীন্য দেখিয়ে জন বলল: "আমি রেড-ইণ্ডিয়ান হব ব'লে দিচ্ছি কিন্তু। আমি আমার সেই ভীষণ কালো কোটটি প'রে ওঁকে খুন করব।"

ব'লে জনের মুখ ভারি জমকালো হ'য়ে উঠল।

রাসেল আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন: "ছেলেপিলেদের ঠিক শান্তিপ্রিয় বলা চলে না, চলে কি?"

আমি বললাম: "না। কিন্তু কেন তারা শান্তি চায় না ভাবি মাঝে মাঝে।"

রাসেল বললেন: "যুদ্ধ ও রক্তারক্তির সংস্কার যুগ যুগ ধ'রে আমাদের রক্তে মজ্জায় মিশে গেছে কি না।"

"কিন্তু ছেলেবেলা থেকে চেষ্টা করলে কি শিশুদের মনে যুদ্ধের সংস্কারের বদলে শান্তির প্রতি অনুরাগ বপন ক'রে দেওয়া যায় না?"

রাসেল চিন্তিত স্বরে বললেন: "বলা শক্ত। কারণ প্রথমত দেখ না, শান্তিবাণী প্রচারটা নিতান্ত একেলে। তার ওপর এটা নানা দিক দিয়ে ঘোরালো—জটিল। কাজেই সরল শিশুর মন সহজে এ-জটিলতায় সাড়া দিতে চায় না। তাই ব'লে মনে কোরো না যে আমি বলছি এ বিষয়ে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। তবে সেটা দু-একদিনে হবার নয়—এই-ই আমার বলবার কথা।"

শ্রীমতী রাসেল বললেন: "জন আগে এতটা মার-মার কাট-কাট করত না, মিস্টার রায়। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের বাড়ীতে একটি বল্‌শেভিষ্ট বালক কিছুদিন ছিল।"

"কে?"

"রুষ দেশের Foreign Charge d'Affaire মিষ্টার রসেনগোলৎসের ছেলে। যে-কদিন সে এখানে ছিল সে-কদিন করেছে শুধু রক্তারক্তির গুণগান।"

আমি হেসে বললাম: "ও—তাই! এ ছেলেটিই বুঝি তাহ'লে আপনাদের শান্তিপ্রিয়তার প্রচার-কাজে বাধা দিয়েছে?"

রাসেল বললেন: "এখানকার মতন তো দিয়েছেই। তোমাকে বলছিলাম না যে, যুদ্ধের প্রবৃত্তি আমাদের মজ্জাগত?"

"কিন্তু বারণ করলেন না কেন?"

"শিশুকে জোর ক'রে বারণ করলে অনেক সময়ে উল্টো উৎপত্তি হয়। নিষিদ্ধ

জিনিষটিকে সে ভয়ে চেপে রাখে, যার ফল কোনো না কোনো ছদ্মবেশে আরও বিষময় হ'য়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেই—কোথাও না কোথাও।

"মানে ?"

"নিষিদ্ধ ফল বেশি লোভনীয়—এই আর কি।"

"তাহ'লে কি আপনি বলতে চান এর কোনো প্রতীকারই নেই ?"

"এরকম স্থলে অনেক সময়ে বোধ হয় শিশুকে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তাহ'লে কিছুদিন ধ'রে সে খানিক ফোঁসফোঁস করে বটে—কিন্তু পিছনে উৎসাহ উত্তাপের আগুন না থাকলে সময়ে জুড়িয়ে যায়ই।"

শ্রীমতী রাসেল জন ও কেটকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। রাসেল বললেন: "ডোরা, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি ও মিস্টার রায় পরে সমুদ্রের ধারে গিয়ে তোমাদের ধরব।"

বাইরে সমুদ্রের জলভরা বাতাস, গাছপাতার শিহরণ গ্রীষ্মের রূপালি কিরণের সঙ্গে মিশে কী সুন্দর যে !

রাসেল একটি পাইপ টানতে টানতে দ্রুত চলছিলেন। তাঁর দীন বেশ সাধারণ জুতা মলিন কলার নেক্‌টাই দেখে আশপাশের লোকেরা তাঁকে গেঁযো কৃষকদের সামিল মনে করছিল বা। সত্যিই তাঁর চেহারার সঙ্গে কর্ণওয়ালের গেঁয়োদের চেহারার সাদৃশ্য সেদিন আমার মনে বেশি ক'রেই উদয় হয়েছিল।

একথা সেকথায় জিজ্ঞাসা করলাম: "লণ্ডনে সেদিন 'আর্কস' খানাতল্লাসি ও তারপর ইংলণ্ডের সঙ্গে রুষদেশের রাজনীতিক সম্বন্ধ-ছেদন সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয় ?"

"নিতান্ত পাগ্‌লামী করছে আমাদের জাত।"

সম্প্রতি চীনদেশে রুষ-বিপ্লবের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ আছে কি ?"

"সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে ? রাশিয়ার সঙ্গে আজকাল ইংলণ্ডের প্রেমের মূল শিকড়টি এতই আলগা হ'য়ে এসেছে যে একটা যুদ্ধ গর্জে উঠ্‌তেই যদি ফ্রান্স হালফিল লড়াইয়ের নামে না ভরিয়ে উঠত।"

"তার মানে ?"

"পোলাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধাবার জন্ম ইংলণ্ড উঠে পড়ে লেগেছে ও

পোলাণ্ডকে খুব পিঠ চাপ্‌ড়ে বলছে—এগোও, এগোও। কিন্তু হ'লে হবে কি, মুস্কিল হচ্ছে—পোলাণ্ড ফ্রান্সকেই দিয়েছে ইষ্টদেবীর বরণ-মালা, ওদিকে ফ্রান্স ঠিক এখন একটা বড় লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত নয়। কাজেই ইংলণ্ডের সদিচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না।"

"আপনার Prospects of Industrial Civilization বইখানিতে আপনি যে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছেন সেটা বেশ ভাবিয়ে দেয় কিন্তু।"

"কি ?"

"যে এর পরের লড়াই বাধবে দুটো মহাদেশের মধ্যে ; একদিকে থাক্‌বে সমগ্র পাশ্চাত্য যার পৃষ্ঠপোষক হবে আমেরিকা, অন্যদিকে থাকবে সমগ্র প্রাচ্য যার পৃষ্ঠপোষক হবে রাশিয়া। হাল আমলে চীনা-বিপ্লবে রাশিয়া হ'ল রসদদার, এদেখে মনে হয় যে আপনার ভবিষ্যদ্বাণী ফলল ব'লে।"

"শুধু চীনদেশেই নয়—রুষদেশ ভারতবর্ষকেও সাহায্য করতে পা বাড়িয়ে রয়েছে। কারণ বড় বড় জাতির মধ্যে কেবল রাশিয়ারই ভারতবর্ষকে সাহায্য করার কোন স্বার্থ আছে।"

"কেন ?"

"ইংলণ্ডকে ভাতে মারতে! বল্‌শেভিক ইম্পিরিয়ালিস্‌ম্‌ ও বৃটিশ ইম্পিরিয়া-লিস্‌মের আন্তর সম্বন্ধটি যে দাকুমড়ো একথা না জানে কে ?"

"বলশেভিকদের প্রচেষ্টাকে কি ইম্পিরিয়ালিস্‌ম্‌ নাম দেওয়া ঠিক মিস্টার রাসেল ?"

"নয় কেন ?"

বল্‌শেভিকদের এটা যদি ইম্পিরিয়ালিস্‌মই হয় তাহ'লেও এর পিছনে কি তাদের বড় বড় আদর্শ নেই দুচারটে ?"

রাসেল ধারালো হেসে বললেন : "বড় বড় আদর্শ কোন্‌ ইম্পিরিয়ালিস্‌মের নেই বলো ? এজাত যখন ওর গলা টিপে ধরে তখনো কি সে বলে না যে এটা সে করছে শুধু বড় বড় আদর্শের শ্বাসকষ্ট দূর করতে ?"

কিন্তু রাশিয়ার কি সত্যিই একটা আদর্শ নেই তাই ব'লে ? তারা কি হুবহু অন্য সব ইম্পিরিয়ালিস্‌টিক জাতের মতন এ বিষয়ে ?"

"অবশ্য রুষদেশকে আমি প্রথমটায় একটু বেশি কাছ থেকে দেখে তার ওপর একটু অবিচার করেছিলাম—"

"তাহ'লেই দেখুন। তাছাড়া রুষজাতি অদূর ভবিষ্যতে জগতের ইতিহাসকে

খানিকটা বদ্‌লে দেবে মনে করা যায় না কি? কম্যুনিস্‌ম্‌ একটা নববাণী কি আনে নি সত্যই।"

"এনেছে। বিশেষ ক'রে নাস্তিকতার দীক্ষায় আর পাণ্ডাপুরুতের ধাপ্পাবাজিকে টিট্‌কিরি দেওয়ার দীক্ষায়।"* কিন্তু মানুষের মনের মাটিতে আদর্শবাদের চাষ-আবাদে যে তারা খুব ফসল ফলাতে পারে নি এ-ও ত সমান সত্য?"

"এখন পর্যন্ত পারে নি হ'তে পারে, কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে যে-সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার ভার তারা সবে নিয়েছে তারা গ'ড়ে উঠলে কম্যুনিস্‌মের আইডিয়াটা সফল হ'তে পারে? অন্তত লেনিনের তো সেই স্বপ্নই ছিল?"

রাসেল চিন্তিত সুরে বললেন: "জোর ক'রে বলা কঠিন। কি জানো? ছেলেমেয়েদের কোনও একটা নীতি খুব জোর ক'রে গিলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে প্রায়ই উল্টো উৎপত্তি হয়। দেখ না কেন, খৃষ্টধর্মের একটা প্রধান নীতি বিনয় ও অহিংসা, বটে তো? কিন্তু এযুগে খৃষ্টান প্রভুদের আধুনিক সংস্করণ দেখলে কি তা মনে হয়? আধুনিক খৃষ্টান দেখে আমি Why I am not a Christian† ব'লে একটি লেকচারে একথা বলেছিলাম।" বলে একটু হাসলেন।

হেসে বললাম: "পড়েছি। কিন্তু তাহ'লে কি আপনি বলতে চান যে নীতি প্রভৃতি মানুষের মনে চারিয়ে দেবার চেষ্টা করার কোনও সার্থকতাই নেই?

* তাঁর Why I am not a Christian বইখানিতে রাসেল তাঁর নাস্তিকতাবাদের সমর্থনে বলছেন যে জগৎ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যে সিদ্ধান্ত ক'রে বসে তার পিছনে একটা মস্ত যুক্তি উহ্য থাকে: সেটা এই যে এ জগতের আশ্চর্য গঠনপদ্ধতি (design) দেখে একজন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান স্রষ্টিকর্তা সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস আসেই। এ যুক্তির উত্তরে রাসেল বলছেন: "When you come to look into this argument from design, it is a most astonishing thing that pepole can believe that this world, with all the things that are in it, with all its defects, should be the best that ommipotence and omniscience has been able to produce in millions of year. I really cannot belive it. Do you think that, if you were granted omnipotence and omniscience and millions of years in which to perfect your world, you should produce nothing better than the Ku Klux Klan, the Fascisti and Mr. Winston Churchill ?"

† তাঁর পূর্বোক্ত লেকচারে রাসেল বল্‌ছেন: "You will remember that he (Christ) said, 'Resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also'...I have no doubt that the present Prime Minister, for instance, is a most sincere Christian, but I should not advise any of you to go and smite him on one cheek. I think that you might find that he thought this text was intended in a figurative sense."

মানুষের মূল বিশ্বাস ও প্রত্যয়গুলি যদি সমাজের ওপর কোনও ছাপই না ফেলে তবে সমাজের সংস্কার হবে কোন্ পথে বলবেন আমাকে ?”

“মানুষের বিশ্বাস ও প্রত্যয়গুলি যে কখনো সমাজে কোনও প্রভাব বিস্তার করে না এমন কথা তো আমি বলি নি। কোনো কোনো বিশ্বাস আছে যার ফল সমাজে ফলে বৈকি। সাক্রামেণ্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলেই তো খৃষ্টানদের মধ্যে ডাইভোর্স আইনের এত কড়াক্কড়ির পাগ্‌লামি। শিশু-জন্ম-নিবারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি অশ্রদ্ধার মূলেও এই সব খৃষ্টানি বিশ্বাস। কেবল শাস্তির চাষআবাদেই খৃষ্টানি নীতির বীজ হ'য়ে রইল বন্ধ্যা।”

“আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন বলুন তো খুলে ?”

“শুধু এই যে অন্তত ধর্ম বিষয়ে কেবল সেই সব বিশ্বাস আমাদের মনের ওপর ছাপ ফেলে যে সব বিশ্বাস নিছক মন্দ।”

দুজনেই উঠলাম হেসে।

* * *

পরদিন মিস্টার রাসেলকে আমার হোটেলে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করলাম। ঠিক্ একটার সময় তিনি এসে হাজির।

দুজনে গ্রাম্য টেবিলে ব'সে অতি সাদাসিধে রকম খাওয়া সুরু করা গেল।

কথায় কথায় বললাম : “জানেন মিস্টার রাসেল, আমার এক ইংরাজ বান্ধবী আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন—আপনার সম্পর্কে ?”

রাসেল হেসে বললেন : “থিয়সফিস্ট বোধ হয় ? এ-দেশটা থিয়সফিস্টে থিয়সফিস্টে ছেয়ে যাবার যোগাড় !”

“থিয়সফিস্ট কি না জানি না, তবে স্পিরিচুয়ালিস্ট বটে। তিনি আমায় একদিন ডব্লিউ, টি, স্টেডের মেয়ের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাজির। কি ?—না, স্পিরিট-ফটোগ্রাফ তুলতেই হবে।”

“কি রকম উঠলো ?”

“সে ভারি মজা। আমাকে তো এক ক্যামেরার সামনে বসাল এক বৃদ্ধা মহিলা। সেই নাকি ভূত নামায়। বসিয়ে একটা ধর্মসঙ্গীত গাইল। তারপর ফটো নিল। প্লেটটা দেখাল। আমার মাথার ওপরে একটা মুখ আবছা হ'য়ে উঠল বটে। কিন্তু ছাপা হ'লে দেখা গেল মুখটা অচেনা।—কিন্তু একটা ভারি অদ্ভুত জিনিষ দেখলাম।”

“কি ?”

"আমার একটি সিভিলিয়ান বিপত্নীক বাঙালি বন্ধুর ছবি দেখলাম মিস স্টেডের স্পিরিটফটোগ্রাফির সংগ্রহের মধ্যে। তাঁর মাথার ওপর তাঁর মৃত পত্নীর ছবি স্পষ্ট দেখা গেল। এক্ষেত্রে ছবিটা fake হবার সম্ভাবনা ত ছিল না?"

রাসেল বললেন: "কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যখনই বিশেষজ্ঞেরা তদন্ত করতে যান তখনই ভৌতিক-উদ্যোক্তাদের কারসাজি ফাঁশ হ'য়ে যায়।"

"কিন্তু মিস্টার রাসেল, এত সব কাণ্ডকারখানার আগাগোড়াই যে ভুয়ো তা মনে করাও কি একটু কঠিন হয়ে পড়ে না?"

"না আগাগোড়াই ভুয়ো নয়। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে।* কিন্তু ততখানি সত্য নেই যতখানি ওরা দাবি করে।"

একটু থেমে: "অন্তত এটা নিশ্চিত যে আত্মা অবিনশ্বর এটা আর যে-ই প্রমাণ করতে পারুক না কেন, ভৌতিক-গবেষকরা পারেন নি।"

একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে: "একটা মজার গল্প শোনো।"

"একজন স্পিরিচুয়ালিস্ট একবার আমাকে সাড়ম্বরে লিখেছিলেন যে যদি ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো প্রশ্ন আমার করবার থাকে যার উত্তর আমি পেতে চাই তা'হলে প্রশ্নটি তাঁর বাহন ভূতপ্রবরকে শুধু একবার জানানোর অপেক্ষা। আমি শক্তি (energy) সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালাম। ভূতপ্রবরও অবশ্য মহা বাগাড়ম্বর ক'রে উত্তর দিলেন। কিন্তু ফলে দেখা গেল কারুরই জ্ঞান এক তিলও বাড়ে নি। আমি তাঁকে লিখলাম যে ভূত-পুঙ্গব আর যে বিষয়েই পারদর্শী হোন্ না কেন বিজ্ঞানের যে তিনি 'ক-খ'-ও জানেন না এ ধ্রুব।"

হাসি থামলে আমি বললাম: "কিন্তু আপনি কি তাহ'লে বলতে চান যে আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের চৈতন্যের কোনো চিহ্নই থাকে না?"

"চিহ্ন যে থাকে সে স্বপক্ষে এ-রটনার লেশমাত্র সাক্ষ্যও পাওয়া যায় না যে!

"কিন্তু থাকে একথা যদি কেউ বলে তার সে-উক্তিকে অপ্রমাণও তো করা যায় না।"

* ভৌতিক-গবেষণাদি সম্বন্ধে রাসেল তাঁর "What I believe"এ সম্প্রতি লিখেছেন যে হাঁ। গবেষণাগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে হচ্ছে বটে, কিন্তু দেহের লয়ের পরে আত্মা যে বিরাজ করে সে সম্বন্ধে কোনো অকাট্য প্রমাণই মেলেনি। পাঁচ বৎসর আগে লুগানোতে এই রাসেলই আমাকে বলেছিলেন ভৌতিক গবেষকদের একটা কথাও তিনি বিশ্বাস করেন না।

"মানলাম। কিন্তু তাতে কি? কথা হচ্ছে এই—তুমি জীবনে যুক্তিপন্থী হ'তে চাও—না, চাও না? যদি চাও তাহ'লে কোন কিছু বিশ্বাস করবার আগে তার স্বপক্ষে তোমাকে যুক্তি খুঁজতেই হবে। তাহ'লেই দেখ, আত্মার অবিনশ্বরতায় যারা আগে থাকতে বিশ্বাস ক'রে বসে তাদেরকে অযৌক্তিক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। এ-রকম বিশ্বাসকে বলা যায় অনেকটা ঘোড়দৌড়ের পেশাদারের মতন যে বাজি রেখে বলে তার ঘোড়াই জিতবে।"

"কিন্তু আপনি কি তাহ'লে সত্যিই বলতে চান যে মানুষের এতশত কীর্তিকলাপ, চিন্তাকল্পনা, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা সবেরি শেষে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট অর্থহীন নাস্তি?"

"অসম্ভব কি? একটা ফুটবল টীম দলবদ্ধ হ'য়ে নানা রকম আশ্চর্য কীর্তি করে। কিন্তু তাই বলে টীমটা যখন ভাঙে তখন শুধু কীর্তির সাক্ষ্যে তাকে জিইয়ে রাখা যায় কি?"

"কিন্তু যখন কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই যে আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চৈতন্য একদম লোপ পায়—"

"প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু সম্ভাবনাটা ঐ দিকেই ঝুঁকে রয়েছে যে। কেননা—অন্তত আজ অবধি দেহের সাহায্য বিনা মনকে কখনো ত প্রকাশ হ'তে দেখা যায় নি। কাজেই দেহ গেলে মনেরও যাবার সম্ভাবনাই পনর আনা—এই কথাই তো মনে আসে।"

"দেহ ছাড়া মনের আত্ম-প্রকাশের যদি কোনো প্রণালীই না থাকে তাহ'লে টেলিপ্যাথিকে কি ক'রে ব্যাখ্যা করেন শুনি?"

"টেলিপ্যাথিও দৈহিক কিছু একটা হ'তে পারে—কেবল আজ অবধি হয়ত আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি কোন প্রণালীর মধ্য দিয়ে সে নিজেকে চালায়। যেমন ধরো বেতার বার্তাবহ।"

"কিন্তু কোথাও কিচ্ছু নেই ভাবতে—ভালো লাগে?"

"চিরদিন বেঁচে থাকব ভাবতেই কি ছাই ভালো লাগে?"

একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: "কেন মিষ্টার রাসেল? জীবনটা কি আপনার কাছে ভালো লাগে না?"

"সেটা আমার মেজাজের ওপর নির্ভর করে। কখনো-কখনো জীবনটা মন্দ লাগে না। আবার অনেক সময়ে মনে হয় যে জীবনটা মোটেই স্থবিধের নয়। কি রকম জানো? অনেকটা খাওয়ার মতন। যখন পেটে আগুন জ্বলে তখন খাওয়াটার

মতন আরাম কমই থাকে। কিন্তু খুব একপেট খাওয়ার পর খাবার দেখলেও অস্বস্তি বোধ হয়। জীবন সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। কখনো সেটা ভালো লাগে, কখনো, লাগে না—কিন্তু না, শোনো—এ-বচসাটার মানে হয় না যেহেতু সৃষ্টিলীলা আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো তোয়াক্কা রাখে ধ'রে-নেওয়াটাই হ'ল স্রেফ অযৌক্তিক : কেননা—ঐ যে বললাম—এরকম মনে করার স্বপক্ষে কোনো রকম সাক্ষ্যই নেই। কাজেই জীবনকে বিচার করবার সময় আমাদের ভালমন্দ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ধারণাকে নিরস্ত রেখে অগ্রসর হওয়াটাই হচ্ছে খাঁটি পৌরুষের পরিচায়ক। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার চশমার মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখতে গেলে সত্য প্রভু মারবেন ডুব। অন্তত আজ অবধি যেটুকু সত্য প্রগতি আমাদের হয়েছে, জীবনকে ও প্রকৃতিকে বোঝবার দিকে আমরা যতটুকু এগিয়েছি, সেটুকু সম্ভব হয়েছে—জীবনকে নিরপেক্ষভাবে নিরাবেগ বিশ্লেষণের ও পরীক্ষার আলোতে বোঝবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। কাজেই মনে হয় কেবল নিরপেক্ষ আবেগহীন অনুসন্ধিৎসার মধ্য দিয়েই আমরা সত্যকে আরো নিবিড় ক'রে পেতে পারি।—আর তাই তো আমি ধর্মের ওপর বীতরাগ। ধর্ম আমাদের শিখিয়েছে—জীবনকে উল্টো বুঝতে, কারণ ধর্ম মানেই হচ্ছে—জীবনকে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনা, ভাল-মন্দের ধারণা দিয়ে বোঝবার চেষ্টা, দেখবার চেষ্টা, পরখ করবার চেষ্টা। তাই তো ধর্ম যত বাড়ল, মানুষের সম্পদ তত কমল।

"আপনি কি সত্যিই বলতে চান যে ধর্মের প্রবর্তনার আগে মানুষের অবস্থা ভালো ছিল?"

"অনেক বিষয়ে ছিল বই কি?"

"বলেন কি?"

"বর্বর মানুষ তার নিজের পরিবার, স্বজাতির গোত্র ও বাইরের প্রকৃতিকে নিজের আবেগ ও ইচ্ছার রঙে অনেকটা না রঙিয়ে দেখতে চাইত। কিন্তু ধর্ম তাকে শেখালো—সদাসর্বদা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে। ফলে মানুষ হ'য়ে পড়ল ক্রমশঃ আত্মকেন্দ্র—স্বার্থপর।"

"সে কী বলেন : ধরুন, বুদ্ধ তো মানুষকে আত্মকেন্দ্র হ'তে শেখান নি?"

"ধর্ম-জগতের যাবতীয় বাসিন্দার মধ্যে একমাত্র বুদ্ধকেই আমি পছন্দ করি।"

একটু থেমে: "বাস্তবিক তাঁর নিজের যত উপদেশাদি আছে তার মধ্যে আপত্তি করার খুব বেশি আমি খুঁজে পাইনে। অবশ্য তাঁর নীতি সম্বন্ধে তাঁর শিষ্য-সামন্তদের বোলচালের কথা বাদ দিয়ে—কারণ তারা বিস্তর বাজে কথা ব'লেছে।"

"বুদ্ধের বাণীর মধ্যে আপত্তি করার কিছু পান না আপনি ?—তাহ'লে তাঁর পুনর্জন্মবাদ ও প্রাক্তন সংস্কার সম্বন্ধে কী বলবেন ?"

"ভুল করছ। পুনর্জন্মবাদ বুদ্ধ নিজে প্রচার করেন নি, করেছে তাঁর শিষ্যবর্গ। তিনি তাঁর শেষ মুহূর্তেও হেসেছিলেন, যখন তাঁর শিষ্যবর্গ রটাল যে তাঁর দেহ গেলেও তাঁর আত্মা থাকবে কায়েমি হ'য়ে।"

"খৃষ্ট সম্বন্ধে আপনার আপত্তি কি ?"

"প্রথমত নরক ও নরকাগ্নি* প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর গায়ের জোরের কথা। দ্বিতীয়ত সব রকম দৈহিক আনন্দের প্রতি তাঁর অযথা বিরাগ।"

"যথা ?"

"ধরো, তিনি ব'লেছেন যে-কেউ নারীকে বাসনার চোখে দেখবে সে তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে ধরতে হবে। কিন্তু কেন যে নারীকে বাসনার চোখে দেখতে পাব না সে বিষয়ে কোনো যুক্তিই দেননি।"

আমরা হেসে উঠলাম।

খানিক একথা-সেকথার পর আমরা বেড়াতে বেরুলাম। তখন সূর্য বাইরে খুব উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। রাসেল হেসে বললেন: "বাইরে আলো ছুটলে ঘরে বসে থাকা এক দায়, না ?"

*　　　*　　　*

পথে চলতে চলতে আমি রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলাম: "খানিক আগে জীবনে কৃচ্ছ্রতা ও বৈরাগ্য (asceticism) সম্বন্ধে আপনি আপত্তি তুললেন। কিন্তু মনে হয় না কি যে জীবনে এসবেরো একটা মূল্য থাকতেও পারে ?"

"মানে ?"

"ধরুন আজকাল তো একদল মনস্তাত্ত্বিক ও চিন্তানায়ক স্পষ্টই বলেছেন যে যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে একটু মোড় ফিরিয়ে না দিলে (sublimation) জীবনে

* তাঁহার "Why I am not a Christian" বইখানিতে রাসেল লিখেছেন যে জগতে অনামা ভয়ের দরুণ মানুষের অশান্তি ও দুঃখ বড় কম বাড়ে নি। তাই জীবনে নরকের ভয়ের মতন মিথ্যা ও নিষ্ঠুর ভয়ের আমদানী ক'রে খৃষ্ট যে অপরাধ করেছেন তাকে ক্ষমা করা কঠিন। রাসেল আরো বলেছেন জ্ঞান ও সহিষ্ণুতার দিক দিয়ে ও বিপক্ষ দলের লোকের প্রতি দরদী মনোভাবের দিক দিয়ে খৃষ্ট বুদ্ধ বা সক্রেটিসের মতন মহৎ ছিলেন না।

সৌন্দর্যসৃষ্টির খাতায় জমার অঙ্কে অনেকখানিই পড়বে মারা।* কাজেই ভোগকে খুব বড় ক'রে দেখলে শেষটায় সার হবে শ্রীহীনতার দুর্ভোগ।"

"ললিতকলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে অনেক সময়ে যৌন-আকাঙ্ক্ষার মোড় ফেরানোর ওপর খানিকটা নির্ভর করে একথা আমি অস্বীকার করি না। অর্থাৎ বড় শিল্পীর কর্তব্য নয়—তাঁর জীবনকে শুধু ভোগের মধ্যে দিয়ে ক্ষইয়ে ফেলা। কিন্তু কি জানো? এখানেও যেটা বর্জনীয় সেটা হচ্ছে—বাড়াবাড়ি। যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে খুব বড় ক'রে ধরাও যেমন খারাপ, তাকে একেবারে চেপে রাখাটাও তেমনি মন্দ। কারণ তাহ'লে আমাদের প্রকৃতি এই অত্যধিক দমনের শোধ তোলেনই তোলেন।"†

ব'লেই আমার দিকে ফিরে বললেন: "কিন্তু ঠিক যৌন-আকাঙ্ক্ষার মোড় ফেরানোর কথা ভেবে তো আর কৃচ্ছ্রবাদীরা কৃচ্ছ্রের সমর্থন করেন না। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ বা ললিতকলার জন্যে তাঁদের কোনো দুর্ভাবনাই নেই। তাঁরা চলতি সুনীতি-দুর্নীতির সম্বন্ধে কড়াক্কড়ি বাড়াবার জন্যেই সন্ন্যাসের বিধি-বিধান দিয়ে থাকেন। আর জানোই তো—আমাদের চলতি সুনীতি-দুর্নীতির ধারণা প্রায়ই আমাদের অপকার ক'রে থাকে; যেহেতু এ সব ধারণার মূলে প্রায়ই যুক্তির কোনো ভিৎ থাকে না। কাজে কাজেই ইমারৎগুলি হ'য়ে ওঠে যেমন অপলকা তেমনি dogmatic."

* ওয়েলস্ তাঁ'র Word of William Clissoldএ সাব্লিমেশনকে দেখেছেন এইভাবে: —"The fatal delusion that a woman can be the crown of a man's life, his incentive to action, his inspiration, has to be cleaned out of her mind altogether. Women may have been an incentive to action for certain types of men, but that is a different statement .... no man has ever done any great creative·thing, painted splendidly, followed up subtle curiosities as a philosopher or explorer, organized an industry, set a land in order, invented machines, built lovely building, primarily for the sake of a woman, These things can only be done well and fully for their own sakes, because of a distinctive drive from within ; they arise from that sublimated egotism we call self-realisation...

† একে বর্তমান মনস্তত্ত্ববাদীদের ভাষায় বলে Repression. ডাক্তার রিভার্স তাঁর Instincts in the Unconscious বইখানিতে Repressionকে আবার দুভাগে ভাগ করেছেন। একটা repression আর একটা suppression, বার্নার্ড হার্ট Psychology of Insanityতে কিন্তু suppressionএর কোনো উল্লেখ করেন নি।

"শিল্পী যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি সৃষ্টির জন্য তাঁর যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে হয়ত অনেক সময়ে মোড় ফেরাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ-করাটা তাঁর সফল হ'তে পারে কেবল তখনই যখন যৌন প্রবৃত্তিকে নিরস্ত করাটা থাকে তার স্বাভাবিক। জোর ক'রে যৌন-তৃপ্তির পথে বাধার বাঁধ দিয়ে প্রবৃত্তি নিরোধ করতে গেলে কুফলই ফলে বেশি। বাধাগুলো জীবনে যদি আপনা-থেকেই এসে থাকে, কেবল তখনই সংযমে সুফল ফলে। অর্থাৎ মন-গড়া বাধার ধাক্কায় যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে মোড় ফিরিয়ে সৃষ্টিশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না। তাছাড়া খুব বেশি সংযমের ফলে জীবনকে আমরা একটু তেড়া-বেঁকা ক'রে না দেখেই পারিনে। কাজেই তাতে যে-শিল্প তৈরী হয় তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় কি ?"

"তাহ'লে কেমন ক'রে জানা যাবে যে মানুষ বাসনা চরিতার্থই বা করবে কতদূর অবধি, আর সংযমই বা করবে কতখানি ?"

"সমাজে পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে গেলে প্রতিদিন যতটা সংযম করতে হয়, তার চেয়ে বেশি সংযম বোধহয় দরকার করে না।"

"কথাটা ঠিক পরিষ্কার হ'ল না মিস্টার রাসেল—'

"কি জানো ? আমরা প্রত্যেকে নানা ক্ষেত্রে যত নারীর দ্বারা আকৃষ্ট হই তাদের সকলকেই তো কিছু পেতে পারি না, নয় কি ? যতগুলি ক্ষেত্রে পেতে পারি না, ততগুলি ক্ষেত্রে তাই বাধ্য হ'য়ে সংযম করতেই হয় ও সে-সংযমের ফলে বড় কম যৌনশক্তি জ'মে ওঠে না। সৃষ্টির পক্ষে এর বেশি সংযমের দরকার করে না, এই-ই আমি বলতে চেয়েছিলাম।"

"আচ্ছা মানুষের সবরকম কীর্তিকলাপই কি যৌন-শক্তির মোড়-ফেরানোর ওপর নির্ভর করতে বাধ্য ?"

রাসেল চিন্তিত সুরে বললেন : "আমার মনে হয়, এ-বিষয়ে রস-সৃষ্টি ও জ্ঞান-সৃষ্টির মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকদের মতন নিছক বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কাজ কি না জ্ঞানচর্চা, যৌনতৃপ্তির ফলে হয়ত সুসাধিতই হয়। কিন্তু এ হ'তেও পারে যে রস-স্রষ্টার পক্ষে খানিকটা যৌন-ব্যর্থতা দরকার।"

"কিন্তু শিল্পীকেই বা তার সৃষ্টির জন্যে বিশেষ ক'রে এতটা মূল্য দিতে হবে কেন ?"

রাসেল সস্মিত সুরে বললেন : "এমন কী মূল্যই বা দেয় তারা ? প্রেমাস্পদের কাছে একদিন হয়ত সে একটু অনাদর পেয়ে হা-হুতুশী কবিতা লেখে। কিন্তু

পরদিনই প্রেমাস্পদ আবার হেসে ওঠেন। তখন কবির কলমে ফের কোকিল ডেকে ওঠে।"

হাসি থামলে রাসেল বললেন: "এখানে অবশ্য আমি গড়পড়তা শিল্পীর কথাই বলছি মনে রেখো। এরকম শিল্পীকে আমার তুলনা করতে ইচ্ছে হয় ময়ূরের সঙ্গে। যখন ময়ূরী প্রণয়িনী ময়ূর প্রেমিকের প্রতি একটু উদাসীন হন তখন কর্তা করেন কি? না গিন্নির সামনে খুব খানিক পেখম মেলে হেলেদুলে নেচে বেড়ান—তাঁর মন চুরি করতে। প্রণয়িনী একটু খেয়ালী-প্রকৃতির না হ'লে হয়ত তিনি এতটা টয়লেট করতেন না। কিন্তু প্রণয়িনীর মেজাজটা এরকম খামখেয়ালী গোছের হয়ই বা কেন? শুধু তাঁর বাজার-দর একটু বাড়ানোর জন্যেই নয় কি?—হা হা হা।"

* * *

কথা উঠল নানা যুগে মানুষের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা নিয়ে। জগতের ক্রমবিকাশে বুদ্ধির বিকাশের স্থান কোথায়?

রাসেল বললেন: "আমরা প্রায়ই ভারি একটা ভুল ক'রে থাকি যখন আমরা ভেবে বসি, যে জীব-জগতে ক্রমবিকাশ ও প্রগতি একই জিনিষ। আসলে ক্রম-বিকাশের মানে হচ্ছে নতুন নতুন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জীবের নিজেকে খাপ খাইয়ে চলা। কেঁচো জীবজগতে বিকাশের দিক দিয়ে খুব এগিয়ে গেছে (evolved), যদিও আমরা এটা স্বীকার করতে বাধা পাই।"

"আপনি কি তাহ'লে ক্রমবিকাশে কোনোরকম প্রগতিকেই বিশ্বাস করেন না?"

"মানে?"

"ধরুন মানুষের বুদ্ধি। আজ কি মানুষের বুদ্ধি আগের চেয়ে বেশি বিকশিত হয় নি? ধরুন গ্রীকদের সময় মানুষ যতটা বুদ্ধিমান ছিল আজ কি"—

"গ্রীকদের কথা যদি জিজ্ঞাসা করো তা'হলে আমি বলব যে তাদের বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির তুলনাই হ'তে পারে না।"

"মানে—তারা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ?"

"তার আর সন্দেহ আছে?"

"কিন্তু আমাদের কীর্তিকলাপ—"

"এখানে তুমি একটা গোল ক'রে বোসো না। কীর্তির দিক দিয়ে আমরা আজ বেশি রোজগেরে, কেননা গ্রীকদের সময়ে তারা জগৎ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে খুব

কমই জানত। আইনষ্টাইনের কীর্তি নিউটনের চেয়ে এগিয়ে গেছে—কিন্তু এ সম্ভব হয়েছে নিউটনের কীর্তি তাঁর পথে আলো ধরল ব'লে।"

"তাহ'লে আপনি মনে করেন না যে আইনষ্টাইনের প্রতিভা নিউটনের চেয়ে বড়।"

"না। তবে নিউটনের সমকক্ষ বৈ কি। এও বলা চলে যে, নিউটনের পর নিউটনের সমান মনীষী আর কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি—ইনি ছাড়া।"

"গ্রীকরা তাহ'লে—"

"কি জানো? যদি বিশহাজার গ্রীককে সে সময় থেকে আজ অবধি কোনো ঠাণ্ডা কলের মধ্যে জীইয়ে রাখা যেত ও আজ তাদেরকে হঠাৎ আমাদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হ'ত তাহ'লে আমাদের সঞ্চিত জ্ঞান অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারা আমাদের দিত দুয়ো। অবশ্য একথা বলছি না যে, গ্রীকদের সমসাময়িক অন্যদেশীয়েরাও বুদ্ধিতে তাদের সমকক্ষ ছিল। গ্রীকরা বুদ্ধির দিক্ দিয়ে অতি অসামান্য ছিল এইটেই আমার বলবার কথা।"

"কিন্তু এতদিনেও আমাদের বুদ্ধি যদি একটুও এগুতে না পেরে থাকে, তাহ'লে মানুষের প্রগতির ভরসা কোথায়?"

"ভরসা থাকতে পারে যদি বিজ্ঞানকে একটু বেশি স্বাধীনতা দেওয়া যায়।"

"মানে?"

"এটা হচ্ছে আসলে শুধু আমাদের বংশকে উন্নত করার সমস্যা। আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীদের বিকাশ দ্রুত করতে পারি যদি বিজ্ঞান ও গবেষণার ফলে আমরা যে-জ্ঞান অর্জন করেছি তাকে কাজে লাগাতে দেওয়া হয়।"

"বিজ্ঞান কিভাবে এগুতে পারে তার একটা মোটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। ধরো, যদি সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহ'লে বিজ্ঞান এমন ব্যবস্থা আজই করতে পারে যাতে ক'রে মানুষের মধ্যে কেবল শ্রেষ্ঠ মানুষই গর্ভাধান করতে পারবে।"

কিন্তু যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ নয়, তারা?"

"যৌন মিলনের ফলে তাদের হবে না কোনো সন্তান—আধুনিক উপায়ে নিবারণ করা হবে! বিজ্ঞান এই রকম করে নানাদিক দিয়েই মানুষের কীর্তিকে এমন বাড়িয়ে তুলতে পারে যে চোখ যাবে ধাঁধিয়ে। কেবল তার সর্ত হবে এই যে মানুষ কুসংস্কার ছেড়ে বিজ্ঞানের প'রে রাখবে আস্থা।"

"কিন্তু এ-আস্থা কি সে রাখতে শিখবে?"

"সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চার্চ বা ধর্ম হাঁকছেন: জন্মনিরোধ হ'ল দুর্নীতি। বিজ্ঞান বলছে: এর ফলে মানুষের বংশ উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করতে পারে। গতপঞ্চাশ বছর ধ'রে আমরা বিজ্ঞানের কথায় বিশ্বাস না রেখে ধর্মকেই দেখছি বড় ক'রে। ফলে মানুষের গড়পড়তা বুদ্ধি ও ক্ষমতার অধোগতি তো দেখতেই পাচ্ছ স্বচক্ষে।"

"সে কি?"

"হবে না? ধর্মের পাল্লা পেয়ে আমাদের মধ্যে অকর্মণ্যরাই সব চেয়ে বেশি সন্তানের জন্ম দিয়েছে, কেন না যোগ্য পিতার ধর্মের চোখরাঙানি সত্ত্বেও অনেকটা জন্মনিরোধ করতে শিখেছে।"

একটু থেমে সব্যঙ্গে: "কাজেই এখন ধরতে গেলে একটা প্রতিযোগিতা এসেছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে। বিজ্ঞান চায় মানুষের নিঃসংস্কার উন্নতি, ধর্ম চায়—গতানুগতিক অধোগতি। দেখা যাক এ দৌড়ে জেতেন কিনি।"

"কিন্তু বিজ্ঞান কি শেষটায় জয়ী হবে না?"

রাসেল সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন: "উহুঁ:। অন্ততঃ য়ুরোপে না। আমাদের একমাত্র ভরসা এখন—আমেরিকা। ওরা ইতিমধ্যে অযোগ্য মানুষের বীজকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্ক্রিয় করতে সুরু ক'রেছে। এটা হচ্ছে একটা সত্যিকার মহৎ প্রচেষ্টা।"

"কিন্তু য়ুরোপ কি আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে না?"

"না করলেও খতিয়ে তত যাবে-আসবে-না যদি আমেরিকা বরাবর এগিয়ে চলে।"

"তার মানে?"

"অর্থাৎ যদি কোনো একটা জাত এরকম ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহ'লে তারা খুব শীঘ্রই এমন একদল মানুষের সৃষ্টি করবে যারা অধোগামী আধুনিক য়ুরোপীয়দের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কাজেই তারা আমাদের দুর্দিনে করবে নির্বংশ—যেহেতু আমরা মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপন্থী। কাজেই যেটা বড় কথা সেটা হচ্ছে এই যে কোনো-একটা জাত বড় হোক—তা সে জাত যে-ই হোক না কেন।"

আমি একটু হেসে বললাম: "এ আপনার হ'ল যেন বড্ড বেশি নিরপেক্ষ, আবেগহীন ভাবে ভাবা, মিষ্টার রাসেল। স্বজাতির ধ্বংসও কামনা করা—"

"চিন্তার কোনো মানেই হয় না যদি মানুষ তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা

ভয়-ভাবনার ওপরে উঠে ভাবতে না শেখে। যেটুকু সত্য সুখের সন্ধান মানুষ পেয়েছে তা সম্ভব হয়েছে শুধু জীবনকে নিরপেক্ষ ভাবে দেখার ফলেই না?"

"মানে আপনি বলতে চান—"

"যে, মানুষ সুখ পায় কেবল তখনই যখন সে সুখের জন্যে লালায়িত না হয়ে জীবনকে জীবনের জন্যেই ভালোবাসতে শেখে। যদি জীবনকে জীবনের জন্যে ভালো না বেসে নিজেদের কোনো স্বার্থের জন্যে বা সুখী হবার জন্যে ভালোবাসতে যাই তাহ'লে সুখ আমাদেরকে এড়িয়ে চলবে আলেয়ার মতন।"

আমরা ক্রমশ সমুদ্রের কাছে এসে পড়ছিলাম। অদূরে খাড়া তৃণশষ্পবিরাগী পাথরগুলো নীলজলে মুখ দেখছে ঝুঁকে। এদিকে সবুজের আগুন লেগে গেছে লতায় পাতায়। আমরা দুজনে চলছি কখনো মাঠের উপর দিয়ে, কখনো আলের উপর দিয়ে, কখনো বা বন-বাদাড় ভেদ ক'রে। রাসেলের বয়স তখন প্রায় ষাট। কিন্তু তাঁর দ্রুতপদবিক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে চলা আমার মতন যুবকের পক্ষেও দায় হ'য়ে উঠেছিল। তাই আরো মনে হচ্ছিল যে, হয়ত এই জন্যেই এ-জাতের সঙ্গে আমাদের ঘর করতে হ'ল—প্রাণবন্ত জাতির ছোঁয়াচ না লাগলে কি আমাদের মতন ক্ষীণপ্রাণ, গতায়ু জাত জাগত কোনোদিনও? একথা রাসেলও বলেছিলেন একবার ভারতে ইংরাজশাসন প্রসঙ্গে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি বিশ্বাস করেন কি না যে ইংরাজেরা ভারতে এসেছে শুধু আমাদের উপকার করতেই। তাতে রাসেল বলেছিলেন: "তোমাদের মঙ্গলার্থেই নিঃস্বার্থ ইংরাজ জাত সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙিয়ে ওখানে গিয়ে রয়েছে একথা শুধু খৃষ্টান মিশনারিরাই বিশ্বাস করতে পরেন—সুস্থমস্তিষ্ক মানুষরা না। আমরা গিয়েছিলাম তোমাদের ওখানে ব্যবসা করতে। কিন্তু তবু একথা কি তুমি স্বীকার করো না যে আমাদের ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হ'য়ে তোমাদের কিছু ভালোও হয়েছে?"

আমি বলেছিলাম: "করি। আর বিদেশীর পরাধীনতার গ্লানির একমাত্র সান্ত্বনা মেলে আমাদের কেবল এই চিন্তায় যে আমাদের জাতীয় জীবনের জড়তার ফলে আমাদের জনসাধারণের মন এত ঝিমিয়ে পড়ছিল যে য়ুরোপের প্রাণশক্তির ধাক্কা না পেলে হয়ত এতদিনে তার ঐহিক নির্বাণ হ'ত।"

রাসেল বলেছিলেন: "শুধু তাই নয়, যান্ত্রিকতাকে (industrialism) বর্তমান সময়ের প্রায় একটা যুগধর্ম বললেই চলে। ইংরাজের গায়ের বাতাসেই যান্ত্রিকতার বীজ তোমাদের দেশের মাটিতে উড়ে গিয়ে পড়ল। তাছাড়া যুথবদ্ধ

হ'য়ে কাজ করার ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তিরও একটা সাক্ষাৎ পরিচয় তোমাদের হ'ল আমাদের দেখাদেখি।"

এ-আলোচনা হয়েছিল শেষদিন, চা খাওয়ার টেবিলে। সেদিন সরাইয়ে ফিরেই লিখে রেখেছিলাম এ অনুলিপি। অনেকদিন বাদে হঠাৎ রাসেলের একটি প্রবন্ধ চোখে পড়ে: "Future Cultural Relations of East and West." তা থেকে একটু উদ্ধৃত করি। রাসেল লিখছেন যে "এমন কি সাহারা বা গোবি মরুভূমিতেও যান্ত্রিকতার অগ্রদূতরা হানা দেবেই যদি সেখানে তৈলাদি মেলে। যেখানেই কাঁচা মাল জুটবে ওরা ছুটবে—কখনো টাকার জোরে, কখনো অসিধারের জোরে।" ব'লেই বলছেন: "কাজেই প্রাচ্যদেশের বাসিন্দারা কিছুতেই যান্ত্রিকতাকে এড়াতে পারবে না—তা তারা স্বাধীনই হোক বা পরাধীনই হোক।" ব'লেই রাসেলের ভয় হয়েছে পাছে তাঁকে সবাই ভুল বোঝে—তিনি টুকছেন: "একথা বলার দরুণ কেউ যেন আমাকে যান্ত্রিকতার পরম পূজারী ঠাউরে না বসেন। আমার মনে হয় যন্ত্রাদির আবিষ্কার মানুষের দুর্ভাগ্যের সূচনা করেছে, কিন্তু হ'লে হবে কি, যন্ত্রাদির প্রবর্তন যখন একবার হয় তখন কোনো দেশই তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে আমি খুবই সহানুভূতি বোধ করি যখন তিনি চান যান্ত্রিকতা থেকে ভারতের অব্যাহতি। যদি এ প্রচেষ্টা সফল হবার আশা দুরাশা না হ'ত তাহ'লে আমি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতাম। কিন্তু আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে এ-সফলতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যান্ত্রিকতার প্রগতি প্রকৃতির শক্তির ম'ত: তাকে আমাদের নিতেই হবে এবং যতটা সম্ভব শুভফলপ্রসূ ক'রে তুলতে হবে।'

কেন তিনি যান্ত্রিকতার অভ্যুদয়কে মানুষের পক্ষে একটি দুর্ভাগ্য মনে করেন তার কারণ নির্দেশ করেছেন তিনি এ সুচিন্তিত প্রবন্ধটিতে। সেসব তীক্ষ্ণ যুক্তিগুলি রাসেলের ভূয়োদর্শনের যোগ্য হ'লেও এখানে সেসবের অবতারণা করার স্থানাভাব। কেবল তাঁর শেষের কথাগুলি উদ্ধৃত করব। রাসেল বলছেন যান্ত্রিকতার ফলে প্রপাগাণ্ডা বাড়ে, মানুষ দলে দলে সংবাদপত্রের প্ররোচনায় মিথ্যায় দীক্ষিত হয়

* "I have the greatest sympathy with Gandhi's attempt to prevent the industrialising of India: if it were possible for him to succeed, I would support him. But I am persuaded that success is quite impossible. The spread of industrialism is like a force of nature: we have to accept it and make the best of it."

ইত্যাদি, ইত্যাদি। কাজেই যান্ত্রিকতার এ সব ফলগুলিই দাঁড়াচ্ছে "সত্যিকার সভ্যতার পরিপন্থী" (antagonistic to real civilization)।

তারপর তিনি দেখাচ্ছেন কী ভাবে যান্ত্রিকতার কুফলের প্রতিকার হওয়া সম্ভব। বলছেন একটা উপায় এই যে যত কাঁচা মাল জগতে আছে সবই আগে বিশ্বের কোষাগারে জমা হবে, তারপর সেখান থেকে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক নানা জাতিকে তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন মত। আসল কথা প্রতিযোগিতার মনোভাবকে নির্মূল করতে হবে। এ কথার উত্তরে পাশ্চাত্য মন্ত্রীরা বলবেন যে এতে ক'রে হানি হবে উৎপাদননৈপুণ্যের (efficiency)। এ আপত্তির উত্তরে রাসেল মৃদু হেসে বলছেন :

"But when men's main purposes are bad, efficiency is only harmful. It would be far better to pursue the common good with some slackening of efficiency than to pursue mutual destruction with the energy and ruthlessness which the West admires. Although, while the present system lasts, the East may need to acquire something of Western efficiency, this should be only a transitional stage leading on to a world where industrialism is used to give leisure and a civilized existence to all. This is a distant goal, perhaps the Western nations will destroy each other in mutual suicide before it is reached. But it is a goal which must be reached if industrialism is to be made endurable, and it is better than anything that is possible without industrialism. It would result naturally from the application of Eastern ideals to the modern economic world. I therefore earnestly hope that Asia will come to the rescue of the world by causing Western inventiveness to subserve human ends instead of the base cravings of oppression and cruelty to which it has been prostituted by the dominant nations of the present day."

সাধে কি রাসেলকে শ্রদ্ধা করেন আধুনিক সত্যসন্ধানীরা? তাঁর উদার মনের মধ্যে বিশ্বপ্রেম কী অপরূপ হ'য়েই ফুটছে হাসির সৌরভে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, সত্যের নিষ্ঠায়!...

একটা পাহাড়ে চড়তে চড়তে রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলাম : "সমাজ-সংস্কারে

বিশ্বাস কি তাহ'লে আমাদের কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে না, এই কথাই আপনি বলতে চান ?"

"না তো। আমাদের মনের মূল বিশ্বাসগুলো বদ্‌লালে আমাদের কর্ম যে কম বেশি বদলাবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক।"

"তবে ?"

"আমি জোর দিতে চেয়েছিলাম প্রধানত এই সত্যটির উপর যে আমাদের মূল বিশ্বাসগুলিকে যাঁরা কর্মের মূল নিয়ন্তা বা প্রেরণা ব'লে মনে ক'রে থাকেন, তাঁরা ভ্রান্ত।"

"মানে ?"

"কি জানো ? হাল আমলে মনোবিৎরা একটা আবিষ্কার করেছেন ভারি সত্যি। সেটা এই যে আমাদের শুধু কর্মের না—বিশ্বাসেরও প্রধান ভর আমাদের প্রকৃতির মূল বনেদের 'পরে। তাই দেখা যায় যে প্রায়ই যে-সব বিশ্বাসকে আমরা আমাদের কোনো কোনো আচরণের মূল ব'লে মনে করি, সে-সব বিশ্বাস আমাদের কর্মের আসল প্রবর্তনা নয়।"*

"কিন্তু বিশ্বাস যদি মানুষের প্রকৃতিকে রাঙিয়ে না-ই তুলবে, তাহ'লে ধর্মবিশ্বাসের ফলে সমাজে এত শত সুন্দর চরিত্র গ'ড়ে ওঠে কেমন ক'রে ?"

"সুন্দর চরিত্র গ'ড়ে ওঠে ঐ যে বললাম আমাদের মূল প্রকৃতিটির প্রভাবে, ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবটা এক্ষেত্রে আসলে অবান্তর।"

"কিন্তু ধার্মিক লোকদের মধ্যেই যে সুন্দর চরিত্র এত মেলে তার কি ?"

"আহা—যাদের তোমরা অধার্মিক বলো তাদের মধ্যে কি সুন্দর চরিত্র মেলে না ? আমি বলতে চাইছি যে, চরিত্রের মহত্বটা ধর্মের লেবেলের উপর নির্ভর করে না।"

"কিন্তু আপনি কি তাহ'লে একথা অস্বীকার করতে চান যে জগতে আজ অবধি ধর্মের রাজ্যেই বেশির ভাগ মহৎ চরিত্র দেখা গেছে ?"

"না, তা চাই না। আমি চাই কেবল বলতে যে এ-রকমটা হওয়ার মূল কারণ

* Bernard Hart তাঁর Psychology of Insanityতে মানুষের এই আত্মপ্রবঞ্চনা সম্বন্ধে বর্তমান মনস্তত্ত্ববাদীদের মত উল্লেখ করে লিখে'ছেন: "He fondly imagines that his opinion is formed soley by the logical pros and cons before him. We see, in fact, that not only in his thin' ing determined by a complex of whose action he is unconscious, but that he believes his thoughts to be the result of other causes which are in reality insufficient and illusory."

শুধু এই যে আজ অবধি সভ্য মানুষ ধর্মের মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কাজেই এখনো জগতে তথাকথিত ধার্মিকের সংখ্যা অধার্মিকের চেয়ে বেশি। একথা যখন সত্যি তখন ভালো চরিত্রের সংখ্যা ধার্মিকের মধ্যে তো বেশি মিলবেই। গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে কথাটাকে এই ভাবে বলা চলে: মানুষের মধ্যে ভালো লোক ধরো শতকরা দশজন! এখন, শতকরা নব্বইজন মানুষ যদি ধর্মের লেবেল প'রে চলে তাহ'লে নয়জন ভালো লোক মিলবে ধার্মিকদের মধ্যে ও একজন মাত্র—অধার্মিকদের মধ্যে। কাজেই এক্ষেত্রে সংখ্যা দিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায় না, যেহেতু চারিত্রের মূল প্রেরণা হচ্ছে—আমাদের নিহিত প্রকৃতি, ধর্ম নয়।"

"কিন্তু ধর্মের প্রেরণাটা চারিত্রের মূল প্রবর্তনা হ'তেও তো পারে?"

"এ সম্ভাবনা স্বীকার করলেও করা যেতে পারত যদি দেখতে পারতে যে, ধর্মের ফলে মোটের উপর মানুষের সুখশান্তি বেড়েছে।"

"আপনি কি তাহ'লে মনে করেন—"

"যে, ধর্মের নামে মানুষ মানুষের যত ভালো করেছে তার চেয়ে ঢের বেশি করেছে মন্দ।"

"তাহ'লে জগতের সেই সব মহাপুরুষদের সম্বন্ধে আপনি কী বলবেন?—যাঁরা ধর্মের প্রেরণাতেই প্রেম, মৈত্রী ও পরহিতের প্রেরণা ও আলো পেয়েছিলেন?"

"ধর্মের আলোতেই যে তাঁরা এ-প্রেরণা পেয়েছিলেন একথা সত্য ব'লে মনে করবার কোনো কারণ নেই।"

"নেই?"

"না।"

"তাহ'লে ধ্যান সাধনা প্রভৃতির ফলে বুদ্ধ খৃষ্ট প্রভৃতি যে-সব বাণী পেয়েছিলেন সে-সব আপনি উড়িয়ে দিতে চান? ধর্মে যে পুলক, উল্লাস প্রভৃতি মানুষ পায় সে-সব কি তাহ'লে ভুয়ো?"

"ভুয়ো কেন? মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য বা তথ্য (data) হিসেবে এ-সবের খুবই মূল্য আছে। কিন্তু পুলক, রোমাঞ্চ, ধ্যান-ধারণার ফলে যে মানুষ সৃষ্টিতত্ত্বের সম্বন্ধে কোনো বড় সত্যের পরিচয় পেয়েছে এ আমি বিশ্বাস করি না। অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে মানুষ যেটুকু সত্য অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছে সেটুকু সে পেয়েছে চেষ্টায়, পরীক্ষায়, যুক্তিতে, কর্মে, ত্যাগে—এ-রকম ধার্মিক পুলক-রোমাঞ্চে নয়। ধর্মের সাধনায় মানুষ মোটের উপর আত্মপর, স্বার্থপরই হ'য়ে এসেছে—অন্তত আজ অবধি।"

"কি রকম?"

"ধর্মের একাকিত্ব ও আনন্দের মধ্যে ক্রমাগত ডুবসাঁতার কাটতে কাটতে মানুষ ক্রমে নিজেকে ছাড়া আর কিছুকে ভালোবাসতে ভুলে যায়: ফলে সে ধীরে ধীরে বাইরের দাবি দাওয়ার মর্যাদা রাখা-না-রাখা সম্বন্ধে একেবারে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে জীবনের বৈচিত্র্যময় আনন্দ ও কর্মের প্রতি আস্থা দুই-ই খোয়ায়।"

"কিন্তু উল্‌টো দিকে সে বলতে পারে না কি যে তার অন্তর্মুখী ভাব-রসে সে যে নিবিড় আনন্দ পায় তাতে তার সব ক্ষতিরই পূরণ হয়?"

"পারবে না কেন? কিন্তু এ কথার পালটা জবাব হ'ল এই যে, আনন্দ পাওয়াটাই যদি মানুষের জীবনযাত্রার চরম সমর্থন হয় তাহ'লে বিলাসী ও মাতালকে দোষ দেওয়া উচিত নয়।"

"আপনি কি বলতে চান যে এ-সব সাধকদের আনন্দের সঙ্গে বিলাসী বা মাতালদের আনন্দের কোনো প্রকৃতিগত প্রভেদ নেই?"

"কী প্রভেদ?"

"কী বলেন আপনি! সাধকেরা তাদের ধর্মের আনন্দের জন্যে যে-স্বার্থত্যাগ স্বীকার করে, যে কষ্ট সহ্য করে, যে—"

"মাতাল কি করে না? সে তার সর্বস্ব ওড়ায়, প্রিয়জনকে কষ্ট দেয়, সাধারণের শ্রদ্ধা হারায়—কত ক্ষতি সহ্য করে শুধু তার নেশার আমোদের খাতিরে! নয়?"

হেসে বললাম: "ঠাট্টা থাক, মিষ্টার রাসেল। বুদ্ধ প্রভৃতি সম্বন্ধে কি সত্যিই আপনি এমন কড়া কথা বলতে পারেন?"

"বুদ্ধের শত্রুপক্ষ যে বলে তিনি ভিক্ষাজীবী ছিলেন সে-অভিযোগকে তো একেবারে নাকচ করা যায় না। কারণ এ-রকম জীবনটা যে মোটের উপর আরামের জীবন একথা মানতেই হবে।"

একটু থেমে: "কিন্তু বুদ্ধের সম্বন্ধে আমার নিজের মত যদি জিজ্ঞাসা করো তাহ'লে আমি বলব যে যত ধার্মিক আজ অবধি জগতে জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে বুদ্ধই আমার কাছে সব-চেয়ে প্রিয়।"*

"খৃষ্টের চেয়েও?"

* "I cannot myself feel that either in this matter of wisdom or in the matter of virtue Christ stands quite as high as some other people known to history. I think I should put Buddha or Socrates above him in these respects." *Why I am not a Christian*......*B.R.*

"সে বিষয়ে সন্দেহ আছে ?"

"খৃষ্টের সম্বন্ধে আপনার আপত্তি কি শুনি ?"

"খৃষ্ট জগতের হিতের চেয়ে অহিত করেছেন ঢের বেশি।"

"আপনি কি সত্যিই একথা বলেন ?"

"কেন বলব না ?"

"কিন্তু জীবনকে কি তিনি অনেকখানি সৌন্দর্য দেন নি ?"

"যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি সৌন্দর্য কেড়ে নিয়েছেন যে। ইহুদি ধর্মের বীজ তিনি বুনে গেছেন গ্রীক সভ্যতার মাটিতে ; ফলে কত সুন্দর সৃষ্টির বিকাশই যে রুদ্ধ হ'য়ে গেছে কে বলবে ?"

"আপনি গ্রীক সভ্যতার যে একজন মস্ত ভক্ত তা জানি, কিন্তু—"

"মস্ত ভক্ত ঠিক নই। তবে গ্রীক সভ্যতার অনেক দানকে আমি মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করি। জ্যামিতি তারাই আবিষ্কার করেছিল সব প্রথমে। সেজন্যে মানুষ তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।"

হেসে বললাম ঃ "আপনি বিজ্ঞানের যে-রকম ভক্ত তাতে আপনার কৃতজ্ঞতার গভীরতা বেশ অনুমান করতে পারি।"

"বিজ্ঞান মানুষের একটি মহীয়সী কীর্তি একথা কে না মানবে বলো ? যদি বৈজ্ঞানিকদের কাজ করবার স্বাধীনতা একটু বেশি দেওয়া হয় তাহ'লে আমরা আজ অবধি যতটুকু জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চয় করেছি শুধু তাই দিয়েই সমাজকে কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন বদ্‌লে দিতে পারতাম যে সেটা অভাবনীয়। আশা করি এ-স্বাধীনতা বৈজ্ঞানিকদের মিলবে—ক্রমে ক্রমে।"

"কি ভাবে সমাজ বদ্‌লে দিতে পারতেন আপনারা !"

"একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত নাও। আজকের দিনে মানুষের মধ্যে শতকরা দশজন হচ্ছে ক্ষীণপ্রাণ ও বিকলমস্তিষ্ক। তাদের দিয়ে সমাজের কোনো হিতই সাধিত হ'তে পারে না, তারা পারে কেবল জগতের দুঃখ বাড়াতে। এখন দেখ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে এরকম বিকল মানুষের জন্ম নিবারণ করা যায়—এখনই যায়। কেমন তো ? তাহ'লেই দেখ সংসারে বেশ খানিকটা দুঃখও এখনই নিবারণ করা চলে—বিজ্ঞানের প্রসাদে। এটা বড় কম কথা নয়।"

আমরা পাহাড় থেকে নিঃশব্দে নামতে লাগলাম।…

রাসেল তাঁর কথার হারানো খেই ধরলেন ফের ঃ "এটা অবশ্য বিজ্ঞানের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা ছোট দৃষ্টান্ত মাত্র। কারণ বিজ্ঞানের শক্তির কথা যতই ভাবা

যায় ততই দেখা যায়, মানুষের জীবনরেখার গতি বদ্‌লে দেবার ক্ষমতা তার অগাধ।"

"যথা?"

"ধরো, আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকদের উপর ভার দেওয়া হ'ল উত্তরোত্তর উন্নত মানুষের জন্ম সহজ ক'রে তুলবার। তাহ'লে বিজ্ঞানের কৃপায় যে-জ্ঞান আজ আমাদের অধিগত হয়েছে শুধু সেইটুকু শক্তির সাহায্যেই এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে ক'রে যোগ্য লোক ছাড়া আর কেউ শিশুর জন্ম দিতে পারবে না। তাহ'লে যে-রকম মানুষ জন্মাতে আরম্ভ করবে তারা যে মানুষ হিসেবে আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত শ্রেণীর আধার দাঁড়াবে এতে কি আর সন্দেহ আছে?"

"সর্বনাশ! আপনি কি তাহ'লে বলতে চান যে মাত্র গুটিকয়েক লোক পিতা হবার অধিকারী, বাকি সব না-মঞ্জুর?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এতে ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে যাবার কী আছে—যৌন-সম্মিলন তো আর রোধ করা হচ্ছে না? নরনারীর মিলিত হবার তো বাধা থাকবে না। কেবল সেইসব ক্ষেত্রে তাদের সন্তানের জন্ম নিবারণ করতে বাধ্য করা হবে সেসব ক্ষেত্রে পিতামাতার সঙ্গমে উন্নত মানুষের জন্মের সম্ভাবনা থাকবে না।"

"কিন্তু বাধাবিপত্তি—"

"জানি, ব্যাপারটা যে এত সহজ নয় তা আমার অগোচর নেই, আমি কেবল এটা একটা স্থূল দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করলাম দেখাতে—বিজ্ঞান কি ভাবে মানুষের প্রগতিকে সহজ ক'রে আনতে পারে।"

আমরা একটা পাহাড়ের সীমান্তে এসে পৌছলাম। সামনের উদার সিন্ধুর অশ্রান্ত ঢেউয়ের বুক রূপালি সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। দূরে দু-একটা নৌকা পাল তুলে দিয়ে চলেছে। নীলাভ জল দিক-চক্রবালের কাছে সাদা মেঘের কোলে আত্মসমর্পণ ক'রে দিয়েছে। মনে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে:

"যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।'

রাসেল অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে।

"আপনি বুঝি সমুদ্র ভালোবাসেন মিষ্টার রাসেল?"

"প্রকৃতির মধ্যে আর কিছু আমি এত ভালোবাসি না।"

একটু থেমে:

"কনফ্যুসিয়াস বলেছেন যে ধার্মিক লোকে পাহাড় পর্বত ভালোবাসে ও জ্ঞানী ভালোবাসে সমুদ্র।"

ব'লে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন: "কিন্তু কোন্ মনস্তাত্ত্বিক এজাহারের সাক্ষ্যে যে তিনি এমন কথা সজোরে ব'লে বসলেন বলা কঠিন।"

"বোধ হয় তিনি নিজে দুটোই ভালোবাসতেন ব'লে।"

"সম্ভব," ব'লে রাসেল একটু হাসলেন: "কিন্তু কনফ্যুসিয়াসের অভিজ্ঞতা অনুসারে তাহ'লে ধর্ম ও আমার মধ্যে সম্বন্ধ হওয়া উচিত দাকুমড়ো—যেহেতু পাহাড় পর্বতের প্রতি প্রেম আমার উচ্ছল নয় মোটেই।"

পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর বেয়ে বেয়ে নেমে দুজনে সমুদ্রতীরে পৌছলাম। সেখানে শ্রীমতী ডোরা রাসেল, জন, কেট ও গভর্নেস। শ্রীমতী রাসেল ছাড়া সকলেই সেই তুষারশীতল সমুদ্রের জলে নেমে গেলেন। রাসেলের সাঁতারে আনন্দ দেখে তাঁর খানিক আগেকার একটা কথা মনে হ'ল।

তিনি বলেছিলেন: "ধার্মিক হওয়ার বিপক্ষে আমার আর একটা প্রধান আপত্তি এই যে, তার ফলে আমরা বহির্জগতের প্রতি ক্রমশঃ উদাসীন হ'য়ে পড়ি। এটা স্বাস্থ্যকর নয়; এর ফলে মানুষ অনর্থক জীবনের অনেক রসসম্পদই হারায়। কাজেই ধর্ম জীবনে সমৃদ্ধি না এনে মোটের ওপর দৈন্যই আনে।"

আমি উত্তরে বলেছিলাম: "কিন্তু যারা ধর্মে আনন্দ পায় তারা যে তার নিবিড় আনন্দের মধ্যে একটা মস্ত ক্ষতিপূরণ পায় না তা কেমন ক'রে বলেন আপনি? প্রমাণ করবেন কেমন ক'রে যে তাদের অন্তর্জীবনের রসসম্পদ কম?"

"তাদের কাছে একথা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে যাওয়া বৃথা। কারণ যেখানে মানুষ গোটাকতক গায়ের জোরের কথার আড়ালে আত্মগোপন ক'রে থাকে সেখানে যুক্তির শেল যে পশে না এতো অত্যন্ত জানা কথা।"

"তবে?"

"কি জানো? জীবনে কি কি বস্তু কাম্য সে-সম্বন্ধে গোটাকতক মূল ধারণা শিশুর মনে বাল্যেই বপন ক'রে দেওয়া যায়। তাই যে-রকম মনোভাব জীবনকে সমগ্রভাবে দেখবার পক্ষে আমাদের সহায়, সেরকম মনোভাব ছেলেবেলা থেকে শিশুদের মধ্যে চারিয়ে দিলে সমাজে তার সুফল ব্যাপক হয়। নইলে জীবনকে শুধু খাটো ক'রে দেখে তার অপমানই করা হ'য়ে থাকে।"

রাসেল যখন সাঁতার দিচ্ছিলেন তখন আমি শ্রীমতী রাসেলের সঙ্গে গল্প করছিলাম সেই সমুদ্রতীরে ব'সে।

কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনার Hypatiaতে আপনি লিখেছেন যে স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতির মধ্যে যে বৈষম্যটা আমরা সচরাচর

এত বড় ক'রে দেখে থাকি, আসলে সেটা তত বড় নয়। কিন্তু সেটা কি সত্যি ?"

"মানে ?"

"ধরুন, আপনার কি মনে হয় না যে, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি ভালো-বাসার কাঙাল ?"

"আজ অবধি সমাজ-ব্যবস্থাটা যে-রকম হ'য়ে এসেছে, তাতে মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাকে বেশি আঁকড়ে ধরতে হয়েছে বৈকি, কিন্তু তার হেতু শুধু এই যে, মেয়েদের সামনে অন্য সব কর্মের পথই এতদিন প্রায় বন্ধ ছিল বললেই হয়। কাজেই একথা জোর ক'রে বলা যায় না যে, পুরুষের মতন সুযোগ পেলে মেয়েরা জীবনের উদার কর্মভূমিতেও আনন্দ পেতে শিখবে না।"

"ভালোবাসা সম্বন্ধে না হয় হ'ল। কিন্তু সন্তান সম্বন্ধে ? আপনার কি মনে হয় না যে সন্তান তাদের কাছে অত্যন্ত বেশি দরকার ?"

"এখনকার যুগধর্ম দেখলে তো মনে হয় না যে মেয়েরা নিজে থেকে সন্তান বেশি চায়। সন্তানবিমুখ মেয়েদের সংখ্যা আজকের দিনে নিতান্ত কম নয়। শুধু তাই নয়, এই শ্রেণীর মেয়েদের সংখ্যাই ক্রমশঃ বাড়তে চলেছে।"

"কিন্তু সেটা কি সন্তানের প্রতি কোনো সত্যিকার বিমুখতার জন্যে ? আপনার কি মনে হয় না যে মেয়েদের অনেক সময়ে অত্যন্ত বেশি সন্তানের জন্ম দিতে হয় ব'লেই এটা ঘটেছে ?"

"একথা অনেক পরিমাণে সত্যি। শ্রমিকদের মধ্যে আমি দেখেছি কত মা বৎসরের পর বৎসর পূর্ণ বিশ্রাম বা একটানা ঘুম কাকে বলে জানেই নি। ফলে স্বাস্থ্যও তাদের ভেঙে পড়ে দু'দিনে, জীবনের আনন্দকেও হারায় তারা—এমন কি সন্তান-স্নেহও। নইলে বেশির ভাগ মেয়েরা যে স্বভাবত সন্তানবৎসল একথা আমার খুবই মনে হয়। তাদের যদি দু-একটির বেশি ছেলেপিলে না হ'ত ত তাহ'লে শিশুদের প্রতি তাদের অনুরাগ যে বাড়ত বই কমত না একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে। কিন্তু তাতে কি ? অল্প ছেলেপিলে হ'লে শুধু যে তাদের সন্তানস্নেহ বাড়ত তাই তো নয়, শিক্ষা ও সুযোগ পেলে যে তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরের কাজকর্মেও যথেষ্ট মন দিতে পারত, আনন্দও পেত।"

ক্রমে শিশুজন্ম নিবারণ করা-না-করা সম্বন্ধে শ্রীমতী রাসেল বললেন যে এ-সব আধুনিক পদ্ধতি সত্যিই খুব সমর্থনীয়।

লোকে এটাকে পাপ মনে করে কেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন

যে ৩০১ একটা গতানুগতিকতা ও কুসংস্কারের দরুণই মানুষের মনকে এত আশ্রয় করেছে। আসলে এই আইডিয়াটাই ভুল যে পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা।*

এমন সময়ে রাসেল স্নান সেরে আমাদের পাশে একটা পাথরের ওপর এসে বসলেন।

তাঁর দিকে চেয়ে এসে শ্রীমতী রাসেল ব'লে চললেন: "শিশুজন্ম নিবারণ করতে না পারার কুফল—অশেষ। আমাকে যদি আমার স্বামী আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য করতেন, তাহ'লে দুদিনে সন্তানদের প্রতি আমার স্নেহ বিতৃষ্ণায় পরিণত হ'ত। শুধু তাই নয়, শেষটা আমি হয়ত তাঁকে ছেড়ে যেতাম।"

ভাবলাম এখানে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় মেয়েদের মনোভাবের মধ্যে কী তফাৎ!

বললাম: "অজস্র শিশুর জন্ম দেওয়ার কষ্ট ও গ্লানি কেন শিক্ষিত সহৃদয় লোকদের চোখে পড়ে না বুঝি না। অনেক ক্ষেত্রেই যে তারা আধুনিক উপায়ে birth-ccntrol কেন করে না—যেখানে করলে তাদের পারিবারিক জীবন এত সুখের হ'ত—"

রাসেল হঠাৎ উষ্ণস্বরে ব'লে বসলেন: "এখন বুঝলে কি কেন আমি ধর্মের এত বিপক্ষে? জগতে অগুন্তি দরিদ্র ও স্বাস্থ্যহীন শিশুর জন্মদান যে আজও পাপ ব'লে গণ্য হয় নি তার জন্যে ধর্ম বড় কম দায়ী নয় জেনো। যদি ধর্মের পাণ্ডা না থাকত তাহ'লে অনেককেই আমরা criminal নাম দিয়ে একঘরে করতাম যারা আজ ভদ্র নামে সম্মানিত।"

"এ-কথাটা কিন্তু একটু বেশি রুক্ষ হ'য়ে পড়ল না কি, মিস্টার রাসেল?"

* মিসেস রাসেল তাঁর The Right to be Happy ব'লে বইটিতে লিখছেন: "The Roman Catholic openly advocate widespread celebacy for men and women, which is, for them, the most holy life and the only legitimate escape from parental responsibility. This teaching, therefore, quite clearly denies that sex is either a necessity or a lawful pleasure to men or to women and allows its indulgence only when the perpetuation of the race is desired. This is a perfectly natural result of the worship of fertility associated with agricultural superstitions. Yet any one capable of examining his or her instincts without regard to prejudice associated with past environments finds that there is a clear division between the impulse to sexual enjoyment and the desire to have children."

"যে-মহাপুরুষ বছর বছর তার অসুস্থ স্ত্রীকে রুগ্ন সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য করে, তাকে criminal ছাড়া আর কী নামে বর্ণনা করা যেতে পারে বলবে আমাকে ?"

"কিন্তু সে যে স্ত্রীর জন্যে নিজেও দুঃখ পায় একথাটাও তো ভুললে চলবে না—যদিও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সময় সে একথা ভাবতে পারে না।"

রাসেল উষ্মার সঙ্গে ব'লে উঠলেন: "স্ত্রীর জন্যে সে সত্যিকার দুঃখ পায় না কখনই। যদি বলে যে পায়, তাহ'লে আমি তাকে বলব মিথ্যাবাদী, না হয় ভণ্ড। কারণ সাদা সত্যটি হচ্ছে শুধু এই যে নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাটাই তার কাছে সব চেয়ে বড়—স্ত্রীর স্বাস্থ্য বা সন্তানের দায়িত্ব অকিঞ্চিৎকর। লম্বা লম্বা কথা ব'লে ধর্ম তার এ-পাশবিকতার সমর্থন করে যেহেতু সে ধর্মের চল্‌তি নীতি অনুশাসন-গুলিকে মেনে চলে।"

"কিন্তু স্ত্রীকে যদি সে ভালোবাসে—"

"কাউকেই ভালোবাসার ধর্ম এ নয়। সে ভালোবাসে শুধু নিজেকে। এটা সহজেই প্রমাণ করা যায়।"

"কেমন ক'রে ?"

"ধরো যদি আজ একটা আইন পাশ হয় যে তার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি ক'রে যদি সে বছর বছর সন্তানের জন্ম দেয় তাহ'লে তাকে যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে মারা হবে, তাহ'লে কি মনে কর যে সে birth-control-এর ব্যবস্থা না ক'রে তার স্ত্রীর ওপর ফের অত্যাচার করবে ?"

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

"অথচ সে নিজে কি তার স্ত্রীকে ঠিক্ অনুরূপ যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে মারে না ? বলো দেখি এ হেন দুঃসহ দুঃখ-নিবারণের উপায় বের হওয়ার পরেও মানুষ-নামধারী জীবের সমাজে এহেন পাশবিক আচরণ করতে সে সাহস করে কেন ? ধর্ম বাহবা দেয় ও birth-control করতে গেলে সেটাকে পাপ ব'লে ধম্‌কায় ব'লেই নয় কি ?"

একটু ভেবে বললাম: "কিন্তু এজন্যে ঠিক ধর্মকে দায়ী করা যায় কি না ভাবি। ধর্মের মধ্যেকার কুসংস্কারকে করা যেতে পারে বটে, কিন্তু ও দুটো ত ঠিক এক বস্তু নয়।"

"মানে ?"

"ধরুন—রবীন্দ্রনাথ। তিনি ত আধুনিক পদ্ধতিতে শিশু-জন্ম নিবারণকে অন্যায় মনে করেন না, অথচ তিনি তো অধার্মিক নন নাস্তিকও নন।"

"কিন্তু এখানে তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ কোনো লেবেল-মারা ধর্মের সম্প্রদায়ভুক্ত নন যে। ধর্ম তত অনিষ্ট করতে পারে না যদি কোনো সামাজিব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তার বিশ্বাসগুলোকে আমাদের জোর ক'রে গিলিয়ে দেওয়া না হয়। ধর্ম যতদিন ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে ততদিন সে খুব হানি করতে পারে না।"

"হানি না হয় করতে পারে না, কিন্তু ভালোও কি করে না কখনো ?"

"না, ধর্মের দ্বারা ভালো যে কখনো হয় না, এ নিশ্চিত।"

আমরা হেসে উঠলাম।

শ্রীমতী রাসেল বললেন: "যদি মেয়েদের মত নেওয়া হ'ত তাহ'লে দেখতে পাওয়া যেত যে অবস্থা প্রতিকূল হ'লে তারা মা হ'তে চাইত না বা আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে শিশুজন্ম নিবারণ করতে একটুও ইতস্তত করত না। শুধু তাই নয়, সন্তান অনাহূত ভাবে না এলে সন্তানের প্রতি স্নেহও মন্দা হয় না, যেমন আজকাল ঢের 'মা'র ক্ষেত্রে হচ্ছে।"

একটু থেমে: "আমার নিজের কথা অন্তত বলতে পারি। আমার যে দুটি সন্তান হওয়ার পরেও যে আমি আরও একটি সন্তান চাই তার কারণও এই যে আমাকে এযাবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে মা হ'তে হয় নি।"

হেসে বললাম: "আপনি তাহ'লে আরও একটি সন্তান চান ?"

শ্রীমতী রাসেল হেসে বললেন: "হাঁ। আমার মনে হয় আমাদের তিনটি সন্তান হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

ব'লেই স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন: "কিন্তু আমার মা একথা শুনে আমাকে কি বলেছেন জানো, বার্টরাণ্ড ?"

স্বামী জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর দিকে তাকালেন। স্ত্রী মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন: আমি কথায় কথায় একদিন মাকে বলেছিলাম যে, কিছুদিন পরে আমার আর একটি সন্তান হ'লে বেশ হয়। তাতে তিনি বলেছিলেন: "অমন গাধার মত কথা বোলো না, ডোরা। আমি চারটি সন্তানের মা হয়েছি কারণ আমি ছিলাম গাধা।"

রাসেল বললেন: "তিনি একথা বলেছিলেন নাকি ? সত্যি ?"

আমরা সকলে খুব একচোট হাসলাম।

হাসি থামলে আমি রাসেলকে বললাম: "আপনার Eudcation বইখানিতে আপনি একাধিক সন্তানের সমর্থন করেছেন, সেইজন্যেই বুঝি মিসেস রাসেল আর একটি সন্তান চান ?"

শ্রীমতী রাসেল বললেন: "অনেকটা তাই বটে। শিশু অন্য কয়েকটি সার্থী শিশুর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা-ধূলো ঝগড়া ঝাঁটি করতে না পারলে তার বাল্যশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। একলা একলা মানুষ হ'লে শিশু অনেক ক্ষেত্রেই কুনো হ'য়ে পড়ে।"

আমি রাসেলকে বললাম: "আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনি লিখেছেন যে বাড়ীতে বরাবর একলা মানুষ হওয়ার ফলে আপনি কলেজে এসেছিলেন একটি আস্ত prig হ'য়ে।"

রাসেল হেসে বললেন: "হাঁ। কিন্তু তারপর আরও একটু লিখেছিলাম যে সে priggishnessটা আমার আরোগ্য হয়েছে কিনা সেবিষয়েমতভেদের অন্ত নেই।"

শ্রীমতী রাসেল সে-হাসিতে যোগ দিয়ে একটু পরে বললেন: "কিন্তু সাধারণত প্রতি দম্পতির দুটির বেশি সন্তান হওয়া বোধহয় বাঞ্ছনীয় নয়।"

রাসেল গম্ভীরভাবে বললেন: "তোরা স্টাটিস্‌টিক্‌স্ অনুসারে প্রতি দম্পতির ২.৪ ক'রে সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত। কেবল এটা কাজে করা একটু কঠিন—এই যা মুস্কিল।"

আমরা ফের হেসে উঠলাম।

আমি বললাম: "আমার মাঝে মাঝে ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে মহাত্মা গান্ধির মতন হৃদয়বান লোকও শিশু-জন্ম-নিরোধের আধুনিক পদ্ধতির বিরোধী হন কেমন ক'রে?"

রাসেল বললেন: "তিনি অত্যন্ত ধার্মিক লোক, একথা ভুলে যাচ্ছ যে?" একটু থেমে "যাঁরা নৈতিক বিধি হিসাবে শিশু-জন্ম-নিরোধের বিরোধী তাঁদের আমি বুঝি, কেবল সে-রকম ভারতীয় দেশভক্তদের একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

"কি?"

"যাঁরা শিশু-জন্ম-নিবারণে বাধা দেওয়ার ফলে নারীজাতিকে ধরতে গেলে শুধু সন্তানের জন্ম দেবার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, তাঁদের আমার জিজ্ঞাসা এই যে তাঁরা স্বাধীন সমাজ বলতে বোঝেন কী?—স্বাধীন মানুষের সমষ্টি না একদল দাস? কারণ যে-সমাজ সন্তান না চাইলেও মেয়েদের জোর ক'রে তাদের মা হ'তে বাধ্য করে সে-সমাজ কেমন ক'রে অনুযোগ করে যদি ইংরেজরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরও ঠিক সেই রকম ভাবে জোর খাটায়? যেখানে আমরা অধীনস্থ লোকদের ওপর অত্যাচার করি সেখানে আমরা কেমন ক'রে তাদের দূষি যারা আমাদের পরাধীন ক'রে রাখতে চায়?

শ্রীমতী রাসেল বললেন: "বার্টরাণ্ড, ফেরা যাক্ চলো। চা খাবার সময় হয়েছে।"

চলতে চলতে পথে রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি কি একবার আমাদের দেশে আসতে পারেন না এখন ?

রাসেল বললেন: "বোধ হয় না। আমি একটা নতুন স্কুল করছি যে। তার দায়িত্ব বহু। কাজেই এখন কিছুদিনের জন্যে আমার পক্ষে তোমাদের দেশে যাওয়া সম্ভব হবে না বোধ হয়—যদিও যেতে ভারি ইচ্ছে করে।"

"কিন্তু কেন করে, বলতে পারেন ?"

"ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের আবহাওয়াটাকে যেমন ভাবে অনুভব করা যায়, দূর থেকে শুধু কল্পনায় ঠিক সে রকম অনুভূতি তো আসে না। ব'লে একটু থেমে বললেন, "কেবল তরুণ ভারত সম্বন্ধে আমি একটু নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েছি।"

"কেন ?"

"কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের তরুণ ভারতীয়দের সঙ্গে একটু সংস্পর্শে এসে।"

"তাদের জাতীয়তা ও সঙ্কীর্ণ দেশভক্তি যে আপনার ভালো লাগতে পারে না স তো আন্দাজই করা যায়।"

"তাদের জাতীয়তা বা দেশভক্তিও নয়—যদিও আমি নিজে প্রাণ গেলেও াতীয়তা বা দেশভক্তি শেখাতে পারব না—আমি সবচেয়ে দ'মে গেছি তাদের ধ্যে অতীত আচার ব্যবহারের প্রতি গোঁড়ামির দৃষ্টান্ত দেখে। কারণ যখন দখছি সব দেশেই অতীত যুগের আচার ব্যবহার বিশ্বাস প্রভৃতি মন্দ তখন শুধু ারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে এর রকমফের হবে একথা মনে করার স্বপক্ষে কোনো যুক্তিই তা নেই।"

পরদিন রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলাম: "শান্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কি নে হয় ?"

"খুব যে ভরসা হয় তা বলতে পারিনে।"

"তাহ'লে এত শান্তিজল ছিটানো—এতশত লেখালেখি কেনই বা ?"

"মানুষের হৃদয় ব'লে। তাই লেখবার আশা ম'রেও মরে না।"

"কিন্তু সত্যিই কি মানুষ শিখবে না কখনো ? কোনো ভরসাই কি নেই ?"

"গত যুদ্ধের আগে ভাবতাম ইতিহাসের দৃষ্টান্ত থেকে হয়ত শিখলেও শিখতে পারে। মনে করতে চাইতাম যে শান্তির সম্ভাবনা হয়ত একেবারে সুদূরপরাহত না

হ'তেও পারে। কিন্তু শেষটায় যখন যুদ্ধ বাধল তখন সব আশাই হ'ল ধূলিসাৎ—বিশেষ যুদ্ধের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।"

"যুদ্ধের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানে।"

"ধরো, যুদ্ধের সময় প্রথম দিকে আমাদের বলা হয়েছিল যে, খুনোখুনিটা ক্রমশঃ এতই ভীষণ হ'য়ে উঠছে যে মানুষ শেষটায় যুদ্ধের নামেও চমকে উঠবে। কিন্তু এরকম আশাকে প্রশ্রয় দিতে পারে কেবল সে-ই যে মানুষের মনস্তত্ত্বকে একদম উলটো বোঝে।"

"কেন

"কারণ মানুষের মনটা এমনই যে, পরাজয়ের ভয় তার যতই বাড়ে যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে সে ততই বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে। ফলে যুদ্ধের সময়ে আমাদের নিষ্ঠুরতাও বাড়তে থাকে। আমার মনে হয় যে, এর পরের যুদ্ধে মানুষ জয়ের লোভে শত্রু পক্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে রোগের বীজাণু সংক্রামিত করতেও পিছপাও হবে না।"

"কী ভয়ানক কল্পনা!"

"ভয়ানক বটে, কিন্তু এ থেকে বোধ হয় নিষ্কৃতি নেই।" রাসেল হাসলেন—সেই করুণ ব্যঙ্গের হাসি।

"কোনো উপায়ই কি নেই?"

"এক যদি আমেরিকা বা অন্য কোনো বড় শক্তি সমস্ত জগতের ছত্রপতি হয়। তখন সমস্ত জগৎ একটা অখণ্ড সাম্রাজ্য ব'লে গণ্য হবে। এটা হয়ত সম্পূর্ণ অসম্ভব না হ'তেও পারে।"*

মধ্যাহ্নভোজনের ঘণ্টা পড়ল।

(আহারের মধ্যে নানা কথা হ'ল তার কোনো বিবৃতি লিখে রাখি নি।)

আহারের পরে ফের বেড়াতে বেরুলাম—রাসেল-দম্পতির সঙ্গে।

জিজ্ঞাসা করলাম: "ওয়েল্‌স তাঁর 'উইলিয়াম ক্লিসোল্ড্' বইটিতে লিখেছেন যে আজকালকার চিন্তাশীল মনীষীরা নাকি মার্ক্সকে একদম নাকচ ক'রে দিয়েছেন।"

রাসেল চিন্তিতস্বরে বললেন: "সম্পূর্ণ নাকচ ক'রে দিতে পেরেছেন ব'লে মনে

* ওয়েল্‌সের মনেও এই সমাধানের সম্ভাবনা খুব আশা দিয়েছে। তাঁর "Salvage of Civilization" দ্রষ্টব্য।

হয় না। কারণ মার্ক্সের নীতির মধ্যে যে অনেকখানি সত্য আছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।"

"যথা?"

"ধরো মার্ক্স ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আধুনিক যুগের একটা মস্ত প্রবণতা হবে এই যে, বড় বড় বাণিজ্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের সংখ্যা ক্রমেই ক'মে আসবে ও তাঁদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যসংঘগুলির পরিসর বাড়বে। অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি বহুসংখ্যক খুচরো লোকের হাত থেকে অল্প লোকের হাতে গিয়ে পড়বে। অন্তত এ ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে নয় কি?* কিম্বা ধরো, তাঁর ইতিহাসকে অর্থনীতির সমস্যার দিক দিয়ে বিচার ও ব্যাখ্যা করা। মানুষের ইতিহাসকে শুধু তার অর্থনীতিক সমস্যার দিক্ দিয়ে বিচার করতে গেলে পুরো বোঝা হয় না একথা সত্য হ'লেও, প্রতি জাতির ইতিহাস যে তার অর্থনীতিক সমস্যা দিয়ে কমবেশি নিয়ন্ত্রিত হয় একথার মার নেই! কাজেই স্বীকার করতেই হয় যে, মার্ক্সের নীতির মধ্যে সবটাই কিছু অসার নয়।"

"তাহ'লে আপনার বিশ্বাস যে, মার্ক্সের নীতি একদম ভুয়ো প্রমাণিত হয় নি ও এখনো চলবে?"

রাসেল তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন: "তোমার কী মনে হয়, ডোরা?"

শ্রীমতী বললেন: "আমার মনে হয় মার্ক্সের নীতি ভুয়ো কি না সেটা একটা প্রশ্ন, আর এ-নীতি চলবে কি না সেটা আর একটা প্রশ্ন। কারণ মার্ক্সের নীতি যদি আগাগোড়াই ভুয়ো প্রমাণ হয় তাহ'লেও তার চল সমানই অব্যাহত থাকতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "তার মানে?"

রাসেল বললেন: "কথাটা খৃষ্টধর্মের উদাহরণ নিলে পরিষ্কার হবে। ধরো না কেন খৃষ্টধর্মের মূল ভিত্তিটা যে একদম ভুয়ো সেটা তৃতীয় শতাব্দীতে কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক পরীক্ষা করামাত্রই তো প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছিল কিন্তু তবু তো এটা চলছে এই বিংশ শতাব্দীতেও—নয় কী?"†

হাসি থামলে কথায় কথায় সোশ্যালিজ্‌মের প্রসঙ্গ উঠল।

---

* তাঁর Prospects of Industrial Civilization পুস্তকে রাসেল দেখিয়েছেন আমেরিকার meat-trust কেমন ক'রে ধ'রে ধীরে দুচার জন মাত্র capitalistএর হাতে গিয়ে পড়েছে—যেটা আগে ছিল না। Private industry, Cottage industryর দিন ক্রমেই চ'লে যাচ্ছে।

† তাঁর Why I am not a Christian পুস্তিকায় রাসেল (খৃষ্টধর্মকে কটাক্ষ ক'রে) লিখছেন যে যত'দিন মানুষ অতীত যুগের অজ্ঞ প্রচারক প্রভৃতির বাজে নীতিকথাকে বেদবাক্য ব'লে শিরোধার্য ক'রে চলবে ততদিন সভ্যতার আশা দুরাশা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "Roads to Freedomএ আপনি রকমারি সোশ্যালিজমের দোষগুণ বিচার ক'রে শেষটায় Guild Socialismএর প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে ঠিক এ-ধরণের কোনো সুসমঞ্জস সোশ্যালিজমের প্রবর্তনের সম্ভাবনা বেশি?"

"না। খুবই কম।"

"কম?"

"কি জানো? কোনো সুশৃঙ্খল পদ্ধতি বা সুসমঞ্জস বন্দোবস্ত যত বেশি গভীর হবে—অর্থাৎ কিনা তার মধ্যে যত বেশি সত্য থাকবে সেটা হবে ততই বেশি জটিল। কাজেই প্রতি বড় কিছুই সংসারে সাধারণের দুরধিগম্য হ'য়ে থাকে; মিথ্যার প্রভাব তাই না জগতে এত ব্যাপক।

"বুঝলাম না—"

"মিথ্যা মিথ্যা ব'লেই তার জটিল হওয়ার দরকার করে না। তার উদ্দেশ্য শুধু কোনোমতে মানুষের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির কাছে গ্রাহ্য হওয়া। কাজে কাজেই জগতে মিথ্যারই জয়জয়কার—সংসারে অধিকাংশ মানুষই বুদ্ধিতে কাঁচা ব'লে।"

"আপনি দেখছি তাহ'লে জীবনে বুদ্ধির আভিজাত্যে বেশি আস্থাবান?"

"তার মানে?"

"অর্থাৎ আপনি কৌলীন্য-পন্থীদের এই বিশ্বাসের পক্ষপাতী যে সত্য কেবল মুষ্টিমেয়ের বুদ্ধিগম্য হ'তে পারে।"

রাসেল ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বললেন: "আমি কোন বিশেষ বিশ্বাস বা নীতির বেশি পক্ষপাতী ব'লে তো কথা নয়। পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন এখানে উঠতেই পারে না। আমি জীবনকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখতে চাই—এই মাত্র।"

"আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না, মিস্টার রাসেল—"

"জীবনে কি হওয়া-উচিত-না-উচিত এ-সম্বন্ধে আমাদের মনগড়া নৈতিক ধারণাকে ছাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করব আমরা কবে? কি ভালো কি মন্দ সে বিষয়ে আগে থাকতে গোঁড়া ধারণা না এঁটে কি জীবনকে বিচার করা যায় না? আমি প্রায়ই দেখি যে, আমরা পদে পদে ঠকি ও ঠেকি শুধু এইজন্যে যে আমরা সত্য-নির্ধারণের সময়েও আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মোহ থেকে মুক্তি চাই না। অর্থাৎ আমরা জীবনকে দেখতে চাই না নিঃস্পৃহভাবে। কিন্তু কোন্ যুক্তিবলে আমরা আগে থাকতে ভেবে ব'সে থাকি যে আমরা কি চাই না-চাই তার সঙ্গে সত্যের স্বরূপের কোনো দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে?"

একটু থেমে: "ধরো না কেন, বাণিজ্যে টাকার চলাফেরা ও ওঠাপড়া; এটা একটা অত্যন্ত জটিল জিনিষ, বটে তো? তাহ'লেই দেখ একজন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের এ-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গ'ড়ে উঠবে কেমন করে? এ-বিষয়টা নিয়ে সে তো মাথা ঘামায়নি, মাথা ঘামাবার শক্তিও নেই। কিন্তু একথা বলার মানে কি এই যে, আমি তার শক্তিহীনতার পক্ষপাতী? ঠিক তেমনি—আমি যখন বলি যে শক্ত জিনিষ মানুষ সহজে বুঝতে পারে না তখন আমি এ-পারা-না-পারার বাঞ্ছনীয়তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করি না মোটেই। আমি একটা পরীক্ষিত সত্যকে উচ্চারণ করি মাত্র। যদি আমি বলি যে, ঘোড়ার গলা গাছের উঁচুডালের পাতার কাছে পৌঁছয় না, জিরাফের গলা পৌঁছয় তাহ'লে কি বলতে হবে যে আমি কোনো বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করছি—বলছি যে ঘোড়ার গলাটাও লম্বা হওয়া বাঞ্ছনীয় বা অমনিতর একটা কিছু? যখন আমরা জীবনটাকে বুঝতে চাই, তার নানান্ সত্যের দর কষতে ছুটি তখন সব আগে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভালো মন্দের ধারণাকে নিরস্ত রাখা চাই। বুঝেছ?*

খানিকদূর গিয়ে একটি পাহাড়ের ওপর যাবার সরু পথের কাছে আসতেই রাসেল থেমে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন: "তুমি আগে চলো।"

"আপনি চলুন আগে—"

রাসেল স্নিগ্ধ হেসে বললেন: "সে কি হয়?"

রাসেলের কণ্ঠে তাঁর খানিকক্ষণ আগের কথার উত্তাপটা হাল্কা কথায় জুড়িয়ে গেছে।

আমরা দুজনে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে একটি বড় পাথরের উপর বসলাম। শ্রীমতী রাসেল নীচে সমুদ্রতীরে পুত্রকন্যার স্নান দেখতে গেলেন।

খানিকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

পায়ের তলায় ঢেউগুলির লুটোপুটি কলহাস্যে সাগরবক্ষ মুখর! পাশ্চাত্ত্য গগনের কৃপণ রবি হঠাৎ কিসের মদে মাতাল হ'য়ে যে ছুড়ছেন কিরণের পিচকিরি!

* শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine-এ লিখেছেন: "The attempt of human thought to force an ethical meaning into the whole of nature is one of those acts of wilful and obstinate self-confusion, one of those pathetic attempts of the human being to read himself, his limited habitual human self into all things and judge them from the stand-point which he has personally evolved and which most effectively prevents him from arriving at real knowledge and complete sight.

অদূরে কয়েকটি সাদা পাল—জেলে ডিঙ্গি। দিগন্তের কোলে এক ঝাঁক পাখী চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ওড়ে।

কিন্তু ক্ষুব্ধতা আমার কাটল না। একটা বিচিত্র ভাব।

রাসেলও বুঝেছিলেন—বেশ বুঝতে পারছিলাম। অথচ না তিনি বলতে পারছিলেন কোনো কথা—না আমি।

মনে হয় আজকের এ অনির্দেশ্য অনুভূতিটির কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। বিশেষ ক'রে—হঠাৎ এই সূত্রে রাসেলের চরিত্রের একটা দিকের পরিচয় পেয়েছিলাম ব'লে।

মনে হচ্ছিল মহাত্মা গান্ধির ধৈর্য রাসেলের চেয়ে কত বেশি। রাসেল হঠাৎ একটা সামান্য প্রশ্ন দুবার করতেই অধীর হ'য়ে উঠলেন—কিন্তু মহাত্মাজিকে রোজ কতলোকের কত প্রশ্নেরই না উত্তর দিতে হয়েছে—কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে! তবে হয়ত মনে হ'ল ভাবতে ভাবতে—রাসেল আসলে মহাত্মাজির চেয়ে আবেগপ্রবণ লোক ব'লেই অল্পে উত্তেজিত হন, তেতে ওঠেন! লেখার সময়ে তীক্ষ্ণ বিচারের কড়া পাহারার সাহায্যে তিনি মনটাকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেন বটে—কিন্তু পারেন কই সব সময়ে? পারলে কি আর The Study of Mathematicsএর মতন প্রবন্ধেও (গণিতের বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করার সময়ে) তাঁর মনে এ ব্যথা-চঞ্চল প্রশ্ন জাগে:

"Have any of us the right, we ask, to withdraw from present evils, to leave our fellow-men unaided, while we live a life which, though arduous and austere, is yet plainly good in its own nature?" কিন্তু তখনই এ প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দিয়েছেন সেটাও খতিয়ে তাঁর বুদ্ধির উত্তর নয়—ঐ আবেগেরই আলো:

"When these questions arise, the true answer is, no doubt, that some must keep alive the sacred fire, some must preserve, in every generation, the haunting vision that shadows forth the goal of so much striving."

মনে পড়ল তাঁর Freeman's Worshipএর অপূর্ব কথাগুলি:

"United with his fellow-men by the strongest of all ties, the tie of a common doom, the free man finds that a new vision is with him always, shedding over every daily task the light of love. The life of man is a long march through the night, sur-

rounded by invisible foes, tortured by weariness and pain, towards a goal that few can hope to reach, and where none may tarry long. One by one, as they march, our comrades vanish from our sight. seized by the silent orders of omnipotent Death. Very brief is the time in which we can help them, in which their happiness or misery is decided. Be it ours to shed sunshine on their path, to lighten their sorrows by the balm of sympathy, to give them the pure joy of a never-tiring affection, to strengthen failing courage, to instil faith in the hours of despair. Let us not weigh in grudging scales their merits and demerits, but let us think only of their need—of the sorrows, the difficulties, perhaps the blindness, that make the misery of their lives ; let us remember that they are fellow-sufferers in the same darkness, actors in the same tragedy with ourselves. And so, when their day is over, when their good and their evil have become eternal by the immortality of the past, be it ours to feel that, where they suffered, where they failed, no deed of ours was the cause ; but wherever a spark of the divine fire kindled in their hearts, we were ready with encouragement, with sympathy, with brave words in which high courage glowed."

রাসেল একদিন বলেছিলেন যে, Freeman's Worship-ই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তাই একথাগুলির একটি মূলানুগ অনুবাদ দিলাম—কারণ রাসেলকে বুঝতে হ'লে মুক্তি তাঁর চোখে কী রঙে রঙিয়ে উঠেছে তার কিছু পরিচয় পাওয়াই চাই :

সবচেয়ে দৃঢ় গ্রন্থি—একই সে-ধ্বংসের পথে সহযাত্রা-ডোর :
সে রাখীবন্ধনে-বাঁধা মানবের নেত্রপথে আজ
ফুটে ওঠে এক নব ধ্যানছবি নিরন্তর, যার
প্রেমের কিরণ ঝরে তার প্রতি কর্মে দিনে দিনে :

আমাদের এ-জীবন যেন কৃষ্ণরাত্রি—অন্ধকারে
সুদীর্ঘ দুরভিসারে চলা,
অদৃশ্য অরাতি যেথা ঘেরে চারিধারে,
ক্লান্তি ব্যথা আনে যেথা যন্ত্রণা দাহন,
এমনি লক্ষ্যের পানে গতি—

মুষ্টিমেয় পান্থ যেথা উত্তরে ক্বচিৎ,
ঠাঁই যেথা নাহি পায় কেহ চিরতরে।

একে একে সে-পথচলায়,
হয় অন্তর্হিত সঙ্গী যত—
সর্বশক্তি-মরণের-নিঃশব্দ-ইঙ্গিতে-ধৃত ক্লিষ্ট বন্দীসম।

শুধু এই দুদিনের তরে
আমরা সহায় তাহাদের—যে-দুদিনে
দুঃখ-সুখ তাহাদের হয় নিরূপিত।
মন্ত্র হোক আমাদের :

তাদের যাত্রার পথে ধরিব সাদরে
যত প্রাণরবিরাগ আছে আমাদের ;
বেদনে তাদের আনি' স্নিগ্ধ সমবেদনা প্রলেপ
শোকতাপ-গুরুভার করিব লাঘব ;
অক্লান্ত ভালোবাসার অমল আনন্দ দিব দান ;
মুমূর্ষু সাহসে—বল ; নিরাশা-প্রহরে
বিশ্বাসের অঙ্গীকার।

চ্যুতি অচ্যুতির যেন না করি' বিচার—রাখি মনে
শুধু তাহাদের অকিঞ্চনতার কথা—
দুঃখ, বাধা, অবোধ অন্ধতা—ফলে যার
জীবন তাদের হ'ল ম্লান, দুর্বিষহ।
যেন নাহি ভুলি কোনোদিন :—
ব্যথার সতীর্থ একই অন্ধকারে আমরা, মানব,—
একই বিয়োগান্ত নাটে সাথী অভিনয়ী।

তারপরে···লয় যবে তারা
এ-ক্ষণিক লীলা-হ'তে অন্তিম বিদায়···
অমরণ অতীতের বরে

ভালোমন্দ তাহাদের হয় যবে স্থির, কালাতীত,
সে-লগনে
এ-সান্ত্বনা যেন রাজে অন্তর-অতলে :—
শোক তাপ পরাভব যত
সহিল তাহারা এ-জীবনে—
নহে আমাদের কোনো কর্মফলে—আর

হৃদয়ে তাদের দিব্য স্ফুলিঙ্গ যখনই
উঠেছে জ্বলিয়া,
আমরা ছিলাম পাশে—অনুকূল-আশ্বাসে-উচ্ছল,
দরদে-মধুর,
ল'য়ে আমাদের বীরবাণী
উত্তুঙ্গ-অভয়ে-আভাময়।

* * *

কেবল মনে মনে ভাবছি যে যাঁর মনটা এইরকম সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে ঘর করে তিনি কেমন ক'রে খানিক আগের উষ্ণতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে ইতস্তত বোধ করছেন? ঠিক এমনি সময়ে তাঁর কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠেছিলাম মনে আছে।

তিনি আমার দিকে ফিরে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন: "আমি যে একটু আগে উত্তেজিত হয়েছিলাম সেজন্যে আমায় ক্ষমা কোরো।" (তিনি forgive কথাটি ব্যবহার করেছিলেন)।

চিন্তা বা আবেগ কি নীরবতার মধ্যে দিয়েও আত্মপ্রকাশ করতে পারে?··· আশ্চর্য!···

আমার ক্ষোভ মুহূর্তে জল হ'য়ে গেল। তাঁর এত স্পষ্টাস্পষ্টি ক্ষমা চাওয়া আমি মোটেই আশা করিনি।

স্পৃষ্ট হ'য়ে বললাম: "আমি কিছু মনে করিনি মিস্টার রাসেল। হয়ত আমিই একটু বেশি অসাবধান হ'য়ে কথা ব'লে থাকব।...আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে—কিন্তু সে যাই হোক আপনি যে আমার এত শত প্রশ্নের পর প্রশ্ন এত ধৈর্য ধ'রে শুনছেন ও প্রত্যেকটির উত্তর দিচ্ছেন এ আপনারই যোগ্য।"

"প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া আমার কাছে একটুও বিস্বাদ মনে হয়নি, সত্যি

বলছি। কিন্তু কি জানো? আমার কাছে একটা জিনিষ অত্যন্ত বড় মনে হয়। হয়ত সেইজন্যেই তার সম্বন্ধে আমি এতটা স্পর্শকাতর।"

"কী?"

"যে, জীবনকে বুঝবার সময়, সত্যকে খোঁজবার সময়ে আমরা নির্বাসনা হওয়ার চেষ্টা করি না। পদে পদে ঠেকি, তবু শিখি না। তাই আমি চাই যে, বাইরেকে পর্যবেক্ষণ করার সময় মনগড়া উচিত-অনুচিতের বাষ্পও যেন আমাদের দৃষ্টিকে আবিল না ক'রে তোলে।"

"আপনার অনেক লেখায়ই Scientific outlook-এর প্রশস্তির সময়ে একথা আপনি নানা সূত্রে বলেছেন।* আপনার সত্যনিষ্ঠার এ-আবেগহীন নিষ্কাম দিকটা যে আমার কতখানি ভালো লাগে তা ব'লে বোঝাতেও পারব না। কেবল আমি আপনাকে বুদ্ধির আভিজাত্য সম্বন্ধে ও-প্রশ্নটি করেছিলাম—টলস্টয়ের কথা ভেবে।"

"ও!"

"এক সময়ে টলস্টয়ের একথাটি আমাকে ভারি স্পর্শ করত যে, মানুষের সেই সব কীর্তিই হচ্ছে আসলে শ্রেষ্ঠ যা আবালবৃদ্ধ বনিতার বুদ্ধিগম্য। আজকাল আমার মনে হয় একথাটা শুনতে যতই ভালো লাগুক না কেন আসলে সত্য নয়—যেহেতু জীবনের ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ঠিক উল্টো সাক্ষ্য দেয়।"

রাসেল সামনের দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে বললেন: "টলস্টয়ের সম্বন্ধে সাইকোআনালিসিসের ফলে নতুন আলো পাওয়া গেছে ভারি চিত্তাকর্ষক। তিনি ভিতরে ভিতরে ছিলেন একজন অত্যন্ত গর্বী মানুষ। তাঁর ফটো থেকে বেশ বোঝা যায় একথা। কিন্তু হ'লে হবে কি—তাঁর যতখানি গর্ব ছিল, ততখানি শিক্ষা বা সংস্কৃতি ছিল না। অথচ এ-আত্মপ্রসাদকে জিইয়ে রাখাই চাই। কাজেই তাঁকে একটা সুবিধেমতন জীবনের ফিলসফি গ'ড়ে তুলতে হয়েছিল। সেটা কি? না, যা আমি জানি না বা বুঝি না তা জানা বা বোঝা অনাবশ্যক। এক কথায়, এই হচ্ছে টল্‌স্টয়ানিজ্‌মের মনস্তত্ত্ব—ওদের ভাষায় র‍্যাশনালাইসেশন।"

* The man of Science, whatever his hopes may be, must lay them aside while he studies nature ; and the philosopher, if he is to achieve the truth must do the same. Ethical considerations can only legitiimately appear when the truth has been ascertained : they can and should appear as determining our feeling towards the truth, and of our manner of ordering our lives in view of the truth, but not as themselves dictating what the truth is to be.—*Mysticism and Logic*.

"ফ্রয়েড সম্বন্ধে আপনার কি মত ?"

"তিনি একজন মস্ত লোক, যদিও তাঁর সঙ্গে সব বিষয়ে আমি একমত নই।"

"কোথায় তাঁর সঙ্গে আপনার মতভেদ হয় ?"

"জীবনের প্রত্যেকটি প্রেরণার মূলে যে যৌন-আকাজ্ক্ষা নিহিত, একথায় তাঁর সঙ্গে সায় দেওয়া কঠিন।* উদাহরণত জ্ঞানকে নেওয়া যেতে পারে।"

"মানে ?"

"মানে জ্ঞানের প্রেরণার উদ্ভব যৌন-আকাজ্ক্ষা থেকে নয় ব'লে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, যদিও ললিত সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে যে যৌন-আকাজ্ক্ষাকে মোড় ফিরিয়ে দিতে পারার দরুণ একথা মানি। কিন্তু জ্ঞানের বিকাশ সম্ভব হয়েছে বোধ হয় শক্তির আকাজ্ক্ষাকে মোড় ফিরিয়ে দিতে পারার দরুণ।"

"কেমন ক'রে ?"

"জ্ঞান আমাদের শক্তি দেয় ব'লে। মানুষ ও প্রকৃতিকে আমাদের ইচ্ছা অনুসারে চলানো-ফেরানোর নামই হচ্ছে শক্তি, জ্ঞানের ফলে আমাদের এই শক্তি বাড়ে।"

অতঃপর আমরা পাহাড় থেকে এলাম নেমে। শ্রীমতী রাসেল সমুদ্রতীরে ব'সে তাঁর শিশু পুত্রকন্যার সাগর-স্নান দেখছিলেন। রাসেল স্নানবেশ পরিধান ক'রে ফের নেমে গেলেন।

আমি শ্রীমতী রাসেলের পাশে বসলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম: "রুশ দেশ সম্বন্ধে আপনার ও রাসেলের কি মতভেদ হয়েছিল ?"

"না তো! আমাদের অধিকাংশ বিষয়েই মতের মিল ছিল। কেবল রুশ দেশ হয়ত আমার একটু বেশি ভালো লেগে থাকবে।"

"কোথায় পড়ছিলাম সেদিন—বর্তমান জগতে রুশ-রমণীর মতন স্বাধীনা নারী নাকি আর কোথাও মেলে না ? একথা কি আপনার সত্য মনে হয় ?"

"না। আমার মনে হয় আজকালকার ইংরাজ বা আমেরিকান মেয়েরা রাশিয়ার মেয়েদের চেয়ে বেশি বেপরোয়া। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি মানি যে এ জন্যে দোষ রাশিয়ার বর্তমান গভর্নমেণ্টের নয়, দোষ—সেখানকার পুরুষের।"

"মানে ?"

* Instincts in the Unconscious পুস্তকে রিভার্স সাহেব ফ্রয়েডের এই নীতির খণ্ডন করেছেন। এ-খণ্ডন আজকাল য়ুরোপ বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত।

"মানে বর্তমান রাশিয়ার গড়পড়তা পুরুষেরা শিক্ষায় ইংলণ্ড বা আমেরিকার সমকক্ষ নয়। নইলে রুশ দেশের আইনকানুন প্রভৃতি জগতের সব দেশের চেয়ে এগিয়ে, একথা মানতেই হবে।"

"কি হিসেবে এগিয়ে?"

"ধরো রুশদেশে এখন যে-কোনো পুরুষ বা মেয়ে সরাসরি ডাইভোর্স পেতে পারে যদি সে বলে যে তার স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে তার বনছে না। আইনের দিক দিয়ে এটা মস্ত প্রগতির নিদর্শন বৈ কি।"

"কিন্তু সন্তানদের ব্যবস্থা?"

"সন্তানদের সম্বন্ধে আইনে কি ব্যবস্থা করেছে সেটা আমি ঠিক জানি না। তবে বোধহয় সে-সম্বন্ধে পিতামাতার মধ্যে রফা মতন কিছু একটা হয়।"

"কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে এরকম বিবাহচ্ছেদের ফলে সন্তানের ক্ষতি হয়?"

"কি হিসেবে?"

"সন্তানের পক্ষে পিতামাতা উভয়েরই স্নেহ ও শিক্ষা কি খুবই দরকার নয়?"

শ্রীমতী রাসেল বিস্মিত হ'য়ে বললেন: "দরকার!—কেন? আর—সব ছেলে-মেয়েরা কি পিতামাতা উভয়েরই স্নেহ বা শিক্ষা পায় মনে করো? বিশেষত শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েরা যে প্রায়ই পায় না—একথা কে না জানে? কোথায় শুনেছিলাম একজন শ্রমিকের ছেলের গল্প। তার বাবা তাকে মারতে সে কাঁদছিল। কে তাকে মেরেছে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল, "যে-লোকটা প্রতি রবিবারে মার সঙ্গে শোয়।"

একটু থেমে: "এমন কত শিশু আছে যাদের সঙ্গে তাদের পিতার সম্বন্ধ শুধু ঐ রবিবার দিনটায়।"

এই সময়ে রাসেল স্নান সমাপন ক'রে এসে আমাদের পাশে একটা পাথরে বসলেন।

আমাদের কথা হচ্ছিল ইংলণ্ডে বিবাহচ্ছেদ সম্বন্ধে আইন নিয়ে। শ্রীমতী রাসেল বললেন: "এটা একটা অত্যন্ত বাজে আইন যে দুপক্ষই ব্যভিচার করলে বিবাহচ্ছেদ হ'তে পারে না। শুধু তাই নয়, বিবাহচ্ছেদ বিষয়ে আমাদের আইনের অনেক সময়ে কোনো মানেই খুঁজে পাওয়া যায় না।"

"কি রকম?"

"ধরো, ডাইভোর্সের জন্যে যখন মামলা চলছে তখন যদি স্বামী স্ত্রী একবারও

বন্ধুভাবে দেখা করে—শুধু চোখের দেখা মনে রেখো—তাহ'লেও বিবাহচ্ছেদ রোধ করাটা আইন তার একটা মহাকর্তব্য মনে করে। এটা যে কী হাসির কথা—"

রাসেল বললেন: "এর মনস্তত্ত্ব হচ্ছে শুধু এই যে, বিচারপতি নিজেকে ধর্মের একজন মস্ত পাণ্ডা মনে ক'রে থাকে। এ ধর্মকে বজায় রাখতে হ'লে পাণ্ডার আত্মপ্রসাদের খাতিরে দেখানো দরকার যে, যে-পক্ষ বিবাহচ্ছেদের জন্য ব্যগ্র, সে-পক্ষ শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক হওয়া সত্ত্বেও অপরপক্ষ দ্বারা উৎপীড়িত;—আর এমন সে-উৎপীড়ন যে বেচারি রেগে আগুন না হ'য়েই পারে না। কিন্তু যেখানে সে নিজে নিষ্কলঙ্ক নয়, সেখানে তার অগ্নিশর্মা হওয়ারও নৈতিক অধিকার বাতিল। কাজেই সেখানে সুবিচারের কর্তব্য হচ্ছে দুজনকেই এক জুড়িতে বেঁধে রাখা—তাতে ক'রে তারা যত দুঃখই পাক না কেন।"

আমি হেসে বললাম: "ওয়েল্‌সের 'উইলিয়াম ক্লিসোল্‌ড'-এ তিনি King's Proctor-এর* এই গোয়েন্দাগিরির জন্যে মহা রাগ করেছেন; বলেছেন King's Proctorকে আইন রেখেছে শুধু সাধ্যমত মানুষের অসুখ ও অশান্তি বাড়াতে।"

শ্রীমতী রাসেল ব্যঙ্গের সুরে বললেন: "এ বিষয়ে আইনের গোঁড়ামি ও অন্ধতা দেখলে গা জ্বালা করে। ভাবো তো দেখি ডাইভোর্স সম্বন্ধে এই আইনটির কথা যে, 'ক' 'খ'-কে যদি একবার ব্যভিচারী প্রমাণ করতে না পারে, তাহ'লে পরে 'খ'-র সে ব্যভিচার সম্বন্ধে যদি নতুন প্রমাণ পায় তাহ'লেও 'ক' ফের নালিশ করতে পারবে না। এই-ই ত আজকালকার আইন, না বার্ট্রাণ্ড?"

"হাঁ ডোরা। কিন্তু এর কারণ কি জানো? কারণ আইনের সূক্ষ্ম বিবেক বলে যে এক অপরাধের জন্যে কেউ একবারের বেশি অভিযুক্ত হ'তে পারে না। গল্প আছে যে কোনো লোককে খুন করার অপরাধে একজনের বিশ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছিল। সে বিশ বছর বাদে ফিরে এসে দেখল যে যাকে সে খুন করতে গিয়েছিল সে বেঁচে গেছে। সে তখন করল কি? না, সোজা গিয়ে তাকে তোফা খুন করল। নিশ্চিন্ত এবার—যেহেতু এ-অপরাধের জন্যে সে যখন একবার কারাভোগ ক'রে এসেছে তখন আইনে তাকে তো আর দ্বিতীয়বার সাজা দিতে পারবে না।" ব'লে রাসেল হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। আমরা সে হাসিতে যোগ দিলাম।

* বিলেতে King's Proctor বিবাহবিচ্ছেদের ছয় মাস পরে অবধি খোঁজ ক'রে থাকেন যে দম্পতি ডাইভোর্স পেয়েছে তাদের সম্বন্ধে। এ-ছয় মাসের মধ্যে উপরোক্ত রকমের কোনো খবর পেলে তিনি ডাইভোর্সকে নাকচ ক'রে দিয়ে থাকেন।

আমরা শেষে চা খেতে রাসেলের কুটিরে ফিরলাম।

কথায় কথায় রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলাম: "বার্ণার্ড শ'কে আপনার কেমন লাগে?"

"চমৎকার লোক। প্রভাবে স্বভাব নষ্ট হয় নি এমন মানুষ জগতে বিরল। নিজের খ্যাতি বজায় রাখার সম্বন্ধে তাঁর এমন গভীর ঔদাসীন্য, সে দেখতেও আনন্দ। এমন সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক, ব্যঙ্গপ্রিয় লোক—তাঁর সাহচর্য একটা মস্ত লাভ।—"

"গলসওয়র্দি আপনার কেমন লাগে?"

"শিল্পী বটে। কিন্তু কর্মজগতে important figure নন।"

"কর্মজগতে important figure আপনি কাকে বলতে চান?"

রাসেল চিন্তিতস্বরে বললেন: "ধরো ওয়েল্‌স্—যদিও তিনি বড় শিল্পী নন।"

"আচ্ছা রোলাঁ বলেন যে বড় শিল্পী মন্দ মানুষ হ'তে পারেন না।"

"বাজে কথা। ডস্টয়েভ্‌স্কি তো বড় শিল্পী, কিন্তু সাইবিরিয়াতে তিনি কর্তৃপক্ষদের যে রকম খোষামোদ করতেন তাতে তাঁর চরিত্রবলের উপর শ্রদ্ধা রাখা কঠিন হ'য়ে ওঠে না কি?"

"আপনি কি উপন্যাস প্রভৃতি পড়েন?"

"পড়ি—যখন সময় পাই—তবে সময় বেশি পাই না।"

"আপনার বুঝি লেখায় খুব বেশি সময় যায়?"

"তা যায় বই কি।"

"আচ্ছা, আপনি কি নিজের লেখা খুব সংশোধন ক'রে থাকেন?"

"মোটেই না—আমি একটানা লিখে যাই ও শেষ হবা মাত্র প্রেসে পাঠিয়ে দিই।"*

"আপনার লেখার ভঙ্গির মধ্যে সংযমটি আমার বড় ভালো লাগে। আপনি কি এ-গুণটি অর্জন করবার জন্যে চেষ্টা করতেন?"

"এক সময়ে করতাম। এক একটা আইডিয়া কত কম কথায় ফুটিয়ে তুলতে পারা যায় সে বিষয়ে আমি ছেলেবেলায় নানারকম এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতাম। এ-ডিসিপ্লিন থেকে আমি যথেষ্ট লাভবান হয়েছি।"

* নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁর Outline of Philosophyতে রাসেল লিখেছেন ভারি চিত্তাকর্ষক কথা:—"In writing a book my own experience is that for a time I fumble and hesitate and then suddenly I see the book as a whole, and I have only to write down as if I were copying a completed manuscript. (pp. 44)

এ-কথায় সে-কথায় বললাম : "কি রকম বই আপনার ভালো লাগে, জানতে ভারি কৌতূহল হয়।"

"তার কি ঠিক আছে ? ধরো ডিকেন্স, শেক্সপীয়র, বার্ণার্ড শ, শার্লক হোম্‌স্—"

"শার্লক হোম্‌স্ আপনার ভালো লাগে জেনে ভারি খুশি হ'লাম।"

"Oh! Sherlock Holmes is delightful!"

কথায় কথায় ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ এল।

আমি বললাম : "যতদিন না ইংরাজেরা আমাদের এই Reformএর মতন বাজে মাল দিয়ে ছেলেভুলোতে চাইবে ততদিন প্রতীকার হবে কেমন ক'রে বলুন ?"

রাসেল বললেন : "ইংরাজেরা তোমাদের যা দয়া ক'রে হাতে ধ'রে দেবে সেটা বাজে মাল ছাড়া আর কিছু হ'তেই পারে না। তারা তোমাদের কিছু দেবে কেবল তখনই যখন তারা ভড়কে যাবে।"

ব'লে একটু থেমে বললেন : "আমি কিন্তু আজকাল কোনো রকম গভর্ণমেণ্টের 'পরেই আর ভরসা রাখি না। কারণ আমার মনে হয় জগতে বর্তমান সময়ে কোনো গভর্ণমেণ্টই ভালো নয়*। ধরো, তোমরা যদি আজ আমাদের ওপর রাজত্ব করতে তাহ'লে তোমাদের শাসন পদ্ধতি আমাদের চেয়ে একটুও উচ্চাঙ্গের হ'ত ব'লে মনে করার কোনো ভিত্তি আছে কি ?"

"সে কথা সত্যি।"

"কিন্তু অন্যদিকে ইতিহাসের সাক্ষ্য যদি নেওয়া যায় তাহ'লে দেখা যায় যে একটা জাতি আর একটা জাতিকে তার সভ্যতার কিছু দিতে পারে কেবল গায়ের জোরে। রোমানরা ইংরাজজাতির মধ্যে তাদের সভ্যতা প্রচার করেছে ঠিক তেমনি ভাবে যেমন ভাবে আমরা আজ করছি তোমাদের মধ্যে। এটা ভালো কি মন্দ সেটা অবশ্য আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু যদি এক দেশের সভ্যতার শিকড় অন্য দেশের মাটিতে বপন করতে হয় তাহ'লে বোধ হয় এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।"

"কিন্তু একথা সব ক্ষেত্রে খাটে কিনা সন্দেহ। ধরুন জাপানের কথা। জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু সেটা তো বাইরের চাপে নয়, নিজের ইচ্ছায়।"

"মোটেই না। বাইরের চাপে নইলে জাপান আজ কখনই জাপান হ'ত না।

* রাসেল তাঁহার একটি বইয়ে লিখেছেন (সম্ভবতঃ PROBLEM OF CHINA-য়): "The holders of power are generally evil men."

তুমি নিশ্চয়ই জানো এক সময়ে জাপান তার বন্দরে য়ুরোপীয় বাণিজ্য-জাহাজকে ঢুকতে দিতে চায় নি, তাকে বাধ্য করানো হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে জাপান এ অপমানের জ্বালায় শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বা আবেদন নিবেদন জানিয়ে সময় নষ্ট করেনি। তারা আমাদের বিজ্ঞানের কাছে হাত পাতল, আমাদের সময়পদ্ধতির অনুকরণ করল ও আমাদের ধরণধারণ ক'রে নিল আত্মসাৎ। আর এমন ক'রে সে এ-কাজটি সাধন করল যে একপুরুষের মধ্যেই তাদের দ্বীপটির ভোল ফিরে গেল।"

একটি আমেরিকান মহিলা ছিলেন, বললেন: "কিন্তু জাপানের নিষ্ঠুরতা—"

রাসেল বললেন: "কিন্তু সেটা যে জাপান আপনার-আমার কাছ থেকেই শিখতে বাধ্য হয়েছিল এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনি কি মনে করেন, আপনি কিম্বা আমি তাকে আজ শ্রদ্ধা করতাম যদি নিষ্ঠুরতায় তার বিদ্যে গুরুমারা না হত? কিন্তু সে যাই হোক, জাপান যা করেছে মানুষের ইতিহাসে তার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাবলে বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে যেতে হয় যে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে জাপানের রাজনীতিকেরা তাদের জাতিকে সামরিক প্রথায় দীক্ষিত করবার যে-বিশাল কল্পনা করেছিলেন জাপান এ-অর্ধশতাব্দীতে অক্ষরে অক্ষরে সে-অসাধ্য সাধন করেছে। মানুষের ইতিহাসে এ-কীর্তি অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব—এমন কি প্রায় অবিশ্বাস্য বললেও বোধ হয় বেশি বলা হয় না।"

নব সংযোজনা

১৯৫৩ সালে আমরা—ইন্দিরা ও আমি—বিশ্বভ্রমণে বেরই। পণ্ডিত নেহেরু ও আবুল কলাম আজাদ আমাদের ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি ক'রে পাঠান। আমরা হংকং, হনোলুলু, সানফান্সিস্কো, লস এঞ্জেল্‌স, শিকাগো, নিউয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন প্রভৃতি নানা শহরে গান গেয়ে (ইন্দিরার নৃত্যসঙ্গতেও আমি গেয়েছিলাম অনেক গান) ইংলণ্ডে পৌঁছই জুনের শেষে। আমি রাসেলকে ইন্দিরার পরিচয় দিয়ে লিখেছিলাম—আমরা তাঁর ওখানে নৃত্যগীত করতে চাই। ১. ৭. ৫৩ তারিখে রাসেল স্বহস্তে সাদর নিমন্ত্রণ করেন—অনুবাদ দিচ্ছি :

"প্রিয় দিলীপকুমার

আমার এখানে যদি তোমরা ৪ঠা বিকেলে চায়ে আসো তো খুব খুশী হব। তুমি টেলিফোন ক'রে জানাবে কি ৪ঠায় তোমরা আসতে পারবে কিনা ? তুমি যদি গাও ও তোমার কন্যাশিষ্যা নাচেন তো চমৎকার হবে। ইতি—

তোমার বার্টরাণ্ড রাসেল।"

আমরা যথাকালে হাজির হলাম। প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পরে তাঁর সঙ্গে দেখা। এর মধ্যে কত কী ঘ'টে গেছে জগতে—কত অচিন্তনীয় ওলটপালট—কিন্তু রাসেল আজ অশীতিপর বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রাণশক্তিতে তেমনি বলিষ্ঠই আছেন, বুদ্ধিতে তেমনি সজাগ, হাসিতে তেমনি প্রফুল্ল। বলা বাহুল্য তাঁর সঙ্গে আমাদের মতামতের নানা অমিল আছে। কিন্তু মতান্তরে মনান্তর হয় নি ভাবতে মন খুশী হ'য়ে উঠল—বিশেষ যখন দেখলাম তিনি তেমনি সাদরেই নিজে হাতে চা ঢেলে দিলেন। লেডী রাসেল (রাসেল এখন লর্ড পদবীতে আসীন) কেক পরিবেশন করলেন ইন্দিরাকে ও আমাকে।

আমাদের আলাপ জমেছিল ঘণ্টাখানেকের বেশি। কিন্তু আমি এ-কথালাপের হুবহু রিপোর্ট দেবার আর তেমন তাগিদ খুঁজে পাচ্ছি না মনের মধ্যে। হিরো-ওয়ার্শিপর হয়ত এখানো আছি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাছে আলো পাওয়ার পরে অন্য প্রণম্যদের প্রণাম করতে মন আজো তেমনি উৎসুক থাকলেও অন্য চিন্তানায়কদের আলোর বাণী আর তেমন কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পশে না। কিন্তু তবু একটা উপলব্ধি যেন নতুন ক'রে পেলাম : যে, হৃদয়ের অনুরাগ যখন মানস চিন্তার

সহচারী হয় তখন সে, কালাতিপাতেও নিষ্প্রভ হ'য়ে আসে না। তাই আজো রাসেল আমাকে দেখে তেমনি প্রসন্ন, আমি তাঁকে দেখে তেমনি উৎসাহিত। মনে পড়ল চেস্টারটনের একটি বিখ্যাত কবিতার চারটি চরণ :

In a time of sceptic moths and cynic rusts
And fatted lives that of their sweetness tire,
In an age of passing loves and fading lusts
It is something to be sure of a desire.*

যে-অভীপ্সা—desire—লর্ড রাসেলকে আমাদের সঙ্গে এক যোগসূত্রেবেঁধেছে তার নাম—এক নবজগতের আশা—হয়ত দুরাশা। লেডী রাসেল আমাকে দিয়েছিলেন রাসেলের একটি সদ্যোজাত প্রবন্ধ। তার শেষাংশে আছে :

"The world that I would wish to see is one where emotions are strong but not destructive and where, because they are acknowledged, they lead to no deception either of oneself or of others. Such a world would include love and friendship and the pursuit of art and knowledge. I cannot hope to satisfy those who want something more tigerish."

(ভাবার্থ : যে-জগতের প্রতিষ্ঠা আমি বরেণ্য মনে করি সে-জগতে হৃদয়বৃত্তি হবে প্রবল কিন্তু সর্বনাশী নয় ; সে-জগতে মানুষ হৃদয়াবেগকে অঙ্গীকার করার ফলে করবে না আত্মপ্রবঞ্চনা কি পরকে বঞ্চনা ; সে-জগতে মান পাবে প্রেম ও বন্ধুত্ব, জ্ঞানচর্চা ও শিল্পপ্রীতি। যাঁরা এসব সুন্দর সাধনা ছেড়ে হিংস্র আসুরিক বৃত্তিকেই বরণ করতে চান তাঁদের মন জোগাতে আমি অক্ষম।)

রাসেলকে আমি ভালোবেসেছি—প্রেম তাঁর মধ্যে সহজ ব'লে। নইলে তিনি এমন আস্তিক্যবাণী উচ্চারণ করতে পারতেন না :

"The root of the matter is a very simple and old-fashioned thing, a thing so simple that I am almost ashamed to mention it, for fear of the derisive smile with which wise cynics will greet my words. The thing I mean—please forgive me for mentioning it—is love, Christian love, or compassion. If you

* যে-যুগ বরণ করে সংশয় বিদ্রূপ অশ্রদ্ধায়,
ইন্দ্রিয়ভোগের অন্তে ছায় শুধু ক্লান্তি অবসাদ,
ক্ষণায়ু যে-যুগে প্রেম, ঘনায় অতৃপ্তি লালসায়,
সে-যুগে ধ্রুবের তৃষা দেয় দিশা, অমৃতপ্রসাদ।

feel this you have a motive for existence, a guide in action, a reason for courage, an imperative necessity for intellectual honesty." (*The impact of Science on Society—chapter 6*)

ভাবার্থ: আমি যা বলতে চাই তার সারমর্ম অতি সরল ও সেকেলে। এত সরল যে আমার বলতে লজ্জা করছে, সেই সঙ্গে ভয়ও—পাছে প্রাজ্ঞ বুদ্ধিমন্তেরা কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দেন। কথাটা এই—ক্ষমা করবেন আমি প্রসঙ্গটা তুললাম ব'লে—যে, আমি চাই আজকের মানুষ মানুষকে একটু ভালোবাসতে শিখুন, খৃষ্টানেরা যে-ভালোবাসার কথা বলেন সেই ভালোবাসা। এ-প্রেম যদি আপনাদের থাকে তাহ'লে বাঁচার একটা মানে হয়, কর্মের একটা লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায়, সাহসের স্বপক্ষে যুক্তি মেলে—সর্বোপরি, বুদ্ধির সততাকে অপরিহার্য ব'লে অঙ্গীকার করা সম্ভব হয়।

আমার সময়ে সময়ে আশ্চর্য লেগেছে ভাবতে যে, এহেন হৃদয়বান মনীষীকে অনেকে কেমন ক'রে ভুল বুঝতে পারেন, ভাবতে পারেন শুষ্ক বুদ্ধিবাদী বা নাস্তিবাদী ব্যঙ্গকুশলী? অবশ্য দুজন মানুষ কখনোই জগতকে অবিকল এক দৃষ্টি দিয়ে দেখে না, দেখতে পারে না—কিন্তু তবু রাসেলের নানা প্রোজ্জ্বল স্বপ্ন, ঝঙ্কৃত আশা, শিল্পে চিন্তনে মহত্ত্বে শ্রদ্ধা কি তাঁর নানা লেখায়ই দীপ্যমান হয়ে ওঠে নি? নাস্তিক? মানি, তিনি ভগবানের স্তবগান করেন না, কিন্তু তাঁর সত্যোজাত আত্ম-জীবনীর নানা স্থানেই তিনি ভগবৎতত্ত্ব নিয়ে সহৃদয় আলোচনা করেছেন।* তাঁর পুত্রবধূ স্থসানকে তিনি একবার বলেছিলেন (স্থসান বলেছিল ইন্দিরাকে লণ্ডনে) যে ভগবান যদি থাকেন তাহলে তিনি মানবেনই মানবেন যে, তিনি (রাসেল) ভাগবতী কথা বলেছেন এমন ঢঙে যেমন ঢঙে ভাগবত পুরুষেরা বলতে পারেন নি। ভগবানের বিরুদ্ধে রাসেলের অনেক অভিযোগকেই আমার মনে হয়েছে প্রেমের অভিযোগ। মানি, ভগবানের প্রেমকে তিনি বেদরদী বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গিয়ে ভুল বুঝেছেন (যেমন রাসেলকে ভুল বুঝেছেন তাঁর বেদরদী সমালোচকেরা) কিন্তু বিশেষ ক'রে

* যথা রাসেল তাঁর প্রিয়বন্ধু লোয়েস ডিকিন্সনকে লিখছেন: "I agree that 'faith in some form or other seems to be an almost necessary condition, if not of life, yet of the most fruitful and noble life.' ...I admit that the love of God, if there were a God, would make it possible for human beings to be better than is possible in a Godless world..." (AUTOBIOGRAPHY, VOL. I, p. 189).

তাঁর Freeman's Worship পড়লে কার মনে হয়—এ উচ্ছ্বাস নাস্তিকের অধিগম্য ? ভাগবতে একটি শ্লোকে পাই ভক্তবর অক্রূর বলছেন কৃষ্ণকে।

সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবমহেশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥ (১০.৪০.)
নানা দেবতারে নানা যোগযাগ মন্ত্রে যাহারা করে পূজন
তাদের সে অনুরাগো কারুণিক তুমি সর্বেশ করো গ্রহণ।

রবীন্দ্রনাথের অনুপম চরণটিও মনে পড়ে, "আর পাব কোথা দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" এর ভাষ্য : যেখানেই হৃদয় আত্মহারা হ'য়ে ভালোবাসে সেখানেই প্রেমের ঠাকুর সে-প্রেমের অর্ঘ গ্রহণ করেন। লক্ষ্য একই, যদিও পথ ভিন্ন। তাই আমার মনে হয় নি কোনদিনই যে, রাসেলের ব্যক্তিরূপের ঠিকমত মূল্যায়ন করা যেতে পারে শুধু তাঁর বুদ্ধি বা যুক্তির নিকষে, যেহেতু বুদ্ধি মনীষীর ব্যক্তিরূপের একটি অংশমাত্র, পূর্ণ পরিচয় নয়। রাসেল যে তাঁর শেষ জীবনে খৃষ্টান প্রেমকে বরণ করেছেন তাতেই প্রমাণ হয় যে, তাঁর অজান্তে তাঁর হৃদয় তাঁর বুদ্ধির রায়কে এড়িয়ে আত্মনিবেদন করেছে প্রেমের ঠাকুরকেই। কিন্তু হারানো খেই ধরি ফের।

* * *

ইন্দিরা কথায় কথায় বলল যে আমেরিকায় অলডাস হাক্সলির সঙ্গে আমাদের অনেক কথালাপ হয়েছিল।

রাসেল : বটে ? কেমন দেখলে তাঁকে ?

আমি : উজ্জ্বল ভাবুক মনে হয়। আপনার মত কী ?

রাসেল : ভাবুক, মানি। তবে তাঁর পথ তো ঠিক আমার পথ নয়। (সব্যঙ্গে) আমার বরাবরই মনে হ'ত—অলডাস শেষটায় রোমান ক্যাথলিকদের দলে ভর্তি হবেন। বলতে বলতে তিনি তার নিত্যসহচর পাইপ ধরালেন।

আমি : আপনি পাইপ-বিলাসী দেখে আমার খুব ভালো লাগল, কারণ আমিও পাইপ-ভক্ত।

লেডী রাসেল (হেসে) : তাহলে আপনার পাইপ ধরাচ্ছেন না কেন ?

আমি : আমাদের দেশে বলে গুরুজনের সামনে ধূমপান গর্হিত (One should not smoke before one's superiors)

রাসেল : (আচমকা মেঘগম্ভীর মুখে) : কী সর্বনাশ ! তাই'লে তো তোমার

সামনে আমার আর ধূমপান করা চলে না (ব'লেই পাইপটি নামিয়ে আমাকে অভিবাদন—সকলের কলহাস্য)

আমি (হাসি থামলে) : পীটার চক ব'লে আমার এক ইংরেজ বন্ধু আমাদের আশ্রমে গিয়ে ছিলেন কিছুদিন। তিনি আপনার প্রতিভার অনুরাগী হ'য়েও অনুযোগ করেন প্রায়ই যে, আপনি একরোখা যুক্তিবাদী ব'লেই এমন অসার কথা ঘোষণা ক'রে থাকেন যে, যুক্তির খেয়াই করে অধমতারণ।

রাসেল : শুধু যুক্তির খেয়ায় অধম কি উত্তম কারুর তারণ হ'তে পারে একথা যে বলে তাকে আর যা-ই বলা যাক না কেন, যুক্তিবাদী বলা যায় না —কেন না যুক্তিই সব আগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মানুষ স্বভাবে কী অসম্ভব অযৌক্তিক।

আমি : জানি। আর পীটারকেও আমি এই কথাই বারবার বলেছি—যদিও সে কান দেয় নি—যে, আপনি আপনার নানা লেখায়ই বলেছেন যে গড়পড়তা মানুষ চলে ঝোঁকের ঠেলায়, যুক্তির নির্দেশে নয়—আর সেই জন্যেই সে যুক্তির নিষেধে এত রুখে ওঠে, যুক্তি ঝোঁকের বাধা হ'য়ে এসে দাঁড়ায় ব'লে।

রাসেল : হয়েছে কি জানো ? আমি লক্ষ্য করেছি যে, অনেকেই আমার সম্বন্ধে আগে থেকে একটা মনগড়া ধারণা গ'ড়ে তুলে তবে আমার লেখা পড়তে বসেন। নৈলে আমি নিছক যুক্তিবাদী বা বুদ্ধিপূজারী এমন কথা কারুর মনে ঠাঁই পেতেই পারত না। কারণ আমি নিশ্চয় এমন বোকা নই যে বলব—বুদ্ধি মানুষের কর্মের প্রেরণা কি নিয়ন্তা! বুদ্ধি আমার আছে ব'লেই আমি বরাবরই ব'লে এসেছি যে, বুদ্ধির কাজ হচ্ছে—শুধু মানুষের নানা অধোমুখী ঝোঁকের রাশ টেনে ধরা, বলেছি,—বুদ্ধির যুক্তির স্বকীয় ক্ষেত্র সুচিহ্নিত। সে পারে শুধু একটি কাজ : দেখাতে যে, কোন পথে চললে কোন লক্ষ্যে পৌছনো যায়। ধরো, যদি তুমি নিউয়র্কে যেতে চাও, যুক্তি বলে—ইস্তাম্বুলের বিমানে না চ'ড়ে নিউয়র্কের বিমানে চ'ড়ে বসাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তোমার পক্ষে নিউয়র্কে যাওয়া ইস্তাম্বুলে যাওয়ার চেয়ে বেশি ভালো কি না সে বিষয়ে বুদ্ধি যুক্তি মৌনী। আরো প্রাঞ্জল ভাষায়—ধরো তোমার লক্ষ্য এই এই। বুদ্ধি তোমাকে সে লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় ব'লে দিতে পারে, কিন্তু তোমার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত সে-নির্দেশ তার এলাকার বাইরে। তবে আমি যুক্তি বা বুদ্ধিকে ভালোবাসি এই জন্যে যে, জগতে গড়পড়তাদের চিন্তা এত ঘোলাটে যে, বুদ্ধিকে মাঝি বহাল করলে ভবার্ণবে পার হওয়া একটু সহজ হয়—অন্তত মাঝদরিয়ায় ভরাডুবি ঘটে না।

লেডী রাসেল আমাকে রাসেলের যে প্রবন্ধটির রিপ্রিণ্ট দিয়েছিলেন তা থেকে আর একটু উদ্ধৃত করি :

"One critic takes me to task because I say that only evil passions prevent the realisation of a better world, and goes on triumphantly to ask : 'Are all human emotions necessarily evil ?' In the very book that leads my critic to this objection, I say that what the world needs is Christian love, or compassion. This surely is an emotion and in saying that this is what the world needs, I am not suggesting reason as a driving force. I can only suppose that this emotion, because it is neither cruel nor destructive, is not attractive to apostles of unreason."

ভাবার্থ : আমি লিখেছি যে, কেবল পাশববৃত্তিরাই এক মহত্তর সুন্দরতর জগতের আবাহনে বেসুর বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একথায় আমার এক ক্রোধন ক্রিটিক সদর্পে আমাকে ধম্‌কেছেন : 'তাহ'লে কি বলব সব আবেগ উচ্ছ্বাসই মন্দ ?' যে বইটি প'ড়ে আমার সমালোচক আমাকে তাড়া দিয়েছেন তাতেই আমি লিখেছি যে, এ-জগতে এখন সব আগে চাই খৃষ্টান প্রেম বা অনুকম্পা। প্রেম বা অনুকম্পা নিশ্চয় আবেগেরই কোঠায় পড়ে, তাই আমার সূত্রের ভাষ্য নয় যে, (আমার মতে) যুক্তি বুদ্ধিই আমাদের নিয়ন্তা। তবে আমার মনে হয় যে, প্রেম প্রীতি অনুকম্পা —এরা নিষ্ঠুর বা সর্বনাশী নয় ব'লেই এইসব যুক্তিবিরোধী পাণ্ডাদের মন টানে না।

* * *

আমি (একটু পরে) : আপনি যা বলতে চাইছেন আমি বুঝি এবং মানি। কেবল একটা কথা। এই যে চিন্তার স্বচ্ছতা বা বুদ্ধির গবেষণা এতে খতিয়ে দাঁড়ায় কী ? এর ফলে কি আপনি পেয়েছেন কোনো পরম সার্থকতার স্বাদ বা শান্তির তৃপ্তি ?

রাসেল (হেসে) : যদি আমি বলি—বুদ্ধি যুক্তি আমাকে পৌঁছে দেয় শেষ সমাধানে তাহ'লে আমাকে হ'তে হবে দারুণ অযৌক্তিক। আর শান্তির তৃপ্তি ? তা পাব কেমন ক'রে এ-জগতে যেখানে কোটি কোটি মানুষ দিনগত পাপক্ষয় করছে গভীর দুঃখদৈন্যের মধ্যে ? (একটু থেমে) কি জানো ? আমি সজোরে ব'লে এসেছি একটি কথা যার মার নেই—যে, বুদ্ধি আমাদের কাজে আসতে পারে সেই সব দুঃখকষ্ট থেকে আমাদের খানিকটা অব্যাহতি দিয়ে—যারা ঘনিয়ে আসে

ঘোলাটে চিন্তার (muddled thinking) পথে চলতে গিয়ে আত্মবঞ্চনার বিপাকে পড়লে।' কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। মানুষ অনেক কিছু চায় কিন্তু পায় না ভুল পথে চলার দরুণ। কোনটা ভুল পথ আর কোনটা ঠিক তার নির্দেশ দিতে পারে বুদ্ধি যুক্তি—দেখিয়ে দিতে পারে কোন্ পথে চললে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। আমার আপত্তি এইখানে যে, যাঁরা বলেন আমি বুদ্ধির সার্থকতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করি তাঁরা আমার মুখে এমন সব অযৌক্তিক কথা বসিয়ে দেন যা আমি কোনোদিনই বলি নি। আমি কোথাও বলি নি যে, বুদ্ধি যুক্তি কর্মের প্রেরণা হ'তে পারে, ব'লে এসেছি বরাবরই যে, কামনাবাসনা আবেগ-উচ্ছ্বাসই আমাদের কর্মের প্রবর্তনা দেয়।

(বলতে ভুলেছি, রাসেলের সঙ্গে এসব কথালাপের অনুলিপি আমি লিখতে পারতাম না যদি ইন্দিরা সহায় না হ'ত। উপরে আমি এ আলাপের রিপোর্ট দিলাম যে রিপোর্ট সাবলীল করার জন্যে ইংরাজী অনুলিপির ভাবানুবাদ দিয়েছি। মূলানুগ তর্জমা বড় আড়ষ্ট ঠেকে ব'লে।)

লেডী রাসেল আমাকে রাসেলের যে নিবন্ধটি উপহার দিয়েছিলেন তার এক জায়গায় আছে :

"There is another, more sinister, motive for liking irrationality. If men are sufficiently irrational, you may be able to induce them to serve your interests under the impression that they are serving their own. This case is very common in politics. Most political leaders acquire their position by causing large numbers of people to believe that these leaders are actuated by altruistic desires. It is well-known that such a belief is more readily accepted under the influence of excitement. I suppose that the advocates of unreason think that there is a better chance of profitably deceiving the populace if they keep it in a state of effervescence. Perhaps it is my dislike of this sort of process which leads people to say that I am unduly rational."

ভাবার্থ : মানুষ অনেক সময়ে অযৌক্তিকতার পক্ষপাতী হয় আর একটি কূট অসদভিপ্রায়ে। মানুষ যদি বেশি অযৌক্তিক হয় তাহ'লে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের অনেক কাজ হাসিল ক'রে নেওয়া যায় তাদের পটিয়ে যে, তারা যা যা করছে সবই তাদের নিজেদের স্বার্থের অনুকূল—যেমন হরদমই হ'য়ে থাকে

রাজনীতির আখড়ায়। বস্তুতঃ, বেশির ভাগ দেশনেতাই প্রতিষ্ঠা পান এই জন্যে যে, তাঁরা লোকের মনে সম্ভ্রম জাগাতে পারেন এই ধাপ্পা দিয়ে যে, তাঁরা—নেতারা—জনসাধারণের উপকার করতেই উঠে প'ড়ে দেশোদ্ধারে লেগেছেন। এ-ও সবাই জানে যে, মানুষ যখন উদ্বেজিত হয় তখন তাদের অনায়াসেই এইভাবে ঠকানো যায়। আমার মনে হয়—অযৌক্তিকতার মহাপাণ্ডারা মনে করেন যে, জনসাধারণকে ঠকিয়ে নিজের কাজ গুছানো বেশি সহজ হয় যদি তাদের মনে উত্তেজনার বিস্ফোরণকে স্থায়ী করতে পারা যায়। আমি এই শ্রেণীর দুর্নীতির বিরোধী ব'লেই হয়ত অনেকে ভেবে বসেন যে, আমি বড় বেশি যুক্তির ওকালতি ক'রে থাকি।

* * *

অতঃপর একথা সেকথা নানা খুচরো কথাবার্তার শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনার Impact of Science on Society বইটি নিউয়র্কে পেলাম। এর পরে আর কোনো বই লিখছেন কি?

রাসেল: একটা গল্পের বই লিখে ফেলেছি—হঠাৎ।

আমি (উল্লসিত): গল্পের বই! কী আশ্চর্য! জানেন—কালই আমি ভাবছিলাম আপনি একটি গল্পের বই লিখলে বেশ হয়।'

রাসেল (হেসে): তাই না কি?

ব'লে বইটিতে আমার নাম লিখে আমাকে উপহার দিলেন: নাম—**Satan in the Suburbs.**

বিদায় নেবার সময় শুধালাম: তবে কবে আপনাকে গান শোনাব ইন্দিরার নৃত্যসঙ্গতের সঙ্গে?

রাসেল: দেখি (পকেট বই খুলে) রোজই তো দেখি একটা না একটা কিছু লেগেই আছে—হয়েছে হয়েছে, এই যে—১১ই জুলাই হ'তে পারে। সেদিন কি তোমাদের সুবিধে হবে?

আমি: বেশ।

বিদায় নেবার সময় রাসেল আমাদের সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন, নিচে নামেন আর কি এমন সময় ইন্দিরা বাধা দিল: সে হবে না—আপনি কষ্ট ক'রে নিচে যাবেন এ হ'তেই পারে না।

রাসেল (করপীড়ন ক'রে হেসে): আচ্ছা।

লেডী রাসেল শুনলেন না। নিচে নেমে আমাদের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললেন: "তবে ১১ই—কথা রইল।"

আমি (খুশি): বেশ, কেবল লর্ড রাসেল তাঁর পকেট বইয়ে লিখে রাখেন যেন—দেখবেন।

লেডী রাসেল (সগৌরবে): পকেট বইয়ে লিখে রাখতে হবে না—ওঁর স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত।

গেট থেকে বেরোবার মুখে রাসেলের ছেলে জন ও পুত্রবধূ স্যুসান-এর সঙ্গে দেখা। স্যুসানের সঙ্গে আমাদের পত্র-ব্যবহার ছিল। একটি পত্র আমার NO REASON CAN EXPLAIN পাণ্ডুলিপিতে টাইপ ক'রে রেখেছি এক অবিশ্বাস্য অঘটনের সম্পর্কে।

স্যুসান আমার AMONG THE GREAT প'ড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক কিছু লিখেছিল। কিন্তু সে অন্য কথা।

স্যুসান (জনকে পেশ ক'রে): আমার স্বামী জন।

আমি (করপীড়ন ক'রে): জন! ১৯২৭ সালে তোমাকে আমি পাঁচ ছ বছরের ছেলে দেখেছিলাম। তুমি আমাকে রেড ইণ্ডিয়ান ভেবে বলেছিলে: "I will kill him."

ওরা দুজনেই হেসে উঠল।

আমি (হাসি থামলে): আমরা ১১ই ফের অভ্যুদিত হব, আমি গাইব—ইন্দিরা নাচবে।

স্যুসান (আনন্দে হাততালি দিয়ে): বা বা!

* * *

এর পরের নৃত্যগীতের আসরের রিপোর্টটিও আমি ইংরাজীতে লিখেছিলাম ইন্দিরার সহযোগিতায়। এ অনুলিপি তারই তর্জমা—যতটা সম্ভব বাংলা ইডিয়মে।

এগারোই জুলাই আমরা আমাদের এক গুজরাতী বন্ধু-ডাক্তার বিনোদ মোদিকে বললাম তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে যেতে রাসেল-নিলয়ে—হার্মোনিয়ম সহ। ঐ সঙ্গে আর একজন আমাদের সঙ্গী হ'ল—আমাদের প্রয়াগের প্রিয়বন্ধু শ্রীবিধুভূষণ মল্লিকের ছোট ছেলে জ্যোতি—কেমিকাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ বৃত্তি পেয়ে আমেরিকা হ'য়ে লণ্ডনে এসেছে। তীক্ষ্ণধী যুবক।

* * *

চারজনে মিলে যখন রাসেলের রিচমণ্ড-নিলয়ে পৌঁছলাম তখন বেলা চারটে। এবার আমাদের সঙ্গে ক'রে ওপরে নিয়ে গেল স্যুসান মহানন্দে।

রাসেলের ঘরে ঢুকে তাঁর করপীড়ন ক'রে বসতে না বসতে চা-র থালা হাতে

লেডী রাসেলের প্রবেশ। রাসেল উঠে কাছাকাছি কোনো চেয়ার নেই দেখে আমাদের বসতে ব'লে বেরিয়ে গিয়ে একটি চেয়ার হাতে ক'রে আসতেই আমি জ্যোতিকে ইশারা করলাম। সে এগিয়ে গিয়ে লর্ড রাসেলের সঙ্গে ধরাধরি ক'রে চেয়ারটি এনে লেডী রাসেলের সামনে রাখল। তিনি এগিয়ে এসে বসলেন।

আমি বিনোদ মোদির গুণগান ক'রে জ্যোতিকে পেশ ক'রে রাসেলকে বললাম: "জানেন লর্ড রাসেল, এই যুবকটি আমাদের এক প্রিয়বন্ধু শ্রীবিধুভূষণ মল্লিকের মেধাবী সন্তান। বিধুভূষণ এলাহাবাদের চীফ্ জাষ্টিস। কিন্তু জ্যোতির মনের গড়ন একেবারে আলাদা। ও চিত্রী কবি তথা কেমিকাল এঞ্জিনিয়ার: যুগপৎ শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক—বিরল যোগাযোগ।"

রাসেল (হেসে): বিরল ব'লে বিরল! লিওনার্দো দা ভিঞ্চির পরে এমন যুগ্ম প্রতিভাধর বোধ হয় এই প্রথম জন্মালো।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

আমি মনে ভাবছি কতক্ষণ গাইব—এমন সময়ে রাসেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও যথাবিধি উঠে দাঁড়ালাম সসম্ভ্রমে।

রাসেল সঘনে বললেন: 'আহা, বোসো বোসো! আমি উঠে দাঁড়ালেই যে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এ-ধরণের লৌকিকতায় মানুষ শুধু বিব্রতই হয়।

আমি (হেসে): মনে পড়ল—আপনার "চীনের সমস্যা"য় আপনি লিখেছিলেন ওরা বড় বেশি পূজো করে পূর্বপুরুষদের।

রাসেল: হ্যাঁ। পূর্বপুরুষদের বেশি পূজো-অর্চা করা কিছু নয়। কারণ একথা যদি সত্য হয় যে, জগৎ চলেছে বিকাশের দিকে তাহ'লে সিদ্ধান্ত করতেই হবে—আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে আমরা কিছুটা অন্তত এগিয়েছি।

আমি: কিন্তু আমরাও যে ভালোবাসি পূর্বপুরুষদের পূজো করতে।

রাসেল: অমন অপকর্ম কোরো না, কারণ তাহ'লে শেষে ঠেকবে গিয়ে বাঁদরদের পূজো করতে। (কলহাস্য)

লেডী রাসেল চা-র থালা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, পিছনে পিছনে রাসেলও নিষ্ক্রান্ত। ফিরে এসে লেডী রাসেল ইন্দিরাকে বললেন: "রাসেল অনেক সময় নিজে হাতে বাসনকোশন ধুয়ে মুছে তাঁকে সাহায্য করেন।"

রাসেল ফিরে এসে সুস্থির হ'য়ে পাইপ ধরাবার পর রাশিয়ায় কয়েকদিন আগে বেরিয়া-র পতন নিয়ে কথা উঠল।

ইন্দিরা: এ-সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয় লর্ড রাসেল?

রাসেল (চিন্তিত স্বরে): বলা মুস্কিল।

আমি: এবার হয়ত মালোনকভ মলোটভের দফা সারবে।

রাসেল: কে বলতে পারে? তবে একথা ঠিক যে দুজনের একজন ডুববে। (একটু থেমে) শক্তি বড় বিচিত্র বস্তু। তার জন্যে মানুষ কত সয়! এমন কি সর্বদা মৃত্যুভয়ে কাল কাটাতেও রাজী।

আমি: আপনার প্র্যাকটিস অ্যাণ্ড থিওরি অফ বল্‌শেভিস্‌ম্‌-এ আপনি ওর সর্বনাশা প্রবণতার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সে কবে!—আর সে এমন সময় যখন বহু চিন্তাশীল মানুষও মোহমুগ্ধ হয়ে বলশেভিস্‌ম্‌-এর গুণগানে মুখর হ'য়ে উঠেছিল। আপনাকে এজন্যে নমস্কার করছে আজ অনেকেই—বিশেষ ক'রে কসলার গীদ স্পেণ্ডার প্রমুখ মনীষীদের মোহভঙ্গের পরে। (এঁরা প্রত্যেকে নিজের স্বপ্নভঙ্গের কথা লিখেছিলেন THE GOD THAT FAILED গ্রন্থে)।

রাসেল (মৃদু হেসে): কিন্তু সে-সময়ে আমি বলি জন দি ব্যাপ্টিস্ট-এর মতনই অরণ্যে রোদন করেছিলাম।

চীনদের প্রসঙ্গ উঠল।

আমি: আপনি কোথায় যেন লিখেছিলেন যে, চৈনিকেরা হয়ত এক নতুন ধরণের সংস্কৃত কম্যুনিস্‌ম্‌ গ'ড়ে তুলতেও পারে।

রাসেল (এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মাথা নেড়ে): কিন্তু আমার সে-আশা পূর্ণ হয় নি। কারন আজকের দিনে চীন ও রাশিয়া—এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে—আমাকে। ধরো, ওদের দণ্ডধরদের ব্রেনওয়াশিং—কী ভয়ঙ্কর! ওরা যেন ঠিক টিয়াপাখীর মতন কপচাতে সুরু করেছে রাশিয়ার জিগির। নিদারুণ!

* * *

. এর পরে আমাদের আসর জমাবার পালা। আমি প্রথমে গাইলাম পিতৃদেবের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।" পরে তার জর্মন অনুবাদ—একই সুরে।

রাসেল (উৎফুল্ল): Very exciting (রক্তে দোলা লাগে)!

তারপর আমি গাইলাম "বন্দে মাতরম্‌"আমার স্বরচিত সুরে ইন্দিরার নৃত্যসঙ্গতে। লেডী রাসেল, সুসান ও জনের সে কী আনন্দ! হাততালি আর থামতে চায় না।

রাসেল (ইন্দিরাকে): চমৎকার! জানো, তুমি যখন এলে আমি মনে মনে তোমার বেশভূষার প্রশংসা করছিলাম। কিন্তু তোমার নাচের সময় আমি দেখছিলাম শুধু তোমার অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্য-সুষমা।

অতঃপর আমি গাইলাম পিতৃদেবের "ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী"—যে গানটি সম্বন্ধে হলিউডে অলডাস হাক্সলি মন্তব্য করেছিলেন: "কী শক্তি উচ্ছল গান!"

রাসেল (গানান্তে ইন্দিরাকে): প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

সবশেষে আমি গাইলাম ইন্দিরার "শান্ত গগনমে"—কৃষ্ণনৃত্য, যেটি "শ্রুতাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলিতে" ছাপা হয়েছে।

রাসেল (সোল্লাসে): অপূর্ব! (Exquisite!) (ইন্দিরাকে) তোমার প্রতিভঙ্গিটি এমন লাবণ্যময় যে মনে হয়—আহা, যদি প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা ক'রে (isolate) চেখে চেখে উপভোগ করা যেত!

আমি (রাসেলকে ধন্যবাদ দিয়ে): দেশে ফিরে আপনাকে আমাদের আরো কয়েকটি রেকর্ড পাঠাব।

রাসেল: ধন্যবাদ। যে-রেকর্ড কয়টি তুমি পাঠিয়েছিলে সেগুলি অতি চিত্তাকর্ষক (interesting)। জন ও সুসান তো উচ্ছ্বসিত।

আমি (বিদায় নেবার সময়ে): আপনার কাছে আমি ঋণী নানা দিক দিয়েই। তাই আপনাকে একটু আনন্দ দিতে পেরে আমার আজ এত আনন্দ। আপনার সামনে নৃত্যগীতের সুযোগ পেয়ে আমরা কৃতার্থ। কিন্তু কেমন ক'রে জানাব আমাদের কৃতজ্ঞতা?

রাসেল: সে কি? তোমাদের ধন্যবাদ দেবার কথা তো আমাদেরই যে তোমরা আমাদের এ-নাচগান শোনবার সুযোগ দিলে কতদূর থেকে এসে।

এ-মহানুভব মানুষটি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই—যিনি আজীবন সত্যের পূজারী ছিলেন, আর সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন মানুষকে ভালোবেসে তার দুঃখ দূর করতে। তাঁর ৭০০ পৃষ্ঠার অপূর্ব "আত্মজীবনী" শুধু তাঁর মহাপ্রাণের আলোকস্তম্ভ হয়েই নয়, ইংরাজী সাহিত্যেরও একটি ভাবোচ্ছল ও রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি ব'লে গণ্য হবে। তিনি নিজে চিরদিন চেয়েছিলেন—তাঁর ভাষায়ই বলি (যা লিখেছিলেন তিনি তাঁর আত্মজীবনীর অনুক্রমণিকায়):

"Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind...

"Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart...I long to alleviate the evil, but I cannot, and I too suffer.

"This has been my life. I have found it worth living, and would gladly live it again if the chance were offered me."

ভাবানুবাদ ঃ

জীবন আমার চলেছে বহিয়া অনিবার ত্রিধারায়
উচ্ছ্বাস-কলকল্লোলে সব বাধার জাঙাল দলি' ঃ
প্রেমের তৃষ্ণা, জ্ঞানজিজ্ঞাসা, মানুষের বেদনায়
অসহ গভীর সমবেদনায় পুছিয়া সমুচ্ছলি' ঃ

"কেমনে ঘুচাব তাপিতের ব্যথা কোন্ প্রাণসাধনায় ?"
প্রেমের জ্ঞানের যুগল পর্ণে করেছি সঞ্চরণ
উর্ধ্ব হ'তে সমুর্ধ্বে—কেবল, গাঢ় অনুকম্পায়
এসেছি ফিরিয়া প্রতিবারই শুনি' পৃথিবীর ক্রন্দন
হৃদয়ের প্রতি তারে, দিনে দিনে চেয়েছি হ'তে সহায়
নিঃসহায়ের, পারি নি যে তবু মুছাতে অশ্রু তার—
এ-বিফলতায় ঝরায়েছি আমি আঁখিজল নিরাশায় ঃ
তবু এ-জীবন করেছি বরণ সাদরে। যদি আবার
শুধায় নিয়তি ঃ "চাও কি লভিতে জন্ম মাটির বুকে ?"
"চাই চাই"—আমি গাহিব অমৃত-আবাহনে যুগে যুগে।

রবীন্দ্রনাথ

(জন্ম—১৮৬১, মৃত্যু—১৯৪১)

"চিরযুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি।"

"ছোটরে কখনো ছোট নাহি করো মনে,
আদর করিতে জানো অনাদৃত জনে।"

RABINDRANATH

We bow to one who serves with the voice of flame
The cause of ruthless love in fire's white surge
Burning from the nation's metal all dross and shame
Her shadowy fane toward golden passions to urge.

Dilip Kumar Roy

(On reading the Poet's reply to Noguchi on 27-10-38)

তোমারে প্রণাম করি ঃ অগ্নিমন্ত্রে তুমি যে করিলে
ব্রহ্মচারী প্রেমের তর্পণ। তব পাবক-উচ্ছ্বাসে
জাতির চরিত্র হ'তে অশুদ্ধির লজ্জারে দহিলে
সন্ধ্যা-দেবালয় তার উদ্ভাসিতে অরুণ-উল্লাসে।

উৎসর্গ

শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী

প্রিয়বরেষু,

স্বভাবে তোমার নীলিমা-নিলীন ব্যথা,
চাঁদের মঞ্জু লাজুক অবতরণ,
আছে মৃদুভাষ, নাই শুধু মুখরতা,
আছে প্রীতি, নাই উছাস-সম্ভাষণ।

স্নেহাসক্ত

দিলীপ

নববর্ষ, ১৩৫১

রবীন্দ্রনাথ :

ব্রহ্মকে ঠিক পাওয়ার কথা বলা চলে না। কেন না তিনি তো আপনাকে দিয়েই ব'সে আছেন, তাঁর তো কোনোখানে কম্‌তি নেই…

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে একথাটা বলা ঠিক চলে না—আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে। ঐখানেই অভাব আছে—সেইজন্যেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন, আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানাপ্রকারে স্বার্থের অহঙ্কারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র এমন কি বিরুদ্ধ ক'রে রেখেছি।…

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা।…আমরা যেন না বলি—'তাঁকে পাচ্ছি নে কেন', আমরা যেন বলতে পারি—'তাঁকে দিচ্ছি নে কেন?' আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

আমার যা আছে আমি সকল দিতে
পারিনি তোমারে নাথ!
আমার লাজ ভয় আমার মান অপমান সুখ দুখ ভাবনা।

দাও দাও দাও, সমস্ত ক্ষয় করো, সমস্ত খরচ ক'রো ফেলো—তা হলেই পাওয়াতে পূর্ণ হয়ে উঠবে। আমাদের যত দুঃখ যত বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পারছি নে ব'লেই; সেইটে ঘুচলেই যে তৎক্ষণাৎ দেখতে পাব, আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।

উপনিষৎ বলেছেন, ব্রহ্ম তল্লক্ষমুচ্যতে—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষ্যটি কিসের জন্যে? কিছুকে আহরণ ক'রে নিজের দিকে টানবার জন্যে নয়, নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ ক'রে তন্ময় হ'য়ে যায় তেমনি ক'রে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে হবে।

শান্তিনিকেতন—১৮ চৈত্র, ১৩১৫

শুনেছি "করুণা"-র একটা সর্ত এই যে পাত্র হবে অপাত্র। বোধ করি এই সর্ত পূরণ করেছি ব'লেই এত মহাপ্রাণ মানুষের করুণা পেয়েছি—যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। বোধ করি তাঁর সঙ্গেই আমার কথাবার্তা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অনুলিপিও রয়েছে এত যে সব এ-বইটিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমার "সাঙ্গীতিকী" বইটিতে "সুর ও কথার রফা" অধ্যায়েও তাঁর অনেক সারগর্ভ কথা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির পুনর্মুদ্রণ অনাবশ্যক। যাঁরা বিশেষ উৎসাহী তাঁদের অনুরোধ করি সেইগুলি সব আগে পড়তে। তারপরে ১৯২৫ সালে ৮ই এপ্রিল তারিখে কথা হয়েছিল কবির সঙ্গে। কবির বক্তব্য কবি স্বহস্তে সংশোধিত ক'রে দেন—অনেকস্থলে প্রায় পুনর্লিখনও বলা চলে।

* * *

সকালবেলা। কবিকে একটু শ্রান্ত দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম: "একটা প্রশ্ন করতে এত ইচ্ছে হচ্ছে—"

কবি হাসিমুখে বললেন: "করো না হে।"

বললাম: "প্রায়ই শুনি সঙ্গীতের আবেদন বিশ্বভৌম। রোলাঁর কাছে অনেক তাড়া খেয়েছি। কিন্তু তবু মন মানে না মানা। আমি বার বার দেখেছি য়ুরোপীয় সঙ্গীত আমাদের মনে যেমন কোনো গভীর রসের খোরাক জোগায় না, আমাদের সঙ্গীতও ওদের মনে তেমনি কোনো গভীর সাড়া তোলে না। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য শুনতে বড্ড ইচ্ছে।"

কবি বললেন: "সকল সৃষ্টির মধ্যেই একটি দ্বৈত আছে, তার একটা দিক হচ্ছে অন্তরের সত্য, আর একটা দিক হচ্ছে তার বাইরের বাহন। অর্থাৎ এক দিকে ভাব আর এক দিকে ভাষা। দুইয়ের মধ্যে যেমন প্রাণগত যোগ আছে তেম্নি প্রকৃতিগত ভেদও আছে। ভাষা সার্বজনীন নয় অথচ এই সত্য সার্বজনীন। এইসব জাতীয় সম্পদকে আয়ত্ত করতে গেলে তার বিশেষ জাতীয় আধারটিকে আয়ত্ত করতে হয়। কবি শেলীর কাব্যের সার্বজনীন রসটি উপভোগ করতে গেলে ইংরেজনামে একটি বিশেষ জাতির ভাষা শিখে নেওয়া চাই। সেই ভাষার সঙ্গে সেই রসের এমনি নিবিড় মিলন যে, দুইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ একেবারেই চলে না। গানের ভিতরকার রসটি সর্বজাতির, কিন্তু ভাষা, অর্থাৎ তার বাইরের ঠাটখানা, বিশেষ বিশেষ জাতির। সেই পাত্রটি যথার্থ রীতিতে ব্যবহারের অভ্যাস যদি না

থাকে তবে ভোজ ব্যর্থ হ'য়ে যায়। তাই ব'লে ভোজের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অন্যায়। য়ুরোপীয়েরা আপন সঙ্গীতের যে-প্রভূত মূল্য দেয় এবং তার দ্বারা যে সুগভীর ভাবে বিচলিত হয় সেটা আমরা দেখেছি—এই সাক্ষ্যকে শ্রদ্ধা না করা মূঢ়তা। কিন্তু একথাও মানতে হয় যে, এই সঙ্গীতের রসকোষের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই, কেননা এর ভাষা আমি জানি নে। ভাষা যারা নিজে জানে তারা অন্যের না-জানা সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়। অনেক সময়ে বুঝতে পারে না, না-জানাটাই স্বাভাবিক। ভাষা যখনি বুঝি তখনি রস ও রূপ অখণ্ড এক হ'য়ে আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। কাব্যের ও গানের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ দেশ কালের যেমন বিশেষত্ব আছে, ছবির ভাষায় তেমন নেই, কারণ ছবির উপকরণ হচ্ছে দৃশ্য পদার্থ; অন্যভাষার মতন সে ত একটা সঙ্কেত নয় বা প্রতীক নয়। গাছ শব্দটা একটা সঙ্কেত, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় শব্দটার মধ্যে নেই, কিন্তু গাছের রূপ রেখা আপন পরিচয় আপনি বহন করে। তৎসত্ত্বেও চিত্রকলার ইডিয়ম যতক্ষণ না সুপরিচিত হয় ততক্ষণ তার রসবোধে বাধা ঘটে। এই কারণেই চীন, জাপান ও ভারতের চিত্রকলার কদর বুঝতে য়ুরোপের অনেক বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু যখন বুঝেছে তখন ইডিয়ম থেকে রসকে ছাড়িয়ে নিয়ে বোঝেনি। উভয়কে এক করে তবেই বুঝেছে। তেমনি সঙ্গীতকেও বোঝবার একান্ত বাধা নেই। কিন্তু তার প্রকাশের যে-বাহ্যরীতি বিশেষ দেশে বিশেষভাবে গ'ড়ে উঠেছে, তাকে জোর ক'রে ডিঙিয়ে সঙ্গীতকে পূর্ণভাবে পাওয়া অসম্ভব। কোনো আভাসই পাওয়া যায় না তা বলিনে, কিন্তু সেই অশিক্ষিতের আভাস নির্ভরযোগ্য নয়।

"এক ভাষায় বিশেষ শব্দের যে-বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থ আছে অন্য ভাষার প্রতিশব্দে তাকে পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে আমাদের ব্যবহারের যে ছাপ লাগে, হৃদয়াবেগের যে-রঙ ধরে সেটা তো অন্য ভাষায় মেলে না। কারণ চরণকমলকে feet lotus বললে কি কিছু বলা হয়? অথচ এই শব্দটির মধ্যে ভাবের যে-সুরটি পাই সেই সুরটি যে-কোনো উপায়ে যে-কেউ পাবে, সেই আনন্দও তার তেমনি সুগম হবে। অতএব এই বাইরের জিনিষটাকে পাওয়ার অপেক্ষা করতেই হবে তাহ'লেই ভিতরের জিনিষটি ধরা দেবে। আমরা ইংরেজি সাহিত্যের রস অনেকটা পরিমাণে পাই, তার কারণ ইংরেজি শব্দের কেবলমাত্র যে অর্থ জানি তা নয়, অনেক পরিমাণে তার সুরটি, তার রঙটিও জেনেছি। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ভাষা সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলতে পারিনে। **Keats**এর **Ode to a Nightingale**এ—**fairy land forlorn**এর **perilous sea**র ঊর্ধ্বে **magic casement**এর ছবি যে-অপূর্ব-সুন্দর হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে

তাকে আমাদের ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ওর শব্দগত সঙ্গীত প্রতিশব্দে দুর্লভ ব'লেই যে এ-বাধা, তা নয়। ওদের পরীর দেশের কল্পনার সঙ্গে যেসমস্ত বিচিত্রতার অনুভাব জড়িয়ে আছে আমাদের তা নেই। কিন্তু Keatsএর কবিতার মাধুর্য আমাদের কাছে ত ব্যর্থ হয় নি। কারণ দীর্ঘকালের অভ্যাস ও সাধনায় আমরা ইংরেজি সাহিত্যের দেউড়ি পেরিয়ে গেছি। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আমাদের সেই সুদীর্ঘ সাধনা নেই—দ্বারের বাইরে আছি। তাই এটুকু বুঝেছি যে, সঙ্গীতের সৌন্দর্য বিশ্বজনের কিন্তু তার ভাষার দ্বারী বিশ্বজনের নিমক খায় না।"

আমি বললাম: "রসের বিশ্বজনীনতার কথা বললেন কিন্তু রুচিভেদ—"

কবি বললেন: "অবশ্য রুচিভেদ নিয়ে মানুষ সৃষ্টির আদিম কাল থেকেই বিবাদ ক'রে আসছে।"

আমি বললাম: "কিন্তু তাহলে কি বলতে হবে যে আর্টে absolute values সম্বন্ধে মানুষের মনের মধ্যে অনৈক্যটাই কায়েম হ'য়ে থাকবে, মতৈক্য কখনও গ'ড়ে উঠবে না?"

কবি বললেন: "উঠবে। তবে সেটার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাল। একমাত্র কালই এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচারক। সাময়িক মতামত যে প্রায়ই শিল্পের বা শিল্পীদের relative value সম্বন্ধে ভুল ক'রে বসে একথা কে না জানে?"

* * *

এর পরের আলাপ ১৯২৬ সালে ৪ঠা এপ্রিল। কবিকে এ-আলাপের অনুলিপি পাঠিয়েছিলাম। তিনি এটিও প্রায় ঢেলে সাজিয়ে ১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে ছাপতে দেন। ভূমিকায় লেখেন:

"দিলীপকুমারের একটি মস্ত গুণ আছে, তিনি শুনতে চান, এই জন্যই শোনবার জিনিষ তিনি টেনে আনতে পারেন। শুনতে চাওয়াটা অকর্মক পদার্থ নয়, সেটা সকর্মক। তার একটা নিজের শক্তি আছে, বলবার শক্তিকে সে উদ্বোধিত করে। যে মানুষ বলে তার পক্ষে সে বড় কম সুযোগ নয়। কেননা বলার দ্বারাই আপন মনের সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় হয়। দিলীপকুমার অনেক সময়ে আমাকে এই আত্মচিন্তা-আবিষ্কারের আনন্দ দিয়েছেন। যখন তাঁকে কথা শুনিয়েছি তখন বস্তুত সে-কথা আপনিই শুনেছি।...সেদিন যে কথাগুলি বলেছিলুম তাকে অনুলিখিত করা শক্ত। একে তো মনে নেই, দ্বিতীয়ত কথাগুলি যে-পরিবেষ্টনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল সেই পরিবেষ্টনটি শুদ্ধ ভাষায় তুলে দিতে যে-সময়ের দরকার তা আমার হাতে একেবারেই নেই।"

তবু এর পরিবেষ্টনটির আভাস দেওয়ার জন্যে কবির একটি কথা শুধু বলি—

মাসখানেক আগে কবি আগরতলা থেকে আমাকে এক পত্র লিখেছিলেন। তাতে এক জায়গায় ছিল :

"নিরতিশয় ক্লান্তির সময়ে এখানে নির্জন কুঞ্জবনে বসন্তের প্রথম সমাগমের রসাবেশ আমার সমস্ত দেহমনকে আবিষ্ট করেছে। উদ্যমের প্রাচুর্য যখন থাকে তখন স্বরচিত কর্তব্যের কারখানা-ঘরে নানা প্রকার কেজো সঙ্কল্পের ঢালাই-পেটাই নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে থাকি, শেষকালে রিক্ত মনটা যখন কারবার বন্ধ করতে বাধ্য হয় তখনি প্রকৃতির দ্বারে আতিথ্য নেবার সুসময় আসে। আজ সেই মোহিনীর হাতে সহজেই ধরা দিয়েছি, ঠিক সুরে বলতে পারছি, 'শিশুকাল হ'তে তোমাতে আমাতে পরাণে পরাণে লেহা।'

দেখা হ'তে কবি এ-চিঠির উল্লেখ ক'রে বললেন : "তোমাকে সেদিন যে-চিঠিখানি লিখেছিলাম সে-চিঠিটা লেখবার সময়ে আমার চিন্তার নানান্ ফাঁক দিয়ে বসন্ত-প্রকৃতির নানান্ ইসারা আমার চিত্তকে কি রকম ঘরছাড়া করবার চক্রান্ত করেছিল, সে আর কি বলব!"

আমি বললাম : "আপনার লেখার প্রতিছত্রে বোঝা যায় প্রকৃতির সঙ্গীত আপনার কতখানি প্রিয়। আপনার 'বর্ষারম্ভে' প্রবন্ধে আপনি আক্ষেপ করেছেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে নাগরিক জীবনের বিচ্ছেদ ক্রমেই গভীর হবার উপক্রম করছে। এ-আক্ষেপে আপনার চরিত্রের এই দিকটা বড় সুন্দর ফুটে উঠেছে।"

কবি বললেন : "মনের যে-দুর্গম গহনে তার আত্মবিস্মৃত বাণী ছায়াপথে বিচরণ করে, নিভৃত প্রকৃতির ডাক সেইখানে পৌঁছে তাকে উতলা ক'রে বের ক'রে আনে। এক কালে দিনের পর দিন আমার এমনি ক'রে কেটেচে। পঞ্চভূত, গল্পগুচ্ছ, চিরকুমার-সভা প্রভৃতি যখন লিখি তখন সেই রকম ধ্যানাবিষ্ট মন নিয়ে আমি নৌকাবক্ষে একান্ত একলা দীর্ঘকাল কাটিয়েচি। সকাল-বেলা আমার স্বল্পভাষী বুড়োচাকর, তার নাম ছিল ফটিক, আমার টেবিলের উপর কেবল একবাটি ডালের জুস রেখে যেত। সমস্ত দিন, সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত সেই আমার একমাত্র খাওয়া ছিল। মনটা পাকযন্ত্রের দাবি থেকে সম্পূর্ণ ছুটি নিয়ে কেবল লেখার কাজই ক'রে যেত।"

"মাঝে কিছু খেতেন না?"

"না। একেবারে সন্ধ্যা সাতটার সময়ে পতঙ্গের অনাহূত প্রবেশের উৎপাত থেকে ভোজনটাকে নিরুপদ্রব করবার জন্যে মস্ত একটা জালের মশারির মধ্যে লুচি

জাতীয় খাবারে প্রবৃত্ত হ'তাম। তখন ছিলাম নিরামিষাশী। তাই চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যখন নিরামিষ খাদ্যের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিয়ে আমার মতে অত্যুক্তি করেছিলেন আমি নিষ্কাম ভাবে তার প্রতিবাদ করতে পেরেছিলাম। কৌতুকের বিষয়টা হচ্ছে এই যে, চন্দ্রনাথবাবু তখন আমিষ খেতেন।"

"এতে আপনার শরীর খারাপ হ'ত না?"

"আমার শরীরের ওপর তখন আমার একটা আশ্চর্য জোর ছিল। মনে হ'ত শরীর নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। টাকা যে আছে সেটা প্রমাণ করবার জন্যে টাকা উড়িয়ে দেবার বুদ্ধি একে বলে। ধনীর পক্ষে দেউলে হওয়া সহজ।"

"কি রকম?"

"এই দেহটাকে আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি, কারণ বিধাতা আমাকে যে-শরীর দিয়েছিলেন সে-শরীর অত্যাচারে কাবু হ'তে জানত না ব'লেই তার বিপদ ঘট্‌ল। যে-শরীর কথায় কথায় স্ট্রাইক করে, তারি মাইনে বাড়ে, খাটুনি কমে, সে আদর পায় বেশি। প্রকৃতি এবিষয়ে কেমন জানো? অনেকটা কাবুলিওয়ালার মতন, দাবি আদায় করতে দেরি করে, কিন্তু হিসাব রাখতে ভোলে না। যখন যৌবনে দেহটাকে নানা প্রকারে উপেক্ষা করি, তার উপরে অন্যায় দায় চাপাতে থাকি, প্রকৃতি স্মিতহাস্যে তখন ধার দিয়ে যেতে থাকেন; বুঝতে দেন না একদিন দেনা বন্ধ ক'রে পাওনায় লাগবেন। অবশেষে কাবুলিওয়ালার মতো লাঠি নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে যখন দরজায় ঘা দিতে সুরু করেন তখন হঠাৎ দেখা যায় সুদটা আসলকে ছাড়িয়ে গেছে।"

আমরা হেসে উঠলাম। খানিক একথা সেকথার পর কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম:

"আচ্ছা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগের উচ্ছ্বাস-প্রবণতা কি ক'মে আসে? না বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের সরসতার সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়?"

কবি বললেন: "যাদের ভাঁড়টা কাঁচা, চুঁইয়ে চুঁইয়ে তাদের বুদ্ধিও কমে, আবেগও কমে। কিন্তু যাদের আধারে দোষ নেই তাদের আবেগের সঞ্চয়টা ক্ষয় হয় না, তবে হয়তো বয়সের সঙ্গে তার ব্যবহারটা ক'মে আসে।"

"কি রকম?"

"শিশুর প্রধান কাজ হচ্ছে বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে ধারণা সঞ্চয় করা। বিচার ক'রে অর্জন করা তার কাজ নয়। আবেগের চঞ্চলতা তার মনকে জানবার বিষয়ের উপরে আছড়ে আছড়ে ফেলতে থাকে। যে-সব জানা কেবলমাত্র বোধ-পটের ছাপ, যাকে বলে 'ইম্প্রেশন', এইরকম বেগের চোটে তাদের দেগে তার কাজ চলতে

থাকে। জীবনের অসংখ্য অত্যাবশ্যক পরিচয়ের বিষয় কেবল ইম্প্রেশনের রেখায় রেখায় চিত্তফলকে অঙ্কিত। বয়স যখন বেশি হয় তখন বুদ্ধির এই প্রাথমিক আহরণ ব্যাপার অনেকটা সাঙ্গ হ'য়ে আসে। তখনকার অভিজ্ঞতা অন্তরতর অভিজ্ঞতা। তখন প্রধানত যাচাই করবার বাছাই করবার কাজ, তখন বাইরের বোধের কাজটা গৌণ হয়, ভিতরের বুদ্ধির কাজটা মুখ্য হ'য়ে ওঠে। তখন শোষণ ক'রে পান করা নয়, চর্বণ ক'রে আহার করা।"

"সেটাতে কি কোনো ক্ষতি নেই?"

"ইম্প্রেশন গ্রহণ করবার যে সহজ সচেতন শক্তি, বিশ্লেষণী-বুদ্ধির একান্ত চর্চায় যারা সেটা হারিয়ে ফেলে তারা দুর্ভাগ্য। জীবনে যতদিন বৃদ্ধির কাজ আছে ততদিন তার মধ্যে শিশু আছে। বৃদ্ধির কাজ বন্ধ হ'লেই তখন মরণদশা আসে, শিশুর প্রকৃতিদত্ত পাথেয় তখনি নিঃশেষ হয়। যাদের চিত্তফলক শুকিয়ে কঠিন হয়েচে, বোধের ছাপ সহজে নেয় না, তারা আপন ভাবনাকে নিয়ে ইটের মত ইমারত গাঁথতে পারে, কিন্তু তাকে নিয়ে মূর্তি গড়তে পারে না।"

"কিন্তু কবির ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে তাঁরা জীবনের শেষ অবধি হৃদয়াবেগের তারুণ্য বজায় রাখতে সক্ষম হন—যে-কথা রোলাঁও বলতেন প্রায়ই।"

"ঐখানেই তো কবির সঙ্কট। স্বভাবের নিয়মে যে-বয়সে আবেগের একাধিপত্য, সে-বয়সটা কেটে গেলেও যদি তারি হাতে জীবনটাকে সম্পূর্ণ সঁপে রাখা হয় তবে সেটাতে লজ্জাও যেমন, বিপদও তেম্‌নি। বিধাতা যার প্রতি সদয় তিনি তার মধ্যে নবীনকেও বাঁচান, প্রবীণকেও সমাদর করেন। তার চিত্তক্ষেত্রে জল ও স্থল দুয়েরই ব্যবস্থা থাকে, তাজা মন নিয়ে সে ধারণা করতে পারে, পাকা মন নিয়ে তার ভাবনা।"

"কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগ উচ্ছ্বাসের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটুকুও প্রকাশ করতে আমরা উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ি কেন? অল্প বয়সে যে-সব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে এতটুকুও বাধে না, বয়সের অনুপাতে সে-সব উচ্ছ্বাস কেন আমাদের উত্তরোত্তর বিব্রতই ক'রে তুলতে থাকে, অনেক সময়ে ঠিক বুঝতে পারি না। কারণ, আমার প্রায়ই মনে হয় যে, উচ্ছ্বাস আবেগ আন্তরিক হ'লে তার প্রকাশে আমাদের সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়।"

"পরিণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিচার বুদ্ধির কাজ যখন সম্পূর্ণ আরম্ভ না হয়েছে তখন আবেগকে আমরা অসঙ্গত পরিমাণে বিশ্বাস করি। আমার ভালো লাগছে কিম্বা লাগছে না এইটেকেই আমরা যুক্তির জায়গায় বসাই। ক্রমে দেখতে পাওয়া

যায়, হৃদয়াবেগ সংসারে আমাদের অনেক ঠকান্ ঠকায়। এইজন্যে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ আপন আত্মপরিচয়ে সেইটেকে প্রাধান্য দিতে সঙ্কুচিত হয়। অন্তত সে এটা জানে যে, তার আবেগের উপলব্ধিকে কেউ যদি অবিশ্বাস করে তবে কোনো উপায় নেই। শুধু তাই নয়, যে-জিনিষটার প্রমাণ যুক্তির অধীন সেটা আমারও যেমন তোমারও তেমনি। সেখানে আমার উপলব্ধি নিয়ে তোমার উপরে জোর খাটাতে পারি—কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমার আবেগের জিনিষ আমার একান্ত ব্যক্তিগত—সেখানে ইচ্ছা করলেও আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এই জন্যেই হৃদয়াবেগেও একটি গোপনীয়তা আছে। তার নিজের রাজ্যে সে যতবড়ই হোক তার এলাকার বাইরে তাকে মুকুট পরাতে গেলে তার অপমানেরই সম্ভাবনা।"

"কাব্যে তো কবির হৃদয়াবেগ সকলের কাছে প্রকাশ্য।"

"কখনই না। যেটা প্রকাশ্য সেটা হৃদয়াবেগ না, সেটা কাব্য। সেই কাব্যটা সার্বজনীন। যে-নারী নৃত্য করছে সে আপন দেহ দিয়েই নাচছে। এই দেহটা তার ব্যক্তিগত এখানে তার লজ্জা আছে। কিন্তু নৃত্যটা সার্বজনীন, সুতরাং নৃত্যের বাহনরূপে দেহটা যখনি উপলক্ষ্য হয় তখনি দেহ প'ড়ে যায় অন্তরালে, সে হয় গৌণ।…এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা আমি বলতে চাই—সেটাকে বর্তমান সভায় উপস্থিত কোনো কোনো যুবক যদি অত্যন্ত বেশি ব্যক্তিগত ব'লে গ্রহণ করেন তাতেও আমি পিছপাও হ'ব না। হৃদয় ব'লে, রসবোধ ব'লে, প্রেমের আকাজ্ক্ষা ব'লে আমাদের একটা বালাই আছে। আমরা অবজ্ঞার ভান ক'রে সেটাকে ছাড়তে চাইলে কম্‌লি ছাড়ে না, এমন কি আরো বেশি ক'রেই জাপ্‌টে ধরে। ঐ বিধিদত্ত জিনিষটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে শুকিয়ে ফেললে তবেই কি তোমাদের দেশের সম্বন্ধে কর্তব্য-সাধনা নিরাপদ ও সুসম্পূর্ণ হবে মনে করছ? জীবনের অসম্পূর্ণতাতেই কি সাধনার সম্পূর্ণতা? তুমিও কি এখনকার সেই সমস্ত দেশাত্মবুদ্ধদলের মধ্যে যাঁরা বলেন সংসারে হৃদয়কে উপবাসী না রাখলে দেশের কাজে জোর পাওয়া যায় না?"

একটু বিব্রত হ'য়ে বললাম: "না, তা নয়, আপনি ভারি অপ্রস্তুত করেন। তবে কি জানেন? আপনিই তো একবার লিখেছিলেন যে, বিবাহ সম্বন্ধে যত কুণ্ঠা-ভয় সে কেবল অবিবাহিত তরুণের; যাদের একবার বিবাহ হয়েছে তাদের বুকের পাটা বেড়ে গেছে। সত্তর আশি বছর বয়স পর্যন্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসার করাটা তাদের কাছে সন্দেশ খাওয়ার ম'তই সহজ হয়েছে—তাতে না আছে খোলা, না আঁটি।"

"ব্যস্ত হ'য়োনা, আমি তোমাকে ব্যাপটাইজ করতে আসিনি। বিবাহ সম্বন্ধে তুমি হীদেন থাকো, পেগান থাকো, তা নিয়ে অনুযোগ করা আমার ব্যবসা নয়, আমার কেবল কৌতূহল মাত্র। কোন্‌খানে তোমাদের বাধছে? দ্বিধাটা কী নিয়ে?"

"দেখুন আমার মনে হয় যে আজকাল যুগধর্মের গুণেই বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক আমরা বিবাহে যা খুঁজি আমাদের পূর্ববর্তীগণ ঠিক সে-জিনিষটি খুঁজতেন না। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা, আদর্শ উদ্যম—এককথায় চরিত্রের সমগ্রতাটুকু সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে একটা অন্তর্দৃষ্টি আশা করি। আগেকার যুগে হয়ত মানুষ স্ত্রীর কাছে এতটা দাবি করত না, কাজে কাজেই সে-সময়ে বিবাহ করাটা ঢের সহজ ছিল। কিন্তু এখনকার দিনে আমাদের দাবিদাওয়ার উপদ্রব বেশি হ'য়ে পড়েছে ব'লে সেটা পূরণ করবার মনের মানুষ মেলাও একটু ভার হ'য়ে উঠেছে, এই আমার বলবার কথা। জানিনা কথাটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারলাম কি না?"

"আমি বুঝেছি তুমি কী বলতে চাইছ। কিন্তু শোনো বলি—তুমি স্ত্রীর কাছে যে-জিনিষটি পাওয়াকে এতবড় ক'রে দেখছ সে-বস্তুটি আসলে তত বড় নয়।"

"বড় নয়!"

"না, কেন শোনো। তুমি বলতে চাও এই যে, আমাদের চরিত্রের মধ্যে যত রকমের বিচিত্রতা আছে তার সমস্তটাই স্ত্রী যদি সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন তবেই তাঁর ভালোবাসা মূল্যবান হ'য়ে ওঠে?—ভেবে দেখ, মানুষ নীহারিকা-মণ্ডলের মতো। তার অনেকটা আছে যা তার নিজের কাছেও ঝাপসা, যা সে কাজে খাটাতে পারে না; যা স্বপ্নের বাষ্পে এলিয়ে আছে, যাকে চোখ বুজে সে মনে করে সত্য, দায়ে ঠেকলেই দেখে ব্যবহারে তার নাগাল মেলে না। আর এক অংশ আছে যেখানে আমার জীবন দানা বেঁধে গেছে—সেটা প্রাত্যহিক ব্যবহারের পক্ষে সত্য, কিন্তু আকস্মিক বিপ্লবে হঠাৎ দেখি সেটা হয়তো সত্য নয়। একটা পুরো মানুষ তো এইরকম ভাবেতে বস্তুতে, কল্পনায় ও সত্যে মিশানো, এই মানুষকে নির্মোহ নির্ভুল ভাবে যদি কোনো স্ত্রী ধারণা করতে পারে, তবে মানুষটি সত্যই খুসি হয় মনে করো? আসলে তোমার কথাটা হচ্ছে তুমি নিজেকে যে-মানুষ ব'লে বিশ্বাস করো, কোনো মেয়ে যদি তোমার সেই স্বকপোলকল্পিত সত্যকে চোখ বুজে মেনে নেয় তাহ'লেই তুমি তাকে বিবাহ করবে। এ যে তুর্কির সুলতানের চেয়েও বেশি সুলতানি হে। কিন্তু এ তো গেল এক পক্ষের কথা। পুরুষরাই কি মেয়েদের

বিয়ে করে? মেয়েরাও কি পুরুষদের বিয়ে করে না? কিন্তু মেয়েরা যে সব সময়ে আদর্শ বিচার ক'রে পুরুষদের ভালোবাসে আমি তা বিশ্বাস করিনে। কেননা আদর্শ জিনিষের বিচার হয় বুদ্ধিতে, কিন্তু ভালোবাসার যোগ্যতা বিচার বুদ্ধিতে করে না, করলে অধিকাংশ মানুষের পক্ষে বিপদ ঘটত—কারণ বুদ্ধি বড় নির্মম্।"

"তবে আপনি কী বলেন?"

"প্রেমের রহস্য মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের এক অভাবনীয় রহস্য। যে-দৃষ্টিতে মানুষ প্রেমের মিল দেখে, সে-দৃষ্টির তত্ত্ব কোনো সংজ্ঞার দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। তুমি পুরাতত্ত্ব নিয়ে থাকো ব'লেই তোমার স্ত্রীর মধ্যে পুরাতত্ত্বানুরাগের আমেজ না পেলে যে তোমার চোখে ঘোর লাগবে না, তোমার মনে নেশা জমবে না, এমন কোনো কথাই নেই। দৈবাৎ যদি তোমার স্ত্রীর পুরাতত্ত্বে সখ থাকে সেটা উপরি পাওনা। আজ তুমি মনে করছ, তোমার সঙ্গে তোমার পরিচিত কোনো স্ত্রীলোকের বিদ্যায় জ্ঞানে কর্মে রুচিতে মিলছে না ব'লেই তোমার বিবাহযোগ্য স্ত্রী জুটছে না—এটা বাজে কথা। ভিতরের দিক থেকে তুমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসোনি ব'লেই বাইরের দিক থেকে ভালোবাসার যোগ্য গুণের একটা লম্বা ফর্দ খাড়া করেছ। এখনকার কালেও রামচন্দ্র যখন সীতাকে বিয়ে করেন তখন তিনি নিজেই হরধনু ভঙ্গ করেন, সীতার কাছ থেকে হরধনু-ভঙ্গের প্রত্যাশা করেন না।"

"কিন্তু আমাদের নানামুখী চিন্তা ও কর্মের নানা দিকের বিকাশের সঙ্গে স্ত্রী যদি সহানুভূতি প্রকাশ করতে একেবারে না পারে, তাহ'লে—"

"তাহ'লেও ব্যাপারটা অত্যন্ত শোকাবহ হয় না। তা সত্ত্বেও তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসতে পারো। নিজের সঙ্গে নিজের স্ত্রীর মারাত্মক অনৈক্য নিয়ে কঠিন দুঃখ পেতে-পেতেও পুরুষ তাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছে পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্তের অন্ত নেই। মেয়ের পক্ষেও তাই। তুমি যদি বৈজ্ঞানিক হও তবে স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক বন্ধু জোটাবার ইচ্ছে হবে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রেয়সী না হ'লে যদি তোমার মন খুঁৎ খুঁৎ করে, তাহ'লে বুঝব তুমি স্ত্রীকে ভালোবাসো না। ইন্দুমতীর যে গুণে অজ মুগ্ধ ছিলেন তার মধ্যে একটা হচ্চে 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ', তার প্রধান কারণ ললিত-কলাবিধির সঙ্গে ভালোবাসার একটা নাড়ীর যোগ আছে। কিন্তু ধনুর্বিদ্যায় তা নেই, ভূতত্ত্বে নেই, নৃতত্ত্বে নেই। সেদিকে মিলন হ'লে সেটা সোনায় সোহাগা, কিন্তু তবুও সেটা সোহাগা, সোনা নয়।"

"তবে কি আপনি বলতে চান যে, স্ত্রীর কাছে গভীর সহানুভূতি পাবার আশা করাটার মানেই নেই ?"

"অনুভূতি জিনিষটা হৃদয়ের জিনিষ। ভালোবাসার ক্ষেত্রে সেটা পাবার আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় থাকে। কিন্তু ভাগ্যদোষে যদি নাও পাই তবু আমার দিক থেকে ভালোবাসার অভাব না হ'তেও পারে। কতকগুলি জিনিষ না থাকলে ভালোবাসা হ'তেই পারে না ব'লে তার যে-একটা ফর্দ টেনে দিয়েছ সেই ফর্দেই আমার আপত্তি। প্রিয়জনের কাছ থেকে প্রার্থনীয় জিনিষ যা পাব তাতে আনন্দ হবে—কিন্তু যদি নাও পাই ? এমন কি, স্ত্রী যদি ভালো ডাক্তারি করতে পারে, যদি নিখুঁৎ আইনের পরামর্শ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয় তবে দোষ কি ? তবু সেটা অত জোর ক'রে বলা চলে না। সর্বগুণবতীকে ভালোবাসা হয়ত দুঃসাধ্য। ভালোবাসা হয়ত গুণের কিছু অভাবে খুসি হয়। অভাব না থাকলে সে যে বেকার হ'য়ে পড়ে। পরস্পরের মিলের উপরেই ভালোবাসা, এও একটা বানানো কথা—তার গভীরতর ভিত্তি অমিলের উপর।"

"আর একটু খুলে বলুন।"

"দুই বিপরীত তড়িতের মেলবার ঝোঁক প্রবল, একথা জানা আছে। তার মধ্যে একটাকে বলে হাঁ-ওয়ালা, একটাকে বলে না-ওয়ালা।"

"সৃষ্টিকাণ্ডে যে-দ্বৈত আছে তার মধ্যে একদিকে গ্রহণ আর একদিকে দান। সঙ্গীতব্যাপারে সুরসমাবেশ থাকে স্থির, তার মধ্যে চঞ্চল তাল প্রবেশ ক'রে তাকে সক্রিয় ক'রে তোলে, তাকে মূর্তি দেয়, চরিত্র দেয়, সজীব করে। তেম্‌নি জৈবসৃষ্টি-কার্যে পুরুষের শক্তি অপেক্ষাকৃত গৌণভাবে স্ত্রীর সৃষ্টি-শক্তিকে সক্রিয় ক'রে তোলে।

"কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সত্তা শুধু কেবল দেহকে নিয়ে তো নয়। তাদের মনঃশরীর আছে, এই মনঃশরীরের প্রকৃতিতে সাধারণত যে-একটি প্রভেদ আছে, তার সত্তা নির্ণয় না ক'রেও তাকে বুঝতে বাধে না। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে যে প্রার্থনা করে, তার মধ্যে মনঃশরীরের এই গভীর আহ্বানটি বড় কম নয়। এখানে তাদের মধ্যে যে-মিলন হয় সে-মিলনেও সৃষ্টি-শক্তিকে জাগরূক করে। সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ধর্মতন্ত্র-গঠন, অর্থ-অর্জন, তত্ত্বান্বেষণ, জ্ঞান ও কর্মের যোগ-সাধন, ভাবকে রসকে রূপদান প্রভৃতি নানা উদ্যোগ নিয়ে মানব-সভ্যতাকে সৃষ্টি ক'রে তোলা মুখ্য ভাবে পুরুষের দ্বারা ঘটেছে। এই সৃষ্টিকার্যে মেয়েদের ব্যক্তিরূপের যে-প্রভাব সে হচ্ছে পুরুষের চিত্তকে গৌণভাবে সক্রিয় ক'রে তোলা। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা স্ত্রী-পুরুষের মনোমিলনের এই রহস্যকে স্বীকার করেছেন, তাই মেয়েদের

বলেছেন শক্তি অর্থাৎ জৈব-সৃষ্টিতে পুরুষের যে স্থান, মানস-সৃষ্টিতে সেই স্থান মেয়েদের।

"য়ুরোপের মতো দেশে যেখানে মেয়েরা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে সেখানে পুরুষদের কর্মোদ্যমের মধ্যে মেয়েদের এই প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি ব্যাপকভাবে কাজ করে। যেখানে সমাজে সেই ব্যবস্থা নেই সেখানে মেয়েদের দুই ভাগ করেচে গৃহধর্মচারিণী ও শক্তিসঞ্চারিণী। তারা পৃথক হ'য়ে আছে।

"পুরুষ নারীর কাছ থেকে কেবল যে সেবার আনন্দ চায় তা নয়, তার কাছ থেকে প্রেরণা চায়। গৃহ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-শান্তিময় সুশোভন স্থিতি, পুরুষের আরামের জন্যে তার যতই দরকার হোক, পুরুষের কর্ম-সাধনার পক্ষে এ যথেষ্ট নয়, যে-আন্দোলনে তার সমস্ত প্রকৃতিকে উদ্যত ক'রে তোলে, বিচিত্র কর্ম-চেষ্টার পৌরুষ-প্রকাশের জন্য সেটা তার অত্যাবশ্যক।"

"কিন্তু এ-প্রেরণা দেওয়াটা কি কেবল অসাধারণ নারীর পক্ষেই সম্ভব নয়?"

কবি বললেন: "না তা নয়। একথাটার আলোচনা প্রথমেই হ'য়ে গেছে। মেয়েরা যে-রহস্যময় আকর্ষণে পুরুষদের চিত্তকে টানে তাকে ইংরেজিতে বলে **charm**, বাংলায় তাকে বলা যেতে পারে হ্লাদিনী শক্তি। বস্তুত এ-নামের দ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা ক'রা হ'ল না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যেমন ধ্বনিতে গন্ধে উত্তাপে আলোতে স্পন্দনে কম্পনে বর্ণচ্ছটায় মিলিত হ'য়ে একটা অপরূপ অতি সূক্ষ্ম জাল নিরন্তর বিস্তারিত ক'রে রেখেছে, যা আমাদের দেহ মন প্রাণকে অহরহ নানারকম ক'রে শিউরে দিচ্ছে, বাজিয়ে তুলছে, জাগিয়ে রাখছে, মেয়েদের হ্লাদিনী শক্তিও তেমনি—তাকে স্থূলরকম ক'রে নির্দেশ করা সহজ নয়। অনির্দিষ্ট হ'লেও তার প্রভাব প্রবল। স্ত্রীপুরুষের এই বিভাগের ভিতর দিয়ে জীবজগতে যে-একটা প্রকাণ্ড বেগের সৃষ্টি হয়েছে, যে-সমাজ তাকে নানাপ্রকার বাধার দ্বারা ক্ষুণ্ণ করে, তার অপরিসীম প্রভাবের অধিকাংশকেই তুচ্ছতার বেড়ার মধ্যে পুষে রাখে, তারা থাকে আধমরা হ'য়ে, পুরুষের জীবন-ক্ষেত্রে তারা মজুরী ক'রে কাটায়, সৃষ্টি করতে পারে না।"

"সমাজের অবস্থা যেমনই হোক ভারতবর্ষে গ্রীসে রোমে পুরুষের কর্ম যে দুর্বল ছিল এমন কথা তো বলা যায় না।"

"আমি সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। এই সকল দেশে সমাজে ব্যাপকভাবে স্ত্রী-প্রকৃতি আপন প্রশস্ত স্থান পায়নি ব'লেই পুরুষ আপন স্বভাবের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনেই এমন একদল মেয়ের জন্যে একটি বিশেষ স্থান প্রস্তুত করেছিল যারা

নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ। খাদ্যের ভিতর দিয়ে আমাদের দেহ সহজ প্রকরণে নিজের প্রয়োজনীয় যে তাপ-পদার্থ আত্মসাৎ করে তার যদি অভাব ঘটে তাহ'লে দেহ আপনিই বিশেষভাবে কম্বল খুঁজে মরে। ঘরের স্বকীয় প্রয়োজনে প্রদীপ জেলে উনুন জেলে কাজ চলে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রাণের আনন্দ সাধনের জন্যে আকাশব্যাপী সূর্যালোকের প্রয়োজন আছে। সেটা ব্যক্তিবিশেষের শিলমোহর-করা আপন সম্পত্তি নয়; সেটা সর্বসাধারণের, এই জন্যেই প্রত্যেক ব্যক্তির। পাশ্চাত্ত্য সমাজে সাধারণ পুরুষ-প্রকৃতির বিকাশের অনুকূল সেই নারীশক্তি সর্বত্রব্যাপ্ত ভাবেই আছে, সেখানকার পুরুষকে নিত্যই উদ্যমশীল ক'রে রেখেছে। প্রাচীন সমাজে যেখানে নারীশক্তিকে সেইরকম ব্যাপকভাবে প্রচারে বাধা দিয়েছে কৃত্রিম উপায়ে তাকে পাবার ব্যবস্থা রেখেছে। এখনকার কালের পণ্যস্ত্রীদের আদর্শে তখনকার কালের মোহিনীদের বিচার করা ভুল। তারা-যে দেহতৃষ্ণা নিবারণের জন্যেই তা নয়, তারা চিত্ততৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। কাপুরুষের কাছেই স্ত্রীলোকেরা লালসার সামগ্রী, বীরের কাছে নয়। কাপুরুষ নিজের হীন প্রয়োজনেই স্ত্রীলোককে হীন ক'রে ফেলে। যেখানে সেই প্রয়োজনের দাবিই একান্ত নয়, সেখানে পুরুষের পৌরুষই নারীমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে। মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার কথা চিন্তা ক'রে দেখলেই একথা স্পষ্ট হবে। চারুদত্তের মতো শ্রদ্ধার যোগ্য গৃহস্থ পুরুষের পক্ষে বসন্তসেনার সঙ্গ যে হেয়, এমনতর বিচারের আভাস মাত্র এই নাটকে কোথাও নেই। শুধু তাই নয়; বসন্তসেনার যে-চরিত্র বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব নেই বটে, কিন্তু রমণীর দায়িত্ব আছে। তাকে অশ্রদ্ধা করবার জো নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় তখন এই রকম নারীরা সতর্কভাবে আপন সম্ভ্রম রক্ষা করবার চেষ্টা করত, নইলে তাদের যেটি আসল কাজ সেটাই ব্যর্থ হ'ত।"

"সমাজের আশ্রয় থেকে মেয়েদের একরকম বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া কি তাদের প্রতি অত্যাচার নয়?"

"পূর্বেই বলেছি, বাঁধ বেঁধে যদি নদীর ধারা বন্ধ করো, তবে জলের জন্যে জলাশয় খুঁড়তে হয়। অবরুদ্ধ স্বভাবের নিয়মই কৃত্রিম প্রণালীকে খুঁজে খুঁজে বের করা। মেয়েরা যেখানে গৃহিণী সেখানে বিশেষ গৃহেই তাদের অধিকারের সীমা, যেখানে তারা হ্লাদিনী সেখানে তারা সমস্ত বিশ্বের। যে-মেয়ের মধ্যে এই হ্লাদিনী শক্তির বিশেষ প্রতিভা আছে সে আপনার এই শক্তিকে জানে। সে যদি এই শক্তিকে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ ভাবে প্রয়োগ করবার সহজ ক্ষেত্র না পায় তাহ'লেই তার রুদ্ধ শক্তি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটায়। সমাজের গৃহবায়ুমণ্ডলকে এই বিকৃতির বাষ্প

থেকেই রক্ষা করবার জন্যেই দু-একটা জানলা একদা খোলা হয়েছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে সেটাতে সমাজকে এবং এই শ্রেণীর মেয়েকে কঠোর আঘাত থেকে বাঁচানোই হয়েচে। পুরুষের চিত্তে শক্তির প্রেরণা-সঞ্চার যে-মেয়েদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক, স্বক্ষেত্রে তারা আপন অপ্রতিহত মহিমা অনুভব করতে পারলে তবে তাদের প্রকৃতি সার্থক হ'তে পারে। প্যারিসে যে সকল নারী তাদের সার্ঁ-সভায় মনীষী পুরুষমণ্ডলীকে নিজের মোহিনী-শক্তির দ্বারা টেনে নিয়ে তাদের চিত্তকে আন্দোলিত ক'রে আলাপ-আলোচনার তরঙ্গ তুলতেন তাঁরা এই জাতের। তাঁরা অনেকে বিবাহিতা হ'লেও গৃহধর্মের গণ্ডীকে স্বভাবতই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সূর্যের আলো সহজেই যেমন গাছের মজ্জায় মজ্জায় প্রাণ সঞ্চার করে, তেমনি ক'রেই তারা তাঁদের সমকালবর্তী গুণীদের মনের ভিতর নারী-লাবণ্যের কিরণ বিকীর্ণ ক'রে তাঁদের মধ্যে সফলতা সঞ্চার করতেন। নারী-প্রকৃতি থেকে প্রবাহিত এই জীবনীধারার জন্যে পুরুষচিত্ত আপন সার্থকতার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করে একথা আমরা সব সময়ে জানিনা,—এরই অভাবে যে আমাদের কৃতিত্বের কৃশতা ঘটে সে-সম্বন্ধেও সব সময়ে আমরা সচেতন নই। কিন্তু একথা আমরা ধ'রে নিতেই পারি যে, পুরুষচিত্তের সম্পূর্ণতার জন্যেই নারীশক্তির প্রভাব নিতান্তই চাই। এমন কি আধ্যাত্মিক সাধনাতেও। বুদ্ধদেবের শুষ্ক তপশ্যার অন্তে সুজাতার যে-সুন্দর সেবাটুকু এসেছিল, এর মধ্যে সেই অর্থটি আছে; যিশু খৃষ্টের প্রকৃতি আপন তৃপ্তির পূর্ণতার জন্যেই মেরি মার্থার ভক্তি নিবেদনের বিশেষ অপেক্ষা করেছে। যুদ্ধে পুরুষ প্রাণ দেয়, তার পিছনেও মেয়েদের প্রেরণাবাণী থাকে, রাজপুতদের ইতিহাসে তা দেখা যায়, মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের বিবরণেও তা পাই। পুরুষ এই শক্তির প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে যখন সমাজধারায় বঞ্চিত হয় তখনি ধর্মতন্ত্রের ছদ্মপথ দিয়ে তৃপ্তির উপায় খোঁজে এবং সেই সব কৃত্রিম উপায়ে তার পৌরুষকে পুষ্ট করে না, বিকৃত করে, আমরা তার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখতে পাই।"

একটু থেমে: "প্রেয়সীর কাছে থেকে বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের সহযোগিতা দাবি করাটাই সব চেয়ে বড় ক'রে তুলো না—বিবাহ রাত্রিটা নাইট স্কুলে Extension lectureএর প্রথম প্রতিষ্ঠার উৎসব নয়। নারীর কাছ থেকে যদি তার প্রেমের আত্মনিবেদন পাও তাহ'লে সেটা তোমার পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ। তার কারণ এ নয় যে, তাতে তোমার হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন হয়, তার কারণ এই যে তাতে তোমার বুদ্ধিতে, তোমার কর্মশক্তিতে তোমার প্রকৃতির সকল অংশেই পূর্ণতা সাধন হয়।"

আমি বললাম: "যখন কথা আপনি তুললেনই তখন এ বিষয়ে আমার মনে যে দু-একটা প্রশ্ন প্রায়ই জাগে সেগুলো আপনার কাছে একটু খোলাখুলি ভাবেই বলি।

"এই-যে স্ত্রীর ভালোবাসা বলছেন, সেটা বিবাহের পর প্রায়ই নষ্ট হ'য়ে যায় না?—বিশেষত আমাদের দেশের বিবাহে পুরুষ যেখানে স্ত্রীর ভালোবাসা পাবার চাইতে তাকে নিশ্চিন্ত ভাবে তাঁবে রাখবার গৌরবটাই বেশি কাম্য মনে করে? আমি তো আমার আত্মীয় বন্ধুর ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিবাহেরই যে-শুষ্ক পরিণাম লক্ষ্য করেছি তাতে আমার মনে হয়েছে বিবাহের মধ্যে যে-স্বত্বাধিকারীর ভাবটা গ্রথিত আছে সেটা সত্যিকার ভালোবাসার মস্ত অন্তরায় না হ'য়েই পারে না। যাঁদের আমরা স্বামী হিসাবে সচারাচর উদারপন্থী ব'লে প্রশংসা ক'রে থাকি তাঁদের মধ্যেও এই ভাবটা যে কী দৃঢ়মূল সে সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেব।

"আমার এমনি একটা বন্ধু একদিন তাঁর স্ত্রীকে আমার সামনেই বলেছিলেন: 'তুমি অমুক জায়গায় যাবে ব'লে আজ যে বেরিয়েছিলে সেখানে গিয়েছিলে কি? স্ত্রী বললেন যে, সেখানে তাঁর যাওয়া হয়নি, অন্য এক জায়গায় আগে যাওয়ার দরুণ। তাতে স্বামী বললেন: 'কিন্তু এ দ্বিতীয় জায়গায় যাওয়ার জন্যে তোমার আমার কাছে অনুমতি নিয়ে বেরুনো উচিত ছিল।'

"এখন দেখুন, একথাটায় অধিকাংশ পুরুষই হয়ত সায় দেবেন যে স্ত্রীর কাছে এই অনুমতি চাওয়ার দাবি স্বামীর পক্ষে খুবই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তিনি স্ত্রীকে এই এই যে মৃদু খোঁচাটি দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, 'স্ত্রীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চিরকালই স্বামীর দয়ার দান মাত্র, জন্মস্বত্ব নয়'— বিবাহের মধ্যে এই মনোভাবটি আমাকে বড় আঘাত করে। জানি না বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের এই দাবিদাওয়াকেও আপনি অকিঞ্চিৎকর মনে করবেন কি না।"

কবি বললেন: "স্ত্রীর প্রতি আপন কর্তৃত্ব-গৌরব সপ্রমাণ করবার সুখটাকে পুরুষ যে আপন প্রাপ্য ব'লে মনে করে এটা কেবল আমাদের দেশে নয়, কমবেশি সব দেশেই। শরীর-তত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বঘটিত যে-কোনো কারণেই হোক স্ত্রীলোককে জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্যে পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই কারণটাকে অবলম্বন ক'রে পুরুষ যথেচ্ছ তার দাম আদায় ক'রে নিতে চায়। পেটের দায়ে যে-পুরুষ অন্য পুরুষের মুখ তাকাতে বাধ্য তাকেও সেই নির্ভরের পরিমাণে আপন স্বাতন্ত্র্য বিকিয়ে দিতে হয়—এমন কি তার চেয়েও অনেক বেশি। এই নিয়েই তো য়ুরোপে আজকাল ধনিকে-শ্রমিকে হাতাহাতি চলছে। এবং সেই একই

লড়াই আজকের দিনে সেখানে মেয়ে-পুরুষে। অন্নের দিক থেকে মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যা পায়, মানস ক্ষুধার দিক থেকে তারা যে পুরুষকে তার চেয়ে অনেক বেশি জুগিয়ে থাকে এই সূক্ষ্ম কথাটি বোঝবার শক্তি অল্প লোকেরই আছে, কেন না এটা চোখে দেখবার জিনিস নয়। প্রভুত্ব নিয়ে মানুষ বড়াই করে কেন না প্রভুত্ব বর্বতার অঙ্গ: প্রভাব নিয়ে বড়াই করে না, সেটা গায়ের জোরের উপরের কথা।"

আমি বললাম: "কিন্তু তাহ'লে কি বলা চলে না, যে, আমাদের দেশেই হোক বা অন্য দেশেই হোক সকল ক্ষেত্রেই নারীকে একান্তভাবে পাওয়াটা প্রেমের মস্ত অন্তরায় হ'তে বাধ্য ?"

কবি বললেন: "বাইরের দিক থেকে পাওয়ার একটা বিপদ নিশ্চয় আছে, তা গভীরতর পাওয়াকে অনেক সময় ম্লান করে। ইংরেজ ভারতবর্ষকে হস্তগত করেছে ব'লেই সেই বাহ্য শক্তির অহঙ্কারে ভারতবর্ষকে সর্বতোভাবে জানা তার পক্ষে এত দুরূহ। নিজের অধিকারের দলিলে প্রমাণিত স্বত্বগুলির ফর্দ ধ'রে যে-পুরুষ স্ত্রীর মূল্য যাচাই করে তার মধ্যে মানব-ইতিহাসের আদিম যুগের স্থূল বর্বরতাই প্রবল হ'য়ে আছে, সেই মানব মানস-পৃথিবীর আফ্রিকাবাসী। কিন্তু, তাই ব'লে বাইরের পাওয়াটাকে বাদ দিয়ে চলাই স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের পরিপূর্ণতা, এ-কথাটা মিথ্যে। আধ্যাত্মিক মানুষ আধিভৌতিক মানুষের উপরের জিনিষ ব'লেই যে সে আধিভৌতিকের বাইরে তা নয়। আধিভৌতিককে যখনি সে আপন অঙ্গীকৃত ক'রে নেয় তখনি সে আপন সম্পূর্ণতা পায়। দেহহীন প্রেতের অবস্থা যে আত্মাহীন দেহের চেয়ে ভালো তা আমি মনে করি না। শেষোক্ত পদার্থটা দিনের বেলায় উৎপাত করে তাকে ঠেকানো যায়, প্রথমোক্তটার উপদ্রব অন্ধকার রাত্রে। তাকে দাবিয়ে রাখবার জন্যে মানুষ কত শাস্ত্র থেকে কত মন্ত্র পাড়ে তার ঠিক নেই, কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না। সেই জন্যেই মানুষের যথার্থ সাধনা হচ্ছে শব্দকে ত্যাগ ক'রে অর্থকে শূন্যে খুঁজে বেড়ানো নয়, শব্দের মধ্যেই অর্থকে পাওয়া। বিবাহে তার সাধনা হচ্ছে, স্ত্রীকে মন্ত্র প'ড়ে পেয়েছি ব'লেই তাকে স্থূল বস্তুর মতো পেয়েছি এমন কথা মনে করার অপরিসীম মূঢ়তা ঘুচিয়ে দেওয়া, এই কথা অন্তরের সঙ্গে জানা যে, মানুষকে দখল না করলেই তবেই তাকে লাভ করা সম্ভব হয়। পরকীয়া-সাধনের তত্ত্বটা মিথ্যা নয়,—তার মানেই হচ্ছে পরকীয়া নারী আমার বাধ্য নয় ব'লেই আমার 'পরে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য। এইজন্যে বিবাহ যখন বর্বরযুগের স্থূল শাসনের থেকে মুক্তি পাবে তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া সাধন প্রচলিত হবে, তখন স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আছে ব'লেই তার

মূল্য পুরুষের কাছে বেশি হবে। বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এই পরকীয়া-সাধনার যুগ এসেছে ব'লেই আশা করি। যদি এসে থাকে তবে মূঢ়তা ক'রে আমরা যেন সেই সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।"

কবির সঙ্গে আরো কয়েকটি আলাপের অনুলিপি প্রকাশ করেছি নানা পত্রিকায়, সেগুলি বাদ দিয়ে এর পরের আলাপাধ্যায়ে আসা যাক।

স্থান—বোলপুর। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৬ সালের সকাল বেলা। কবি-সুরকার অতুলপ্রসাদ সেন ও দিলীপকুমার রায়ের শিমুলতলা থেকে সটাং বোলপুরে অভ্যুদয়।

সকালবেলা কবির ওখানে পৌঁছতেই অতুলদা খুশী হ'য়ে কবিকে বললেন: "আপনার চেহারা তো খুব ফিরেছে দেখছি।"

কবি সত্রাসে বললেন: "চুপ চুপ। কালই এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব হয়েছে—তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী সভায় আমাকে সভাপতি করতে তিনি কোমর বেঁধে মরীয়া হ'য়ে এসেছেন। তাঁকে বহুকষ্টে বিশ্বাস করিয়েছি যে আমি মরণাপন্ন। আচম্‌কা আমি ভালো আছি জানলে তিনি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হ'য়ে উঠবেন, যাবেন আমাকে টেনে নিয়ে, তখন তাঁর স্ত্রীর জন্যে প্রকাশ্য সভায় চোখের জল না ফেলে আমার কি আর উপায় থাকবে?"

আমরা খুব হেসে উঠলাম।

অতুলদা হেসে বললেন: "তাঁকে বিশ্বাস করালেন কী ক'রে?"

কবি সকৌতুকে বললেন: "জানা চাই হে, জানা চাই। আটঘাট বেঁধেছি কি কম? পাছে ফ'স্কে যায় এই ভয়ে তাঁকে ঘটা ক'রে বুঝিয়েছি যে এরূপ ক্ষেত্রে যিনি পতি তাঁরই সভাপতি হওয়া কর্তব্য।"

এর পরে বসল গানের আসর। কবি শ্রীমতী রমা মজুমদারের সঙ্গে গাইলেন তাঁর "তোমার বীণা আমার মনোমাঝে" গানটি। অতুলদা গাইলেন তাঁর "আমারে এ আঁধারে এমন ক'রে চালায় কে গো? আমি দেখতে নারি ধরতে নারি বুঝতে নারি কিছুই যে গো?"

তারপরে যে-সব আলোচনা হয়েছিল তার অনুলিপি কবি প্রায় সবটাই ঢেলে সাজিয়েছেন, অবশ্য আমার বক্তব্যকে বাঁচিয়ে।

এখানে সেই অনুলিপিই দিচ্ছি।

* * *

কবি বললেন : "যে আদর্শ ধ'রে আমি গান তৈরী করি সে সম্বন্ধে আর একটু বলি আজ তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে।

"হিন্দুস্থানী গানের রীতি যখন রাজা বাদশাদের উৎসাহের জোরে সমস্ত উত্তর ভারতে একচ্ছত্র হ'য়ে বসল তখনো বাঙালির মনকে বাঙালির কণ্ঠকে সম্পূর্ণ দখল করতে পারেনি।

"বাংলায় রাধাকৃষ্ণের লীলাগান দিলে হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে ঠেকিয়ে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তন-গান হ'য়ে উঠল পালাগান।

"স্বভাবতই পালাগানের রূপটি নাট্যরূপ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নাট্যরূপের জায়গা নেই। উপমা যদি দেওয়া চলে তাহ'লে বলতে হবে ঐ সঙ্গীতে আছে এক একটি রত্নের কৌটা। ওস্তাদ জহুরি ঘটা ক'রে প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে তার ঢাকা খোলে। আলোর ছটায় ছটায় তান লাগিয়ে দিকে দিকে তাকে ঘুরিয়ে দেখায়। সমজদার তার জাত মিলিয়ে দেখে, তার দাম যাচাই করে। ব'লে দিতে পারে এটা হীরে না নীলা, চুনি না পান্না।

"কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলায়। যে-জন রসিক সে প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয় কণ্ঠে স্বতন্ত্র ক'রে দেখতে পায় না, দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ ক'রে সে-সমগ্র রূপটি নানা ভাবে হিল্লোলিত, সেইটিই তার দেখবার বিষয়। কিন্তু এটা হিন্দুস্থানী কায়দা নয়।

"মনে পড়ছে আমার তখন অল্প বয়স। সঙ্গীত-সমাজে নাট্য-অভিনয়। ইন্দ্র চন্দ্র দেবতারা নাটকের পাত্র। উদ্যোগকর্তা অভিনেতারা ধনী ঘরের। সুতরাং দেবতাদের গায়ে গহনা না ছিল অল্প, না ছিল ঝুটো না ছিল কম দামের। সেদিন প্রধান দর্শক রাজোপাধিধারী পশ্চিম প্রদেশের এক ধনী। তাঁকে নাটকের বিষয় বোঝাবার ভার আমার উপরে; আমি পাশে বসে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, সেখানে বসানো উচিত ছিল হ্যামিলটনের দোকানের বেচনদারকে। মহারাজের একাগ্র কৌতূহল গয়নাগুলির উপরে। অথচ অলঙ্কার-শাস্ত্রে সামান্য যে-পরিমাণ দখল আমার, সে বাক্যালঙ্কারের, রত্নালঙ্কারে আমি আনাড়ি।

"সেদিন অভিনয় না হয়ে যদি কীর্তন হ'ত তাহ'লেও এই পশ্চিমে মহারাজা গানের চেয়ে রাগিণীকে বেশি ক'রে লক্ষ্য করতেন, সমগ্র কলা-সৃষ্টির সহজ সৌন্দর্যের চেয়ে স্বর-প্রয়োগের দুরূহ ও শাস্ত্রসম্মত কারু-সম্পদের মূল্য বিচার করতেন, সে আসরেও আমাকে বোকার মতো ব'সে থাকতে হ'ত।

"মোট কথা হচ্ছে, কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সঙ্গীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্মিলিত। জীবনের লীলা নদীর স্রোতের মতো নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে বিচিত্র। ডোবা বা পুকুরের মতো একটি ঘের-দেওয়া পাড় দিয়ে বাঁধা নয়। কীর্তন চেয়েছিল এই বিচিত্র বাঁকা ধারার পরিবর্ত্যমান ক্রমিকতাকে কথায় ও সুরে মিলিয়ে প্রকাশ করতে।

"কীর্তনের আরো একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের প্রাবল্যে ধর্ম-সাধনায় বা ধর্ম-রসভোগে একটা ডিমক্রাসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে-প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হ'ল। এটা বাংলা দেশের ভূমি প্রকৃতির মতোই। এই ভূমিতে পূর্ববাহিনী দক্ষিণবাহিনী বহু নদী এক সমুদ্রের উদ্দেশ্যে পরস্পর মিলে গিয়ে বৃহৎ বিচিত্র একটি কলধ্বনিত জলধারার জাল তৈরী ক'রে দিয়েছে।

"হিন্দুস্থানে তুলসীদাসের রামায়ণ সুর ক'রে পড়া হয়। তাকে সঙ্গীতের পদবী দেওয়া যায় না। সে যেন আখ্যান-আসবাবের উপরিতলে সুরের পাৎলা পালিশ। রসের রাসায়নিক মতে সেটা যৌগিক পদার্থ নয়, সেটা যোজিত পদার্থ। কীর্তনে তা বলবার জো নেই। কথা তাতে যতই থাক। কীর্তন তবুও সঙ্গীত। অথচ কথাকে মাথা নিচু করতে হয়নি! বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের পদকে কাব্য হিসেবে তুচ্ছ বলবে কে?

"কীর্তনে বাঙালির গানে সঙ্গীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালির অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু শ্রীধর কথকের টপ্পা গানে, হরু ঠাকুর রাম বসুর কবির গানে সঙ্গীতের সেই যুগল মিলনের ধারা।"

বললাম: "এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। জীবনে দাম্পত্য-মিলনের সুখশান্তি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও গানের ক্ষেত্রে দাম্পত্য বলতে কী বোঝায় সেটা আমি বুঝি ব'লেই আমার বিশ্বাস। কেবল, আপনি যেমন কথাকে ছাড়িয়ে যাওয়াটা সুরের পক্ষে অপরাধ ব'লে মনে করেন আমিও তেমনি বলি কথার চাপে সুরের শ্বাসকষ্ট হওয়াটা দোষের—এইমাত্র। তাই আমার মনে হয়, আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ ঘটে প্রধানত, কোথায় সীমা নির্দেশ করবেন তাই নিয়ে, মূলনীতি নিয়ে নয়। আমার মনে হয়, আপনি গানে সুরের যতটা দাবি মানতে রাজি আমি সুরকে তার চেয়ে বড় স্থান দিয়ে থাকি।

গানে আমি সুরের আরো ঐশ্বর্য চাই, এটা শুধু আমার তর্কের খাতিরে বলা নয়—এ নিয়ে আমি সত্যই, যাকে এক্স্পেরিমেণ্ট বলে, তা করতে করতে নিত্য নতুন আলো পাচ্ছি। কাজেই আমার এই অনুভূতিকে কেমন ক'রে অস্বীকার করি?"

কবি বললেন: "তোমার এই তর্কে দুটো ভাগ দেখছি, একটা মূলনীতি, আরেকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। মূলনীতি জিনিষটা নির্ব্যক্তিক, সেটা হ'ল আর্টের গোড়াকার কথা। নানা উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্যেই কলারচনার পূর্ণতা, এই অত্যন্ত সাদা কথাটা তুমিই মানো আর আমি মানিনে এমন যদি হয় তবে শুধু সঙ্গীত কেন কাব্য সম্বন্ধেও কথা ক'বার অধিকার আমাকে হারাতে হয়। বাক্য এবং ছন্দ, কবিতার এই দুই অঙ্গ। বাক্য যদি ছন্দের বন্ধন ছাড়িয়ে অর্থের অহঙ্কারে কড়াগলায় হাঁকডাক করে, কাব্যে সেটাও যেমন রূঢ়তা তেমনি ছন্দের অতি প্রচুর ঝঙ্কার অর্থসমেত বাক্যকে ধ্বনি চাপা দিয়ে মারলে সেটাও একটা পাপের মধ্যে। গানে সেই মূলতত্ত্বটা আমি অর্ধেক মানি অর্ধেক মানিনে, এত বড়ো দৃঢ়তা প্রমাণ হলে রসিক-সমাজে আমার জাত যাবে। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে জাতে ঠেলবার যোগ্য ব'লে মনে করো না?

"তাহ'লেই দাঁড়াচ্ছে ব্যক্তিগত বিচারের কথা। অর্থাৎ নালিশটা এই যে, আমার রচিত অধিকাংশ গানেই আমি সুরকে খর্ব ক'রে কথার প্রকাশ ক'রে থাকি তুমি তা করো না। অর্থাৎ সর্বজনসম্মত মূলনীতি প্রয়োগ করবার বেলায় অন্তত আমার সঙ্গীতে আমার ওজন-জ্ঞান থাকে না।

"এখানে মূলনীতির আইনের বই খুলে তুমি আমাকে আসামীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছ। ফশ ক'রে আমি যে 'প্লীড্ গিলটি' করব নিশ্চয়ই তুমি ততটা আশা করো না। এই জাতের তর্ক অনেক সময়েই কথা-কাটাকাটি থেকে মাথা-ফাটাফাটিতে গিয়ে পৌছায়। সুতরাং তর্কের চেষ্টা না করাই নিরাপদ। তবু বিনা তর্কে আমার পক্ষে যতটা কথা বলা চলে তাই আমি বলব।"

"য়ুরোপীয় সাহিত্যে এক শ্রেণীর কবিতাকে 'লিরিক' নাম দেওয়া হয়েছে। তার থেকেই বোঝা যায়, সেগুলি গান গাবার যোগ্য। এমন-কি, কোনো এক সময়ে গাওয়া হ'ত। মাঝখানে ছাপাখানা এসে শ্রাব্য কবিতাকে পাঠ্য করেছে। বর্তমানে গীতি-কাব্যের গীতি অংশটা হয়েছে উহ্য। কিন্তু উহ্য বলেই যে সে পরলোকগত তা নয়। যা শ্রোতার কানে ছিল এখন তা আছে পাঠকের মনে। তাই এখনকার গীতিকাব্যে অশ্রুত সুর আর পঠিত কথা দুইয়ে মিলে আসর জমায়।

"এইজন্যে স্বভাবতই গীতিকাব্যে চিন্তাযোগ্য বিষয়ের ভিড় কম, আর তাতে তত্ত্বের ছাপ-ওয়ালা কথা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হয়। চণ্ডীদাসের গান আছে—

কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

"এর শ্রুত বা পঠিত কথাগুলি কঠিন ও উঁচু হয়ে উঠে অশ্রুত সুরকে হোঁচট খাইয়ে মারছে না। ঐ কবিতাটিকে এমন ক'রে লেখা যেতে পারে :

শ্যাম নাম রূপ নিল শব্দের ধ্বনিতে।
বাহেন্দ্রিয় ভেদ করি' অন্তর-ইন্দ্রিয়ে (মরি)
স্মৃতির বেদনা হ'য়ে লাগিল রণিতে।

"এর তত্ত্বটা মন্দ না। শ্যাম নামটি অরূপ। ধ্বনিতে সেটা রূপ নিল। তারপরে অন্তরে প্রবেশ ক'রে স্মৃতি-বেদনায় পুনশ্চ অরূপ হ'য়ে রণিত হ'তে লাগল। ব'সে ব'সে ভাবা যেতে পারে। মনস্তত্ত্বের ক্লাসে ব্যাখ্যা করাও চলে, কিন্তু কোনো মতেই মনে মনেও গাওয়া যেতে পারে না। যাঁরা সারবান্ সাহিত্যের পক্ষপাতী তাঁরা এটাকে যতই পছন্দ করুন না কেন, গীতি-কাব্যের সভায় এর উপযুক্ত মজবুত আসন পাওয়া যাবে না। এখানে বাক্য এবং তত্ত্ব দুই পালোয়ানে মিলে গীতকে একেবারে হটিয়ে দিয়েছে।

"নিজের রচনা সম্বন্ধে নিজে বিচারক হওয়া বেদস্তুর, কিন্তু দায়ে পড়লে তার ওকালতি করা চলে। সেই অধিকার দাবি ক'রে আমি বলছি, আমার গানের কবিতাগুলিতে বাক্যের আসুরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি, অর্থাৎ সেইসব ভাব সেইসব কথা ব্যবহার করেছি সুরের সঙ্গে যারা সমান ভাবে আসন ভাগ ক'রে বসবার জন্যেই প্রতীক্ষা করে। এর থেকে বুঝতে পারবে তোমার মূলনীতিকে আমি সুরের দিকেও মানি, কথার দিকেও মানি।

"তবু তুমি বলতে পার, নীতিতে যেটাকে সম্পূর্ণ পরিমাণে মানি রীতিতে সেটাকে আমি যথেষ্ট পরিমাণে মানিনে। অর্থাৎ আমার গানের কবিতাতে কথার খেলাকে যতই কম করি না কেন, তবু তোমার মতে মূল নীতি অনুসারে তাতে আরো যতটা বেশি সুরের খেলা দেওয়া উচিত তা আমি দিইনে। কথাটা ব্যক্তিগত হ'য়ে উঠল। তুমি বলবে তুমি অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করেছ, আমিও তোমার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই একই কথা বলব।"

বললাম : "কাব্যে গানে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বাদ দিয়ে চলবার জো নেই।

কেননা অনুভূতিতেই তার সুরু এবং সারা। বুদ্ধিকে নিয়ে তার কারবার নয়, তার কারবার বোধকে নিয়ে। তাই, আমার ব্যক্তিগত বোধেরই দোহাই দিয়ে আমাকে বলতে হবে যে, মনোজ্ঞ কাব্যকে সুরের সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যে-রকম নিবিড় ভাবে পাওয়া যায়, সুরের একান্ত সরলতার মধ্য দিয়ে সে ভাবে পাওয়া যায় না। কারণ ললিত-কলায় একান্ত সারল্য কি অনেকটা রিক্ততারই সামিল নয়?"

কবি বললেন: "ঐ 'একান্ত' বিশেষণ পদের বাটখারাটা যখনি বেমালুম তুমি দাঁড়িপাল্লায় কেবল এক দিকেই চাপালে তখনি তোমার এক-ঝোঁকা বিচারের চেহারাটা ধরা পড়ল। সুরের সারল্য একান্ত হ'লেও যত বড়ো দোষ, সুরের বাহুল্য একান্ত হ'লেও দোষটা তত বড়োই। 'একান্ত' বিশেষণের যোগে যে-কথাটা বলছ ভাষান্তরে সেটা দাঁড়ায় এই যে, সুরের দূষণীয় সরলতা দোষের, যেন সুরের দূষণীয় বাহুল্য দোষের নয়। অর্থাৎ বাহুল্যের দিকে দোষটা তোমার সহ্য হয়, সারল্যের দিকের দোষটা তোমার কাছে অসহ্য। তোমার মতে 'অধিকন্তু ন দোষায়'। 'সর্বমত্যন্তং গর্হিতং' এটাতে তোমার মন সায় দেয় না।

"কিন্তু পরস্পরের ব্যক্তিগত মেজাজ নিয়ে তর্ক ক'রে কী হবে? জবার মালা মাথায় জড়িয়ে শাক্ত যদি সরস্বতীর শ্বেতপদ্মের দিকে কটাক্ষ ক'রে বলে, 'তুমি নেহাৎ শাদা, যাকে বলে রিক্ত', তাহ'লে সরস্বতীর চেলাও জবাকে বলবে, 'তুমি নেহাৎ রাঙা, যাকে বলে উগ্র'। এতে কেবল কথার ঝাঁজ বেড়ে ওঠে, তর্কের মীমাংসা হয় না। আমি তাই তর্কের দিকে না গিয়ে সারল্য সম্বন্ধে আমার মনোভাবটা বলি।

"অনেক দিন আছি শান্তিনিকেতনে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যে অরণ্য গিরি নদীর আয়োজন নেই। যদি থাকত সেটাকে উপযুক্তভাবে ভোগ করা কঠিন হ'ত না। কারণ, সৌন্দর্য-সম্পদ ছাড়াও বহু বৈচিত্র্যের একটা জোর আছে, সেটা পরিমাণগত। নানাদিক থেকে সে আমাদের চোখকে বেড়া-জালে ঘেরে, কোথাও ফাঁক রাখে না।

"এখানকার দৃশ্যে আয়োজনের বিরলতায় আমাকে বিশেষ আনন্দ দেয়। সকাল বিকাল মধ্যাহ্ন এই অবারিত আকাশে আলো-ছায়ার তুলিতে কত রকমের সূক্ষ্ম রঙের মরীচিকা এঁকে যায়, আমার মিতভোগী অক্লান্ত চোখের ভিতর দিয়ে আমার মন তার সমস্তটার স্বাদ পুরোপুরি আদায় করে। এখানকার বাধাহীন আকাশ-সভায় বর্ষা বসন্ত শরৎ তাদের ঋতু বীণায় যে গভীর মীড়গুলি দিতে থাকে তার সমস্ত সূক্ষ্ম শ্রুতি কানে এসে পৌঁছয়। এখানে রিক্ততা আছে ব'লেই মনের বোধশক্তি অলস হ'য়ে পড়ে না, অথবা বাইরের চাপে অভিভূত হয় না।

"একটি উপমা দিই। একজন রূপরসিকের কাছে গেছে একটি সুন্দরী। তার পায়ে চিত্র-বিচিত্র-করা একজোড়া রঙিন মোজা। রূপদক্ষকে পায়ের দিকে তাকাতে দেখে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে মোজার কোন অংশে তাঁর নজর পড়েছে। গুণী দেখিয়ে দিলেন মোজার যে-অংশ ছেড়া। রূপসীর পা দুটি ঐ যে মোজার ফুল-কাটা কারু-কাজে তানের পর তান লাগিয়েছে নিশ্চয়ই আমাদের হিন্দুস্থানী মহারাজ তার প্রতি লক্ষ্য ক'রেই বলতেন, বাহবা, বলতেন সাবাস। কিন্তু গুণী বলেন, বিধাতার কিম্বা মানুষের রসরচনায় বাণী যথেষ্টের চেয়ে একটুমাত্র বেশি হ'লেও তাকে মর্মে মারা হয়। সুন্দরীর পা দু'খানিই যথেষ্ট, যার দেখবার শক্তি আছে দেখে তার তৃপ্তির শেষ হয় না,—যার দেখবার শক্তি অসাড়, ফুলকাটা মোজার প্রগল্ভতায় মুগ্ধ হ'য়ে সে বাড়ী ফিরে আসে।

"অধিকাংশ সময়েই উপাদানের বিরলতা ব্যঞ্জনার গভীরতাকে অভ্যর্থনা ক'রে আনে সেই বিরলতাকে কেউবা বলে শূন্য, কেউবা অনুভব করে পূর্ণ ব'লে। পূর্বে তোমাকে একটা উপমা দিয়েছি, এবার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

"বাংলা গীতাঞ্জলির কবিতা ইংরেজিতে আপন মনেই তর্জমা করেছিলুম। শরীর অসুস্থ ছিল, আর কিছু করবার ছিল না। কোনদিন এগুলি ছাপা হবে এমন স্পর্ধার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। তার কারণ, প্রকাশযোগ্য ইংরেজি লেখবার শক্তি আমার নেই—এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল ছিল।

"খাতাখানা যখন কবি য়েট্সের হাতে পড়ল তিনি একদিন রোদেন্স্টাইনের বাড়িতে অনেকগুলি ইংরেজ সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসজ্ঞকে তার থেকে কিছু আবৃত্তি ক'রে শোনাবেন ব'লে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি মনের মধ্যে ভারি সঙ্কুচিত হলেম। তার দুটি কারণ ছিল। নিতান্ত সাদাসিধে দশবারো লাইনের কবিতা শুনিয়ে কোনোদিন আমি কোনো বাঙালি শ্রোতাকে যথেষ্ট তৃপ্তি পেতে দেখিনি। এমন-কি অনেকেই আয়তনের খর্বতাকে কবিত্বের রিক্ততা ব'লেই স্থির করেন। একদিন আমার পাঠকেরা দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, ইদানিং আমি কেবল গানই লিখছি। বলেছিলেন আমার কাব্যকলায় কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাব, রচনা তাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে বচনের দিকে ছোটো হয়ে আসছে।

"তারপরে আমার ইংরেজি তর্জমাও আমি সসঙ্কোচে কোনো কোনো ইংরেজি-জানা বাঙালি সাহিত্যিককে শুনিয়েছিলেম, তাঁরা ধীর গম্ভীর শান্তভাবে বলেছিলেন, মন্দ হয়নি, আর ইংরেজি যে অবিশুদ্ধ তাও নয়। সে সময়ে এণ্ড্রুজের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।

"য়েট্‌স্ সেদিনকার সভায় পাঁচ সাতটি মাত্র কবিতা একটির পর আরেকটি শুনিয়ে পড়া শেষ করলেন। ইংরেজ শ্রোতারা নীরবে শুনলেন, নীরবে চ'লে গেলেন—দস্তুরপালনের উপযুক্ত ধন্যবাদ পর্যন্ত আমাকে দিলেন না। সেরাত্রে নিতান্ত লজ্জিত হ'য়ে বাসায় ফিরে গেলাম।

"পরের দিন চিঠি আসতে লাগল। দেশান্তরে যে-খ্যাতি লাভ করেছি তার অভাবনীয়তার বিস্ময় সেই দিনই সম্পূর্ণভাবে আমাকে অভিভূত করেছে।

"যাই হোক, আমার বলবার কথাটা হচ্ছে এই যে, সেদিনকার আসরে যে-ডালি উপস্থিত করা হ'ল তার উপহারসামগ্রী আয়তনে যেমন অকিঞ্চিৎকর, উপাদানে তেমনি তার নিরলঙ্কার বিরলতা। কিন্তু সেইটুকুই রসজ্ঞদের আনন্দের পক্ষে এত অপর্যাপ্ত হয়েছিল যে, তার প্রত্যুত্তরে সাধুবাদের বিরলতা ছিল না। অলঙ্কার-বাহুল্য শ্রোতার বা স্রষ্টার নিজের মনের জন্যে কিছু জায়গা ছেড়ে দেয় না। যার মন আছে তার পক্ষে সেটা ক্লেশকর।

"কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা নিজের মনোহীনতার গহ্বর ভরাবার জন্যেই রসের ভোজে যায়, তারা বলে না, 'যৎস্বল্পং তদিষ্টম্'। তারা থিয়েটারে টিকিট কেনে শুধু নাটক শুনবে ব'লে নয়, রাত্রির চারটে পর্যন্ত শুনবে বলে তারা নিজেকে চিরকাল ফাঁকি দেয়, কেবলি সেরা জিনিষটির বদলে মোটা জিনিষটাকে বাছে। সাজাই করার চেয়ে বোঝাই করাটাতেই তাদের আনন্দ ; এই কারণে তুমি যাকে সারল্য বলছ সেটা তাদের পক্ষে রিক্ততা নয় তো কী ?"

কবি একটু থেমে বললেন : "তুমি যেমন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছ আমিও তেম্‌নি বলব। আমি গান রচনা করতে করতে, সে-গান বার বার নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি, যে দরকার নেই 'প্রভূত' কারু-কৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়—অতি সূক্ষ্ম অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।"

বললাম : "কথাগুলি আমার খুবই ভালো লাগল। শিখলামও অনেক কিছু। যদিও এখানে একটা কথা ব'লে রাখতে চাই যে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্তত এ রকম সারল্যের অফুরন্ত আবেদন সম্বন্ধে আমি একেবারে অন্ধ নই। আমি একবার আমার কোনো বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলাম যে, কোনো রিক্ত মাঠের একটি মাত্র গাছ সন্ধ্যাবেলায় নিত্যনূতন মূর্তি ধরত আমার চোখের সামনে। তবুও আমার মনে হয় যে, সব ললিত কলার বিকাশ-ধারাই যে অতিমাত্রায় সরলতার দিকে হবে এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। কেননা অনেক শ্রেষ্ঠ

শ্রেণীর ললিত-সৃষ্টি দেখা যায় যার মধ্যে একটা complex structure, একটা বৃহৎ সুষমা, একটা সমষ্টিগত মনোজ্ঞ সমাবেশ পাওয়া যায় ও তার মধ্যে একটা গভীর রস-সত্য বিরাজ করে। যেমন ধরুন বীণার তানের আনন্দ-ঝোরার বিচিত্র লাবণ্য, য়ুরোপীয় সিম্‌ফনীর বিরাট গরিমাময় গঠন-কারু-কলা, মধ্যযুগের য়ুরোপের অপূর্ব স্থাপত্য, তাজমহলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাস্কর্যের গাথা। প্রতিভার একটা দান সরলতার দিকে হ'তে পারে, কিন্তু আর একটা দান যে ঐশ্বর্যের দিকে এ আমার প্রায়ই মনে হয়। আমার তাই ভয় হয় পাছে রসবোধে একপেশো হয়ে পড়ি। পরমহংসদেবের কথা আমার মনে লেগেছে: "আমি ঝোলেও আছি, ঝালেও আছি, চচ্চড়িতেও আছি, আবার পোলোয়া কালিয়াতেও আছি, একঘেয়ে কেন হব?' আমাদের মনে একটা স্বভাবান্ধতা নেই কি? একদিকে যখনই ঝোঁকে অন্য দিকগুলো শুধু যে দেখতে পায় না তাই নয়—অস্বীকার করতেই পায় বেশি আনন্দ। জীবনে রসবোধ ভালো, কিন্তু সব রসের প্রকাশ যে একঝোঁকা এমনতর ডগ্‌মাটিস্‌ম্‌ বোধ হয় এ বিচিত্র বিশ্বে মন্দর কোঠায়ই পড়ে।"

"একথা কি আমিই মানিনে? আমি কেবল বলতে চাই, সরলতায় বস্তু কম বলে রসরচনায় তার মূল্য কম একথা স্বীকার করা চলবে না, বরঞ্চ উল্‌টো। ললিত-কলার কোনো একটি রচনায় প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে এই, যে, তাতে আনন্দ দিচ্ছে কি না। যদি দিচ্ছে হয়, তাহ'লে তার মধ্যে উপাদানের যতই স্বল্পতা থাকবে ততই তার গৌরব। বিপুল ও প্রয়াসসাধ্য উপায়ে একজন লোক যে ফল পায় আর একজন সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পায়াস উপায়েই সেই ফল পেলে আর্টের পক্ষে সেইটেই ভালো। বস্তুত আর্টের সৃষ্টিতে উপায় জিনিষটা যতই হাল্কা ও প্রচ্ছন্ন হবে ততই সৃষ্টির দিক থেকে তার মর্যাদা বাড়বে। এই মূলনীতি যদি মানো তাহ'লে সকল প্রকার আর্টেই পদে পদে সতর্ক হ'য়ে বলতে হবে, অলমতি বিস্তরেণ। বলতে হবে, আর্টে প্রগল্‌ভতার চেয়ে মিতভাষ, বাহুল্যের চেয়ে সারল্য শ্রেষ্ঠ। আর্টে complex structure অর্থাৎ বহুগ্রন্থিল কলেবরের দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাজমহলের উল্লেখ করেছ। আমি তো তাজমহলকে সহজ রূপেরই দৃষ্টান্ত ব'লে গণ্য করি। একবিন্দু অশ্রুজল যেমন সহজ, তাজমহল তেমনি সহজ। তাজমহলের প্রধান লক্ষ্য তার পরিমিতি—ওতে একটুকরো পাথরও নেই যাতে মনে হতে পারে হঠাৎ তাজমহল কানে হাত দিয়ে তান লাগাতে সুরু করেছে। তাজমহলে তান নেই। আছে মান, অর্থাৎ পরিমাণ। সেই পরিমাণের জোরেই সে এত সুন্দর। পরিমাণ বলতেই বোঝায় উপাদানের সংযম। আমের সঙ্গে কাঁঠালের তুলনা ক'রে দেখ না।

কাঁঠালের উপরকার আবরণ থেকে ভিতরকার উপকরণ পর্যন্ত সমস্তটার মধ্যেই আতিশয্য, সবটা মিলে একটা বোঝা। যেন একটা বস্তা। বাহাদুরির দিক থেকে দেখলে বাহবা দিতেই হবে। কাঁঠালের শস্যঘটিত তান-বাহুল্যে মিষ্টতা নেই তাও বলতে পারিনে,—নেই সৌষ্ঠব, কলা-রচনায় যে-জিনিষটি অত্যাবশক। কাঁঠালকে আমের মতো সাদাসিধে বলে না, তার কারণ এ নয় যে, কাঁঠাল প্রকাণ্ড এবং ওজনে ভারি। যার অংশগুলির মধ্যে সুগঠিত ঐক্য, সেই হচ্চে সিম্প্‌ল্‌। যদি নতুন কথা বানাতে হয় তাহ'লে সেই জিনিষকে বলা যেতে পারে সকল, অর্থাৎ তার সমস্ত কলাগুলি সুসঙ্গত। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মকে বলে নিষ্কল, তাঁর মধ্যে অংশ নেই, তিনিই হচ্ছেন অসীম সিম্প্‌ল্‌—অথচ তাঁর মধ্যে সমস্তই আছে—সমস্তকে নিয়ে তিনি অখণ্ড। সূর্যের যে-রশ্মিকে আমরা সাদা বলি তার মধ্যে বর্ণ-রশ্মির বিরলতা আছে তা নয় তার মধ্যে সকল রশ্মির ঐক্য। তাজমহলও তেমনি সাদা, তার মধ্যে সমস্ত উপকরণের সুসংঘটিত সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যের সুষমাকে যদি আমরা ছিন্ন ক'রে দেখি তবে তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত দেখব না। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে একটি অশ্রু-বিন্দুতেও আমরা বহুকে দেখতে পাই কিন্তু যে-দেখাটিকে অশ্রু বলি, সে নিতান্ত সাদা, সে এক। সেখানে সৃষ্টিকর্তা তাঁর ঐশ্বর্যের আড়ম্বর করতে চাননি—সরলভাবে তাঁর রূপদক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর অশ্রুজলে রিক্ততা আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন সেই অশ্রু-জলের হিসাবের খাতা বের ক'রে দেখান তখন ধরা পড়ে রিক্ততার পিছনে কতখানি শক্তি। তখন বুঝতে পারি অতিরিক্ততাই সৃষ্টি-শক্তির অভাব প্রকাশ করে, আর যারা অতিরিক্ত না হ'লে দেখতে পায় না তাদের মধ্যে দৃষ্টিশক্তিরই দীনতা।"

কবির কথাগুলি শুনতে শুনতে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ি—তাঁর কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধতায়, উপমায়, চাহনিতে, এককথায় সব জড়িয়ে তাঁর ব্যক্তিরূপের মহিমায়। মনে হ'ল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা। আমাকে তিনি বলেছিলেন পাটনায় (১৯২৩ কি ২৪ সালে): "রবীন্দ্রনাথ উকীল হ'লে আমাদের হারিয়ে দিতেন চক্ষের নিমেষে।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রায়োক্তি যে, মন হ'ল উকিল, তাকে দিয়ে যা বলাবে তাই বলবে সে। কিন্তু হ'লে হবে কি, মনের এই একচোখোমি, একপেশোমিতেই যে সে আমাদের চোখ আরো ধাঁধিয়ে দেয়—যখন যেটার ওকালতি করে তাকে এম্‌নি পরিপাটিই সাজায় যে মন বলে সাবাস—সত্য শুধু এইখানেই, অন্যত্র নেই।

তবু বললাম কবিকে : "আপনি যে এত কষ্ট ক'রে আমাকে সারল্যের সৌন্দর্য ও স্বল্পের মহিমা বোঝাতে চেষ্টা করলেন এজন্যে আপনার কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তবু আমার মনে হয় বার বারই যে ভগবান তাঁর সৃষ্টিলীলায় ঐশ্বর্যের অজস্র সমারোহে এত রস পেতেন না যদি না প্রাচুর্যের মধ্যেও একটা গভীর সার্থকতা থাকত। বোলপুরের দৃশ্যসৌন্দর্যের উপকরণদৈন্যের যেমন একটা দিক আছে দার্জিলিঙের বিশাল শৈলমালার ও ধবলহিমাদ্রির জমকালো মহিমারও তেমনি একটা দিক আছে। শীতে গাছপালার নিরাভরণ বৈধব্যের মধ্যে আছে যেমন একটা তাপসী সুষমা তেমনি বসন্তে শ্যামলতার অজস্র আবির্ভাবের মধ্যেও একটা মহিমা নেই কি?

"থিওরি পরে, অভিজ্ঞতা আগে। তাই যখন দেখব যে থিয়োরিস্ট অভিজ্ঞতার মাত্র একটা দিক দেখেই চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ছুটলেন তখন তাঁকে আহা, যান কোথায় ব'লে রুখতে চেষ্টা করি রসিকদের অন্যদিকের অভিজ্ঞতার রাশ দিয়ে। গানের বেলায় একটি সুরেলা মিড়ে মন দুলে ওঠে এ একটা অকাট্য অভিজ্ঞতা, মানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও একটা অপ্রতিবাদ্য অভিজ্ঞতা যে রাগমালার, তানের, আলাপের ধ্বনিসমারোহেও মনে বিস্ময়ের সম্ভ্রম জোগায়, আনন্দের অভিভূতি আনে। একটি শিশুর* 'ভজমন রামচরণ দিনরাত্রি' তুলসীদাসী ভজনেও আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি বহুবার, মুগ্ধ হয়েছি তার নিরলঙ্কৃত সুরশোভায়—কিন্তু অন্যদিকে আবার আবদুল করিমের অফুরন্ত দরবারি কানাড়ার আলাপেও রসাবেশে মন ভিজে টস টস ক'রে উঠেছে সুরসুন্দরীর অলংকৃত ঝংকারে মন গেছে ছেয়ে! অন্যের কথা বলতে পারি না, তবে শ্রীকৃষ্ণের রূপের বৈচিত্র্যে আমি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠি। একদিকে তাঁর বালগোপাল রূপকেও বলি সরল সুরে :

চমকে তিমির থির বিজলীর বিভায় মনোচোরা
আয়রে মধুর বাজিয়ে নূপুর স্বর্গস্বপনঝোরা
তোর বাঁশিতে নিখিল চিতে অলখ এল বেয়ে
তোর শুনি' তান বইল উজান যমুনা গান গেয়ে।

"অন্যদিকে আবার তাঁর বিশ্বরূপদর্শনের কল্পনায় অর্জুনের সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছা করে 'কস্মাচ্চ তে'ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে'?

* ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকায়—বালক চন্দ্রশেখরের গানের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

রূপমহিমার আদি নাহি যার—নিখিল যাহার সৃষ্টি
দিকে দিকে যার আলো-ওঙ্কার করে ঝঙ্কার-বৃষ্টি
যাহার মুরলী মন্দ্রে উছলি' নাচে আনন্দে শম্ভু
সে তোমারে নতি বিস্ময়পতি, না করিবে কে—স্বয়ম্ভু ?

"যতই বলুন না কেন, মানুষের অন্তরে ঐশ্বর্য-তৃষ্ণা যে অফুরন্ত এর নিশ্চয় কোনো গভীর তাৎপর্য আছে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপেই পেয়েছিলেন, কিন্তু যেই জানলেন যে তিনিই বিশ্বরূপ অম্‌নি বললেন কেন সপরিতাপে ?—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখেতি
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।

সখারূপে নাথ রজনী প্রভাত করেছি কত যে পরিহাস,
মহিমা উদার না জানি' তোমার প্রণয়ে উছলি' উচ্ছ্বাস,
আহারে বিহারে ডাকি দেবতারে পেতেছি যে পাশে শয্যা
সে শুধু তোমায় না চিনিয়া হায়, ক্ষমি' রেখো মোর লজ্জা।

"মা-কে একদিকে জানি ঘরোয়া সঙ্গিনী। তবু তাঁকে অন্যদিকে জগদ্ধাত্রীরূপে অন্নপূর্ণারূপে কল্পনা না ক'রেও তো দেখি সাধ মেটে না! কেন এমন হয় ? কারণ দীনতম মানুষও ঐশ্বর্যের অসীমতার মধ্যে মুক্তির আস্বাদ পায়। এই জন্যেই পরমহংসদেব বলতেন ভগবান্ সম্বন্ধে 'ঐশ্বর্য না থাকলে সে-শালাকে মানত কে ?" এইজন্যেই সব দেশেই যুগে যুগে মহাকবির মধ্যে মানুষ দাবি করেছে অপর্যাপ্তি, পেতে চেয়েছে God's plenty—কিন্তু এ-প্রগ্‌লভতাও 'ক্ষাময়ে', হে অপ্রমেয় কবিবর, যেহেতু এ বাচালতাও আসলে শুধু 'গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।' —কিন্তু ঠাট্টা যাক—সরলতার আবেদন সম্বন্ধে আপনি আজ যা বললেন মতভেদ সত্ত্বেও তাতে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি বিশ্বাস করবেন। আপনার চরণতলে এমনি ক'রে কত কথাই যে শিখেছি!···

* * *

পরদিন সকালে

অতুলদা, আমি ও কবি।

এটি লিখে রেখেছিলাম আমি ২রা জানুয়ারী (১৯২৭) সকালবেলা। কথাগুলি হয়েছিল পয়লা।

কথায় কথায় এল মৃত্যুর প্রসঙ্গ। আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম: "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছে অনেকবার।"

কবি হেসে বললেন: "শাস্ত্রে বলে ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে মরলে ফের জন্মাতে হয়।"

হাসি থামলে আমি বললাম: "মৃত্যুর পরেও আমাদের চৈতন্য থাকে—একথা আপনি বিশ্বাস করেন কি?"

কবি বললেন: "মৃত্যুর পরে আমাদের চৈতন্য যে লোপ পায় না, এ আমার খুবই মনে হয়, তবে—"

ব'লে একটু থেমে চিন্তিত সুরে বললেন: "তবে আমাদের সে-চৈতন্য যে'এ চৈতন্যের জের টেনে চলে না এ ও মনে হয়।

অতুলদা বললেন: "একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন না কথাটা।"

কবি বললেন: "কি রকম জানো? আমাদের জীবনে কি অনেক সময়েই মস্ত অদল-বদল হ'য়ে যায় না কোনো অভাবনীয় কিছু একটা ঘটলে? একটা নড়চড় ভাঙচুর হ'লে যেমন সমস্ত দৃশ্যটা থাকে অথচ আগাগোড়া বদলে যায় অনেকটা তেম্‌নি। অর্থাৎ হয়ত আমাদের মনোভাব প্রাণের সাড়া দেওয়ার ভঙ্গি' হৃদয়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুর মধ্যেই একটা বড় রকমের রূপান্তর ঘটে। এ যদি জীবনের ভূমিকম্পেই ঘটে তাহ'লে মৃত্যুর ভূমিকম্পে আরো ঘটবে, এই তো মনে হয় বেশি ক'রে।

"কেমন? ধরো—এটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত মনে রেখো—ধরো এমনও হ'তে পারে যে মৃত্যুর পরে আমাদের পক্ষে প্রিয়জনের দূরে-থাকা ও কাছে আসার মধ্যে হয়ত আর কোন তফাৎ থাকবে না। তাই মৃত্যুর পরে চৈতন্য রইল বলতে আমি বুঝি না যে, সেটা হ'ল এই চৈতন্যেরই সম্প্রসারণ—লাইনকে টেনে-বাড়ানোর মতন। আমার মনে হয় যে খুব সম্ভব সে-চৈতন্যের মধ্যে একটা মূল ছন্দ যায় বদ্‌লে।"

বললাম: "কি রকম?"

কবি বললেন: "একটা উপমা দিই বোঝাতে। ধরো ডিমের মধ্যে তার শাবকের জীবন আর ডিমের বাইরে তার জীবন। এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ কি আকাশ পাতাল নয়? একটা হ'ল গণ্ডীবদ্ধ আচ্ছন্ন, অস্ফুট অথচ প্রকাশের বেদনায় উচ্ছল—অপরটা হ'ল মুক্তপক্ষ, প্রবুদ্ধ ও প্রকাশের উপলব্ধিতে চঞ্চল। মৃত্যুর পরেও—আমার মনে হয়—আমাদের চৈতন্যের আত্মপ্রকাশের রীতির এই

ধরণের কোনো অদলবদল হয় যাকে বলা যেতে পারে fundamental—মূলগত।”

বললাম: “তন্ত্রের এই রকমই একটা আইডিয়া সেদিন পড়ছিলাম একটি বইয়ে। আইডিয়াটি এই যে, আমাদের চৈতন্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মপ্রকাশের প্রকৃতিও যায় বদলে। অর্থাৎ চৈতন্যের ক্রমপ্রগতির একটা স্তরে আমাদের কোনো তৃষ্ণা—ধরুন ভালোবাসা—যেভাবে নিজেকে জানান দেয়, আর-একটা স্তরে সে মোটেই সে-ভাবে আত্মবিজ্ঞপ্তি চায় না।”

কবি বললেন: “তাতো বটেই হে। শোনো—এ-প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দেই যখন কথাই উঠল। তুমি এইমাত্র যা বললে সেটা না বুঝে আমাকে অনেকে বড় দোষ দেয়। তারা রাগ করে এইটে দেখে যে আমার আচরণ হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ইত্যাদির রীতি আর পাঁচজনার থেকে আলাদা। বোঝে না তারা যে এ-স্বাতন্ত্র্য না থাকলে আমি আর যা-ই হই না কেন রবীন্দ্রনাথ হ'য়ে উঠতে পারতাম না। যেমন ধরো, আমার কতসময়েই মনে হয়েছে যে আমার হৃদয়বৃত্তিগুলি যদি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতো তাহ'লে আমার দ্বারা আর যা-ই হোক না কেন কোনো রূপসৃষ্টি সম্ভব হ'ত না।

“এটা সত্যি অহঙ্কারের কথা নয়। আমি সত্যিই বহুবার অনুভব করেছি যে আমাকে দিয়ে একটা বিশেষ ‘কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ব'লেই কর্মকর্তা আমাকে কর্মের চাপে ফেলেছেন কিন্তু অপকর্ম করান নি, নানা দুঃখ বেদনায় হাবু-ডুবু খাইয়েছেন কিন্তু তলিয়ে যেতে দেন নি। এক কথায়, বিধাতা সব রকম অভিজ্ঞতার বোঝাই আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন কিন্তু পিষে ফেলেন নি, নানা বাঁধনে বেঁধেছেন কিন্তু কোনো শিকলে বন্দী করেন নি, যেমন অন্য পাঁচজনকে করেছেন—বা তারা হয়েছে, যা-ই বলো।

অতুলদা বললেন: শুনেছি নেপোলিয়ানও ছিলেন এই ধরণের, কি বলব—fatalist—নিয়তিবাদী?”

কবি বললেন: “আমি ঠিক ও-ধরণের অদৃষ্ট মানি না। আমি মানি যে, আমাদের স্বাধীনতা আছে ভালো করবার বা মন্দ করবার। অথচ—তবু একটা হাত—অদৃশ্যবিধান—আমাদেরকে চালায়। কালই তুমি গাইছিলে না—‘আমারে এ-আঁধারে এমন ক'রে চালায় কে গো? ব'লে আমার দিকে ফিরে বললেন: “না, ঝাপ্সাই রয়ে গেল?”

আমি বললাম: “বোধ হয় বুঝতে পারছি খানিকটা। জীবনে নানা সময়ে

একজন অদৃশ্য নিয়ন্তাকে বোধে বোধ করা গেলেও যেমন ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না—তেমনি তো? কিন্তু একথা কি অলোকসামান্য লোকদের সম্বন্ধেও খাটে না?"

কবি বললেন: "নিশ্চয়ই খাটে। কেবল একটা উপমা আমার মনে হয় এ-সম্বন্ধে। ধরো একজন বাঁশিওয়ালা। রকমারি বাঁশি বানিয়েছে। প্রতি বাঁশিই আলাদা আলাদা রকম বাজে। কিন্তু তার মধ্যে দু-একটা বাঁশি যায় উৎরে—দেখা যায় যে দু-একটা বাঁশিতে কি-ক'রে-যেন সবই হয়েছে মাপসই—তার ফুটো ঠিক পরিসরের, কাঠ ঠিক মাপের, ভিতরের ফাঁক ঠিক আয়তনের সব মিলে গেছে। বাঁশিওয়ালা অন্যসব বাঁশিও বাজায় কিন্তু এই উৎরে যাওয়া বাঁশি কয়টি বাজাতেই তার বেশি ভালো লাগে। মানুষের বেলায়ও এ কথা। প্রতি মানুষকেই বিধাতা আলাদা আলাদা রূপে গড়েছেন আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালাই ক'রে। কিন্তু কয়েকটা আধার বেশি উৎরে গেল। এদের চরিত্র একটু অভিনিবেশ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তাদের অভিজ্ঞতায় গঠনপ্রকৃতি, গুণসমাবেশ, ঘটনার যোগাযোগ সবেরই পিছনে যেন রয়েছে একজন অদৃশ্য কারিগরের, কি বলব—design —মৎলব। তবে আমি এ-ধরণের কথা বলতেও অহঙ্কার করতে চাই নি বিশ্বাস কোরো। বরং ঠিক উল্টো, কেন না আমি এ-কথা বলছি আমার আমিত্বকে ফাঁপিয়ে তুলতে নয়—এইসব যোগাযোগকেই বড় ক'রে ধরতে।"

আমরা হেসে উঠলাম। অতুলদা বললেন: "আপনি এত সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন এসব কথা বলতে? আপনি পাঁচজনের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চললেও তারা-যে কাঁধে আপনার সমান নয় একথা কি কারুর চোখে ধরা না প'ড়ে পারে?"

কবি যেন একটু আশ্বস্ত হ'য়েই বললেন: "বাঁচালে অতুল। হয়েছে কি জানো? আমি ছেলেবেলা থেকে যেরকম একলা-একলা মানুষ হয়েছি ও যে-অবজ্ঞার মধ্যে গ'ড়ে উঠেছি তাতে আমার মধ্যে একটা ভীরুভাব—shyness—বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে যার প্রভাব আমি আজও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।"

বললাম: "অবজ্ঞা?"

কবি বললেন: "আমার শৈশবে যে কী অনাদর ও ঔদাসীন্যের মাঝখানে কেটেছে জানো না। আমাকে সবাই ভাবত অপদার্থ।"

অতুলদা হেসে বললেন: "এও কি একটা কথা হ'ল কবি?"

কবি বললেন: "একটুও বাড়িয়ে বলছি নে অতুল, বিশ্বাস করো। এমন কি—" ব'লে স্বর একটু নামিয়ে নিয়ে একবার অতুলদার দিকে ও একবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট ক'রে বললেন: "দুঃখের কথা বলব কি, আমার এই

চেহারাটা যে নিহাৎ অচল নয় একথা আমি প্রথম টের পাই কোথায় জানো?—বিলেতে—আর একথা আমাকে সর্বপ্রথম বলে আমার এক বোন।"

বললাম: "বোন?"

কবি কৌতুকোজ্জ্বল চোখে বললেন: "নইলে আর বলছি কি? তার কাছে নাকি তার দু একজন ওদেশিনী সখী একথা বলত। আরে ছাই, আমার কাছেই বল্, তাও না। কি জানি হয়ত আমার লজ্জা দেখেই লজ্জাশীলারা লজ্জা পেতেন, কে বলতে পারে?"

অতুলদা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। তাঁর প্রাণখোলা হাসি ছিল সংক্রামক। কবি ও আমাকে যোগ দিতে হ'ল।

হাসি থামলে আমি বললাম: "বলুন না আপনার এসব গল্প আজ একটু খুলে।"

কবি বললেন: "আহা বলব কী বলো দেখি।"

বললাম: "যা প্রাণ চায়। বলুন আপনার কী মনে হ'ত রূপসীদের মুখে নিজের রূপের তারিফ শুনে।"

"প্রথম প্রথম বিশ্বাসই হ'ত না হে, সত্যি বলছি। কিন্তু ক্রমে যখন কীর্তন-কল্লোল বেড়ে উঠল তখন স্থির করলাম যে রূপসম্বন্ধে আমাদের দেশের স্ট্যাণ্ডার্ড ও বিলিতি স্ট্যাণ্ডার্ডের মধ্যে ব্যবধান এতই বেশি যে আঁকড়ে পাওয়া ভার।"

সাগ্রহে বললাম: "বলুন না এসব গল্প। আপনার নিজের মুখে এসব শুনতে যে কত ভালো লাগে—"

কবি বললেন: "বলবার মতন কিছু কি করবার মতন ক'রে করেছি হে যে বলব? এতই লাজুক ও মুখচোরা ছিলাম সে সময়ে যে, তরুণী মহলে এরকম প্রতিষ্ঠার কানাঘুসা শুনেও ওদিকে ভিড়তে সাহস পায়নি। সত্যি বলছি আমার সেই বোনটি আমাকে প্রায়ই তিরস্কার করত: 'Why can't you flirt a little?' অনেক সময়ে করত কি—হয়ত তার কোনো রূপসী সখীর কাছে হঠাৎ আমাকে একলা ফেলে কি অছিলায় আসছি ব'লে দে চম্পট।

"আপনি?"

"একেবারে বোবা—আর কেন লজ্জা দাও হে জিজ্ঞাসা ক'রে?"

অতুলদা হেসে বললেন: "যাকে বলে মুখে রা-টি নেই?"

কবি বললেন: "সত্যিই তাই। আর কারণ কি জান? কারণ আসলে আমার বয়স হয়েছিল দেরিতে। আমি বিলেতে প্রথমে যে-ডাক্তারপরিবারে অতিথি

হয়েছিলাম তাঁর দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপ্‌সা নেই—কিন্তু তখন যদি ছাই সেকথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত!"

আমরা তো হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ি আর কি।

কবি সে-হাসিতে যোগ দিয়ে বললেন: "এখন তোমরা হাসছ, কিন্তু সে-সময় আমার এদিকে সুশীলতা হসনীয় ছিল না শোচনীয় ছিল বলা একটু কঠিন।"

আমি বললাম: "কি রকম?"

কবি বললেন: "শোনো একটা ঘটনা বলি, তাহ'লেই সব জলের মতন সাফ হ'য়ে যাবে।"

আমরা খুব উৎকর্ণ হ'য়ে কবির মুখের দিকে চেয়ে। দারুণ কৌতূহলে বুক টিপটিপ করছে।

* * *

কবি বললেন: "তখন আমি কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ পড়েছি মনে রেখো—এবং মনে মনে নবকুমার ও নগেন্দ্র হয়েছি যে কতবার। কিন্তু স্বপ্নে যা-ই করি না কেন, সত্যিকার রোমান্স যে আমার মতন জনৈক নগণ্য, মুখচোরা, ভয়কাতুরে, অবজ্ঞাত কিশোরের বাস্তব জীবনে ঘটতে পারে এমনতরো স্পর্ধাকে জাগ্রত অবস্থায় মনের ত্রিসীমানায়ও আসতে দিই নি।

"তখন আমার বয়স বছর ষোলো। আমাকে ইংরাজি কথা বলা শেখানোর জন্যে পাঠানো হ'ল বম্বেতে একটি মারাঠি পরিবারে। সেই আমার প্রথম বাড়ি ছেড়ে থাকা। গেলাম কি আর সাধ ক'রে? যেতে হ'ল।

"সে-পরিবারের নায়িকা একটি মারাঠি ষোড়শী। যেমন শিক্ষিতা তেম্‌নি চালাকচতুর তেম্‌নি মিশুক।"

বললাম: "অর্থাৎ যাকে আপনি বলেন হ্লাদিনী।"

কবি বললেন: "ঠিক আমার মুখের কথাটি কেড়ে বলেছ। যাকে বলে 'চার্মিং'।

"বলাই বেশি, তার স্তাবক-সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না—বিশেষ আরো এই জন্যে যে, ঐ বয়সেই সে একবার বিলেত চক্র দিয়ে এসেছিল। সে-সময়ে মেয়েদের বিলেত-যাওয়া আজকের মতন পাড়া-বেড়ানো গোছের ছিল না, মনে রেখো।

"আমার সঙ্গে সে প্রায়ই যেচে মিশতে আসত। কত ছুতো ক'রেই যে ঘুরতো আমার আনাচে কানাচে!—আমাকে বিমর্ষ দেখলে দিত সান্ত্বনা, প্রফুল্ল দেখলে পিছন থেকে ধরত চোখ টিপে।

"একথা আমি মানব যে, আমি বেশ টের পেতাম যে ঘটবার মতন একটা-কিছু ঘটেছে, কিন্তু হায় রে, সে-হাওয়াটাকে উস্কে দেওয়ার দিকে আমার না ছিল কোনোরকম তৎপরতা, না কোনো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।"

"একদিন সন্ধ্যাবেলা," কবি বলতে লাগলেন: "সে আচমকা এসে হাজির আমার ঘরে। চাঁদনী রাত। চারদিকে সে যে কী অপরূপ আলো হাওয়া! কিন্তু আমি তখন কেবলই ভাবছি বাড়ির কথা। ভালো লাগছে না কিছুই। মন কেমন করছে বাংলাদেশের জন্যে, আমাদের বাড়ির জন্যে কলকাতার গঙ্গার জন্যে। হোমসিকনেস যাকে বলে।

"সে ব'লে বসল: 'আহা কী এত ভাবো আকাশপাতাল!'

"তার ধরণধারণ জানা সত্ত্বেও আমার একটু যেন কেমন কেমন লাগল। কারণ সে প্রশ্নটা করতে না করতে একেবারে আমার নেয়ারের খাটের উপরেই এসে বসল।

"কিন্তু কী করি—যা হোক হুঁ হাঁ ক'রে কাজ সেরে দিই। সে কথাবার্তায় বোধ হয় জুৎ পাচ্ছিলনা, হঠাৎ বলল: 'আচ্ছা আমার হাত ধ'রে টানো তো—টাগ্-অফ্-ওয়ারে দেখি কে জেতে?'

"আমি সত্যিই ধরতে পারিনি, কেন হঠাৎ তার এত রকম খেলা থাকতে টাগ্-অফ্-ওয়ারের কথাই মনে প'ড়ে গেল। এমন কি আমি এ শক্তি-পরীক্ষায় সম্মত হ'তে না হ'তে সে হঠাৎ শ্লথভাবে হার মানা সত্ত্বেও আমার না হ'ল পুলক-রোমাঞ্চ না খুলল রসজ্ঞ দৃষ্টিশক্তি। এতে সে নিশ্চয়ই আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ রকম সন্দিহান হয়ে পড়েছিল।

"শেষে একদিন বলল তেম্নি আচম্কা: 'জানো, কোনো মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে যদি তার দস্তানা কেউ চুরি করতে পারে তবে তার অধিকার জন্মায় মেয়েটিকে চুমো খাওয়ার?'

"ব'লে খানিক বাদে আমার আরাম কেদারায় নেতিয়ে পড়ল নিদ্রাবেশে। ঘুম ভাঙতেই সে চাইল পাশে তার দস্তানার দিকে। একটিও কেউ চুরি করে নি।"

আমরা ফের হেসে উঠলাম।

হাসি থামতে-না-থামতে কবির মুখের চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেল। হাস্যোজ্জ্বলতার দীপ্তি ঢেকে গেছে ছায়াভ এক স্নিগ্ধতায়—গম্ভীর কোমল মাধুর্যে।

কবি বললেন: "কিন্তু সে-মেয়েটিকে আমি ভুলি নি বা তার সে-আকর্ষণকে কোনো লঘু লেবেল মেরে খাটো ক'রে দেখি নি কোনো দিন। আমার জীবনে

তারপরে নানান্ অভিজ্ঞতার আলোছায়া খেলে গেছে—বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন—কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব ক'রে : যে, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি—তা সে-ভালোবাসা যে-রকমই হোক না কেন। প্রতি মেয়ের স্নেহ বলো, প্রীতি বলো, প্রেম বলো আমার মনে হয়েছে একটা প্রসাদ—favour : কারণ আমি এটা বারবারই উপলব্ধি করেছি যে প্রতি মেয়ের ভালোবাসা তা সে যে-রকমের ভালোবাসাই হোক না কেন—আমাদের মনের বনে কিছু না কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়—সে-ফুল হয়ত পরে ঝ'রে যায় কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।"

মনে আছে কবির কথাগুলির রেশ সারারাত মাথার মধ্যে ঘুরেছিল···ভালো ক'রে ঘুম হয় নি সে-রাতে।

বিশেষ ক'রেই মনে বেজে উঠছিল তাঁর ঐ কথাটি : কোনো মেয়ের ভালোবাসাকেই আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি! এ-ধরণের এক একটা কথা তো কথা নয়—এক একটা অভিজ্ঞতার চেয়েও বেশি।*

* * *

এর পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পণ্ডিচেরিতে—জাহাজে। কবি যাচ্ছিলেন বিলেত। কোন্ বছর ঠিক মনে পড়ছে না—তবে যতদূর মনে পড়ছে যে বৎসর তিনি অক্সফোর্ডে হাওয়ার্ড লেকচার দিতে যান বোধ হয় সেই বছরেই।

জাহাজে ছন্দ নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। লিপিবদ্ধ ক'রে রাখি নি সেদিনকার কোনো কথা—বেশি কথা হয়ও নি।

এর পরে কবির সঙ্গে দেখা—২১ মার্চ ১৯৩৮ সকাল বেলা—জোড়াসাঁকোয়। কবি বিশেষ খুসি, যেহেতু আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতীরা অনেকেই যথা রেবা, লীলা, উমা (ওরফে হাসি) প্রভৃতি। আরো ছিলেন বন্ধুবর শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। তিনি এদিনকার কথাবার্তার একটা অনুলিপি কয়েকদিন বাদে আমাকে দেন ও আমি কবিকে প'ড়ে শোনাই। কবি অনুমতি দেওয়ায় সেটি বিচিত্রায় ছাপা হয়। এখানে সেটি পুনর্মুদ্রিত করলাম—কেননা কবির ব্যক্তিরূপ তাতে সুন্দর ফুটেছে।

* এই মেয়েটির কথা বহুদিন বাদে লিখে গেছেন তাঁর "ছেলেবেলা" বইটিতে তের অধ্যায়ের শেষে তাকে "আপন-মানুষের দূতী" উপাধি দিয়ে।

ঘরের কোণায় আবদ্ধ যে-জীব, স্বভাবে যে উদ্ভিজ্জ, তাকে যদি বাইরের আলো-বাতাসের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় তবে তার চোখে ধাঁধা লাগা স্বাভাবিক। অভ্যস্ত প্রাত্যহিকতার বাইরে ব'লেই মুক্ত প্রকৃতিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে তার সময় লাগে।

নিজের পারিপার্শ্বিকের কথা বলতে চাইনে, কেননা সেটা নিতান্ত ব্যক্তিগত। কিন্তু এটুকু বলতে বাধা নেই, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ-মানবের খুব কাছাকাছি আসবার যে-দুর্লভ পুণ্যটুকু আজ অর্জন করলাম সে আমার প্রতিষ্ঠিত কৃতিত্বের জোরে নয়। আমার পরিধিকে যদি বহুধা বিস্তৃত ক'রেও দিই তবু রবীন্দ্রনাথের ম'ত মহামানবের নাগাল পাবার কথা আমার নয়। ঢেলার ওজন যদি বেশি হয় তবেই পুকুরের জল অধিক দূর ছড়ায়, আর হালকা হ'লে কোনো কাঁপন জাগায় না, শুধু ডুবে যায় টুপ্ ক'রে। ভার নেই ব'লেই আমার পরিচয়ের জলটা ঝিলিমিলি কাটে, কিন্তু বেশিদূর ছড়ায় না।

কিন্তু এমন এক একজন লোক থাকেন যাঁকে আশ্রয় করলে বোধ হয় স্বর্গের সিঁড়িও বাওয়া চলে। হাসির কথা নয়, দিলীপদা' ওই ধরণেরই লোক। তাঁর পরিচয়ের বৃত্তটি এত বড়ো যে, বিশ্ব-সংসারে মস্ত মস্ত নামের পেছনে আমাদের মত চুনোপুঁটিরও তাতে জায়গা আছে। খুব বড়ো একটি মালা, তাতে বসোরা গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকার ফাঁকে ফাঁকে নাম-না-জানা গন্ধহীন বুনো ফুলও আছে সন্ত্রস্তভাবে লুকিয়ে। বলা বাহুল্য, তাঁরই কৃপায় রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছ থেকে দেখবার বিরল সুযোগটুকু লাভ ক'রে চরিতার্থ হয়েছি। সে কথা বলি।

কবিকে দূর থেকে দেখেছি, কিন্তু তাঁর চরণতলায় ব'সে তাঁর কথা শুনতে পাবো এ যেন আমার কল্পনারও অতীত ছিল। কাজেই উৎসাহের আতিশয্যে ভোরে যথানির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই তৈরি হ'য়ে নিলাম।

ঠাকুরবাড়ীর উত্তর মহলের সামনেকার একটি ছোট ঘরে কবি বসেছিলেন। আমরা যখন পৌছলাম তখন সে-ঘরে আর গুটিকয়েক লোক ছিলেন—মহিলাই বেশি। হাসিদেবীও ছিলেন সেখানে।

ঘরে ঢুকতেই দিলীপদা'কে দেখে কবি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন,—"আরে এসো এসো, চেহারাখানা দেখছি খাসা বানিয়েছে, মনটাও বেশ তাজা আছে জানি, কিন্তু তোমার ঐ পরণের গেরুয়াটেরুয়াগুলোর জন্যেই হয়েছে বিপদ—যা তুমি লিখেছ। লোকে ভাবছে তুমি মহাপুরুষ।"

প্রায় দশ বৎসর পর কবির সঙ্গে দিলীপদা'র এই প্রথম সাক্ষাৎ। মামুলি প্রথামত কুশল জিজ্ঞাসার যে চিরাচার আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তিনি তার ধার পাশ দিয়েও গেলেন না, সম্ভাষণের সুরুতেই পরিহাস-তরল কণ্ঠে এমন হাসি ঠাট্টার সুর লাগালেন যে আমাদের ম'ত নবীনদেরও চমকে যেতে হয়। অত্যন্ত সজীব মন না হলে এই বয়সে এমন হাসির ফোয়ারা ছোটান সোজা কথা নয়।

আমরা কবিকে প্রণাম ক'রে চারিদিকে ঘিরে বসলাম। দিলীপদা' বসলেন কবির ঠিক পায়ের তলায়। ছবিটি মনকে স্পর্শ করে। প্রাচীন-কালোক্ত মহাজ্ঞানীর চরণতলে দূরদেশাগত জ্ঞানার্থী নবীনের সশ্রদ্ধ বসবার ভঙ্গিটিকে মনে করিয়ে দেয় এক নিমেষে।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, এত বড়ো ব্যক্তিত্বের সামনে এসে আমি প্রায় অভিভূত হ'য়ে গেলাম। এতকাল কবিকে তাঁর লেখার ভেতর দিয়েই জেনেছি, শ্রদ্ধা করেছি, ভালোবেসেছি; আজ তাঁর সমস্ত লেখাকে আড়াল ক'রে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব এসে আমার মনকে সবেগে নাড়া দিয়ে গেল। নিজের অজান্তে অর্ধসচেতন ভাবে অনেকদিনের পড়া অনেক লেখার সঙ্গেই যেন তাঁকে মিলিয়ে দেখলাম। এমনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম যে, গোড়ার দিকে তিনি কী বলছিলেন তা প্রায় কানেই গেলো না। যেমন পূর্ণনিবদ্ধদৃষ্টি সাপ কিছু শুনতে পায় না আমারও কতকটা সেই অবস্থা।

কিছুক্ষণ যেতেই কবি বলছেন শুনতে পেলাম: "দিলীপ, তুমি তোমার গানের বইয়ের (সাঙ্গীতিকী) যে অংশগুলি আমাকে পাঠিয়েছ আমি সে-সব খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। আমার যে ভালো লেগেছে সেকথা তোমাকে চিঠিতেও আমি জানিয়েছি। আমি আজকাল বড় একটা পড়িটড়িনে, তবে তোমার অনুরোধ এড়ানো বড়ো শক্ত। কিন্তু পড়তে গিয়ে এতো ভালো লাগলো যে কী বলবো। তোমার ভাষাও তাতে চমৎকার উৎরেছে। পড়তে পড়তে একটা জিনিষ আবিষ্কার করলুম, গানের ব্যাপারে আমার ঔপপত্তিক অজ্ঞতা যে এতদূর তা আমি নিজেই জানতুম না। আর জানোই তো, গান রচনা করেছি, সুর দিয়েছি, গেয়েছি, কিন্তু কোনোদিনও ওর পাণ্ডিত্যের দিকটাতে পা বাড়াইনি, ভালোও লাগেনি কোনোদিন, জানব কোত্থেকে বলো?"

"কেন," দিলীপদা প্রশ্ন করলেন, "পাণ্ডিত্য জিনিষটা কি খারাপ?"

কবি বললেন, "লেখকের যেটা বলবার কথা পাণ্ডিত্য যখন সেটাকে ছাড়িয়ে যায় তখন সাহিত্যের হয় ভরাডুবি। সে-সমস্ত রচনাই ব্যর্থ হয়েছে যাতে

পাণ্ডিত্য দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার চেষ্টা আছে। সাহিত্যে জাহিরিপনার স্থান নেই।"

দিলীপদা বললেন, "সবই বুঝি, কিন্তু লোভ সামলান সহজ কথা নয়। বোধ হয় আপনার বয়সে সম্পূর্ণ লোভমুক্ত হ'তে পারব।"

কবি গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "না ঠাট্টা নয় দিলীপ, পাণ্ডিত্যকে সব সময়ে দূরে দূরে রাখতে না পারলে কারও মুক্তি নেই জেনো।"

কথাপ্রসঙ্গে হাসিদেবীর কথা উঠলো। কবি হাস্যপরিহাসের সুরে বলতে লাগলেন, "দেশের যত ভালো ভালো মেয়ে আছে তুমি যদি তাদের এমনি ভাঙিয়ে নিয়ে যাও তো আমার কী অবস্থা দাঁড়ায় বলোতো? চমৎকার ওর কণ্ঠ—তোমার গান শেখানো সার্থক। সেজন্যে হিংসে করিনে, কিন্তু ওকে তোমার নাচ শেখাতে দিতে হবে। সে ভার রইল আমার 'পরে। ওখানে আর তুমি ভাগ বসাতে যেয়োনা।"

সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠলো। দিলীপদা বললেন, "আমার আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু শুনেছি নাচলে কণ্ঠস্বর খারাপ হ'য়ে যায়, সেইজন্যেই—"

কবি উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়ে বললেন, "সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, নাচলে গলা কেন খারাপ হ'তে যাবে? আর দেখেছো ওর শরীরটাই হচ্ছে নাচের, ওকে নাচ শিখতেই হবে। ভাগ বাঁটোয়ারা ক'রে একটা ভাগ তুমি নাও আপত্তি করবো না। কিন্তু ভালো ভাগটা রইল আমার জন্যে তোলা, বুঝলে?"

কোনো বৃদ্ধের কণ্ঠে এমন পরিহাসতরল সুরের লীলা চলতে পারে এ আমার কল্পনারও অতীত ছিল। বার্ধক্য অনেকদিন দেহকে কবলিত করেছে কিন্তু মনের এ কী প্রাণবন্ত রূপ। এই প্রাণশক্তির মূল নিহিত আছে তাঁর স্বভাবসুলভ কবিধর্মেই, নয় কি?

দিলীপদা বললেন, "সাঙ্গীতিকীর সম্পর্কে আপনি আমাকে যে চিঠিগুলো লিখেছেন তাতে একটা কথা প্রমাণ হয়নি কি যে আপনি আপনার পূর্ব মত বদ্‌লেছেন? জীবনস্মৃতিতে গান নিয়ে যে সব কথা আপনি লিখেছেন আপনি তো তার বিরুদ্ধ মতই পোষণ করছেন আজকাল।"

কবি বললেন, "সারাজীবন ধ'রে একটা নির্দিষ্ট মতের অনুবর্তন ক'রে চলাটা মনের স্বধর্মের পরিচায়ক নয়। আমার মত যদি বদ্‌লেই থাকে তাতে আমি ক্ষোভ করিনে। একটা কথা আমি ভেবে দেখেছি: গানের ক্ষেত্রে, শুধু গানের ক্ষেত্রে কেন, সমস্ত চারুশিল্পের ক্ষেত্রে, নতুন সৃষ্টির পথ যদি খোলা না-ই রইলো তবে তা

কিছুতেই শিল্পের পাংক্তেয় হ'তে পারে না। শিল্পী নিজের পথ নিজে ক'রে নেবে, প্রাচীন সঙ্গীতের কণ্ঠে ঝুলে থাকাটা তার সইবে কেন? পুরাতনকে বর্জন করতে বলিনে, কিন্তু নতুন সৃষ্টির পথে যদি তাতে কাঁটার বেড়া দেখা দেয় তবে তা নৈব নৈব চ। আকবর শা'র দরবারে তানসেন মস্ত বড় গাইয়ে ছিলেন, কেননা তাঁর শিল্পপ্রতিভার নিত্য নতুন সৃষ্টির খাতে রসের বান ডাকিয়েছিল—আকবর শা'র যুগে সে-ঘটনা ছিল অভিনব। কিন্তু একালের মানুষ আমরা, আমরা কেন এখনো তানসেনের গানের জাবর কেটে চলবো অন্ধ অনুকরণের মোহে? এই যে-সমস্ত হিন্দুস্থানি ওস্তাদ দেখতে পাও, এদের হয়ত কারও কারও প্রতিভা আছে, কিন্তু এদের যেটুকু প্রতিভা, সেটা নিঃশেষিত হ'য়ে যায় বাঁধা পথের অনুবর্তন ক'রতে ক'রতেই। সুতরাং নতুন সৃষ্টির কোনো জায়গা সেখানে থাকে না। কিন্তু বাংলা গানের কথা স্বতন্ত্র, এর অপূর্ব সম্ভাবনার কথা ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ হয়। বাংলা গানে নিত্য নতুন স্বকীয়তার পথ তোমরা সৃষ্টি করতে থাকো, তাতেই বাংলা গান খুঁজে পাবে সার্থকতা। তুমি তো অনেকদিন য়ুরোপে ছিলে, তাদের সঙ্গীতের ভালো ভালো জিনিষ দিয়ে যদি বাংলা গানের সাজি ভরাতে পারো তবে সেটা একটা সত্যিকারের কাজ করা হবে। অন্ধ অনুকরণ দোষের, কিন্তু স্বীকরণ নয়।"

দিলীপদা প্রশ্ন করলেন, "আপনি নতুন সৃষ্টির কথা এত বললেন, স্বকীয়তাকে নানাদিক থেকে সমর্থনও করলেন অথচ এতদিন আপনি আপনার স্বরচিত গানের ব্যাপারে একটু রক্ষণশীল ছিলেন না কি? আমার তো মনে হয় আপনি কিছুদিন আগে পর্যন্তও গায়কের সুরবিহারের (improvisation) স্বাধীনতাকে সমর্থনই করেন নি।"

কবি বললেন, "এখনো আমি সমানই রক্ষণশীল আছি। তবে একটা কথা আছে। তোমাদের মত প্রতিভাবান শিল্পীদের দিয়ে আমার ভয় নেই, কিন্তু এপথ সবারই জন্য নয় জেনো। যাকে তাকে যদৃচ্ছা পক্ষবিস্তার করার স্বাধীনতা দিলে তাতে সুফলের পরিবর্তে অপফলটাই ফলবে বেশি ক'রে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিল্পী-গায়কের 'পরে থাকবে এর দায়িত্ব।"

কথায় কথায় নানা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ল। "চণ্ডালিকা"র কথাও উঠলো। আমাদের মধ্যে একজন বললেন, "চণ্ডালিকা" খুব চমৎকার হয়েছে। তাতে কবি বললেন, "তোমরা হয়ত জানো না এর জন্যে আমাকে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। দিন নেই, রাত নেই এদেরকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে গড়েপিটে নিতে হয়েছে—সে যে কী কষ্ট তোমরা বুঝবে না।"

তারপর একটু থেমে বললেন, "অথচ গানের ভেতর দিয়ে আমি যে-জিনিষটি ফুটিয়ে তুলতে চাই সেটা আমি কারও গলায় মূর্ত হ'য়ে ফুটে উঠতে দেখলুম না। আমার যদি গলা থাকত তাহ'লে হয়ত বা বোঝাতে পারতুম কী জিনিষ আমার মনে আছে। আমার গান অনেকেই গায়, কিন্তু নিরাশ হই শুনে। একটিমাত্র মেয়েকে জানতুম যে আমার গানের মূল সুরটিকে ধরতে পেরেছিল—সে হচ্ছে ঝুমু, সাহানা। আমি গানের প্রেরণা পেয়েছি আমার ভেতর থেকে, তাই আপন লীলায় আপন ছন্দে ভেতর থেকে যে সুর ভেসে ওঠে তা-ই আমার গান হ'য়ে দাঁড়ায়। ওস্তাদের কাছে 'নাড়া' বেঁধে সঙ্গীত-শিক্ষার দহরম মহরম করা—সে আমাকে দিয়ে কোনো কালেই হ'লো না। ভালোই হয়েছে যে ওস্তাদের কাছে হাতেখড়ি হয়নি। আমাদের বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খুব চর্চা হ'তো সে-কথা তোমরা সবাই জানো। অথচ আশ্চর্য, এবাড়ির ছেলে হ'য়ে আমি কোনোদিনও ওস্তাদিয়ানার জালে বাঁধা পড়িনি। আড়ালে আবডালে থেকে যেটুকু শুনেছি সেটুকুই আমার শেখা। বারান্দা পার হ'তে গিয়ে কিম্বা জানালার ওপাশে ব'সে-থাকার-কালে যে সব সুর ভেসে আসতো কানে, সেগুলোই মনের ভেতর গুঞ্জরণ ক'রে ফিরতো প্রতিনিয়ত। তার থেকেই পেয়েছি আমি গানের প্রেরণা। বর্ষার দিনে ভিতরে ভূপালি সুরের আলাপ চলেছে আমি বাইরে থেকে শুনেছি। আর কী আশ্চর্য দেখ, পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ষার গান রচনা করেছি তার প্রায় সব কটিতেই অদ্ভুত ভাবে এসে গেছে ভূপালির সুর। কাজেই বুঝেছো সঙ্গীত শিক্ষাটা আমার সংস্কারগত—ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক নয়।"

"ছোটো বেলায়" কবি বলতে লাগলেন, "আমার গলা খুব ভালো ছিল। সেকালের সেরা ওস্তাদ যদুভট্ট—অত বড় গাইয়ে বাংলায় আজ পর্যন্ত হয়েছে কি না সন্দেহ—আমাদের বাড়ীর সভাগায়ক ছিলেন। তিনি কত চেষ্টা করেছেন আমাকে গান শেখাবার জন্যে, কিন্তু মেরেকেটেও আমাকে বাগ মানাতে পারেন নি। সে-ধাতের ছেলেই আমি নই। কোনো রকম শেখার ব্যাপারে আমার টিকিটিও খুঁজে পাবার যো ছিল না। এই ধরো না কেন, লেখা-পড়ার কথা। কোনোদিন কেউ আমাকে স্কুলের গণ্ডীর মধ্যে ধ'রে রাখতে পারলো না। স্কুলের শিক্ষার প্রতি যে-মনোভাব জনবিদিত, সেটা গ'ড়ে উঠেছে আমাদের বাড়ীর গুরুজনদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনের আওতায়। আমাদের বাড়ীতে লেখাপড়ার আদর ছিল কিন্তু স্কুল-কলেজের লেখাপড়া নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় নি। আমি মাঝে মাঝে ছাদে দাঁড়িয়ে তন্ময় হ'য়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতুম, বড়দা পেছন থেকে এসে আমার মাথায়

হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতেন, রবি বড় হ'লে নিশ্চয়ই দার্শনিক হবে। বোধ হয় হয়েছিও খানিকটা, কিন্তু জীবনে স্কুল-কলেজের শিক্ষা আমার কোনোদিনই পোষাল না!"

একটু থেমে: "জ্যোতিষে তোমাদের বিশ্বাস আছে কিনা জানিনে, আমার কোষ্ঠিতে জন্মলগ্নে আছে চন্দ্র, আর বিদ্যাস্থানে বৃহস্পতি। লেখা আছে জাতক ইচ্ছা না করলেও বিদ্যার্জন করবে। বোধ হয় আমার কোষ্ঠির কথা কিছুটা সত্যি। স্কুল-কলেজের ভিতর কোনদিনই আমি মাথা গলালুম না; একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের ফটকের ভেতর পা দিয়েছিলুম আর উত্তর জীবনে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচ্যরার হলুম অনুরোধের চাপে প'ড়ে। ক'দিন লেকচ্যর দিয়েছিলুম, কিন্তু ভালো লাগল না। ঐ পর্যন্তই কলেজের সাথে আমার সম্পর্ক। আমাদের কলেজে যেভাবে লেখাপড়া শেখানো হয় আমি তার ঘোর বিরোধী। বিশেষ ক'রে পণ্ডিতদের কাব্য পড়াতে দেখলে ত্রস্ত না হ'য়ে পারিনে। সব সওয়া যায় কিন্তু বিজ্ঞ অধ্যাপকের কাব্য-বিশ্লেষণ—অসহ্য। দিলীপ, তুমি তো এম্, এস, সি পাশ—জীবনে ওই একটা মস্ত ভুল করেছো।"

দিলীপদা বললেন, "আজ্ঞে না, আমি মাত্র বি, এস, সি, তবে আমার যেটুকু সত্য শিক্ষা সেটা হয়েছে তার পরে।"

কবি বললেন, "স্কুল-কলেজে শিক্ষা হ'তেও পারে না। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে এর সম্পর্কে আমি খুব আশান্বিত নই। কেন না, শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবস্থার কোনো দাম নেই। যে-প্রেরণা থেকে প্রকৃত গানের জন্ম ক্লাসরুমের চতুঃসীমার ভেতর কেউ তা পেতে পারে না। স্বরলিপি পরিচয় কিম্বা ধরাবাঁধা কয়েকটা গান শেখাতেই ঐ ব্যবস্থার সমস্ত কৃতিত্ব যাবে ফুরিয়ে। দল পাকিয়ে শিক্ষা হয় না, শিক্ষাকে কার্যকরী কর'তে হলে ছোটোখাটো শ্রেণীবিভাগের 'পরে জোর দিতে হবে। বিলেতে থাকতে আমি এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের কাছে পড়েছিলুম, Henry Morley। দেখেছি কী অপূর্ব তাঁর শিক্ষাপ্রণালী! তাঁর সঙ্গে আমার মনের সম্পর্ক এ-জীবনে ঘুচবার নয়। আমাদের দেশে তেমন শিক্ষক মেলে কই? শুধুমাত্র নাম করা যেতে পারে একজনার, তিনি হচ্ছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।"

কিছুদিন আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন (convocation) উৎসবে রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ সাহেব সারগর্ভ বক্তৃতা করেছিলেন কবির উপরোক্ত কথায় সে-কথা মনে প'ড়ে গেলো। বুঝতে পারলুম রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ সাহেবের প্রেরণার উৎস কোথায়।

কথায় কথায় সাধারণ ভাবে বাংলা দেশের রাজনীতির কথা এসে পড়লো। কবি বললেন, "বর্তমান বাংলা দেশ এই যে অনেকটা পেছিয়ে পড়েছে, যুবশক্তির পঙ্গুতাকেই সেজন্যে দায়িক করতে হয়। তরুণদেরও দোষ দিতে পারিনে। শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে যাদের দিয়ে অনেক গঠনমূলক কাজ হ'তে পারতো ভ্রূকুটিকুটিল রাজরোষের কবলে প'ড়ে তাদের শক্তি ক্ষ'য়ে গেছে। এদের অনেকেই বিকৃত বুদ্ধির চাপে প'ড়ে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা তো অস্বীকার করতে পারিনে যে কল্পনাশক্তির বিকাশে সমস্ত ভারতবর্ষে বাঙালির জুড়ি মেলে না। পথ ভ্রান্ত হোক অভ্রান্ত হোক সেটা পরের কথা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই আত্মত্যাগের প্রেরণা আসে কোত্থেকে ? বাংলা দেশের মাটিতে আছে ফলপ্রসূ কল্পনার বীজ তাই বাঙালির রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। এই জেনারেশনের কাছ থেকে হয়তো খুব বেশি কিছু পাওয়া যাবে না, কিন্তু পরবর্তী কালকে দাবিয়ে রাখবে কে ? এটা আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে নিরবচ্ছিন্ন রাজনীতির চর্চাতেই কী ক'রে দেশ উদ্ধার পেতে পারে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নাচ, গান এদের কিছু দাম নেই ? আনন্দকে অপাংক্তেয় ক'রে রেখে এমন কী চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে, বুঝিনে। দেশের অস্থি-মজ্জায় আনন্দকে চারিয়ে তোলো, তাতে সব দিক থেকেই লাভ হবে, এমন কি রাজনীতির দিক থেকেও। য়ুরোপের দিকে তাকিয়ে দেখ, রাজনীতির বিশুদ্ধ চর্চা ওদেরকে শিল্প সাহিত্যের দিকে মোটেই উদাসীন ক'রে তোলেনি, আর আমাদের দেশে কিনা ফাঁকা ধুয়ো উঠেছে আনন্দকে বাইরে ঠেলে রেখে রাজনীতির যুযুধান প্রবৃত্তিকে শানিয়ে তুলতে পারলেই মোক্ষলাভ হবে। বাংলা দেশের বুদ্ধিবৃত্তিতে নিশ্চয়ই ঘুন্ ধরেছে, নইলে এমন মতিগতি হবে কেন ?"

কবি ব'লে চললেন, "কিন্তু বাংলা দেশকে যেমন আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি তেমন তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগও আছে বিস্তর। তুমি জানো না এই বাংলা দেশের কাছ থেকে কতো ব্যাপারে কতো আঘাত আমাকে সইতে হয়েছে। এটা আমি দেখেছি, যাদের জীবনে আমি সব চাইতে আত্মীয়ের ম'ত দেখেছি তাদের দিক থেকেই আঘাত এসেছে সব চাইতে বেশি। কৃতজ্ঞতার মূল্য এরা যে-ভাবে শোধ করেছে তাতে মুহ্যমান হ'তে হয়েছে, কিন্তু অভিযোগ করিনি। জানি যে বাঙালি আত্মঘাতী জাত—কারও ভালো করার চাইতে সমালোচনার উদ্ধত ফলায় শান দেওয়াতেই তার বেশি তৃপ্তি। কৃতজ্ঞতার দাম সে এই ভাবেই দেয়।"

দিলীপদা' বললেন, "শ্রীঅরবিন্দ বলেন, কৃতজ্ঞতার একটা ভার আছে, সেটা সবাই বহন করতে পারে না, তার জন্যে প্রয়োজন হৃদয়ের প্রসারের।"

কবি সেকথা সমর্থন ক'রে বললেন, "অতি সত্যি কথা। এক এক সময় মনে হয় কি জানো? সাধারণ বাঙালির চরিত্রের সঙ্গে আমার কোথাও মিল নেই, কোথায় কোন্ এক জায়গায় যেন আমি এদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এমন কথাও মাঝে মাঝে মনে না ক'রে পারিনি যে আবার যদি জন্মগ্রহণ করি তবে যেন বাংলা-দেশের মাটিতে আর না জন্মাই।"

দিলীপদা বললেন, "এ আপনার রাগের কথা, অভিমানের কথা।"

কবি বললেন, "হয়ত হবে, কিন্তু তুমি তো জানো না, কী নিদারুণ ব্যথা আমাকে পেতে হয়েছে এদের কাছ থেকে।" তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "যদি বা আবার জন্মগ্রহণ করি, জর্মনিতে জন্মগ্রহণ করবো না এটা ঠিক, জাপানেও নয় নিশ্চয়ই, তার চাইতে শূন্যে লীন হ'য়ে যাওয়াই ভালো, কি বলো?"

সামান্য দু-একটি হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে ডিক্‌টেটরীয় স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি যে ইঙ্গিতপূর্ণ বিদ্রূপ তিনি করলেন সেটা প্রণিধান করবার মতো।

তারপর কবি একটু থেমে হেসে বললেন, "কিন্তু বাংলা দেশের মেয়েরা বড়ো ভালো দিলীপ! এ কথা ভেবে আমার আনন্দ হয় যে, এদের কাছ থেকে আমাকে আজ পর্যন্ত সামান্য আঘাতটুকু পেতে হয়নি। জানিনা এদের প্রতি আমার মন কেন এত ঝোঁকে—হয়ত এটা আমার কবিসুলভ দুর্বলতা।"

সবাই হেসে উঠলো। দিলীপদা বললেন, "এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি দ্বিমত নই। সত্যি বাংলাদেশের মেয়েরা এত ভালো যে—খুবই ভালো।"

কবি বললেন, "নিশ্চয় মেয়েদের ভেতর এমন কোনো গুণ আছে যাতে তাদের আত্মঘাতী হবার হাত থেকে বাঁচিয়েছে—সহনশীলতার প্রবৃত্তিটি তাদের মজ্জাগত। এই একটু আগে আমি Julian Huxley-র কতকগুলি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ পড়ছিলুম, তাতেও একথার সায় আছে।"

কথায় কথায় নানা কথা উঠলো। পুনরায় গানের কথাও এলো। দিলীপদা বললেন, "পূর্বাশায় ধূর্জটির কথা ও সুর নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে—ও যে কী বলতে চায় আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওর লেখা দিন দিন যেন আরো বেশি অস্পষ্ট হ'য়ে আসছে। বাংলা গানের বিরুদ্ধে ওর প্রধান আপত্তি এই যে বাংলা গানেতে স্বরবর্ণ নেই। এ কথার কোনো সার্থকতা আমি খুঁজে পাইনে। ধরুন, 'জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা' বা 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল', এত স্বরবর্ণের প্রাচুর্যই তো দেখতে পাই, ব্যঞ্জনবর্ণ কোথায় জগদ্দল

পাথর হ'য়ে বসেছে বুঝতে তো পারলাম না। অথচ দেখুন ওদের একটা গান তুলসীদাসের বিখ্যাত

শ্রীরামচন্দ্রকৃপাল—

নব কঞ্জলোচন, কঞ্জমুখকর, কঞ্জপদকঞ্জারুণম্

একেবারে ব্যঞ্জনবর্ণে ঠাসা। তাই ধূর্জটির এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।"

কবি এ-কথায় বেশ আমোদ পেলেন, বললেন, "ধূর্জটি বলেছে এ কথা? কেন, আমাদের স্বরবর্ণ নেই কে বললে? হিন্দুস্থানীদের আছে Short অ্য, আমাদেরও তেমনি রয়েছে 'অ'। ওরা যখন 'অ্য' 'অ্য' ব'লে স্বর বিস্তার করবে আমরা না হয় তখন 'অ' 'অ' ব'লে স্বরের লীলা দেখাব। অত ভয় কিসের?" ব'লে ভঙ্গি সহকারে 'অ' এর ওপর স্বরবিস্তার ক'রে দেখালেন।

আমরা তো হেসে কুটিপাটি। কবি দিলীপদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "দেখ তোমাকে একটা সদুপদেশ দিই, মনে রেখো। গানকেই জীবনের ব্রত ক'রে নাও, নির্জনবাস আর কেন, যথেষ্ট তো হয়েছে। দেশকে গানের লীলায় মাতিয়ে তুলবে সেই হবে তোমার একমাত্র mission।"

দিলীপদা বললেন, "কিন্তু এটা তো আপনি মানবেন, কোনো একটা বড় কাজ করতে হ'লে তার জন্যে শক্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন। অবশ্য এ আমি বলিনা যে পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় না ক'রে কোনো কাজে হাত দিতে নেই, কিন্তু আমার জীবনে নীরব সাধনার বড়ো দরকার হ'য়ে পড়েছিলো।"

কবি বললেন, "যথেষ্ট সাধনা করেছো, ওই তোমার পক্ষে পর্যাপ্ত। এবার দেশের দিকে তাকাও।"

এমনি নানা কথায় বিদায় নেবার কাল ঘনিয়ে এল। কবি বললেন, "তোমাকে দেখে কী যে আনন্দ পেয়েছি বলতে পারিনে দিলীপ। অসুখ থেকে উঠবার পর এত কথা এক সঙ্গে আমি কোনোদিন বলিনি। তুমি আজ পর্যন্ত আমাকে যে কতো বকিয়েছ তার আর ঠিকঠিকানা নেই। বকিয়ে বকিয়ে আমাকে প্রায় মেরে ফেলবার যোগাড়। দুজনেই সমান বাক্য-বাগীশ, ঠোকাঠুকিরও তাই বিরাম নেই। তোমার মতো তার্কিকের পাল্লায় পড়লে কি রক্ষে আছে?"

দিলীপদা বললেন, "এই বয়সে আপনার এতো প্রাণশক্তি কোত্থেকে আসে ভাবতে অবাক লাগে। আপনি ক্লান্ত শ্রান্ত একথা বলেন কেন? লেখার বেগও তো আপনার এতটুকু মন্দীভূত হয়নি। 'প্রান্তিক' প'ড়ে কী যে ভালো লাগলো! কেবল বইয়ের নামকরণেই যা ক্লান্তির লক্ষণ, লেখায় ক্লান্তির চিহ্নও নেই।

কবি কণ্ঠে কৃত্রিম গোপনিকতার সুর এনে বললেন, "তোমাকে নিভৃতে একটা কথা বলি শোনো, আমি ক্লান্ত, এটা যদি লোকদের না বোঝাতে পারি তাহ'লে তাদের হাতে আমার অপঘাত যে অনিবার্য। এমনিতেই আমার প্রাণ যায় যায়। জানো তো সবাই আমাকে নামকরণের রাজা ব'লে জানে। অমুকে অমুক ইন্‌স্টিট্যুশন খুলেছে, ধরো রবিঠাকুরকে, একটা নামকরণ ক'রে দিতে হবে, অমুক শ্রীমানশ্রীমতীর বিয়ে, চিঠি এলো বিয়ের ওপর একটা মিষ্টি কবিতা লিখে দিতে হবে। এমনি আরো কত উৎপাত। কিন্তু তুমি যখন বিয়ে করবে কবিতা টবিতা লিখে দেবার জন্যে আবার আমার কাছে ধন্না দিওনা ব'লে রাখছি।"

ঘরের ভেতর উচ্চহাসির রোল উঠলো।

কথাপ্রসঙ্গে কবি একবার হাসিদেবীকে লক্ষ্য ক'লে বললেন, "দেখ, তোমাকে একটা কথা বলি, মনে রেখো। যদি সত্যি ভালো চাও তো দুটো জিনিষ একেবারে বাদ দিয়ে চলতে হবে। এক নম্বর স্কুল-কলেজের ছায়া মাড়ানো চলবে না, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিয়ে করবে না কিছুতেই। বুঝেছো?"

ঘরে আবার তুমুল হাস্য কলরোলের ঝড় উঠলো।

একে একে সবাই কবিকে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করলাম।

* * *

এর পরে কবির সঙ্গে দেখা বরানগরে কয়েকদিন বাদেই। কবি তখন অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ ও শ্রীমতী রাণী মহলানবিশের অতিথি। রাত্রে হাসি কবিকে আমার কয়েকটি গান শুনিয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল পরদিন সকালে এই নিয়ে কবির সঙ্গে কিছু সাঙ্গীতিক আলোচনা করবার। রাত্রে রাণীমাসির আতিথ্য স্বীকার করা গেল। ভোরে প্রাতরাশ সমাধা ক'রেই (২৬. ৩. ৩৮) ধরলাম কবিকে।

বললাম: "বন্ধু নারায়ণ আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তার যে রিপোর্ট ছাপিয়েছেন তাতে দু-একটা কথা ঝাপসা থেকে গেছে। কিছু যদি মনে না করেন—"

কবি সহাস্যে বললেন: "করলেই কি নিষ্কৃতি পাব হে তোমার প্রশ্নবাণ থেকে? বিদ্ধ করো।"

আমি বললাম: "সঙ্গীত সম্পর্কে একটা কথা অনেকদিন থেকেই আপনাকে আরো একটু খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছে। কথাটা জরুরি, অথচ আমি এখনো পুরোপুরি মনস্থির করতে পারি নি।

"কথাটা হচ্ছে এই যে, সম্প্রতি আমার ক্রমাগতই আরো বেশি ক'রে মনে হচ্ছে যে আমাদের ওস্তাদি সঙ্গীত মৃত না হ'লেও মরণাপন্ন—ওদের ভাষায় ডেকেডেণ্ট : অথচ সময়ে সময়ে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, ভীষ্মদেব, তারাপদর মতন কয়েক-জনের ওস্তাদি গানে যেন নতুন প্রাণশক্তির আভাস পাই। ওস্তাদি সঙ্গীত আমি অত্যন্ত ভালোবাসি এখনো—জানেনই তো, অথচ যে-সব ওস্তাদি গান আগে ভালো লাগত সে-সব প্রায়ই দেখি ভালো লাগে না—মনে হয় এদের চাই নবজন্ম, revival নয়—renaissance : কিন্তু হয়েছে কি, শতকরা নিরানব্বইজন ওস্তাদ চান ঐ পুনরুজ্জীবন—জের-টেনে-চলা। আর্টে বিশুদ্ধ ফিরে-যাওয়া ব'লে কোনো জিনিষ নেই ব'লেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, অথচ ভীষ্মদেবের মতন, আবদুল করিমের মতন, মোতি বাইয়ের মতন কয়েকজন গুণীর গান শুনতে শুনতে মনে খটকা লাগে : তবে কি এ-গান এখনো পঞ্চত্ব পায় নি ? এ-গান যে এখানো পুরো মরে নি তার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় যখন দেখি, ধরা যাক ভীষ্মদেবের মতন প্রাণবন্ত প্রতিভাবান্ গায়ককে এ-সঙ্গীতে এখনো এমন কি সার্গমের মতন মামুলি জিনিষেও নবদীপ্তি আনতে পারে। কেন না তাহ'লেই প্রমাণ হ'ল অন্তত এইটুকু যে, এ-স্বরবিন্যাসের প্রাণ আছে—মরা জিনিস তো জীবন্ত মানুষকে প্রাণবন্ত প্রতিভাকে ডাক দেয় না—তার মনে সাড়াও তোলে না। অথচ আশ্চর্য লাগে যখন ওস্তাদি গান শুনতে শুনতে প্রায়ই মনে হয় এ-সঙ্গীতের এসেছে জরা—গঙ্গাযাত্রার আর দেরি নেই—এখন চাইতে হবে এ-সঙ্গীতের আত্মার নবজন্ম নব-দেহে : মানে, এ-সঙ্গীতের শাশ্বত আলো হাওয়া দিয়ে নতুন গানের ফুল ফোটানো এতে নতুন দীপ্তি এনে, প্রেরণা এনে—নব রক্তে একে পুনর্জীবন দিয়ে। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি'—'জীর্ণ বাস ছেড়ে মানুষ যেমন নতুন বাস পরে', তেমনি গানের শাশ্বত প্রেরণাও এক কাঠামো এক ফর্মে বার্ধক্য বোধ করলে নবীন কাঠামো নবীন ফর্মে ঝলকে ওঠে নবদ্যুতিতে—এরই তো নাম শিল্পের নবজন্ম। এই গেল প্রশ্ন পয়লা নম্বর।

"দোসরা নম্বর কী—শুনুন একটু ধৈর্য ধ'রে। কারণ এটা আরও জরুরি হয়ত একদিক দিয়ে।

"আমার যতদূর মনে হয় আপনার সঙ্গে অনেক দিন ধ'রেই আমার একটা মতভেদ মতন আছে একটা বিষয়ে। আপনি মনে করেন—অন্তত আমার এই ধারণা—যে আমাদের গানের যারা রূপকার—Performer—তারা সুরকারকে—composerকে—এতটুকু লঙ্ঘন করলেও, পান থেকে চুনটি খসালেও 'মহতী

বিনষ্টিঃ'। আমার মনে হয় ওস্তাদি সঙ্গীতের দীর্ঘজীবিতার একটা প্রধান কারণ এই —যেকথা আপনি সেদিন জোড়াসাঁকোয় মেনেছিলেন—যে তাতে শিল্পীর সৃজনী প্রতিভাকে খানিকটা ছাড়া দেওয়া হ'য়ে থাকে। আপনি বলেছিলেন যে যদিও অধিকাংশ ওস্তাদই তাদের প্রতিভার দৈন্যবশে এ স্বাধীনতার অপব্যবহার ক'রে থাকে, তবু এ-স্বাধীনতা দেওয়ার মূল মন্ত্রটি অসত্য নয়। কেন নয় সেটা একটু উদার দৃষ্টিতে দেখতে গেলেই দেখা যায় স্পষ্ট।

"সব দেশের চিন্তাশীল মানুষই স্বীকার করেন যে, যে-শিল্পে যে জীবনযাত্রায় ব্যতিক্রমের জন্যে কোনো প্রশ্রয়ই নেই সে-শিল্পে প্রতিভার খোরাক দুদিনে ক্ষীণ হ'য়ে আসেই আসে। সেদিন আপনি আরও বলেছিলেন, বড় স্বাধীনতা সবাইকার জন্যে নয়। একথা যে সত্য, না মানবে কে? কিন্তু তবু আমাদের বলতে হবে যে, বড় স্বাধীনতার স্বাদ সবাই ঠিক মতন না পেলেও, বড় স্বাধীনতার সুপ্রয়োগবিধির মর্ম সবাই গ্রহণ করতে না পারলেও, সৃজনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার যে সবাইয়ের আছে—সমাজে এ-সত্যটি স্বীকৃত হওয়া দরকার। ওস্তাদি গানে এই সত্যটি মূলত স্বীকৃত হয়েছিল ব'লে হাল আমলেও আবদুল করিম, জোহরা বাই, মোতি বাই, সুরেন্দ্র মজুমদারের মতন সুরস্রষ্টার গান শোনার পরম সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। দিন কয়েক আগে কাশীতে মোতি বাইয়ের অপূর্ব আশাবরী ও ভৈরোঁ শুনতে শুনতে একথা যেন আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম। তাই আমি চাই যে, অন্তত একশ্রেণীর বাংলা গান থাকবে যাতে সুরকার শিল্পীকে এ-স্বাধীনতা দেবেন—কেন না, এ মূলনীতিটি সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে ওস্তাদি গানে এখনো রসিক হৃদয় রসিয়ে উঠত না। এই শক্তিকে আমি বলি সুরবিহার—improvisation; ওদের দেশেও ওরা বলে এ-শক্তি তোমাদের মস্ত সম্পদ, এ হারিয়ো না যেমন আমরা হারিয়েছি। জানেন হয়ত—রোলাঁ লিখেছেন আমাকে—যে ওদের দেশেও আগে সুরবিহারের ক্ষমতা ছিল—এমন কি সেদিনও বীটোভ্‌ন্ পিয়ানোয় তাঁর সুরবিহারে সঙ্গীতানুরাগীদেরকে গভীর ভাবে বিচলিত করতেন। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর জীবনীতে লিখেছেন যে অনেক সময়ই দেখা যেত যে বিটোভ্‌নের সুরবিহার যখন থাম্‌ল তখন ঘরে একটি শ্রোতার চোখও শুষ্ক নেই। একথা মানি যে, এহেন শক্তি ওদের মধ্যে লাখে ন মিলয় এক। হার্মনির চাপে ওদের মধ্যে এধরনের মেলডিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে—আমার এ-অভিযোগের উত্তরে দশবারো বৎসর আগে রোলাঁ তাঁর একটি পত্রে একথা অকুণ্ঠে মেনে নিয়ে আমাকে লিখেছিলেন যে এর ক্ষতিপূরণ মিলেছে যে হার্মনিতে। হয়ত হার্মনি এলে আমাদের সঙ্গীতেরও ঐ অবস্থা হ'ত।

কিন্তু সে যাই হোক না কেন, সব জড়িয়ে এ-সৃজনী প্রতিভা যে আদরণীয় সে-বিষয়ে বোধ হয় অভিজ্ঞ মহলে মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা নেই। তাই আমি চাই—ওদের ভাষায়—সুরকারের সুরকে ইণ্টারপ্রেটেশনের স্বাধীনতা। বিলেতে, যেখানে হার্মনির দরুণ এত বাঁধাধরা, সেখানেও গুণীর এ-স্বাধীনতা মঞ্জুর করেছে ওরা সবাই একবাক্যে।"

কবি খুব মন দিয়ে শুনলেন, পরে ধীরে ধীরে এক এক ক'রে বলতে লাগলেন:

"তোমার পয়লা নম্বর প্রশ্নের উত্তরে গোড়ায়ই আমি ব'লে রাখতে চাই যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আমি সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসি—আজ ব'লে নয়, বাল্যকাল থেকেই। মনে করি ভালোবাসা উচিত। প্রতি সুন্দর সৃষ্টি পুরোনো হ'লেও রসিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে এ-ই তো হওয়া উচিত। যাঁরা সত্যিকার ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনেও বলেন: 'ও কী তা-না-না-না মেও মেও বাপু, ও ভালো লাগে না'—তাঁদেরকে আমি বলব: 'তোমাদের ভালো লাগে না এজন্যে তোমাদের সঙ্গে তর্ক করব না—কেন না রুচি নিয়ে তর্ক নিষ্ফল—কেবল বলব তোমরা একথা সগৌরবে বলো না, লক্ষ্মীটি! কারণ ভালো জিনিষ ভালো না-লাগাটা লজ্জারই বিষয়, গৌরবের নয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠশ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যখন সত্যিই সঙ্গীতের একটি মহৎ বিকাশ তখন সেটা যদি তোমাদের কারুর ভালো না-ও লাগে তো সলজ্জেই বোলো—লাগল না, বোলো ও-রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই করি নি বা করবার সময় পাই নি, নইলে লাগত নিশ্চয়ই।

"আমার ভালো লাগে। উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আমি ভালোবাসি, বলেছি বহুবারই। কেবল আমি বলি যে ভালো জিনিষকেও ভালোবাসতে হবে কিন্তু মোহমুক্ত হ'য়ে। সবরকমের মোহই সর্বনেশে। তাজমহল আমার ভালো লাগে ব'লেই যে তাজমহলের স্থাপত্য-শিল্পের অনুকরণে প্রতি বসতবাটিতে গম্বুজ ওঠাতে হবে এ কখনই হ'তে পারে না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভালো লাগে ব'লেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ কথাটা কথাই নয়। অজন্তার ছবি খুবই ভালো কে না মানবে? কিন্তু তাই ব'লে তার উপর দাগা বুলিয়ে আমাদের চিত্রলোকে মুক্তি খুঁজতে হবে বললে সেটা একটা হাসির কথা হয়। তবে প্রশ্ন ওঠে: অজন্তা থেকে তাজমহল থেকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে আমরা কী পাব? না, প্রেরণা ইন্‌স্পিরেশন। সুন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা দেওয়া। কিসের? না, নবসৃষ্টির। তানসেন আকবর শা ম'রে ভূত হ'য়ে গেছেন কবে—কিন্তু আমরা আজও চলতে থাকব তাঁদের সুরের শ্রাদ্ধ ক'রে? কখনই না। তানসেনের সুর

শিখব, কিন্তু কী জন্যে?—না, নিজের প্রাণে যাকে তুমি বলছ renaissance—নবজন্ম—তারই আবাহন করতে। আমিও এই কথাই ব'লে আসছি বরাবর যে নবসৃষ্টির যত দোষ যত ত্রুটিই থাকুক না কেন—মুক্তি কেবল ঐ কাঁটাপথেই—বাঁধা সড়ক গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়ে মোড়া হ'লেও সে-পথ আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে শেষটায় চোরা গলিতেই। আমরা প্রত্যেকেই মুক্তিপন্থী—আর মুক্তি কেবল নব সৃষ্টির পথেই, গতানুগতিকতার নিষ্কলঙ্ক সাধনার পথে নৈব নৈব চ।

"হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জয়ার দশার কথা বলছিলে। হয়েছে কি, ও-সঙ্গীত হ'য়ে প'ড়েছে ক্লাসিক। ক্লাসিক মানে একটা সর্বাঙ্গসুন্দরতার, পার্ফেকশনের ফর্মে অচল প্রতিষ্ঠা। এ-হেন পূর্ণতা পূর্ণ ব'লেই মরেছে। পূর্ণতায় সিদ্ধির সঙ্গে আসে স্থিতি। কিন্তু শিল্পের মুক্তি চাইতে পারে না স্থিতির অচলায়তন। তাই ইতিহাসে দেখবে অঘটন ঘটে যখন বেশি খুঁৎখুঁতেপনায় আমাদের ধরে এই ক্লাসিকিয়ানার সেকিলিয়ানার মোহে। গ্রীক রোমানরা ছিল সভ্য জাত এ তো নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু তবু ওদের মতন সভ্যজাতির স্থিতির প্রতিষেধক হ'য়ে এল কারা? না, বর্বরেরা। কিন্তু কেন এ-অঘটন ঘটল ইতিহাসে? ওদের মত সভ্য জাতের উপর অসভ্যরা কি একান্ত অকারণেই চড়াও হয়েছিল? না। সভ্যতা যখন ঘুমিয়ে পড়তে চায় তখন ভূমিকম্পই আসে—অবসন্ন স্থৈর্যের চেয়ে ধ্বংসও ভালো, কুম্ভকর্ণের মোহতন্দ্রার চেয়ে ঝড়তুফানও ভালো। আত্মপ্রসন্ন নির্বিকার চিরস্থিতি নিয়ে করব কি? এই জন্যে দেখবে—সব দেশেই ক্লাসিকিয়ানার বিরুদ্ধে একদল প্রাণবন্ত মানুষ করে বিদ্রোহ। কেন করে? তারা ক্লাসিককে ভালোবাসেনা ব'লে? না। ভালোবাসে ব'লেই করে। বিদ্রোহ ক'রেই তারা শত্রুকে আপন ক'রে নেয়—তার পাষাণ-প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার ক'রে। বলে না—রাবণ ছিল রামের মহাভক্ত—কেবল সে চাইত রামকে শত্রুভাবে পূজা করতে?

"হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিরুদ্ধে আজ এই যে বিদ্রোহের চিহ্ন দিকে দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাকে তাই অকল্যাণজনক মনে করা সঙ্গত নয়। হিন্দুস্থানী বীণাপাণি আজ শবাসনা—তাঁর এ আসনকে চাই টলানো। নইলে কমলাসনারও হবে ঐ নির্জীবন আসনেরই দশা—সে মরবে। বাংলা গানে দেখ হিন্দুস্থানী সুরই তো পনর আনা। কাজেই কেমন ক'রে মানব যে বাংলা গানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দাকুমড়ো সম্বন্ধ? বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সুরের শাশ্বত দীপ্তিই যে নবজন্ম পেয়েছে এ-কথা ভুললে তো চলবে না। আমরা যে বিদ্রোহ করেছি সে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, তার

আনন্দদানের বিরুদ্ধে না—কেননা আমাদের গানেও তো আমরা হিন্দুস্থানী গানের রাগরাগিণীর প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে আমরা চেয়েছি, কিন্তু আপনার ক'রে পেলে তবেই না পাওয়া হয়। হিন্দুস্থানী স্বরবিহার প্রভৃতি শুনে আমি খুসি হই ; কিন্তু বলি : বেশ—খুব ভালো, কিন্তু ওকে নিয়ে আমি করব কী ? আমি চাই তাকে যে আমার সঙ্গে কথা কইবে। প্রাকৃত ও সাধু বাংলার দৃষ্টান্ত দিলে এ-কথাটা পরিষ্কার হবে।

"বিদ্যাসাগরী 'রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্যনির্বিশেষে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন' এ হ'ল অতি ব্যাকরণসম্মত অনবদ্য ভাষা। কিন্তু তবু বঙ্কিম একে গ্রহণ করেন নি। তাঁকে গাল খেতে হ'ল তাঁর নবভাষার জন্যে—কিন্তু তবু বঙ্কিমই হলেন ভাষার ধ্বজাবাহী—বিদ্যাসাগর নন।

"আমরাও এই পথেই চলেছি—অর্থাৎ নব স্বষ্টির পথে। বৈয়াকরণরা কখনো বা হাসলেন, কখনো বা গুরুগম্ভীর স্বরে তর্জন করলেন 'তিষ্ঠ—গুরুচণ্ডালি দোষে ভাষার যে ঘটল ভরাডুবি।' কিন্তু একথা বোধকরি আজ আর বড় কেউ অস্বীকার করেন না যে আমাদের হাতে প্রাকৃত বাংলার অনধিকার প্রবেশে ভাষার ঘটেনি অপঘাত। দু-একজন সেকেলে পণ্ডিত পেডাণ্ট ছাড়া সবাই মানবে যে প্রাকৃত বাংলার সহযোগে বাংলা ভাষার প্রকাশশক্তি বেড়েছে অজস্র রঙে ঢঙে ব্যঞ্জনায়। আর এ সম্ভব হয়েছে জেনো এই গুরুচণ্ডালী দোষের প্রসাদেই। তারই কল্যাণে আজকের বাংলায় সংস্কৃত জীমূতমন্দ্রের সঙ্গে প্রাকৃত বাংলার কেয়ূর কঙ্কণ মিশে গেল—পর হ'ল আপন, মান্য-গণ্য হ'ল প্রিয় পরিজন।

"হিন্দুস্থানী স্বরে তাই মিশেল আনতে আমাদের বাধবে কেন ? আমি মানি রাগ-রাগিণীর একটা নিজস্ব মহিমা আছে। এ-ও মানি যে, রাগরাগিণীর পরিচয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঐ যে বললাম তা থেকে প্রেরণা পেতে, তাকে নকল করতে নয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত কেমন জানো ? —যেন শিব। রাগরাগিণীর তপস্যা হ'ল শৈব বিশুদ্ধির তপস্যা। কিন্তু তাইতেই ও মরল। এল উমা—সঙ্গে এল ঐ ফুলের তীরন্দাজ ঠাকুরটি যার নাম ইংরাজিতে 'প্যাশন'। আমি বলি যুগে যুগে ক্লাসি-সিজমের শৈব তপস্যা ভাঙতে হবে এই প্যাশনে—স্থাণুকে করতে হবে বিচলিত। নিষ্ক্রিয় নির্বিচলতার মধ্যেও এক রকমের মহিমা আছে মানি—সে মহান্। কিন্তু স্বষ্টির গতি থাকলে তবেই এ-স্থিতির নিষ্ক্রিয়তার বৃত্ত হয় পূর্ণ। প্রকৃতি বিনা পুরুষকে চাইলে পরিণাম নির্বাণ—কৈবল্য। সে পথে অন্তত শিল্পের মুক্তি নেই সাগর পারের ঢেউও আমাদের প্রাণে জাগাক এই প্যাশন—সংরাগ। তাতে

ভুল চুক হবে—হোক না—নির্ভুলতম ঘুমের চেয়েও ভুলেভরা জাগার দাম ঢের বেশি নয়কি ?

"শেষ কথা, স্বরবিহারের সম্বন্ধে। ইংরেজি ইম্প্রভাইজেশন কথাটির তুমি বাংলা করেছ স্বরবিহার—বেশ তর্জমা হয়েছে। এ-ও আমি ভালোবাসি। এতে যে গুণী ছাড়া পায় তা-ও মানি। আমার অনেক গান আছে যাতে গুণী এ-রকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি। আমার আপত্তি এখানে মূল নীতি নিয়ে নয়, তার প্রয়োগ নিয়ে।

"কতখানি ছাড়া দেব ? আর কাকে ? বড় প্রতিভা যে বেশি স্বাধীনতা দাবি করতে পারে এ কথা কে অস্বীকার করবে ? কিন্তু এক্ষেত্রে ছোট বড়র তফাৎ আছেই যে কথা সেদিন বলেছিলাম।

"আর একটা কথা। গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী ? ঠেকাব কী ক'রে ? তাই আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলি নে যে আমি যা ভেবে অমুক স্বর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবে ভাবিত হ'তে হবে। তা যে হ'তেই পারে না। কারণ গলা তো তোমার এবং তোমার গলায় তুমি তো গোচর হবেই। তাই এক্সপ্রেশনের ভেদ থাকবেই যাকে তুমি বলছ ইণ্টারপ্রেটেশনের স্বাধীনতা। বলছিলে বিলেতেও গায়ক-বাদকের এ স্বাধীনতা মঞ্জুর। মঞ্জুর হতে বাধ্য। সাহানার মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম ? না তো। সাহানাকেও শুনতাম—বলতে হ'ত 'আমার গান সাহানা গাইছে'। তোমার ঢঙের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তোমার একটা নিজস্ব ঢঙ গ'ড়ে উঠেছে এটা তো খুবই বাঞ্ছনীয়। তাই তোমার স্বকীয় ঢঙে তুমি 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গাইলে যে-ভাবে, আমার সুরের গঠনভঙ্গি রেখে এক্সপ্রেশনের যে-স্বাধীনতা তুমি নিলে তাতে আমি সত্যিই খুসি হয়েছি। এ-গান তুমি গ্রামোফোনে দিতে চাইছ, দিও আমার আপত্তি নেই। কারণ এতে আমার স্বররূপের কাঠামোটি Structureটি জখম হয়নি। তোমার এ-কথা আমিও স্বীকার করি যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশনের কমবেশি স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাৎ আছে এ-কথাটি ভুলো-না। প্রতিভাবানকে যে-স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।"

কবির কথাগুলি লিখলাম দ্বিপ্রহরে, ও বিকেলে তাঁকে প'ড়ে শোনালাম। কবি

খুসি হ'য়ে বললেন: "কথাগুলি আমারই এ-কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, লেখাও খুব ভালো হয়েছে। তুমি ছাপতে পারো।"

এর পরে কবির সঙ্গে কিছু আলাপ হয় কেসর বাইয়ের অপূর্ব সঙ্গীত নিয়ে। তাঁর গানে কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন ও লিখেছিলেন:

"Kesar Bai's singing is an artistic phenomenon of exquisite perfection. The magic of her voice with the mystery of its varied modulations has repeatedly proved its true significance not in any pedantic display of technical subtleties mechanically accurate, but in the revelation of the miracle of music possible only for a born genius."

কিন্তু কেসর বাইয়ের গানের সম্বন্ধে এমনতরো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও তার পরেই আমাকে হিন্দুস্থানী গানের সম্বন্ধে অনেক কথা আবার বললেন যার অর্থ আমি ভালো বুঝতে পারি নি। কথাগুলি নতুন নয়—স্বর ও সঙ্গতিতে বলেছেন কবি যথেষ্ট বিশদ ক'রে। কথাগুলির অর্থও দুর্বোধ্য নয়, কিন্তু কবির অভিযোগ যে ঠিক কিসের বিরুদ্ধে—তাঁর আক্রমণের নিশানা যে ঠিক কে বোঝা ভার। এ নিয়ে এখানে বেশি আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে—তবে দু-একটা কথা না বললেও নয়।

কথাটা এই যে কবির মতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তানালাপ ভালো লাগে ব'লেই কবি মেনে নিতে চান না যে এ-ভালো-লাগা উচিত।

একথায় মন কিছুতেই সায় দেয় না। কারণ আমরা কিছুতেই ভেবে পাইনে ভালো লাগার চেয়ে বড় কথা কী হ'তে পারে—বিশেষ শিল্পকলায়? মন যদি আনন্দে ভরপূর হ'য়ে ওঠে, যদি মনে হয় যে এ হ'ল সেই বস্তু "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—যা পেলে আর কোনো লাভকে লাভই মনে হয় না—তাহ'লে আর চাই কি? যেমন আগে ভাষা তার পর ব্যাকরণ, তেমনি আগে রস তার পরে রসতত্ত্ব। একথা বলার মানে এই যে, যদি কোনো কিছুতে গভীর আনন্দ পাই এবং তার পরে দেখি যে তার রস-সম্বন্ধে আমাদের কোনো মনগড়া থিওরি খাটছে না, তাহ'লে বুঝতে হবে থিওরিটারই দোষ আছে—যেহেতু রসের চেয়ে প্রামাণিক কিছু থাকতেই পারে না। কাজেই রসের সাক্ষ্য অবিসংবাদিত হ'লে থিওরিকেই নামঞ্জুর করতে হবে, রসকে নয়। তবে এ-ধরণের একদেশদর্শিতা সম্বন্ধে রস-তাত্ত্বিকেরা প্রায়ই যথেষ্ট সচেতন থাকেন না, তাই তাঁদের ভুল হয় এ-সাদা কথাটি মানতে—যা যুগযুগান্তর ধ'রে তাত্ত্বিকেরা ছাড়া আর সবাই মেনে

এসেছেন—যে, আনন্দের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এ-আনন্দ এ-রস যদি কোথাও পাই তখন বলবই : "বাতিল হোক সে সব থিওরি, রসতত্ত্ব—যারা তাদের নিষেধের সঙিন উঁচিয়ে এ-আনন্দের পথ আগলে থাকে।" কেসর বাইয়ের গানকে যেই "সুরের ইন্দ্রজাল" ব'লে মান্‌ব সে-ই তার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সব প্রশ্ন আপনা আপনিই নিরস্ত হবে। না যদি হয় তাহ'লে বুঝব যে তাকে "ইন্দ্রজাল" বলছি মন থেকে, প্রাণ থেকে না। একটু আগে কবির সঙ্গে বরানগরে যে-আলোচনা হয়েছিল একথাগুলোকে সে-আলোচনার মন্তব্য হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এ নিয়ে তর্ক নিষ্ফল—আমার ধারণাটুকু বলার আমার স্বাধীনতা আছে ব'লেই বললাম একথা। কবি নিশ্চয়ই নিজগুণে আমার এ-স্পর্ধা মার্জনা করবেন ও আমাকে ভুল বুঝবেন না। কবি অধিকার দিয়েছেন ব'লেই যথাসম্ভব সসম্ভ্রমে খুলে বললাম কোথায় তাঁর কথা গ্রহণীয় মনে হচ্ছে না—এবং কেন।

* * *

এর পরে কবির সঙ্গে দেখা হয় কালিম্পঙে। সেখানে কবির সঙ্গে আলাপ আলোচনা তখনি তখনি লিখে রাখতাম ও কবিকে প'ড়ে প'ড়ে শোনাতাম। কবি অত্যন্ত প্রীত হ'তেন শুনে। পরে এ-সম্বন্ধে আমাকে লিখেছিলেন :

"দিলীপ,

আমার সঙ্গে তোমার আলাপের যে-বিবরণ তুমি ছাপাতে চেয়েছ সেটাতে আমার সঙ্গে আলাপ করে আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনে যেসব কথা স্বতই জেগে উঠেছে সেটা প্রকাশ পেয়েছে একথাটা বললে রচনাটির মূল্য কমে না বরং বাড়ে। আমি যে-কথা বলেছি ঠিক তার যন্ত্রকৃত প্রতিলিখনটা অসম্পূর্ণ—তোমার মনে যেসব চিন্তার উদ্রেক হয়েছে সেইটের যোগে সমস্তটা সজীব এবং সম্পূর্ণ। বাণী-ধারার উৎপত্তি যেখানেই হোক তার পরিণতি তোমারই মধ্যে। অর্থাৎ এটা নকল নয়, এটা রচনা। আলাপ-ব্যবহারে রসের রাসায়নিকতা সক্রিয় হ'য়ে ওঠে, দুটো মৌলিক পদার্থে মিলে হ'য়ে দাঁড়ায় যৌগিক, তোমার লেখাটিতে সেই যৌগিকতা প্রকাশ পেয়েছে একথাটাকে চাপা দিলে জিনিষটাকে খাটো করা হয়। যে-প্রক্রিয়ায় রেডিয়ম হ'য়ে যায় শিষে সেটা শোচনীয় তা স্বীকার করি, এক্ষেত্রে তাহ'লে দুই হাত তুলে দোহাই পাড়তুম। খোলসা ক'রে সব কথা ব'লে তুমি ছাপিয়ো, তাতে পাঠকদের পরিতৃপ্তি হবে।

ইতি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯-৬-৩৮।"

কবির কাছ থেকে এত বড় প্রশংসা আমি কোনোদিনই পাই নি। তাই এ

নিয়ে যদি একটু গৌরব করি তাহ'লে আশা করি সেটা সহৃদয় পাঠকপাঠিকা শোভন ব'লেই অনুমোদন করবেন—যেহেতু এ-অনুলিপির সাফল্যের মূলে আছে আমার কবিভক্তি—আত্মাদর নয়।

এ-সম্পর্কে গৌরচন্দ্রিকায় মাত্র আর একটি কথা বলতে চাই। অনেকে দেখতে পাই মনীষীদের কথাবার্তার অনুলিপি রাখা সম্বন্ধে বেশ একটু দোমনা। বলেন এ-বস্তু নিখুঁৎ হয় না।

মানি। কবি মনীষীদের বক্তব্য তাঁদের নিজের কলমে যেমন নিখুঁৎ হ'য়ে ফুটে ওঠে তেমন নিখুঁৎ হ'য়ে ফুটতে পারে না অপরের মনের আয়নায়। কিন্তু কথোপকথন তো শুধু একটা একতরফা প্রকাশ নয়। এর রস হ'ল দুতরফা জিনিষ। দুটো মনের চকমকিতে যে-আগুন জ্ব'লে ওঠে এর রস সেই আলোর রস। রস কথাটার চেয়েও ভালো শব্দ হবে চমক। কারণ এ-রসের মধ্যে শুধু আবেশই তো নেই, আছে চমক—আর আছে পরিচয়ঃ একটা বড় মন আর পাঁচটা মনে কত সহজে রঙ ধরাতে পারে। যাক এবার বলি তার পরের কথা।

কালিম্পঙে আমার পিতৃবন্ধু শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্রজা শ্রীমতী অশ্রুকণার আতিথ্যে রাজোচিত সুখে ছিলাম। কাজেই নড়তে ইচ্ছা ছিল না। ওখানে পৌঁছিয়ে শুনলাম কবি মংপু পাহাড়ে 'উদিতা'-র কবি শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর স্নেহচর্চায় বন্দী। মংপু কালিম্পঙ থেকে ষোল মাইল। কবি লোক পাঠালেন আমাকে সেখানে নিমন্ত্রণ ক'রে। কি করি, যাওয়ার উদ্যোগ করছি এমন সময়ে কবি কল্পনার তৃতীয় দৃষ্টিতে আমার অনুক্ত অনিচ্ছাকে প্রত্যক্ষ ক'রে (নইলে কবি বলেছে কেন ?) লিখলেনঃ

"কল্যাণীয়েষু,

সুসংবাদ। স্বাগতও বলতে পারি কিন্তু এখানে পাছে অসুবিধা ঘটে সে-আশঙ্কাও মনে আছে। প্রথম কারণ, তুমি একান্তই বান্ধবী-বৎসল, বিচ্ছেদের দুঃখ নিয়ে যদি এসো তবে হয় তো বিনাকারণে নিরপরাধে আমাদের প্রতি মন বিমুখ হ'তে পারে। জনশ্রুতি এই যে, এখানকার উপযুক্ত সম্বল পথের মধ্যেই কিঞ্চিৎ আহরণ করেছ—কিন্তু এখানকার সিন্‌কোনা ক্ষেত্রে যথা-পরিমাণে রসসঞ্চার করবার মতো নয়। তাই মনে ভাবছি এখান থেকে কালিম্পঙ গিয়ে সেখানকার মিতালি-মধুর আবহাওয়ার মধ্যেই তোমার অভ্যর্থনা করব, সুবিধা হবে এই যে, সেখানে আমার স্বল্পায়োজনের পূরণ হবে সহজেই। এখানে আমার দুর্গদ্বার অপ্রসিক্ত শৃঙ্খলে আঁট ক'রেই বাঁধা সেজন্যে আশঙ্কা আছে। অল্প মেয়াদের ছুটি

পেতেও পারি। সেখানে তোমার আসর জমবে ভালো—এখানে লোক এত কম যে গান স্বগত-উক্তির মতোই শোনাবে। গুণিজনের পক্ষে জনবিরলতা দুঃখকর, তাতে ঘাতপ্রতিঘাতের প্রবলতা যায় ক্ষীণ হ'য়ে, অনেকখানি দান লুপ্ত হয় শূন্যপথে। সত্যযুগ হ'লে ইন্দ্রদেব আসতেন নেমে, বোধ হয় বান্ধবীদেরও অভাব ঘটত না। কালিযুগে সুরসভার ফাঁক ভরাট করতে অসুরও ঢুকে পড়ে অনেক—সেও ভালো বিশুদ্ধ শূন্যবাদের চেয়ে।

ম্লান হ'য়ে এসেছে আমার দৃষ্টি—লেখাপড়ায় বাধা পাচ্ছি—অন্তত আধা মাইনেতে ছুটি নিতে হবে। এচিঠিতে চিঠির চেয়ে আরো তোমাকে কিছু বেশি দিলুম, সে হচ্ছে আমার চোখের দুঃখ। ইতি ৬।৬।১৯৩৮

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ"—ইতি অবতরণিকা পর্ব।

৯ই জুন, ১৯৩৮

কবি মংপু থেকে এসে উঠলেন "গৌরীপুর নিলয়ে"। গেলাম বিকেলবেলা। কালিম্পঙের সৌন্দর্যের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। দার্জিলিঙের মতন উঁচুনিচু রাস্তা এখানেও—কিন্তু প্রায়ই রাস্তাঘাট অত খাড়া খাড়া নয়। তাছাড়া ঠাণ্ডাও অনেক কম, আর অমন স্যাঁৎসেতে নয়। খুব এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পরেই খটখটে শুকনো। তাই দার্জিলিঙের চেয়ে আরামদায়ক তো বটেই। এখান থেকে তুষার-মৌলিও দেখা যায় মেঘ কেটে গেলে। তখন দার্জিলিঙের কথা আরো মনে হয়।

গৌরীপুর নিলয়ের অভিমুখে যেতে যেতে দুধারে মেঘের সঙ্গে পাহাড়ের সেই লুকোচুরি খেলা। পর্বতপ্রবর অত বৃদ্ধ না হ'লে নিশ্চয় 'টু' ক'রে উঠতেন দুষ্ট মেঘবালার এত শত উঁকি ঝুঁকিতে। জায়গায় জায়গায় নিচের খট্টায় এক ফালি জল চিকিয়ে ওঠে যেন গিরিবালার সবুজ শাড়িতে রুপালি পাড়। ঝর্ণাও দেখা দেয় কোথাও কোথাও। কিন্তু কালিম্পঙে দার্জিলিঙের তুলনায় সবই শান্তমতন। দার্জিলিঙের ঃ

তুঙ্গ মহান্ তুষার বিতান পাগল ঝর্ণা নৃত্য
দিকে দিগন্তে ফুলবসন্তে অপার চমক দীপ্ত

এখানে নেই। কিন্তু আছে পাহাড়ে পাহাড়ে সবুজের তান নীরবতার পটভূমিকায়। আর মেঘের সঙ্গে মাটির কত যে কানাকানি, গলাগলি, ছাড়াছাড়ি—এই ভাব এই আড়ি—

উপরে নীল, নিচে সবুজ জলদপরী লাজুক চোখে ধীরে
ঘোম্‌টা খোলে—ঝল্‌কে ওঠে তুষার-কেতন শিখরমন্দিরে।

ফুলের বাঁশি বেজে ওঠে—আলোর মৃদং অসাঙ্গ-ঝঙ্কার...
অন্তরে বসন্ত জাগে ছায়াঙ্কিত—বিস্ময়বিথার !

সন্ধ্যা ছ'টা। সঙ্গে কণা—অশ্রুকণাকে কণা ব'লেই ডাকেন সবাই।

কবিকে গিয়ে উভয়েই প্রণাম করলাম।

(কুশীলবের নাটকীয় ভঙ্গিই ভালো)

দিলীপ (প্রণাম ক'রে): চোখের দৃষ্টি "ম্লান" হয়েছে লিখেছেন, দেখতে কি কষ্ট হয় ?

কবি : হয় বই কি।

কণা : এ তো সহজ কথা নয়।

কবি : সঙিন। লোকে বলে মানুষ অকৃতজ্ঞ। আমি বলি—বিধাতাও কম যা না। আমি বলি তাঁকে : 'কিন্তু একদিন বুঝবে তুমি যে, তোমার কতবড় ভক্তের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছ। তোমার এ-সৃষ্টিকে আমি যে-ভাবে তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছি, দেখব ভবিষ্যতে কজন দেখে তেমন দরদ দিয়ে। তোমার বিশ্বলীলাকে দেখার সাধ আমার এখনও মেটে নি। অথচ এত বড় পূজার প্রতিদানে কি না তুমি এই পুরস্কার দিলে আমাকে—আমার চোখে পর্দা! বুঝবে একদিন—কিন্তু তখন তোমার হা হুতাশ হবে বৃথা।' কিন্তু যাক সে কথা। আমার সম্বন্ধে তুমি এ করেছ কী বলো তো দিলীপ ? কী ব'লে তুমি তোমার অভিভাষণে রটিয়ে দিলে যে আমি সবাইকে সমান দাক্ষিণ্যে আমার সঙ্গসভায় অভ্যর্থনা করি ?

কণা : ক্ষতি কি ?

কবি : চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?

কণা (হাসিমুখে) : বিষে নাই ভুগলাম, যাতনার কথাটা একটু শুনতে ক্ষতি কি ?

কবি : সে কি একটা যে বলব ? তবে শোনো একটা ঘটনা।

তখন আমি কলকাতায়। এক ভদ্রলোক সটাং আমার শয়নকক্ষে উদয় হ'লেন। বসলেন বিনা বাক্যব্যয়ে একটা কেদারায়। তারপরেই একটা খবরের কাগজ তুলে নিয়েই 'সুপুরি আছে ?—Have you got betelnut ?' তর্জমার তাৎপর্য—পাছে বাংলা প্রশ্নটা আমি বুঝতে না পারি।

কণা : বলেন কি ?

কবি : আর বলি কি !

দিলীপ : কী করলেন তখন ?

কবি : কী আর করব ! বললাম ভয়ে ভয়ে : আনিয়ে দিচ্ছি।

কণা : তারপর ?

কবি : তিনি বললেন : 'দেখুন, আমি ভেবে দেখেছি আপনার সঙ্গ বড় শিক্ষাপ্রদ। আমি তাই স্থির করেছি যে আমার স্ত্রীকে আপনার জিম্মায় রেখে দিই কিছুদিন।' আমি ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললাম : 'না না অতটায় কাজ নেই। তিনি একে ভদ্রমহিলা, তার ওপর এতখানি কষ্ট—'। ভদ্রলোক রুষ্ট হ'য়ে উঠলেন : 'সে কি কথা? কষ্ট হবে ব'লে কালচার চাই নে?'—কিন্তু দেখো হে দিলীপ, এসব যেন তুমি আবার রিপোর্ট ক'রে দিয়ো না। (কণাকে) ওর কাছে কথা বলতে আমার ভয় হয়।

কণা (সহাস্যে) : ভয়ের কারণ নির্মূল হয় নি। সেদিন এখানকার এক ভদ্রলোক আপনার "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি" নিয়ে আপনাকে যেসব প্রশ্নের খোঁচা দিয়েছিলেন, মনে আছে তো ? সেসব দিয়েছেন ছাপিয়ে এক রিপোর্টে।

কবি (করুণভাবে) : জানি। আর সে কী রিপোর্ট !

দিলীপকে যতই বকি ঝকি—অধর্ম করব না—এটুকু তবু আমাকে বলতেই হবে যে ওর হাজারো দোষের মধ্যে এই একটা গুণ আছে যে ও কানে শোনে। বেশির ভাগ সাক্ষাৎকারীরা হয় বোবা, নয় কালা। যারা বোবা তারা ঠায় ব'সে থাকে আমার কাছে এসে। অগত্যা আমাকে বলতে হয় এবছর বৃষ্টি হয়েছে বেশি—অনাবৃষ্টির দিনেও—আর যারা কালা তাদের কাছে আরও বিপদ। আমি যা বলি আর যা আমাকে দিয়ে তারা বলিয়ে নেয় এ-দুয়ের মধ্যে অনেক সময়েই দেখি দা-কুমড়ো সম্পর্ক।

(ত্রয়ীর কলহাস্য)

দিলীপ : যাহোক ভাগ্য ভালো যে, একটু প্রশ্রয়ের দম্‌কা বাতাসের আভাস পেলাম—

কবি (হাসিমুখে) : আহা, এ-আভাসকে নিবিড় করতেই তো আমি চ'লে এলাম মংপু পাহাড় থেকে তোমার আসরে।

দিলীপ : কিন্তু না এলে আমি যেতাম—

কবি : না হে না। সেখানে মৈত্রেয়ীদের বাড়িতে আমরা ক'টি প্রাণী ছাড়া আর কেউ নেই। অতটা জনবিরলতা তোমার সইত না।

দিলীপ (সানুযোগে) : আমি শান্তি সইতে পারি নে এই নিদারুণ অপবাদ—

কবি : খুবই কি ভিত্তিহীন ? (কণার দিকে চেয়ে) কি বলো গো তুমি ? যা রটে তার কতক তো বটে।

কণা : এক্ষেত্রে প্রায় পনের আনাই।

কবি : ঐ দেখ। তোমার বান্ধবীরা কে না বলবে যে তোমার যেখানেই আবির্ভাব হয় সেখানেই আসর সরগরম হ'য়ে ওঠে ? নির্জনতা—ও সইতে পারি আমরা—সবাই জানে।

কণা : আপনি পারেন নির্জনতা সইতে ?

কবি : পারি না ? চিরটা জীবন যার কাটল নিঃসঙ্গে !

দিলীপ (উদ্যতা কণাকে বাধা দিয়ে) : প্রতিবাদ কোরো না কণা, শুনে যাও। মেকলের কথা মনে নেই ?—সেই যে কথা তিনি মিল্টন সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে no person can be a poet without a certain unsoundness of mind.

কবি : আহা হা ভিড় ক'রে ঠেঙিয়ে এসে যারা আমাকে দিয়ে নিজের কার্যোদ্ধার ক'রে নিয়ে যায় তাদের সঙ্গকেও কি সঙ্গ বলতে হবে না কি ? সঙ্গ মানে মনের মানুষ। এ-বিষয়ে তোমার জুড়ি নেই—তুমি সহজেই পাও ওদের।

(শ্রীমতী কণার রুপালি হাস্য)

কবি : সত্যি হে, জানো—তুমি অনেকের শত্রুতা কুড়িয়েছ এইজন্যে। হবে না ? বলো তো কী বেপরোয়া ভাবেই লিখে যাও তোমার বান্ধবী-বৎসলতার কথা—তোমার "তরঙ্গ রোধিবে কে" বইটির পাতা উল্‌টোতে উল্‌টোতেও এই কথাই মনে হচ্ছিল। আমাদের ও সুযোগ কোথায় ?

দিলীপ (ঈষদ্ধাস্যে) : শেক্ষপীয়র বলেছিলেন Poetry tells lies.

কবি (করুণনেত্রে কণাকে) : বিশ্বাস করে না কেউ ! আরে, ওরকম সুযোগ যদি আমার থাকত তো—তুমিই বলো না—দিলীপকে নভেলিয়ানায় আমি হারাতে পারতুম না ?—কী সব কাণ্ডই যে লিখতাম—মনেই আছে। কিন্তু—আমাদের কোথায় বলো তেমন আকর্ষণ ?

(অথ কণার হাস্য)

দিলীপ : কণা, তোমার মুখে হাসি দেখে মনে হ'ল স্কটের একটা কথা কবিদের সম্বন্ধে—যে তারা হ'ল

A simple race that waste their toil
For the vain tribute of a smile ?*

* কবিরা সরল ! পণ্ডশ্রম কত না করে
একটি অসার হাসির পুরস্কারের তরে।

কবি: আরো না হে না, আমরা হ'লাম কবি। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোথায় তুলনা? তোমরা হ'লে গুণী—নগদ বিদায় পাও হাতে হাতে—জনস্রোতের দাবির হাওয়ায় তোমাদের গানসাগরে ওঠে ঢেউ। আমাদের দানসাগর সে-তুলনায় স্থির বড় জোর একটু আধটু হিল্লোল—ঐ যা বললে হাসির। কিন্তু তোমাদের পুরস্কার কল্লোলে—করতালিতে।

দিলীপ: কিন্তু ক্ষতিপূরণের বেলা? আমরা গান গাইলাম—রইল না। কিন্তু আপনারা লিখলেন, রইল চিরন্তনীর সভার জন্যে, ভাবিকালের জমার খাতায়।

কবি: একটা কথা বলি, সত্যি বলছি এ 'কবিত্ব' নয় কণা, বিশ্বাস কোরো। আমি সত্যি বুঝতে পারি না মানুষের কেন এত কাঙালপণা এই ভাবিকালের প্রসাদের জন্যে। লিখি, আনন্দ পাই, মনে আলো যায় বিছিয়ে—এই তো বেশ। ভাবিকালের বিচারে এসব টি'কবে কি না, রসোত্তীর্ণ ব'লে গণ্য হবে কি না এ-সব নিয়ে কেন মিছে এত বাদবিতণ্ডা তর্কাতর্কি দাপাদাপি বলো তো? যাদের জানব না দেখব না শুনব না—না না দিলীপ, তোমাদের অদৃষ্ট ঢের বেশি ভালো এদিক দিয়ে। নগদবিদায়ের 'মর্যাদা' যদি না-ও মেলে, 'মূল্য' তো থাকবেই। আমরা হয়ত এ ও পাব না, ওতেও হব বঞ্চিত।

দিলীপ: আপনি কি তাহ'লে বলতে চান যে গ্রহীতার স্বীকার অঙ্গীকার একেবারেই অবান্তর?

কবি: ঠিক তা বলিনে। আমি কি বলি শুনবে? (একটু থেমে) সত্যি বলছি আমি নিজের রচনার প্রতি নিষ্ঠুর। এক সময়ে ছিল—প্রথম বয়সে—যখন চাইতাম অন্যের দরদ স্বীকার অঙ্গীকার। আজকাল মনে হয় এ-চাওয়া ভুল।

কণা: একেবারেই ভুল?

কবি: না, প্রথম দিকে একটু সার্থকতা আছে—দরদের। কারণ ললিত-সৃষ্টিতে প্রথম দিকে মানুষ খানিকটা চলে আধছায়া আধআলোর রাজ্যে তখন অপরে যদি উৎসাহ দেয় তাহ'লে দেখা যায়—ছায়া কাটে, আলো বাড়ে। সে-সময় তাই বড় কৃতজ্ঞ বোধ হয় যখন দেখি যে, আমি যা উপলব্ধি করছি অপরের মনেও তার রং ধরছে - তাই না তারা সায় দিল প্রশংসার ঢেউ তুলে। কিন্তু পরে—যখন আমাদের মধ্যে আত্মপ্রতীতি দানা বাঁধে, গোধূলির ছায়া যখন আলোর কাছে হার মানে, তখন কী দরকার অপরের স্বীকৃতির? তখন কী মনে হয় না—আমি যা পেয়েছি তা যখন নিশ্চয়ই পেয়েছি, তখন অপরের না-করায় তো আর সেটা না-পাওয়া হ'য়ে যেতেপারে না? আনন্দ হল সৃষ্টির অনুষঙ্গী নিত্যসঙ্গী—সে যখন এসে বলে অহময়ং

ভোঃ—আমি আছি হে, তখন তাকে নামঞ্জুর করবে সাধ্য কার? কাজেই তখনো কেন আমরা হাত পাতব অপরের কাছে—তা সে আমাদের সমসাময়িকদের কাছেই হোক, বা নিত্যকালের ভাবী সভাসদদের কাছেই হোক? স্বয়ং আত্মপ্রতীতি যখন শিরোপা দিল তখন অপরের সেলামি তৃপ্তি দিতে পারে কিন্তু অপরিহার্য সে নয়।

দিলীপ: আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে ঢের বেশি, তাই আপনার সামনে এ বিষয়ে কিছু জোর ক'রে বলতে বাধে। তবে আমার কি মনে হয় বলব?

কবি: বলো না।

দিলীপ: আমার মনে হয় সব সৃষ্টিপ্রেরণারই একটা বৃত্ত আছে—circuit: একথা সত্য যে, স্রষ্টা যখন রূপ সৃষ্টি করেন, করেন নিজের অন্তরের তাগিদেই—আর এ-তাগিদের অনুকূল হাওয়ায় যে ফুল ফুটে ওঠে সে স্বয়ংসার্থক স্বয়ংসিদ্ধ। কিন্তু তবু মানুষে মানুষে যে-ঐক্যবোধ আছে তাকেও এ সৃষ্টিলোকে আমরা সঙ্গী চাই। দান করে মানুষ দাক্ষিণ্যের তাগিদেই বটে, কিন্তু দানের উল্টোপিঠে গ্রহণ যখন থাকবেই তখন কী ক'রে বলব দান এক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মসিদ্ধির দ্বীপাবদ্ধ? ভালোবাসার ক্ষেত্রে একথাটি মিলিয়ে দেখলে মন্দ কি? ভালোবাসি ভালো না বেসে পারিনে ব'লেই—তার পরম বিকাশ অহৈতুকী আত্মদান—কিন্তু তবু ভালোবাসার সাড়া পেলে সে যেমন অপরূপ হ'য়ে উঠে, মন ভ'রে ওঠে,—স্নেহের কোনো প্রতিদানই না মিললেও তেমনটি হয় কি? শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণের অহেতুক প্রবর্তনায়—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাড়া না দিলে শুধু যে কাব্য গ'ড়ে উঠত না তাই নয়—ছবিও কি অসম্পূর্ণ থেকে যেত না? বাস্তবিক দেওয়া-নেওয়া চাওয়া-পাওয়া এ দুই হ'লে তবেই হয় বৃত্ত সম্পূর্ণ—circuit complete: এইজন্যেই—আমার মনে হয়—স্রষ্টা এত বেশি দুঃখ পায় যখন অপরে তাকে মানে না, যেহেতু সুষমার সবচেয়ে বড় শত্রু অমিলের দুঃখ।

কবি: আমি সাড়ার আবশ্যকতা অস্বীকার করি নি—সে যে তৃপ্তি দেয় এ-ও কে না মানবে? কিন্তু আমি বলি কি, দেয় মানুষ দেওয়ার সহজ আবেগেই। দেখ না কেন, জগতে এমনও তো বহুবার হয়েছে যে স্রষ্টা যে-সৃষ্টি করেছে তার কোন স্বীকৃতিই তার ভাগ্যে জোটে নি তার সমসাময়িকদের কাছ থেকে। কিন্তু তবু যখনই তার অন্তরে উপলব্ধির আলো জ্ব'লে উঠেছে তখনই সে জেনেছে যে সে যা পেয়েছে তা সত্য। এ যখন সে জানল তখন কেন সে হাত পাতবে অপরের কাছে, কেন দুঃখ পাবে যদি দেখে সে নিজে যা জানল অপরে তা মানল না?

গানের উদাহরণ দিয়ে বলি একথা আরো বিশদ ক'রে।

দেখ, আমি যখন গান বাঁধি তখনই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই। মন বলে—প্রবন্ধ লিখি বক্তৃতা দিই কর্তব্য করি এসবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম :

যবে কাজ করি প্রভু দেয় মোরে মান :
যবে গান করি—ভালোবাসে ভগবান।

একথা বলি কেন? এইজন্যে যে, গানে যে-আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন ক'রে নতুন ক'রে। এই বোধ যে, জীবনের হাজারো অবান্তর সংঘর্ষ হানাহানি তর্কাতর্কি এসবের তুলনায় বাহ্—এই ই হ'ল সার বস্তু—কেননা এ হ'ল আনন্দলোকের বস্তু যে-লোক জৈবলীলার আদিম উৎস। প্রকাশলীলায় গানের সুষমা সব চেয়ে সূক্ষ্ম—ethereal তাই তো সে অপরের স্বীকৃতির স্থূলতার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়, নিজের হৃদয়ের বাণীকে সে রঙিয়ে তোলে সুরে। যেমন ধরো যখন ভালোবাসার গান গাই তখন পাই শুধু গানের আনন্দকেই না—ভালোবাসার উপলব্ধিকেও মেলে এমন এক অভিনব নৈশ্চিত্যের মধ্যে যে, মন বলে পেয়েছি তাকে যে অধরা, যে আলোকবাসী, যে "কাছের থেকে দেয় না ধরা দূরের থেকে ডাকে।"

কিন্তু তা ব'লে একথা মনে ক'রে বোসোনা যেন যে নিত্যকালের সাড়াকে আমি অস্বীকার করছি। বরং নিত্যকালকে মানি ব'লেই বর্তমান কালকে অতি-স্বীকারের মর্যাদা দিতে বাধে। না বেধেই পারে না, কারণ প্রতি যুগের মধ্যেই আছে বটে কয়েকটি নিত্যকালের মন—যাদের নাম রসিক মন—কিন্তু বাকি সব? তাদের মন তো নিত্যমন নয়, সত্য রসিক তো তারা নয়। অতীত কালের সাড়া দেবার নানান্ ধারা পর্যালোচনা ক'রে ও ভাবী কালের সাড়া কল্পনা ক'রে তবে একথা বুঝতে পারি, চিনতে পারি তাদেরকে যাদের জন্যে গান বাঁধি, কবিতা লিখি।

বর্তমান কালের বহু মনই ঘুলিয়ে রয়েছে বর্তমানের হাজারো ঝড়তুফানে, দুলছে সর্বদাই পক্ষপাত-বিদ্বেষ, উচ্ছ্বাস বিরাগ, উৎসাহ-আক্রোশের নাগরদোলায়। তাই তো তাদের বিচার সুবিচার হ'তেই পারে না, তাই তো দক্ষিণা চাইবার সময়ে বিপুলা পৃথ্বীতে নিরবধি কালের সমানধর্মীকে ডাক পাড়তে হয়। এ হেন দরদী মন অবশ্যই অবান্তর নয়—তোমার ভাষায়, তাকে নইলে বৃত্ত ঠিক সম্পূর্ণ হয় না। (একটু থেমে) তাছাড়া চিরন্তনীর সভাসদদের সাড়ার মূল্য আরো দিতে হয় যখন দেখি সমসাময়িক গ্রহীতাদের পনের আনা সাড়ার মতন-সাড়া দিতে পারে না। দেখ, সাহিত্যের ব্যবসা এদিক দিয়ে বড় দুঃখের ব্যবসা। এমন অভাজন

নেই দেখবে, যে ভাবে না যে তার মত দেবার অধিকার আছে কোনটা সুকাব্য কোনটা কু। সাহিত্যের পরিষদে জজ ও জুরি নয় কে? কে না ভাবে সে অভ্রান্ত? বহু সাধনায়, বহু পরীক্ষায় বহু পরিশ্রমে কবি যে-রূপ গ'ড়ে তুললেন দুকথায় তার বিচার সারা হ'য়ে গেল এদের হাতে: রবিঠাকুর সোনার তরীর মতন কবিতা আর লিখতে পারলেন না—আজকাল কী যে সব ছাইভস্ম লেখেন—এই ধরণের সব মন্তব্য। তবে এজন্যে দুঃখ তত নেই স্রষ্টার দিক দিয়ে—দুঃখ হয় বেশি গ্রহীতার কথা ভেবে।

দিলীপ: কথাটা—

কবি: শোনো বলি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে।

য়ুরোপে প্রথম যৌবনে যখন আমি ওদের গান শুনতে যাই তখন আমার ভালো লাগে নি। কিন্তু আমি দেখতাম সার বেঁধে পর পর ওরা দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—টিকিটের জন্যে। কী যে আগ্রহ, কী যে আনন্দ ওদের—কন্সার্ট হলে ভালো গান শুনে—দেখেছ তো তুমিও স্বচক্ষে। প্রথম প্রথম আমি বুঝতাম না ওদের গান। কিন্তু ভাব'লে একথা কখনো বলিনি যে, ওদের কী যে সব বাজে গান! বলতাম: আমিই বুঝতে পারছি না এর মর্ম ওদের গানের ইডিয়ম জানি নে ব'লে, শিখিনি ব'লে। অর্থাৎ ওদের গানে প্রথম প্রথম আনন্দ না পেলেও এমন অশ্রদ্ধার কথা কোনোদিন বলিনি যে, আনন্দ পাওয়াটা ওদের অন্যায়।

এইখানেই আসে শ্রদ্ধার কথা—তুমি যাকে বলছ সাড়ার বৃত্ত তা পূরে ওঠে এই শ্রদ্ধা থাকলে তবেই। কিন্তু এসব সময়ে সাড়া না পাওয়াটা স্রষ্টার কাছে যতখানি দুর্ভাগ্য—তার দশ গুণ দুর্ভাগ্য তাদের—যারা সাড়া দিতে পারল না। আক্ষেপ হয় সত্যিই তাদের কথা ভেবে। কারণ স্রষ্টা যখন সত্য সৃষ্টি করলেন তখন গ্রহীতারা সবাই মুখ ফেরালেও তাঁর আনন্দের তো মার নেই—তিনি তো পেলেন সৃষ্টির আলো আকাশ বাতাস আনন্দ। কিন্তু যে-দুর্ভাগা এ-আলোয় এ-হাওয়ায় এ-আনন্দে সাড়া দিতে পারল না, কিছুই পেল না, তার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কার বলো?

(নিশ্চুপ)

কবি: এইজন্যেই আমি বলি যে, আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তারা যে নেয়, নিতে পারে, তার প্রথম কারণ: তাদের মধ্যে সহজেই স্নেহের সম্ভ্রম ওঠে জেগে, দ্বিতীয় কারণ: তাদের মধ্যে নেই পৌরুষ প্রতিযোগিতার ভাব। কিছু মনে কোরো না দিলীপ, এদিক দিয়ে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই

আমাদের বেশি উস্কে দেয়। কারণ বেশির ভাগ পুরুষেরাই অন্য পুরুষদের কৃতিত্ব-বিচারের সময় মনে মনে একটা বিমুখতা অনুভব ক'রে থাকে। জানি না এ তুমি অনুভব করেছ কি না।

দিলীপ: করেছি। আর শুধু আমি না আরো অনেকেই করেছেন। কোথায় একবার পড়েছিলাম:

> Poets are Sultans if they had their will
> For every author would his brother kill *

কবি: (ঈষদ্ধাস্য)

দিলীপ: হাসি নয়, আপনার একথা শুনে আমার নিজেরও একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। শুনুনই না—কারণ এটা ব্যক্তিগত হ'লেও বোধ হয় সাধারণ ভাবে সত্য। অন্তত এতে আপনার কথার পুরো সমর্থন মেলে।

জানেন হয়ত, কেসর বাই প্রথমদিন কন্‌ফারেন্সে গায় "দ্রৌপদী পুকারী" ব'লে একটা ভজন। আমি কাগজে লিখেছিলাম যে, কেসর বাইয়ের খেয়াল অপূর্ব বটে, কিন্তু ভজন বা কাব্যসঙ্গীত তাঁর স্বধর্ম নয়, যেহেতু তাঁর গানে কথার কাব্যরস বা ভজনের ভক্তিরস সুরের চকিবাজির সঙ্গে মিশ খায় না।

এর পরে বাইসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই তাঁর হোটেলে। দেখলাম বাইসাহেব আমার প্রতি বেশ একটু অপ্রসন্ন। বললেন: তিনি ভজন গাইতে জানেন না একথা আমি কাগজে লিখলাম কেন? লোকে কী ভাবল ইত্যাদি। সে অনেক কথা।

যাই হোক তারপর তিনি আমাকে শোনালেন নানা ভজন। শেষে অনুরুদ্ধ হ'য়ে আমি গাইলাম শ্রীমতী রাহানার একটি ভজন যার বাংলাটা গ্রামোফোনের দৌলতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে:

সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই
আজো পড়ে মনে সখি, পড়ে যে কেবলি মনে
সেই আলোর দুলাল শ্যামলের প্রেম ছবি
আজো পড়ে মনে সখি, পড়ে যে কেবলই মনে।...ইত্যাদি মূল হিন্দিটা হ'ল—

সো বৃন্দাবনকী মঙ্গললীলা
য়াদ আওয়ে, য়াদ আওয়ে

---

* কবিদের নাম সুলতান তারা সহোদর মহাচণ্ড,
ভাই-ভাই মুখে, এ দেয় উহারে আনন্দে প্রাণদণ্ড।

কৃষ্ণ কনৈয়া ছৈল ছবীলা

য়াদ আওয়ে য়াদ আওয়ে...ইত্যাদি

বললে হয়ত বিশ্বাস করবেন না শুনতে শুনতে বাইসাহেবের চোখ জলে ভ'রে এল প্রায়—গান শেষ হ'লে ছলছল চক্ষে আমাকে নমস্কার ক'রে বললেন:

"ঐসা ভজন মৈ কৈসে গাউঙ্গি বাতাইয়ে?"—বলাই বেশি দরদিনীর সঙ্গে দেখতে দেখতে খুবই ভাব হ'য়ে গেল।

কিন্তু দেখুন, আগে বিমুখ থেকেও তিনি প্রসন্ন হ'লেন আমার গান শুনবামাত্র। পুরুষ ওস্তাদদের ক্ষেত্রে এ কখনো ঘটতে পারত না—আমি বাজি রেখে বলতে পারি। তাঁরা কোনোদিনই আমার গান ভালো বলেন নি, বলবেন না, বলতে পারেন না। তাঁদের মতে আমার গান কিছুই না। কিন্তু কেসর বাই বিশুদ্ধ ওস্তাদিতেও যিনি কোন পুরুষ ওস্তাদদের চেয়েই কম নন এবং গানের কলাকারুতে এখন যাঁকে প্রায় অদ্বিতীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না তিনিও আমার গান শুনতে না শুনতে আমার সঙ্গে দরদের একটা সহজ স্তরে মিললেন তো এসে। কারণ এ-মিল যদি না থাকত সাধ্য কি তাঁর মন ভেজাই? সত্যি বলতে কি বাইরে যখন তিনি অপ্রসন্ন তখনও অন্তরে যে তিনি আমার প্রতি বিরূপ নন এ-অনুভবটি সেদিন আমার কাছে বড় বিচিত্রভাবে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছিল।

গানের আসরে মেয়েদের কাছে এই গ্রহিষ্ণু শ্রদ্ধা—এই গৃহ্নামি-র ভাব আমি অনুভব করেছি তাদের দরদের স্নেহের প্রত্যক্ষ স্পন্দনে। তাই তাদের আবির্ভাব হ'লে আমার গান ভালো হয়—এবং তাদের নৈযুজ্য থাকলে বিশুদ্ধ গোঁফদাড়ির জাঁকালো আসরে আমার গান জমে না—এ আমি বহুবার ঠেকে শিখেছি। কণাও জানে।

কণা (সলজ্জে): কী যে বলেন।

কবি (তৎপর): বলেন ঠিকই গো। না না দিলীপ, বলো—ওঁদের কথা বলো—বার বার বলো—ওদের সলজ্জ আপত্তির ভান সত্ত্বেও সুর ক'রে বলো—আমিও দোয়ার দেব ভয় নেই—যে, "তোমা বিনে কোথা মোর শক্তি?"—বিশেষত বাঙালি মেয়েকে।

দিলীপ (হেসে): ঐ তো—

কবি: আমিও বলি—ঐ তো। ঐখানে কিছুতেই তোমাদের সঙ্গে আমি মিলতে পারব না। বিলিতি মেয়েদের সব ভালো তোমাদের কাছে—এমন কি গায়ের রঙও! ধিক্। ও যে মৃত্যুর রঙ একথা বুঝবে তোমরা কবে?

কণা: আপনার ভালো লাগে না অমল ধবলতা?

কবি: পাল সম্বন্ধে হ্যাঁ, কিন্তু মেয়েদের রঙ সম্বন্ধে—না। আমার ভালো লাগে শাম্‌লা মেয়ে—শাদার ওপর ছায়া পড়লে তবে আমার মন নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

দিলীপ (কণাকে); ক্ষমা কোরো কণা, দুটো স্পষ্ট কথা বলবই প্রতিবাদে। (কবিকে)

দেখুন, শ্যামলিনীদের মধ্যে এমন একটা সুষমা আছে যা অন্যত্র মেলা ভার এ আমারো মনে হয়েছে, যদিও আমি বিদেশিনীদেরও ভালোবাসি কবুল করছি। কিন্তু তনুশ্রীর কথা মুলতুবি রেখে একটা কথা বলবই যে, ওদেশের মেয়েদের মধ্যে এমন একটা তেজস্বিতা, এমন একটা মনের প্রসার চোখে পড়ে, যা এদেশীয়াদের মধ্যে বড় একটা পড়ে না।

কবি (গম্ভীর): কণার রেগে ওঠা সঙ্গত। কিন্তু মেয়েদের স্তাবক ব'লে একটা বদনাম আমার থাকলেও আমিও স্পষ্টবাদী হ'তে পারি হে। অন্তত তোমার এ-তুলনায় সায় দিয়ে আমার কলঙ্কভঞ্জন খানিকটা তো হোক। ওদের দেশের মেয়েদের মধ্যে একটা তেজস্বিতা আছে বৈ কি। আমি বলি প্রায়ই যে, ওদের স্নেহ-ভালোবাসার মধ্যেও একটা character আছে—না না কণা, রাগ করো না। শোনো কিন্তুটা শেষ করি—।

কিন্তুটা কি জানো দিলীপ! আমি বলি কি, মেয়েদের মেয়েলি সুষমাটাই ভালো—এত বেশি প্রসার কেনই বা? ওদের বেশি প্রসার হলে আমরা নাগাল পাব কী ক'রে? আহা—আমি বলি সকৃতজ্ঞে—আমাকে কেন্দ্র ক'রেই ওদের আদর যত্নের অত্যাচারে বিকশিত হ'য়ে উঠুক না—সেটিই বা কী সৌন্দর্যে কম? বিশেষ যদি এ-অত্যাচার পরিবেষন করেন পরমাসুন্দরীরা?—না—খেতেই হবে—ও শুনব না—শরীরকে যত্ন করতেই হবে আপনাকে—কোথায় যাবেন—ছাড়লে তো!

(ত্রয়ীর কলহাস্য)

১০-৬-১৯৩৮

পরদিন ভোরবেলা উঠেই কবিসন্দর্শনে যাত্রা। একাই এযাত্রা।

পাহাড়ে বর্ষা—কখন কোত্থেকে হানা দেয় বোঝা যায় না। পথে খুব এক পশলা হ'ল। মেঘের সে কী চক্রাকারে গর্জানি! কড় কড় শব্দের কী দাপট! কিন্তু বর্ষালো না তেমন, ছাতার দৌলতে মাথা বাঁচল কিন্তু পাদুকা কাতরোক্তি শুরু করল।

সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া চলে না—সামনে মেঘের এতই অপরূপ অভিযান। কখনো হেলে, কখনো দোলে, কখনো ঘুরে ঘুরে টলতে টলতে চলে শিখরগুলি টপ্‌কে টপ্‌কে।

আর সাদায় সবুজে মাখামাখি। সঙ্গে জলধারার তির্যক তালে গাছগুলোর মর্মরিকা রাগিণীতে সে যে কী তাণ্ডবনৃত্য! জল মানুষের আদিম কালের বন্ধু—কিন্তু স্থলের সঙ্গে তার এখনো তেমন শান্তির সম্বন্ধ হয় নি। সে যেন চায় হারানো প্রজাকে ফিরে পেতে। স্থলও ছাড়ে না—কাজেই জলও থেকে থেকে হুস্ হুস্ শব্দে কখনো বা মেঘলা চোখের কান্না জুড়ে দেয়, কখনো বা বৈদ্যুতিক স্বরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে সন্ধিপত্র খান খান ক'রে ছিঁড়ে ফেলে প্রতি গাছের পাতাকে টান মেরে। গাছগুলো বলে "করছ কী?—কথা দিয়েছিলে—" আর কথা! তাই বোধ হয় মানুষ মানুষের সঙ্গে আজও সন্ধি করে এম্‌নি ব্যর্থ স্বাক্ষরে।

প্রকৃতি মানুষকে তাঁর এই চঞ্চলতা শিখিয়ে ভালো করেছেন না মন্দ সে-বিষয়ে মনস্থির করবার আগেই কবিদর্শন।

প্রতিমা দেবী কফি দিলেন। কবিও দিলেন চুমুক।

কবি: আহা—এই মিষ্টিটুকু—

দিলীপ: না না—(ইত্যাদি ইত্যাদি)

প্রতিমাদেবী: একটুও কিছু—এই টোস্টটা?

দিলীপ: না না—(ধন্যবাদ দেওয়া মুস্কিল ব'লে আরো মুস্কিল)

* * *

কবি: তোমার নিজের গানগুলির রেকর্ডগুলো শুনলাম। গানের architectural দিকটার দিকে তোমার বেশি দৃষ্টি মনে হয়—কিন্তু আমি এ-ধরণের গান ছাড়াও আর এক ধরণের গানের পক্ষপাতী যে-সব গান intensely lyrical.

দিলীপ: আমিও ভালবাসি, তবে গ্রামোফোনে হাসি (উমা) যে গানটা দিয়েছে সেটা হয়ত একটু কঠিন—কিন্তু ওকে আমি কঠিন গানই শেখাচ্ছি এখন—অমন গলা তো পাব না বেশি।

কবি: সত্যি সেকথা। আমি এসব শেখানোর বিপক্ষে কিছু বলছি না—আমি শুধু বলছি যে হাসির মতন কণ্ঠ মিললে লিরিকাল গান শিখিয়েও খুব আনন্দ পরিবেশন করা যায়। (হঠাৎ) কিন্তু সুকণ্ঠ কত কম মেলে, না?

দিলীপ: সত্যি। বিশেষত যে-সব কণ্ঠে দরদ ফোটে সে-জাতের কণ্ঠ! অন্তত আমাদের দেশে। ওদের দেশে মেলে কিন্তু।

কবি: সত্যি কথা। আমাদের দেশে কত খুঁজি দরদী গলা—পাই না হে! কিন্তু ওদের দেশে কত বেশি পাওয়া যায়! আমার মনে আছে জার্মানিতে ডার্মষ্টাড সহরে একবার একটা শিল্পপ্রদর্শনীতে ওদের একদল কৃষাণ ও কৃষাণী কোরাস গেয়ে

আমাকে অভ্যর্থনা করেছিল। আগে থেকে একটুও তৈরী ক'রে রাখেনি সে-গান। সে-সমাদরে আমি এত আনন্দ পেয়েছিলাম আরো এইজন্যে যে, ওরা গাইলো অতি চমৎকার।

দিলীপ : গানের আরো চর্চা হ'লে সুকণ্ঠ আমাদের দেশেও মিলবে এ নিশ্চয়। তবে একটা কথা আমার মনে হয় এ-সম্পর্কে : আমাদের দেশে কণ্ঠমাধুর্যের যথেষ্ট মূল্য আমরা দিই না ব'লেই বোধ হয় আমাদের মাটিতে কণ্ঠকৃতিত্বের ফসলই ফলে বেশি—আমরা ভুলে যাই কণ্ঠমাধুর্যের মহিমার কথা। তবে ক্রমশ আমরাও কণ্ঠমাধুর্যের মর্যাদা দিতে শিখছি বৈকি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন, শচীন দেব, রেণুকা, সাহানা, হাসি, যূথিকা এদের কণ্ঠ যে লোকের এত ভাল লাগে এতে আমি খুশী। তাই মনে হয় সাড়াটা আসছে ক্রমে এদিকে। হয়েছে কি জানেন? এই সব পেডাণ্টদের এখনো প্রতিপত্তি রয়েছে—যদিও এ-প্রতিষ্ঠার এখন কৃষ্ণপক্ষ—অমাবস্যা এলো ব'লে। তখন গানের রসদানের ক্ষমতা ও প্রতিভাকেই লোকে বেশি মানবে কণ্ঠমাধুর্যের সহযোগে।

কবি (খুশী) : যা বলেছ। আমার এ-বিষয়ে একটা উপমা প্রায়ই মনে হয় জানো? একদল রাঁধিয়ে আছেন তাঁরা রান্নার নৈপুণ্য মালমশলা মেশাবার কৌশল, নানান্ বিরুদ্ধ ব্যঞ্জনের সামঞ্জস্য—এইসবকেই বড় বলেন। তাঁরা রাঁধতে রাঁধতে পাকা দ্রৌপদী হ'য়ে বেমালুম ভুলে যান যে রান্নার নৈপুণ্য ভালো জিনিষ হ'লেও আরো ভাল জিনিষ হচ্ছে আহার্যের সুতারের মহিমা, আনন্দদানের শক্তি। আমাদের দেশে তথাকথিত ওস্তাদদের রাগরাগিণীর চুলচেরা বিশ্লেষণ দেখে শুনে আমার কেবলই মনে হয় এই কথা যে, এরা ওস্তাদ রাঁধিয়ে কিন্তু রসিক খাইয়ে নয়। আমাদের মধ্যে এই নম্র স্বীকারোক্তির সময় এসেছে যে, ভালো গান ভালো সুর যে পরিবেষন করে তার ভালোত্বটাই বড় জিনিষ, সে কী উপায়ে সেটা করল সেটা তার নিজের কথা—আনন্দ যারা পেল তাদের কাছে সেটা বাহ্য।

দিলীপ (সোৎসাহে) : কী চমৎকার ক'রে বলেছেন কথাটা। আমি ঠিক এই কথাই সেদিন লিখেছি কেসর বাইয়ের গানসম্পর্ক যে, তিনি গান্ধারী রাগের গান্ধারীত্ব নিখুঁত দেখাতে পারলেন কি না তাঁর গানের খাঁটি রসবিচারে সেটা অবান্তর—একেবারেই অবান্তর। একথা শুনলে শুধু ওস্তাদরাই নন শিক্ষিত গানজ্ঞরাও হাতে মাথা কাটতে ছুটবেন আমার। কিন্তু মরণাপন্ন হ'লেও শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে আমি বলব—তোমাদের মারিবে যে বাড়িবে বাড়িবে সে। এ হন্তা ও হন্ত্রীর নামই হ'ল সুরদরদী কোকিলকণ্ঠ ও কোকিলকণ্ঠী।

—কেবল একটা কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে বলবেন খুলে আপনার মত?

কবি: অকুতোভয়ে।

দিলীপ: আমার মনে হয় সময়ে সময়ে যে গান শেখাতে হলে আমাদের দেশের কোকিল-কণ্ঠীদের শেখানো হয়ত পণ্ডশ্রম। কারণ তারা ভালোবাসে না গান। শিল্পে তাদের "প্রীতি" থাকতে পারে কিন্তু "প্রেম" নেই। সরল বাংলায়, শিল্পপ্রেম পুরুষেরই একচেটে, মেয়েদের নয়। এখানে ভালোবাসা বলতে আমি বুঝছি যা ভালোবাসি তার জন্যে কষ্ট সইতে চাওয়া —শুধু গান ভালোলাগাকেই বলা চলে না গান-ভালোবাসা।

কবি: তোমার সঙ্গে আমি একমত। হয়েছে কি জানো? মেয়েরা—অন্তত আমদের দেশের মেয়েরা—যতই কেন না গান গাক কবিতা লিখুক নাচ শিখুক, বিয়ে হ'লেই তারা আত্মসমর্পণ করে একমাত্র ঘরকন্নার কাছে। মুখে তারা যতই হাঁকডাক করুক না কেন, তাদের মনপ্রাণ মানে এক ঘরকে। ভবিষ্যতে হয়ত তাদের মধ্যে এ-সাহস গ'ড়ে উঠবে যার জোরে তারা অকুতোভয়ে বলতে পারবে যে, ঘরকন্নার চেয়ে নাচ গান কবিতা বড়—কিন্তু এখনো সে দিন সুদূর। তবে ওদের তরফের কথাটাও ভেবো। প্রকৃতি বেঁধেছে ওদেরকে আষ্টেপিষ্টে। তাই গৃহ সংসার ছেলে মেয়ে এসবের কাছে ওরা ধরা না দিয়ে পারে না। এইজন্য সত্যিই সময়ে সময়ে তোমার মতন আমারও মনে হয় যে, মেয়েদের নাচগান শেখানো পণ্ডশ্রম। তবে আশা করি ভবিষ্যতে মেয়েদের মধ্যেও এ-চেতনা আসবে যে, মানুষ বিধাতার কাছে যা পায় তার বেশি যতক্ষণ না দিতে চায়—যতক্ষণ না বোঝে যে, ভগবানের কাছেও ঋণী থাকতে নেই—বরং সে-ঋণ সুদে আসলেই ফিরিয়ে দেওয়ার নামই মনুষ্যত্ব, ততক্ষণ তারা মেয়েই থেকে যাবে, মানুষ হবে না।

দিলীপ (হরষে বিষাদ): সত্যি কথা। আমাদের দেশের মেয়েরা এখনো বোঝে নি যে, ভগবানের কাছে তারা যা পায় তার মর্যাদা দিতে তারা একটুও শেখেনি। আপনি 'বলাকায়' ভগবানকে বলেছেন না যে, জৈবলীলায়,

আর সকলেরে তুমি দাও
শুধু মোর কাছে তুমি চাও?

তবে ভবিষ্যতে এ-চেতনা আমাদের মেয়েদের মধ্যেও আসবে যে, ভগবান তাদের কাছেও চান কলাসৃষ্টি। অন্তত এ-আশা আমার আছে। কিন্তু সদুঃখে বলতে আমি বাধ্য যে, এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশের মেয়েরা নাচগান শেখে কবিতা

লেখে প্রধানত এইজন্যে যে, গান গাইতে পারা কবিতা লিখতে জানা এতে ক'রে তাদের বৈবাহিক দর বাড়বে।

কবি: চুপ্‌, চুপ্‌, ও ঘরে বাড়ির মধ্যেরা রয়েছেন। এত সত্য সমাজে বলতে আছে?

(খুব একচোট হাসি)

দিলীপ: জানেন, আপনার নানান্‌ কথাবার্তা আমার ভালো লাগে ব'লে অনেকে বলেন আমার নাকি আপনার সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা আছে। একজন সেদিন বললেন—কালিম্পঙে কবির কাছে এখন আর কী পাবেন যে যাচ্ছেন তাঁর কাছে?

কবি: (করুণ হাস্য)

দিলীপ: আমার কিন্তু করুণ হাসি বর্ষণ করতে ইচ্ছে হয় এদেরই 'পরে। আপনার ঐ কথাটা আমার বেজায় মনে ধরেছে যে, আমরা বড় মানুষের কাছে বড় জিনিষ দাবি করি না—তাই পাই না। অথচ না পেলে কী-ই বা আছে পাওয়ার? শ্রীঅরবিন্দ ১৯২৪ সালে একটা কথা আমাকে বলেছিলেন আমার মনে পড়ে: দেওয়ার দায়িত্ব শুধু দাতার নয়, গ্রহীতা নিজের মন খুলে না ধরলে না বোঝে দাতার দাক্ষিণ্য, না পায় বিধাতার দান।

কবি: খুব সত্যি কথা। আমি তাই প্রায়ই বলি যে, এদেশে বড় হ'তে হয় এই ব্যাপক ক্ষুদ্রতার পিছুটান কাটিয়ে তবে। ওদেশে তা নয়। ওরা আদায় ক'রে নিতে জানে, তোমার ভিতরে বড় জিনিষ থাকলে ওদের দেশে আছে তার চাহিদা। আমাদের দেশে ডাকে কী জন্যে? না সার্টিফিকেট দিতে, ছেলেমেয়ের নামকরণ করতে, সভায় সভাপতি হ'তে। সমাজ বড় হয় কখন? যখন আমাদের ভিতরকার বড় জিনিষগুলি আনুকূল্য পায় পাঁচজনের দরদে প্রীতিতে স্নেহে।

দিলীপ: আমিও আপনাকে এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম কাল। বলতে চেয়েছিলাম—যদিও হয়ত গুছিয়ে বলা হয় নি—যে প্রেমে প্রেম জাগে—জাগা প্রেমময়ের অভিপ্রেত, প্রাণে প্রাণ জাগে—জাগা প্রাণময়ের অভিপ্রেত, মনের পরশে মন জাগে—জাগা মনময়ের অভিপ্রেত। আপনি বললেন স্রষ্টা শিল্পী আন্তর আনন্দ-প্রেরণাতেই বাইরের ঔদাসীন্য-অস্বীকৃতির ক্ষতিপূরণ পান! মানি। কিন্তু বাইরে অস্বীকার হবেই বা কেন? হওয়া কি স্বাভাবিক? এ-সুন্দর জগতে এমনতরো অসুন্দর অঘটন ঘটবেই বা কেন? একথা সত্য যে, প্রাণবন্ত মানুষ দুঃখকেও অমৃতের সোপান ক'রে গড়ে তোলেন, কিন্তু তাই ব'লে দুঃখকে অমৃত বলাটা ভুল।

বড় জিনিষ স্থষ্টি করলে তার উত্তরে সাড়াও হোক বড়—মানুষের এই উচ্চাশার মূলে নেই কি হার্মনির—স্থষমার—তৃষ্ণা? তাই যদি দেখি যে, কোনো যুগে বড় গানে বড় কবিতায় কেউ সাড়া দিল না, তখন মনে জানব গ্রহীতাদের মনের এ অবস্থার চিকিৎসা দরকার—সে কোনো না কোনো কারণে ব্যাধিগ্রস্ত। কারণ বড় স্রষ্টা তাঁর স্থষ্টির হাওয়ায় মনের বনে ফুল ফোটাবেন এই-ই তো স্বাভাবিক। যে-মনের মাটিতে ফুল ফুটল না—বলব না সে দুর্ভাগা মাটি? বড় দ্রষ্টা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গভীর দৃষ্টি ফোটাবেন "চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"—চোখ ফোটান ব'লেই না দিশারির নাম গুরু। আপনার বর্ষার কবিতায় বর্ষার সৌন্দর্য সম্বন্ধে কত অন্ধের চোখ ফুটেছে। চণ্ডীদাসের প্রেমের গানে কত প্রেমিকের মনে প্রেমের আত্মত্যাগ সম্বন্ধে সহজ চেতনা জেগেছে। বড় কীর্তনিয়ার কীর্তনে কত ভক্তের হৃদয় বুঝেছে স্থর ও কথার রাসলীলায় আনন্দের চিত্রলোকে ভক্তি কেমন ক'রে আশ্রয় পায়, রঙিয়ে ওঠে। আনাতোল ফ্রাঁস তাই তো বলেছেন তাঁর অতুলনীয় Jardin d'Epicure-এ যে কবি জন্মান ব'লেই আমরা দেখতে শিখি, ভালোবাসতে শিখি। আজকাল কে না স্বীকার করে অস্কার ওয়াইল্ডের কথা যে, শুধু শিল্পই প্রকৃতিকে অনুকরণ করে না—প্রকৃতিও শিল্পের রঙে নিত্যই ওঠে রঙিয়ে। আপনি কালই বলেছিলেন না যে, আপনি প্রেমের স্থক্ষ্মদৃষ্টি নিবিড় দৃষ্টি দিয়ে বিধাতার এই বিশ্বলীলাকে দেখেছেন সেটা বিধাতা বুঝলেন না, এ দুঃখ আপনার যাবে না? কথাটা কত সত্য! কত সময়ে ঝরাপাতার দৃশ্যে শব্দে আমাদের মনে জেগেছে আপনার কত কবিতা ঝরাপাতার ধ্বনি নিয়ে। তাজমহল দেখে আনন্দ পেয়েছি কত বেশি আপনার তাজমহল-বন্দনা স্মরণ ক'রে। জীবনে গভীর-স্থরে গভীর কথা শুনব তো কবিরই কাছে। কাজেই মনে বাজবে না যখন দেখব এমন সব দানের মর্মও মানুষ বুঝল না?

কবি: তুমি বলেছ ঠিকই। আমিও তো এই কথাটি বলি। এরই নাম শ্রদ্ধা। তুমি বলছিলে গীতার কথা যে, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ'—কি না, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের কাছে জ্ঞান আহরণ করবে তাঁদের 'প্রণাম ক'রে প্রশ্ন ক'রে সেবা ক'রে'। একথা আরো বেশি খাটে রসবোধের ক্ষেত্রে। রসবোধকেও বরণ করতে হয় শ্রদ্ধার গ্রহণে। বিজ্ঞানে অশ্রদ্ধা না হোক অবিশ্বাস নিয়ে এগুতে পারো। কেননা সেখানে মন অস্বীকারের বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সত্যের যাচাই করে। এ-খোঁচাখুঁচি বৈজ্ঞানিক সত্যবহ্নিকে নেভায় না, উস্কেই দেয়। কিন্তু রসের সভায় শিল্পের ক্ষেত্রে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা

খাটে না। তার পথ প্রেমের পথ শ্রদ্ধার পথ। এ পথের পথিককে তাই করতেই হবে প্রণাম, হ'তেই হবে জিজ্ঞাসু। নইলে কোনো সৃষ্টিতেই সাড়া দেওয়া সম্ভব হবে না। মহৎ ললিতসৃষ্টিতে মানুষ অনেক সময়ে সাড়া দিতে পারে না জানবে এই জন্যেই—তাদের মনের মাটিতে এই সহজ সরল শ্রদ্ধার চাষ তারা করেনি বলেই তাদের প্রাণের বাগানে রঙিন ফুল ফোটে না বড় কবির কাব্যবসন্তে, বড় গুণীর গানমেলায়।

য়ুরোপে দেখবে আছে এই শ্রদ্ধা মানুষের মনের আকাশে বাতাসে চারিয়ে। তাই ওরা শুনতে চায় জানতে চায় ঢের বেশি প্রাণের আবেগে, সহজ কৌতূহলে। এতে ক'রে ওরা ভুল হয়ত করে, কিন্তু সেও প্রাণশক্তির ভুল—হোঁচট খেয়ে পড়েও যদি, পড়ে আগুপথেই—বিপথে না। কারণ যখন মানুষের থাকে এই প্রাণের সম্পদ, সে দেয় সহজেই—বিলোয় তার প্রীতি প্রাণের সরল দাক্ষিণ্যে, হৃদয়ের সহজ ঔদার্যে। এ-গতিবেগে স্রোত আছে ব'লেই গ্লানি জমতে পায় না।

কিন্তু আমাদের দেশে জীবনীশক্তি অতি ক্ষীণধারা। তাই না বড়োকে স্বীকার করার পথে এত বাধা। যারা পায় বেশি তাদের দিতেও কার্পণ্য নেই। তারা যে একদিকে কৃতার্থ হয়েছে, তাই তাদের নেই ক্ষোভ। এইজন্যে দেখবে ওদের দেশে যারা বড়ো তাদের চারদিকের আবহাওয়া মহত্ত্বের অনুকূল হ'য়ে উঠতে পেরেছে।

তাই বুদ্ধির জগতে, মনোজগতে ওরা কত বড়ো—কত সহজে বড়ো—ভাবো একবার। সময়ে সময়ে ওদের এ-মহত্ত্ব যখন দেখি, মনে হয় বুদ্ধিজগতের এ-স্তরে বুঝি আমরা কোনোদিনও পৌঁছতে পারব না।

দিলীপ: আমাদের দেশে যে লোকের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা বেশি এ আমি মানি। এর মূল হ'ল তামসিকতা—জীবনীশক্তি ক্ষীণ হ'য়ে এলে মানুষ তামসিক তো হবেই। স্রোত ক্ষীণ হ'লে শ্যাওলা ছাড়া আর কী জন্মাবে বলুন?

এও মানি আমি যে, ওদের দেশের প্রাণশক্তির প্রবলতা বিস্ময়জনক। দুঃখ এই যে প্রাণের ঐশ্বর্যে ওরা প্রমত্ত হ'য়ে উঠেছে ব'লে ঠিক পথে চলা ওদের পক্ষে ক্রমেই শক্ত হ'য়ে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানতে হবে যে মুক্তি নিষ্প্রাণতার পথে নয়, মুক্তি শুদ্ধ প্রাণশক্তির বেগপথে।

কেবল একটা কথা আমার মনে হয় সম্প্রতি। আমার একথা সত্য মনে হয় না যে, আমাদের দেশে মনোজগতের বা বুদ্ধিজগতে ঐশ্বর্যের কিছু কম্‌তি আছে। কিন্তু শুধু এটুকু বললেও আমার প্রতিবাদ খুব জোরালো হবে না। আমাদের মধ্যে—মানে আমাদের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে আলো নামে বুদ্ধির চেয়ে কোনো ঊর্ধ্বতর

লোক থেকে। আর তার মূল হ'ল অনাসক্তি। এই অনাসক্তিই দেয় দিব্যদৃষ্টি। একথা জোর ক'রে বলতে আমার সঙ্কোচ হয় পাছে লোকে ভুল বোঝে আমাকে, বলে এ সেই 'আমরা হ'লাম বীর শিশু, এমন আর কে,' জাতীয় মনোভাব—যে-মনোভাবের উপর জহরলাল হাড়ে হাড়ে চটা। আমরাও। কিন্তু এ সত্যিই আমার আত্মমুখী পক্ষপাতিত্বের কথা নয়। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, আমরা অলক্ষ্যলোকের পানে খানিকটা খুলতে পারি মনকে—তার নাম পারলৌকিতাই (otherworldliness) দিন বা অনাসক্তিই দিন।

কবি: একথা আমারো যে মনে হয়নি তা নয়। ধরো অমুকের কথা। সে তো বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যা বিরল। এ-মহত্ত্বের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার প্রধান গুণ তুমি যাকে বলছ অনাসক্তি। কিন্তু তবুও তার মধ্যে কিছু একটা অভাব তোমার চোখে পড়েনি কি?

দিলীপ: পড়েছে। তার কাছ থেকে আমি জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি, শিখেছি, জেনেছি। তার কথা ভাবতেও আমার মনে কৃতজ্ঞতা উপছে পড়ে। কিন্তু তবু আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে যে, তার ভিতরে নেই সেই তাগিদ—সেই প্রবর্তনা যা মানুষের শক্তি ও জ্ঞানকে সৃষ্টিলোকে উত্তীর্ণ করে। তার মধ্যে যথেষ্ট আছে স্বপ্নালুতা, আছে ধ্যানশক্তি, কিন্তু সেই প্রাণশক্তি নেই যা নিজেকে প্রকাশ না ক'রে বাঁচতেই পারেনা।

কবি: এই শক্তিকেই আমি বলেছি য়ুরোপের একটা মস্ত দান: প্রাণের এই অজস্রতা, সক্রিয়তা, বহুমুখিতা। এ না থাকলে মানুষ ভাবতে পারে, জানতে পারে, কিন্তু নিবিড় ভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে না। আমাদের ঋষিরা বলেছেন "পুরুষঃ পরম্" মানে স্রষ্টা পুরুষ। বলেছেন যে, ব্রহ্মের নঙর্থক গুণ হ'ল তিনি অবর্ণ, অস্নাবির, অপাপবিদ্ধ—কিন্তু তাঁর পরেই হ'ল তাঁর শ্রেষ্ঠ মহিমা, তিনি হলেন কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ।

দিলীপ: একথা আমি খুব মানি। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রাণশক্তিকে বলেন the vital. বলেন উপলব্ধি—realisation চাই তো বটেই, কিন্তু তারও পরে হ'ল প্রকাশ—manifestation, বলেন যে, প্রাণশক্তিই আত্মিক ও বস্তু জগতের মধ্যে ঘটকালি করে—এ নৈলে বড় উপলব্ধি হ'তে পারে কিন্তু বস্তুজগতে কোনো বড় পরিবর্তন বা রূপান্তর—transformation—আনা অসম্ভব। তাই আমার মনে হয়—যেকথা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ওরফে Ronald Nixon-ও বলেছিল—যে, য়ুরোপের তাঁবে যে আমরা আছি এর তাৎপর্য এখানেই খুঁজতে হবে। আপনিও একথা তো

কতবারই বলেছেন। প্রাণ হ'ল তাজারক্ত। আমাদের প্রাণশক্তি নিস্তেজ হ'য়ে এসেছিল তাই আমাদেরকে হ'তে হ'ল ওদের পদানত। নৈলে হয়ত আমরা জাগতাম না কোনোদিনই—কে বলতে পারে? আমাদের জরাজীর্ণ দেহে অনেকখানি নব প্রাণ এসেছে ওদের দেহ-মনের যৌবরাজ্যে।

কবিঃ একথা খুবই সত্য দিলীপ। আমাদের যে কী ক্লৈব্য এসেছে সে কি চোখে না প'ড়ে পারে কারুর? আত্মঘাতী বলি কাদের? না, যারা চায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ মানুষদেরকে ছোট প্রতিপন্ন করতে। তারাই ভোলে যে, সামান্যতম মানুষও অসামান্যের গৌরবের সরিক। কিন্তু আমরা অন্ধ—বুঝি কই?—তাই চাই সব আগে তাদেরকে ভূমিসাৎ করতে যাদেরকে ধ'রে আমরা উঠে দাঁড়াব। এ-করার সময় একবারও ভাবি না এর শাস্তি কী।

দিলীপ ঃ হয়েছে কি, আমাদের মনের মাটিতে লয়াল্টির বীজে ফসল ফলে না।

কবি (সাবেগে) ঃ কিন্তু কেন ফলে না—একবার ভেবে দেখেছ কী?

দিলীপ (চিন্তিতস্বরে) ঃ আমাদের সমাজে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করার, দলপতিকে মেনে চলার কোনো মন্ত্রতন্ত্র নেই ব'লে?

কবি ঃ না। দল বেঁধে আমরা অনিষ্ট করতে পারি—পারি না ইষ্ট করতে। এক ধরণের প্রবৃত্তি আমাদের মনের পাতালে থাকে—যাদেরকে প্রশ্রয় দিতে নেই। এ-প্রবৃত্তির নাম দেওয়া যেতে পারে আঁধারবৃত্তি—এ নিয়ে যায় আমাদেরকে অপঘাতের আঘাটায়, আত্মঘাতের পথে। দেহ যখন দুর্বল হয় মাইক্রোব তখনই পায় প্রশ্রয়। জাতীয় মন যখন তামসিকতায় ঢেকে যায় তখনই অন্ধকারের দৈত্যদানারা দেয় হানা—উজ্জীবন ছেড়ে মারণমন্ত্রই হ'য়ে ওঠে চাঙ্গা।

দিলীপ (সাক্ষেপে) ঃ মনে আছে স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাই বলতেন বার-বার যে আমরা আসলে তামসিক হ'য়ে পড়েছি, কেবল অন্ধতাবশে ভাবি যে এরই নাম সাত্ত্বিকতা।

১০, ৬, ১৯৩৮

বিকেল পাঁচটা। কণা, শ্রীহিতেশ চক্রবর্তী, তার স্ত্রী শ্রীমতী অণিমা, কুমারী অনু সেনগুপ্তা ও আমি; কবি চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

পথে আসতে আসতে ফের আকাশে সেই মেঘের চক্রান্ত। কণা এধরণের বাদলের বর্ণনা বড় চমৎকার লিখেছিল আমাকে একটি চিঠিতে—একটু উদ্ধৃত না ক'রে থাকতে পারলাম না।

"কালিম্পঙে সূর্যদেব অনেকটা প্রশ্রয়দাত্রী মায়ের ম'ত। মাঝে মাঝে তাঁর শাসন

অত্যন্ত প্রখর হ'য়ে ওঠে, ফলে দিগন্তের মুখ যেই বিবর্ণ হ'য়ে আসে অমনি তাঁর হুকুমে আকাশ ঢালে ব্যথিতা পৃথিবীর 'পরে অজস্র বারিসান্ত্বনা: জলের অশ্রান্ত ঝর্ঝরে, গাছের নামহারা মর্মরে,ঝিল্লির করুণ ঝঙ্কারে কী যে এক মায়ার সৃষ্টি করে! অন্তর ওঠে উৎসবে জেগে। আদিযুগে এই পৃথিবীর আদিকথা জেগেছিল জলের ভাষায়। কত কোটি বৎসর পার হ'য়ে গেল এখনও সেই জলের কলধ্বনি মানুষের মনের মাঝে পাঠায় তার সেই ডাক।

"এখানে গত তিনদিন ধ'রে কী যে দুর্যোগ! আলুথালু পাগলা মেঘগুলো আকাশের অঙ্গনে ভিড় ক'রে দাঁড়ায় থেকে থেকে—আর কুচক্রী হাওয়া তাদের কানে কানে কী মন্ত্রণা দেয় কে জানে—উৎসাহে তারা আর টাল সামলাতে পারে না, হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ে বেচারি ধরণীর বুকের ওপর। আদিযুগের মতন সব জলে জলময় করবে নাকি?"

যাই হোক সেদিন বৃষ্টি ক্ষণজন্মার মতন হ'তে না হ'তে নির্বাণ লাভ করল। পাতায় পাতায় ফের রঙিয়ে উঠল কিরণমালীর সোনালি হাসি। মনে হ'তে থাকে কেবলই শেলির সেই

Emerald green of leaf-enchanted beams.

* * *

প্রতিমা দেবী চা পরিবেষন ক'রে দিলেন।

কণা (কবিকে): আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে।

কবি: শুভস্য শীঘ্রম্।

কণা: দিলীপদা আমার তদারকে ছিলেন একরকম মন্দ না। অন্তত ওঁর নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু সেদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা হঠাৎ ঘোমটা-খোলার পর থেকে উনি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই রইলেন আন্‌মনা। তবু যাহোক একটু আধটু সাড় ফিরে আসত সময়ে সময়ে। কিন্তু কাল আপনি আসা থেকে উনি অথই জলে—আমার কথা কানে হয়ত যায়, কিন্তু মরমে যে পশে না এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে স্বয়ং গিরিবর ও কবিবর যদি আমার সঙ্গে এভাবে প্রতিযোগিতা করেন তাহ'লে আমি দাঁড়াই কোথায়?

কবি: ওর আশা ছেড়ে দাও। যদি নিতান্তই না পারো তবে এক কাজ করো, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লেখা উদ্ধৃত করো।

কণা: কিম্বা আনাতোল ফ্রাঁস?

কবি: হ্যাঁ তাঁকে হ'লেও চলবে।

(অথ কলহাস্য)

দিলীপ: আপনার "বিশ্বপরিচয়" এত ভালো লেগেছে যে বলতে পারি নে। বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক নাকচ ক'রে সাহিত্যের মশলা দিয়ে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য চড়চড়ি এমন মুখরোচক ক'রে রাঁধা যায় কে ভেবেছিল!

কবি: হয় কি, বিজ্ঞানের এ-ধরণের বই লিখবার সময় ভাবতে নেই আমি বিজ্ঞান লিখছি। তাহ'লেই ভারি ভারি শব্দযোজনায় ভাষা হ'য়ে ওঠে গজেন্দ্রগামী, আর বিজ্ঞানতথ্য হ'য়ে ওঠে দুষ্পাচ্য—সাধারণের কাছে।

দিলীপ: আইনষ্টাইন কিন্তু বলেন যে, বৈজ্ঞানিক তথ্য পপুলার করতে গেলেই তার জাত যায়। আমার একথা ভালো লাগে না।

কবি: আমারো না—অন্তত বড় বড় আবিষ্কারের ক্ষেত্রে টেকনিকাল কচকচি বাদ দিয়ে জনসাধারণের মনের মাটিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সার দেওয়া দরকার, তাতে যে জাতীয় মন উর্বর হয় এবিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নেই।

দিলীপ: আচ্ছা, হাল আমলে বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন আকাশ সান্ত finite, অথচ সীমান্তহীন—boundless—এ কি হেঁয়ালি, না কী বলুন তো? আকাশ বা সময় কেমন করে সান্ত হবে?

কবি: ওদের অনেক কথাই মেনে-নেওয়া চলে না। আমি ওদের দান সশ্রদ্ধে মান্‌ব কিন্তু যেমন গানের সত্য মেনেও তার ওস্তাদের কথা সবই মেনে নিতে পারি না তেমনি জ্ঞানের মূল নীতিগুলি মেনেও তাদের ওস্তাদের সব কথা হজম করতে পারি না। ধরো ওরা বলে সূর্যের বয়স ধরা যাক্ পঞ্চাশ লক্ষ কোটি বৎসর। একথার মানে কী? পঞ্চাশ লক্ষ কোটি বৎসর আগে সূর্য ছিল না? তাহ'লে কি ছিল? কোথেকে সে এল? প্রতি সৃষ্টিরই আঁতুড়ঘরের হদিশ পাওয়া ভার।

দিলীপ: কিম্বা ধরুন ওঁরা বলেন এ-বিশাল জ্যোতিষ্ক ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পৃথিবী নামে যে রেণুর রেণু গ্রহটি টিমটিম করছে চৈতন্যময় জীব কেবল সেইখানেই জাগন্ত —অন্য সব গ্রহ নিষ্প্রাণ। এ-ও কি হ'তে পারে কখনো? শ্রীঅরবিন্দ আমার এক বিজ্ঞানভক্ত বিলাতফেরত বন্ধুকে একবার লিখেছিলেন যে বৈজ্ঞানিকেরা জানলেন কী ক'রে যে পৃথিবীনামক গ্রহে প্রাণের স্ফুরণ হ'ল দৈবাৎ—by accident—কিম্বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র প্রাণের ধর্ম হবে এইরকমই আর তা যদি না হয় তবে সে নেই? এগুলো হ'ল—তিনি লিখেছিলেন—মনের জল্পনা কল্পনা—কোনো নৈশ্চিত্য এদের থাকতেই পারে না। জীবন 'দৈবাৎ' জন্মাতে পারে না যদি না সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই

'দৈবাৎ' জন্মে থাকে। এ-ধরণের বাক্যবাগীশদের বাক্য নিয়ে সময় নষ্ট করা পণ্ডশ্রম—কেন না এসব হ'ল ক্ষণমুহূর্তের বুদ্বুদবাজি।*

বাস্তবিক কী ক'রে ওঁরা বলেন এত জোর ক'রে যে, আমাদের পৃথিবীতে প্রাণ যেভাবে বাঁচে সেভাবে ছাড়া প্রাণলীলা অসম্ভব? এখানেই তো দেখতে পাই—প্রাণ কতরকমের বাঁচে: মাছ জলে, সিন্ধুঘোটক বরফে, পাখি বাতাসে, কেঁচো ভূগর্ভে। কাজেই কেমন ক'রে মেনে নেব বলুন যে এই অগুন্তি গ্রহতারা জ্যোতিষ্কের সমারোহ বিল্‌কুল্ প্রাণশূন্য, কেবল পৃথিবী নামে একটা ছোট্ট মাটির ঢেলা প্রাণোৎসবে সরগরম?

কবি: বটেই তো। বৈজ্ঞানিকরা খুবই শ্রদ্ধেয় মান্য—একশোবার। জীবন-যাত্রায় সুখসুবিধার প্রত্যক্ষলোকে, তাঁদের দানের কথা ছেড়ে দিলেও, তাঁরা যে নানান্ বিশ্বতথ্যভূমিকার—dataর—মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিয়ে আমাদের জ্ঞানের ও কল্পনার পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন এজন্যেও তাঁদের কাছে কে না কৃতজ্ঞ? কিন্তু তাঁদের নানান্ দান মান্য ব'লে যে তাঁদের সব কথাই শুনব, বা তাঁদের সব বিধি-বিধানকেই বেদবাক্য ব'লে অঙ্গীকার করব এ হ'তেই পারে না। তবে তুমিও তো দেখতে পাচ্ছ যে তাঁদের মধ্যে জোর-ক'রে-কথা-বলার অভ্যাস ক্রমেই অনাদৃত হচ্ছে। প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের নৈশ্চিত্যবোধের ঝোঁকে বলতেন হয়ত অনেক কথাই বেশি ভরসা ক'রে। কিন্তু আজকাল তাঁরাও কত নম্র হয়েছেন সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

দিলীপ: একথা সত্য। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। সেদিন পড়ছিলাম অলডাস হাক্সলির Ends and Means বইটি—পড়েছেন?

কবি: পড়েছি, আমার এত ভালো লেগেছে—

দিলীপ: কৃষ্ণপ্রেম বইটি প'ড়ে লিখেছে সমালোচনায় যে এ বই লোকের চুরি ক'রেও পড়া উচিত—যদি কেনবার পয়সা না থাকে।† কারণ অলডাস আর

* "How does Sir James Jeans or any other scientist know that it was by a 'mere accident' that life came into existence or that there is no life anywhere else in the universe or that life elsewhere must either be exactly the same as life here under the same conditions or not at all? These are mere mental speculations without any conclusiveness in them. Life can be an accident only if the whole world is an accident—a thing created by Chance and governed by Chance. It is not worth while to waste time on this kind of speculation which is only the bubble of a moment." —*Sri Aurobindo.*

† শ্রীঅরবিন্দ (১৯৩৮, ডিসেম্বরে) বন্ধুবর নীরদবরণকে বলেন যে অলডাসের মতন intellectual-এর যে এ-ধরণের যোগে শ্রদ্ধা এসেছে—তার কিছু ব্যাপক ফল ফলবেই য়ুরোপে।

সে অলডাস নেই যিনি বলতেন জগতের সত্যনির্ধারণের একমাত্র পদ্ধতি হ'ল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। তিনি অকুণ্ঠে লিখছেন যে, এক সময়ে ভাবতাম বিজ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে ছক কেটেছে কেবল সেই ছকই নির্ভরযোগ্য বাকি সব উড়োকথা, কবিকল্পনা। কিন্তু এখন বুঝেছি যে, জৈবলীলার বিশাল সত্যভূমিকা থেকে মাত্র কয়েকটি গুনে-পাওয়া ও মেপে-দেখা তথ্য নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা ব্রহ্মাণ্ডের যে-ছক কাটছেন সে-ই ধোপে টেঁকে না। তাই তিনি বিদ্রূপ করেছেন য়ুরোপের বিজ্ঞান-স্তাবকদেরকে যারা হ'ল "convinced that the scientific picture of an arbitrary abstraction from reality is a picture of reality as a whole and that therefore the world is without meaning or value." আর বলেছেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে We are living now, not in the delicious intoxication induced by the early successes of science, but in a rather grisly morning-after, when it has become apparent that what triumphant science has done hitherto is to improve the means for achieving unimproved or actually deteriorated ends."*

কবি: একথা সত্য তো বটেই। কারণ বিজ্ঞান যা বলেছে তা যে শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য অন্যত্র নয় এ আজ অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই মানেন। ধরো না কেন সবাই জানে যে বিজ্ঞানের রাজ্য হ'ল গোনাগুন্তি মাপজোপের রাজ্য—কিন্তু valueর রাজ্যে তার বলবার কিছুই নেই। বিজ্ঞান বলে—ও আমার জুরিসডিকশনের বাইরে।

দিলীপ: সেকথা সত্য, কিন্তু শাঁস বীচি ছিবড়ে সব জড়িয়ে তবে তো আম। কাজেই value বাদ দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের যে-ছবি বৈজ্ঞানিক আঁকছেন সেটাকেই তো আর সম্পূর্ণ ছবি বলা চলা না। অলডাসও তাই বলেছেন যে তাঁরা বিজ্ঞানের তথ্য-জিজ্ঞাসার পদ্ধতি মানতে মানতে প্রথম দিকে এই ভুল সিদ্ধান্তের পৌঁছেছিলেন যে, বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে ব্রহ্মাণ্ডের কীতিকলাপ যতখানি সাড়া দেয় কেবল ততখানিই নির্ভরযোগ্য—বাকি সব কল্পনা, এলোমেলো।

কবি: একথা সত্য। কিন্তু জনসাধারণের এরকম ভাবার জন্যে বৈজ্ঞানিকরা

* "Beliefs" অধ্যায় দ্রষ্টব্য, ২৬৯ পৃষ্ঠা। এ অধ্যায়ে তিনি আরো লিখেছেন তঁার শাণিত ভাষায়: "Most ignorance is vincible ignorance. We don't know because we do not want to know. It is our will that decides how and upon what subjects we shall use our intelligence. Those who detect no meaning in the world, generally do so because, for one reason or another, it suits their books that the world should be meaningless."

দায়ী নন একথাও ভুলো না। অন্তত আজকালকার বৈজ্ঞনিকেরা যে নন এ নিশ্চয়। প্রথম যুগে বৈজ্ঞানিকরা হয়ত একটু বেশি অতিনিশ্চিত হ'য়ে বলতেন যে, ব্রহ্মাণ্ডকে একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই জানা যাবে কিন্তু হাল আমলে তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে বিপ্লব ঘটে গেছে। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর বদ্‌লে যাচ্ছে তাঁদের থিওরি—বদ্‌লে যাচ্ছেই বলো বা পূর্ণতাসমৃদ্ধ হ'য়ে উঠছেই বলো, যায় আসে না—কথাটা এই যে, তাঁরা এখন আর বলছেন না যে, কোনো নিয়মই শেষ নিয়ম ব'লে ধরা যেতে পারে। এ-বিষয়ে অন্য অন্য জিজ্ঞাসায় মানুষের ধারণাজগতে যে-সব অদল বদল দেখা যায় বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় অদল-বদল ঘটছে অন্তত তার দশগুণ বেশি বেগে। সেদিন পড়ছিলাম একজন বৈজ্ঞানিক বলছেন যে সব lawই man made law : হয়ত দুচারজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এখনো সেকেলিয়ানার মনোবৃত্তি প্রবল—কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনের মূল প্রবণতা যে dogmatismএর বিরুদ্ধে এবং উদার পরীক্ষা তথা জিজ্ঞাসুতার দিকে একথা বোধ হয় জোর ক'রেই বলা যায়।

দিলীপ : আপনাকে আরো দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল—যদি ক্লান্ত বোধ না করেন—

কবি : আহা বলোই না হে (কণার দিকে ফিরে) তুমি লক্ষ্য করেছ কি যে সময়ে সময়ে দিলীপেরও আমার প্রতি করুণা না অনুকম্পা না অনুতাপ মতন কি একটা হয় ?

কণা : করেছি—আর আশ্চর্যও হয়েছি কম নয়।

কবি : আশ্চর্য হবার কথা। ও-ই আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সবচেয়ে বেশি বকায় অথচ থেকে থেকে ও-ই সবচেয়ে বেশি আহা আহা করবে।

(অথ কলহাস্য)

দিলীপ : আপনার 'প্রান্তিক' প'ড়ে বড় ভালো লাগলো—বিশেষ ক'রে মানুষের স্বপ্ন যে দেউলে হ'তে চলল সেই নিয়ে আপনার বেদনায়। এ দেখে আনন্দ হ'ল আরো এই জন্যে যে, এখনো এই সব স্বপ্নকেই মহত্তম সত্য বলবার লোক আছে—আর যিনি বলছেন তাঁর কণ্ঠে কবির ঝঙ্কার এখনো বেজে ওঠে। কিন্তু জগৎজোড়া রণতাণ্ডবের এই-যে হাহাকার ও শ্মশান-লীলা এর প্রতিষেধ কী তা তো কই বলেন নি তেমন স্পষ্ট ক'রে ?

কবি : আমি কি বলি শোনো। আমি আজকাল এ সব ব্যাপারকে অনেক নিস্পৃহ— dispassionate—দৃষ্টিতে দেখি। আমি দেখি যে জৈবলীলায় জীব এক একটা সময়ে এক একটা উপায়ে বেঁচেছে—যে-উপায় তখন ছিল তার বাঁচার

পক্ষে অনুকূল। তারপর যুগ বদলালো—উপায়ও বদলালো। এমন ঘটল, অনেক সময়ই, যখন সে-সব উপায় জীবনযাত্রার অনুকূল না হ'য়ে, হ'য়ে দাঁড়াল প্রতিকূল। তখন সে বাঁচল না—সে ভাবে বাঁচা যায় না ব'লে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। বিপুলকায় ম্যামথ। নিশ্চয়ই প্রথমে ওরা অমন মহাকায় ছিল না। কিন্তু যে-কারণেই ম্যামথের ক্ষুদ্র সংস্করণ ক্রমশই বৃহৎ হ'তে চাইল মাংস মেদ বৃদ্ধি ক'রে। শেষটা এমন হ'ল যে অত মাংসমেদের খোরাক মিলল না—কিম্বা হয়ত পরস্পরের বিরুদ্ধে তারা এমন নখদন্ত বার করল যে ম্যামথলীলার সমাপ্তি হ'ল সে-যুগের কুরুক্ষেত্রে। তখন বিধাতা বললেন: হুঁ, আচ্ছা দিচ্ছি এবার মন—কেন না দেখা যাচ্ছে যে মাংস নখ দাঁতের দিন ফুরোলো।

এলেন মন। তিনিও ম্যামথের মাংসবৃদ্ধির মতনই বাড়তে লাগলেন। ম্যামথের আকারবৃদ্ধির মতন তাঁর আয়তন বৃদ্ধিও হ'য়ে উঠল বিস্ময়কর। কিন্তু দেখা গেল ক্রমে ক্রমে যে মন-ম্যামথেরও নখ দন্ত আছে—তারও আছে ভার। হয় কি, প্রতি নবশক্তি একটা সুমিতি ও সুষমার এলাকা যেই পেরিয়ে যায় অমনি পড়ে অকূল পাথারে। তখন তার জোগানো অস্ত্র অনুকূল আয়ুধ না হ'য়ে, হ'য়ে দাঁড়ায় প্রতিকূল শক্তিশেল।

এজগতে এ-মন তার নখদন্তের আয়ুধ নিয়ে মিতালি করল কার সাথে? না, ঐ সর্বনেশে লোভের। মানুষ গৃধ্নু তাকে চাইল বাসনার মোহে, মন যুক্তি জোগালো যে, বাসনাই হ'ল দিশারি, লোভই হ'ল সারথি। ঠিক ঐ একই ভাবে চাকার ধ্বংসপর্ব ঘুরে এল সৃষ্টিপর্বের পরে। এ নিয়ে দুঃখ ক'রে কী হবে বলো? দেখা গেল যে, মনের প্ররোচনাও মিথ্যা হয়। মানুষ বুঝতে সুরু করল যে নিরবধি মাংসকে প্রশ্রয় দিলেও যেভাবে ধ্বংস, নিরবধি মনকে প্রশ্রয় দিলেও তাই। কারণ মনও মায়াজাল গড়ে, তারও আছে কারসাজি। এইজন্যেই উপনিষদে বলেছে—মন সত্যের নাগাল পেতে পারে না, হাত পাততে হবে আমাদের অন্তরাত্মার কাছে: মনের চিকিৎসায় ব্যাধি সারবে না আর—কারণ লোভের এ-রোগ তার আয়ত্তের বাইরে। দেখছ না কি স্বচক্ষে কী অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে শুধু মনের পথনির্দেশ মেনে? মাংস খানিকদূর অবধি এঁটে উঠেছিল, ম্যামথের জয়জয়কারও রটেছিল ততদিন। মনের বেলায়ও ঘটল অবিকল তাই। মন অনেক কিছু দিয়েছে, গড়েছে, জেনেছে, কিন্তু সে যখন অতিস্ফীত হ'য়ে বলল সে-ই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্তা ও নিয়ামক, তখন অন্তর-দেবতা হাসলেন—কিন্তু কথাটি কইলেন না। মন আরো এগুল, কিন্তু ঐক্যের সাম্রাজ্যে নয়, ভেদবুদ্ধির লোভরাজ্যে। ফল হ'ল কি? না,

মানুষের কাছে মনুষ্যত্বের আর্জি আর পৌঁছল না, মন যুক্তি জোগাল: না না ওসব হ'ল সেকেলে দুর্বলতা। মানুষ লোভে প'ড়ে সেকথায় কান দিল—বিষের বীজ বুনল তার প্রবৃত্তির মাটিতে। ফল ফলবে না? ফলল বৈকি: গজালো বিষবৃক্ষ হাজারো চেনা ও অচিন ভয়ের শাখা নিয়ে। তাই তো মানুষ আজ ভয় করছে মানুষকে। কী ভাবে তারা বিপথে চলেছে দেখ! লোভের স্বপক্ষে মনের জোরালো সব যুক্তি তাদের শক্তির স্বর্গে টেনে আনবে ব'লে ভরসা দিয়ে দুর্বলতার কী পাতালেই না নামিয়ে আনছে! মানুষ আজ মাটি খুঁড়ছে, গ্যাস-মুখোষ বানাচ্ছে, স্টীল জাহাজ তৈরী করছে। কী? না বাঁচতে হবে তো! আগেও তাদের অস্ত্রশস্ত্র বানাতে হয়েছিল কিন্তু তখন শত্রু ছিল শ্বাপদ। এখন তার শত্রু স্বয়ং মানুষ। রোগ সঙিন বৈকি। আর সঙিন ব'লেই তো যখন তুমি কাল দুঃখ করছিলে যে বোমা পড়ছে নিরস্ত্র শিশু অবলার উপর তখন আমি তোমার দুঃখে সায় দিলেও বিস্ময়ে সায় দিতে পারিনি।:যা বুনবে তা ফলবে না? যদি অপ্রেমেকেই কোল দাও, তাহ'লে শিশু নারী এদেরই বা যুদ্ধে বাঁচবার কী অধিকার শুনি? যে-জিনিষ—প্রেম—আমাদের বাঁচাবে তারই মূলোচ্ছেদ ক'রে, লোভের ঝাঁজ ক'রে তুলবে সর্বেসর্বা, অথচ চাইবে যে, আমাদেরকে ত্রাণ করবে পরম শান্তির ছায়া, করুণার বর্ম? যখন মানুষ স্বখাত ধ্বংসপথের যাত্রী হ'তে চেয়েছে তখন এ-দোহাই পাড়ার বিড়ম্বনা কেন যে, অন্তত শিশুকে নারীকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাও?

দিলীপ: মনে পড়ছে, গত যুদ্ধের সময় বার্ণার্ডশ-ও এই কথাই বলেছিলেন যে, দমদম বুলেট ব্যবহার করবে না, গ্যাস না, সাবমেরিন না, এসব কী ছেলেমানুষী? যুদ্ধ যদি করতেই চাও তাহ'লে যতটা পারো পৈশাচিক হও—go the whole hog হয়ত তাহ'লেই নিজের দানবী মূর্তি দেখে ডরিয়ে উঠবে বেশি শীঘ্র, হবে চৈতন্য। এ তো বুঝলাম—কিন্তু একে তো আর আশার বাণী বলা চলে না? কঃ পন্থাঃ এই-ই না চিরন্তন প্রশ্ন?

কবি: এর উত্তরও চিরন্তন। মানুষ সে-পথ নেবে না যে—উপায় কী বলো? মা গৃধঃ—লোভ কোরো না—স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—ধর্মের কণা-বিন্দুও শঙ্কাসিন্ধু থেকে বাঁচাতে পারে—একমাত্র ধর্মই পারে আর কেউ না। যদি বাঁচতে চাও তবে অন্য রাস্তা নেই।

দিলীপ: কথাটা খুবই ভালো লাগল। আপনাকে এইখানে আমার একটা সংশয়ের কথা বলি। ধর্ম খুবই ভালো কথা, কিন্তু মনে হ'ত আমার বহুদিন থেকে যে শুধু নীতিকথাতেই শানাবে না, দরকার হ'লে সমাজব্যবস্থা বদলাতে হবে বলপ্রয়োগ

ক'রে। যেমন ধরুন, মানুষ যে আজ চাইছে সবাইকে ভদ্র জীবন যাপনের অধিকার দিতে, মানুষ যে আজ বলছে যে ধন-বাঁটোয়ারার বৈষম্য দূর ক'রে সবাইকে সমান স্বাচ্ছন্দ্য না দিলে লোভ বেড়েই চলবে এ-কথা সত্য। ভদ্র জীবনে যে প্রতি মানুষের জন্মস্বত্ব একথা বোধ হয় স্বতঃসিদ্ধের মতন অকাট্য। কিন্তু লেনিনের দল বলল এ-স্বত্ব মানুষ ভোগ করতে পারবে না যদি গায়ের জোরকে সহায় না পাওয়া যায়। আগে আগে মনে হ'ত এ-কথা খুবই সঙ্গত—নৈলে মানুষ বদলাবে না, কিন্তু আজকাল ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের এ-ধরণের চিকিৎসায় আমাদের আর তেমন জোরালো বিশ্বাস নেই যেমন ছিল প্রথম যৌবনে—যখন ভেবেছিলাম জোর ক'রে মানুষকে সাধু করা সম্ভব। কিন্তু গাছকে তার ফল দেখে বিচার করা যদি জ্ঞান ও বিচক্ষণতাসম্পন্ন হয় তাহ'লে মনে করা কি অসঙ্গত যে লেনিন স্টালিনরা যে-পথে চলেছেন সে-পথ ঠিক পথ নয়? দেখুন না কেন ফ্যাশিস্‌ম্। কী দানবীয় সঙ্ঘ! অথচ এর উদ্ভব তো হ'ত না যদি বলশেভিস্‌ম না মাথা-চাড়া দিয়ে উঠত। হয়ত ধীরে ধীরে মানুষের চিত্তশুদ্ধি না ক'রে গায়ের জোরে তার কাঁচা বোঁটায় বিশ্বমৈত্রীর পাকাফল ফলাতে গিয়েই এহেন ছেঁড়াছিঁড়ি হানাহানির সৃষ্টি। হয়ত ইংরেজরা মোটের উপর খুব ভুল বলে না যে, রিভল্যুশনের পথে না, ইভল্যুশনের পথেই বেশি সহজে আসবে সমাজ-সমস্যার সমাধান—ন্যায্য ব্যবস্থার প্রবর্তন। একথা আমরা মানি যে, রুষদেশ প্রগতির ধ্বজাবাহী—এবং ফ্যাশিস্‌ম টানছে আমাদের পিছুপানে। কিন্তু এ-ও কি হ'তে পারে না যে, রুষ দেশে সাম্যবাদের আদর্শ ওরা যে-পথে লাভ করতে চাইছে সে-পথে তাকে মিলবে না—হবে শুধু জগৎজোড়া কুরুক্ষেত্রে সভ্যতার ধ্বংস? কেন না একথা তো না মেনে উপায় নেই যে, আদর্শে বলশেভিস্‌ম্ ও ফ্যাশিস্‌ম্ ঠাঁই ঠাঁই হ'লেও অসহিষ্ণুত ও বলপ্রয়োগের পদ্ধতিতে একেবারে ভাই ভাই?

কবি: খুব সত্য কথা। সাম্যবাদের আদর্শ কে না মানবে বলো? কিন্তু এই-যে দল বেঁধে জোর ক'রে হিংসার পথে মানুষকে প্রেমিক ক'রে তোলা যাবে একথায় মন ভ'রে ওঠে না। কি, হাসছ যে?

দিলীপ: অলডাস তাঁর সদ্যোজাত বই Ends and Means-এ একটা কথা বলেছেন মনে পড়ল। তিনি লিখেছেন যে, ভূগোল ও ইতিহাসের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। ভূগোলে একটা জায়গা থেকে আরম্ভ ক'রে সোজা চললে সেখানে ফের ফিরে আসা যেতে পারে—কিন্তু ইতিহাসে যদি চাই অমুক সত্যকে, তাহ'লে তার দিকে পিঠ ক'রে ঠিক উল্টো মিথ্যের দিকে ছুটলে সে-সত্য থেকে ক্রমশঃ দূরেই

স'রে যেতে হবে। যদি মৈত্রীই হয় লক্ষ্য তবে হিংসার অস্ত্রশস্ত্র কামানবারুদ বাড়িয়ে সেখানে পৌছন যাবে না। যদি স্বাধীনতাই হয় লক্ষ্য, তবে শাসনযন্ত্র কড়া ক'রে মানুষকে নিয়মের শিকলে ক'ষে বাঁধলে সে রাতারাতি জীবন্মুক্ত হ'য়ে পড়বে না। এ তো বুঝলাম। কিন্তু তাহ'লে উপায় কী?

কবি: উপায়—যা সত্য—চিরদিনের সত্য তার দিকে একলা চলো রে। দল না—একলা তীর্থযাত্রা।

দিলীপ: মিথ্যার বিরুদ্ধেও বাঁধবেন না ব্যূহ? অর্গ্যানাইজ—

কবি: না। আমেরিকায়ও আমাকে ওরা এই প্রশ্নই করেছিল। আমি বলেছিলাম যে না, তোমাদের এই অর্গ্যানাইসেশনে, এই দল বাঁধায় আমার আস্থা নেই। অলডাস ঠিকই বলেছেন যে, মিথ্যার পথে হয় না সত্যের প্রতিষ্ঠা। দল বাঁধতে হ'লেই কোন-না-কোনো ছলে মিথ্যাকে আশ্রয় করতেই হবে, আসবেই দলাদলি। কিন্তু যে-জোর দল বাঁধাবে সে-জোরের বনেদই যখন অসত্য—তখন সৃষ্টি দাঁড়াবে কী ক'রে শুনি?

না। আমি বলি মিথ্যার সঙ্গে আমি করব নৈযুজ্য। আমি লোভ করব না- আর লোভ করব না ব'লেই করব না ভয়। মরব কিন্তু হিংসার মার মারবও না—মিথ্যার ধার ধারবও না। একা থাকতে হয় থাকব, কিন্তু সুবিধার জন্যে মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে দলাদলিকে আস্কারা দেব না কিছুতেই।

জগতে সত্যের মহত্তম প্রসার হয়েছে এই পথেই। এক একজন দাঁড়িয়েছে শিখরের মতন, আলোস্তম্ভের মতন—একা। বলেছে—শোনো বা না শোনো এই সত্য আমি উপলব্ধি করেছি। সে-সত্য অনাদি অশেষ। তার মন্ত্র প্রেম। এই সব এক একজনের জাগৃতির ছোঁয়াচ লেগে, ডাক শুনে হাজার হাজার লোক জেগেছে। কিন্তু তারপর তারা যেই দল বেঁধেছে, হয়েছে সত্যভ্রষ্ট—ফলে সত্যও ডুবেছে দেখতে দেখতে। তাই দেখ, দেশে দেশে একদল লোক জেগেছে তারা এই কথাই বলছে আজ যে, তারা একা বটে কিন্তু ভয় করে না কাউকে। তাদেরকে ধরো কাটো—তারা মারামারি কাটাকাটি করবে না। যুদ্ধে না-যাওয়ার জন্যে যেতে হয় যাবে তারা জেলে, কিন্তু হিংসার দলিলে টিপসই দেবে না। বাইরে যে যা বলুক, তারা কান পেতে থাকবে শুধু অন্তর দেবতার বাণী শুনতে!

মনে বেজে উঠল কবিরই এক গান:

ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল র'ব

বক্ষে আমার দুঃখে বাজে তোমার জয়ডঙ্ক
দেব সকল শক্তি, ল'ব অভয় তব শঙ্খ।)

বললাম: মনে পড়ল আর এক একলা কবির কথা:

For forms of faith let graceless zealots fight
For his can't be wrong whose life is in the right.

মন্ত্র তন্ত্র কতই আছে
যে যারে চায়—ছুটুক পাছে
রণরোলের: আমায় দিয়ো সত্যপথের সঙ্গ
তাহ'লে অভ্রান্ত স্বরে বাজবে তোমার শঙ্খ।

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। কণাই কথা কইল প্রথম। বলল: "কাল আপনার ঐ গল্পটির কথা আমাদের কেবলই মনে পড়েছে, আর আমরা হেসেছি।"

কবি: কোন্ গল্পটি?

কণা: আপনার ঐ have you got betelnut-এর। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য করুণাও হয়েছে আপনার দুঃখের কথা ভেবে।

কবি: তবু তো শোনো নি আমার স্ত্রীর পূর্বজন্মের সেই ছেলের কাহিনী।

অণিমা: বলুন না—যদি কষ্ট না হয়।

কবি (সহাস্যে): শোনো তবে। সে একটা বলবার মতন বিষয়।

আমি তখন এক স্টীম লঞ্চে। হঠাৎ এক চিঠি আমার স্ত্রীর নামে। একটি যুবক লিখেছেন তাঁকে: "আমার বড় অসুখ; স্বপ্নে পেলাম, আমার পূর্বজন্মের মা-র পাদোদক খেলে তবে সারবে। আমার এজন্মের মা বলেন যে আমার পূর্বজন্মের মা আপনিই। তাই আপনার পাদোদক বিনা আমার আর নিস্তার নেই।

উপায় কি? এলেন পূর্বজন্মের ছেলে। দুপুরে। আমার স্ত্রী নেই তখন, গেছেন লোরেটোয় পড়তে। বললাম আমার বৌদিকে, 'বৌঠাকরুণ আমার স্ত্রী তো এখানে নেই, তুমিই না হয় বসলে তিনি হ'য়ে।' তিনি ভারি খুসি: দেখাই যাক না মজাটা। হায় রে, তখন যদি জানতাম এ-মজায় কী মজা! যাহোক বৌদি তো ডুবোলেন ঘটিতে তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল।

ছেলেও কৃতজ্ঞতায় আনন্দে গদগদ, বলাই বেশি।

কিছুদিন বাদে আর এক চিঠি:

'আমার অসুখ প্রায় সেরেছে—এবার একটু প্রসাদ।'

কর্মফল : পাঠালাম কিছু বাতাসার গুঁড়ো। চিঠি এল কিছুদিন বাদে মাতৃচরণে—যে প্রসাদসেবনে যখন পুত্রের রোগমুক্তি হয়েছে, তখন কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধতে তাঁকে এসে থাকতেই হবে আমাদের কাছে—যেহেতু শুধু মাতৃচরণেই তাঁর ঠাঁই, আর কোথাও না।

বিপন্নকণ্ঠে বললাম আমার স্ত্রীকে : 'দেখ তুমি ওর পূর্বজন্মের মা হ'তে পারো কিন্তু আমি তো ওর পূর্বজন্মের বাবা নই। কী ক'রে এ-দায়িত্ব নিই বলো দেখি ?'

(কলহাস্য)

কবি : আমার স্ত্রী একথা শুনে বোধ হয় খুব প্রসন্ন হয় নি। যাহোক কি করব ঠাহর পেতে না পেতে ছেলে এসে হাজির সশরীরে ; দিতে হ'ল তাঁকে আমারই বৈঠকখানা ছেড়ে। আমি উপরতলায় আমার স্ত্রীর ঘরেই আশ্রয় নিলাম।

দিলীপ : সে কি ! আপনার নিজের ঘর দিলেন ছেড়ে ?

কবি : কী করি হে ? আর তো ঘর ছিল না আমার—থাকতে দেব কোথায় ? সাক্ষাৎ স্ত্রীর পূর্বজন্মের ছেলে, না বলা তো চলে না।

কণা
অণিমা } (একত্রে) : তারপর ?

কবি : ছেলে তো রইলেন কায়েমি হ'য়ে। একদিন ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি দোর-গোড়ায় সারি সারি জুতোর শোভাযাত্রা—ঘর তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকার। ছেলে মাতৃচরণে আনন্দ করছেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে।

(কলহাস্য)

দিলীপ : তারপর ?

কবি : ঘরে ঢুকে বললাম : আচ্ছা আমার ব্রাউনিঙটা ?

ছেলে বললেন সকুণ্ঠে : "বলতে বাধে তবে সত্যবাবু—(আমার দাদা মনে রেখো)—এঘরে আসেন মাঝে মাঝে।"

কণা : কী কাণ্ড ! প্রকারান্তরে আপনার দাদাকে চোর বললেন তো ?

কবি : না ব'লে করেন কি—যখন বইটির চিহ্ন নেই কোথাও ?

দিলীপ : তবু স'য়ে রইলেন ?

কবি : কী করি বলো হে ? অতিথিকে তাড়াই কী ক'রে—বিশেষ যখন—(চোখ মিটমিট ক'রে) বুঝতেই তো পারো—এজন্মের ব্যাপার নয়—সাক্ষাৎ—(অথ কণা ও অণিমার হাসিতে প্রায় ভূম্যবলুণ্ঠিত অবস্থা—দিলীপ ও হিতেশের অট্টহাস্য বহুক্ষণ-ব্যাপী)

দিলীপ : খেদ রইল এই যে, আপনার এ-টোন এ-কটাক্ষের কোনো অনুলিপি রিপোর্টে ফলানো যাবে না আপনার দুঃখের ছবি আঁকতে।

কবি : আরে শোনো আগে সবটা। দুঃখের এখন হয়েছে কি ?

ছেলে তো রইলেন আরো আসর জম্‌কে। আমার একটা খোলা ড্রয়ারেই টাকা থাকত। দেখি কেমন যেন ক'মে ক'মে যাচ্ছে !

কণা : বলেন কি ?

কবি : এহো বাহ্য—আরো আগে কই—শোনোই না।

পূর্বজাতক তো আমার ঘর থেকেই কলেজে যান বি-এ পড়তে। বইটই সব অবশ্য আমাকেই জোগাতে হয়। কিন্তু তাতেও সানালো না। তিনি একদিন বললেন : দেখুন আমার বি-এ পড়ায় যদি একটু হেল্‌প্‌ করেন।

(কণা ও অণিমার দিকে পর পর চেয়ে) : এখন তোমরা নিশ্চয়ই মানুষের দুর্বলতা ক্ষমা করবে। আমার মনে হ'ল এ আমাকে নিশ্চয়ই মস্ত পণ্ডিত ঠাউরেছে। নিরুপায় আমি মহোৎসাহে ছেলেকে বি-এ পড়ায় হেল্‌প্‌ করতে লাগলাম।

(কলহাস্য পুনরায়)

দিলীপ : তারপর ?

কবি : পূর্বজাতক বলতেন তাঁর দাদা নাকি তাঁর সম্পত্তি অপহরণ করেছেন। আমি ভালো ভালো উপদেশ দিতাম নালিশ না করতে। অর্থের জন্যে দাদার সঙ্গে মামলা, ধিক। বিশেষ যখন তাঁর মাসিক প্রায় পঁচিশ টাকা আছে—কাজ কি হীন মামলা মোকদ্দমায় ?

হঠাৎ একদিন কে এসে বললে : ও তো আই-এ পাশ করে নি—বি-এ পড়ে কী ক'রে ? যায়ই বা কোন্ কলেজে ?

খোঁজ নিলাম। কোনো ক্যালেণ্ডারেই নাম নেই।

দিলীপ : সে কি ?

কবি : আর কি ? অথচ আমি তার বি-এ পড়ায় সমানে হেল্‌প্‌ ক'রে যাচ্ছি মনে রেখো।

(কলহাস্য)

কণা : তারপর ?

কবি : হঠাৎ একদিন ছেলের দাদা এসে হাজির। বললেন : ওকে যদি পাঠিয়ে দেন বৌমা—ওর স্ত্রী—আসন্নপ্রসবা। বললাম : সে কি ও বিবাহিত ? দাদা বললেন : আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক দিন। কিন্তু খোঁজ নেয় না একবারও।

বাংলা দেশ। পাড়ার এক কন্যাদায়গ্রস্ত চাইলেন এমন মহাপুরুষের গলায়ও কন্যাকে ঝুলিয়ে দিতে।—আমি যখন এত স্নেহ করি তখন নিশ্চয়ই ভালো ছেলে।

মেয়ের মা হাজার হোক মা তো। খোঁজ নিতে লোক পাঠালেন—কেমন ছেলে, কী করে ইত্যাদি। তখন আমি বলতে বাধ্য হলাম সব কাহিনী। আর চলে না। বললাম তাকে ঢের সয়েছি, আর তো সবো না। বিশেষ যখন আমি স্নেহ করি ব'লে লোকে তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছে, তখন সে-চাওয়ার কিছু দায়িত্ব পড়ছে বৈকি আমার কাঁধে।

* * *

মনে পড়ে বাণভট্টের উপমা কাদম্বরীতে :

হারময়ানর্ককিরণান্ চন্দনময়মাতপম্ :
গাহে এ সূর্য : "দহিতে আমি না জানি,
শান্ত কিরণে কান্ত মালিকা গাঁথি,
চন্দনসুখ-স্নিগ্ধ-আমার বাণী,
সুষমাছন্দ মোর বসন্তসাথী।"

* * *

কবির সঙ্গে এর পরে কথাবার্তা আর হয় নি—হয়েছিল পত্রালাপ। তবে চোখের দেখা দেখতে গিয়েছিলাম—শেষ দেখা—১৯৪১ সালে ৭ই আগস্ট তাঁর মহাপ্রস্থানের দিনে।

আমার বন্ধুকন্যা উমা বসু মৃত্যুশয্যায় খবর পেয়ে সে-বৎসর জুলাই মাসে কলকাতায় যাই। খবর এল যথাকালে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অসুস্থ। কিন্তু উমাকে [illegible]তে পারি নি কবিকে শেষদেখা দেখতে। তবু শেষদেখাটা ভাগ্যে ছিল। [illegible]্যায়ও তাঁর দর্শনকে বহুভাগ্য বলব বৈ কি) তাই হঠাৎ সুযোগ মিলল। বন্ধুবর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ওখানে সেদিন সকালে গিয়েই দেখি তিনি টেলিফোন কানে ক'রে ব'সে :

"কী ? A question of minutes ?"

বুঝতে বাকি রইল না। কারণ ভোরে উঠেই কাগজে দেখেছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ অচৈতন্য কাল থেকে। বন্ধুবর বললেন : "চলুন।"

মোটরে যখন যাচ্ছি তাঁর সঙ্গে, মনে জেগে উঠল একের পর এক ছবি। প্রথম দিন—যেদিন কবির সঙ্গে দেখা হয়। শরৎচন্দ্র আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন টেনে। আমি অত্যন্ত সকুণ্ঠে গিয়েছিলাম, কারণ পিতৃদেবের সঙ্গে কবির যে

মনান্তর হয়েছিল তা পিতৃদেবের জীবদ্দশায় কাটে নি। কিন্তু তবু কত সহজেই না কবি আমার মন জয় ক'রে নিয়েছিলেন! আমি ছেলেবেলায় যখন তাঁকে দেখেছি তখনও তিনি সুন্দর পুরুষ ছিলেন কিন্তু এমন দীপ্তি দেখি নি সে সময়ে। রোলাঁ বলেছিলেন আমাকে সুইজর্লণ্ডে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে "Quelle harmonie!" (কী সুষমা)। মনে পড়ল তাঁর কত টুকরো হাসির কথা। অতুলদাকে* পুষ্টকায় দেখেই সেই দুষ্টুমি ভরা কটাক্ষ ক'রে:

"কী অতুল, বেশ যে একটু সংগ্রহ ক'রে এনেছ এবার!" বলেই সে কী স্নিগ্ধ হাসি!

"মনে পড়ে অতুল, সেই পদ্মায়? চারদিকে সেই হংস—আর তাদের মাঝে আমি (হাতটাকে কনুয়ের উপর হাঁসের মতন দাঁড় করিয়ে) সেই পরমহংস!"

আর অতুলদার সে কী হাসি!

মনে পড়ল কালিম্পঙে কবি সুধাকান্তর সেই গল্প।

সুধাকান্ত (তাঁর কবিভ্রাতা নিশিকান্তের মতনই) ঈষৎ ভোজনবিলাসী। নিশিকান্ত কবির কাছে প্রায়ই গিয়ে মিষ্টান্নের সংস্থান করতেন। সুধাকান্ত আরো অনেক কিছুর। নিশিকান্তর দাদা তো। কালিম্পঙে হঠাৎ সুধাকান্ত চোখে চশমা নেন। কবির কাছে প্রথম চশমা প'রে উদয় হ'তেই কবি অবাক্।

"এ কী হে!"

"আজ্ঞে ডাক্তারে দিল।"

"তবু ভালো—যে, ডাক্তারে তোমাকে দিতে পারল যা বিধাতা পারেন নি দিতে—চক্ষুলজ্জা।"

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপম "ঘরোয়া" বইটিতে বলেছেন ঠাকুরবাড়ির এই হাসির কথা। আমিও আবাল্য পিতৃদেবের অতুলনীয় দিলদরিয়া হাসির আবহাওয়ায় মানুষ, কাজেই রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ ও শরৎচন্দ্রকে তাঁদের হাসির জন্যে বড় কম ভালোবাসিনি। হাস্যবিমুখ মুখের ঘনঘটা দেখলে আমার আজও শুধু যে কষ্ট হয় তাই নয় মনে হয় পিতৃদেবের গান:

"জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জানত?"

মনে পড়ল শরৎবাবুর বিচিত্রায় সেই জুতো-চুরির উৎপাতে খবরের কাগজে নিজের পাদুকা-যুগলকে মুড়ে পরম আদরে অঙ্কশায়িনী ক'রে রবীন্দ্রনাথের সামনে

* বিখ্যাত গীতকবি ৺অতুলপ্রসাদ সেন

রসা। কে বুঝি কবিকে ব'লে দিয়েছিল জনান্তিকে (বোধকরি কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়) যে শরৎবাবুর কোলে—জুতো।

রবীন্দ্রনাথ শরৎবাবুর দিকে কটাক্ষ ক'রেই বললেন নিতান্তই ভালোমানুষি স্বরে : "তোমার কোলে ও কী শরৎ ?"

শরৎবাবু (মাথা চুলকে) : আজ্ঞে, বই।

রবীন্দ্রনাথ (ততোধিক নিরীহ স্বরে) : কী বই শরৎ ? পাদুকা-পুরাণ ?

আরও কত ঠাট্টা ! কী অফুরন্ত রসিকতা ! মনে পড়ল কালিম্পঙে রবীন্দ্রনাথের ওখানে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে প্রথম দেখা। কবি বললেন : "ওহে দিলীপ, এই সেই মৈত্রেয়ী যে তোমার গান শুনতে কি যে চায়।—আর (আমাকে দেখিয়ে মৈত্রেয়ী দেবীকে) এই সেই দিলীপ যে বান্ধবীবৎসল। ফের (আমার দিকে তাকিয়ে) তোমাদের আলাপের সেতু হ'লাম আমি—কেবল দেখো আলাপ করতে এগিও একটু র'য়ে স'য়ে—সেতুটি বৃদ্ধ—বেশি দলন সইবে না।"

আর এক বন্ধু মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন একটি বড় মজার কাহিনী। কবি উঠেছেন ট্রেনে বোলপুরের গাড়িতে। বর্ধমানে এক সিগার মুখে কালো সাহেব উঠলেন—সঙ্গে অজস্র মালপত্র। রবীন্দ্রনাথের পাশের কামরায় তিনি ঢুকতে পারতেন কিন্তু গ্রাহ্যও না ক'রে উঠলেন তেরিয়া হ'য়ে। রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণে ছিলেন বিশেষ রকম আভিজাত্যপন্থী—সঙ্গবাহুল্য পছন্দ করতেন না—তাই এ-অভ্যুদয়কে বক্র কটাক্ষ ক'রে বললেন : "আপনি কে মশায় ?"

অভ্যুদয় আরো উদ্ধত স্বরে বলল : "কেন মশায় ? মানুষ !"

রবীন্দ্রনাথ স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন : "যাক্, সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল।"

* * *

জোড়াসাঁকোর সেই পরিচিত বাড়ি। কত হাসি গল্প গানের স্মৃতি উজ্জ্বল প্রাসাদ আজ ম্লান ! "পুরবাসী সব মিলন নীরব বিষাদ মগন সকল ধাম !" ভুলব না সে-দৃশ্য কোনোদিন—লোকে লোকারণ্য। সবাই কথা বলছে ফিশ ফিশ ক'রে। সবারই মুখ বিষণ্ণ। অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতেই তিনি আমাকে আলিঙ্গন ক'রে শিশুর মত কেঁদে উঠলেন।

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন : "শেষ দেখা দেখে নাও।"

দেখলাম। আহা—কী সুন্দর সে মুখ—মৃত্যুর ছায়ায়ও তার আভা নিভে যায়নি ! শুধু শীর্ণ—এই যা। এমন মুখ জগতে কটা দেখা যায় কালের পরাক্রমও

যেখানে পরাস্ত? মনে হ'ল সেই দুঃখের মাঝেও নিজের সৌভাগ্যের কথা—এই অপরূপ মুখের হাসি, কথা, গান শোনার সৌভাগ্য। ভবিষ্যতে যারা তাঁর কাব্য পড়বে তারা কি কল্পনাও করতে পারবে সে-কাব্যে কী সুরের ঝঙ্কার বেজে উঠত তাঁর কণ্ঠের মৃদঙ্গে, রূপের সঙ্গতে, চাহনির লাবণ্যে? কক্ষনো পারবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা নাটক গল্প আবৃত্তি যারা তাঁর মুখে শোনে নি তারা কখনই আন্দাজ করতে পারবে না তাঁর ব্যক্তিত্বের সেই জাদু যার ছোঁয়ার তাঁর উচ্চারিত প্রতি শব্দেই জেগে উঠত এক অভিনব ছন্দ। সে-ছন্দ তাঁর জীবনের—সমস্ত প্রাণসাধনা-দিয়ে-গ'ড়ে-তোলা সুষমার—হার্মনির॥

তাঁর মৃত্যুমলিন শান্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে যখন হৃদয়ে অশ্রুর উচ্ছ্বাস উঠল উদ্বেল হ'য়ে তখন বিদায় নিলাম বন্ধুবর ৺বরেন বসুর সঙ্গে। পথে কিছু কথা হ'ল তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মহিমা নিয়ে—যদিও কথা কইতে ইচ্ছা হয় নি।

তবু হ'ল কথা। নানা কথা। অথচ কতটুকু কথাই বা হ'ল? কথার পটে কি সে বহুমুখী মহিমার ছবি আঁকা সম্ভব? সে-দাক্ষিণ্য, সে-সৌকুমার্য, সে-দরদ, সে-স্নেহ সে-নিরভিমানিতা, সে আনন্দের অক্লান্ত স্ফটিক-নৃত্য, সে রসের বিরতিহীন নৃত্য-গতি, সে সংযম, সেই সব-জড়িয়ে ফুটে ওঠার রহস্য—দুঃখকে হার মানিয়ে, শত্রুকে ভালোবাসিয়ে, আত্মাভিমানকে পৌরুষে দাবিয়ে, সর্বোপরি—নিয়তির পিছুটান কাটিয়ে দিনে দিনে তিলে তিলে জগৎজোড়া তামসিকতার মাঝে স্বপ্নকে সৃষ্টিকে রসকে তাঁর বিষজয়ী প্রাণশক্তিতে জাগিয়ে!

বিষজয়ী তিনি ছিলেন সত্যিই। নৈলে দুঃসহ রোগের দুঃখ ও মৃত্যুযন্ত্রণার মাঝেও তাঁর আনন্দ জেগে থাকতে পারত কি উনশেষ মুহূর্ত অবধি? মৃত্যুর দুদিন আগেও তিনি কত হাসি ঠাট্টা করেছেন—বলছিলেন সেদিন আমাকে অবনীন্দ্রনাথ।

মনে পড়ছিল ক্রমাগতই কবির একটি প্রিয় শ্লোক—যা ছিল তাঁর জীবনের একটি সিদ্ধিমন্ত্রের মতন:

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবনম্
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা।

তিনি অপরাজেয় ছিলেন শুধু তো জীবনে নয়—মরণেও। তাইতো তিনি এত সহজে পেরেছিলেন সেই সবচেয়ে-কঠিন-সাধনায় উত্তীর্ণ হ'তে: সর্বব্যাপী দুঃখ-বেদনার মাঝে আনন্দ রূপকে দেখতে পারা। মনে পড়ে একবার য়েট্স লিখেছিলেন দুঃখ ক'রে:

তাপিত ধরায় দে বিদায়,
দেববালাদের হাত ধ'রে চ'লে আয়।
ম্লান মৃন্ময়ীর বুকে যে-ক্রন্দন উপ্ত চিরন্তন,
তল তার কে পায় চিন্তায়?

Come away
With the fairies, hand in hand
For the world is more full of weeping
Than you can understand.

এ বিষাদ মন্ত্রের উত্তরে কবি চেষ্টারটন লিখেছিলেন :

জগৎ তপ্ত, অকরুণ, ধূলি-ম্লান,
হৃদয় ক্লান্ত, সুদূর—সাধনে জয় :
তবু কেন তার মহিমা নিরবসান
তুমি কী বুঝিবে বন্ধু, অশ্রুময়!

The world is hot and cruel,
We are weary of heart and hand,
But the world is more full of glory
Than you can understand.)

এ বাণী আস্তিকের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই আস্তিক। তাই না নরোয়ের প্রেমিক লিখেছেন ভারতের বাণীবাহ-কে :

"He is India bringing to Europe a new divine symbol : not the Cross, but the Lotus."*

প্রতীচীরে দিলে কবি, ভারতের প্রসাদ অমল :
নহে শরশয্যা—সে যে আনন্দের মন্ত্র-শতদল।

এ-কথাটা তাঁর দেহরক্ষার পরে আরো বেশি ক'রে মনে রাখা চাই, যখন তাঁর শেষের দিককার জীবনে অবান্তর অনেক কিছু দেখে আমাদের এই বিভ্রম জন্মানো অসম্ভব নয় যে এই-ই ছিল তাঁর পরিণত মতির স্বধর্ম। আজ তাঁর জীবনের এ-ও-তা উদ্ধৃত ক'রে দেখানো খুবই সহজ যে তিনি ছিলেন (১) বস্তুবাদী (২) জড়বাদী (৩) দুঃখবাদী (৪) গণ্যবাদী (৫) দলবাদী (৬) তারুণ্যবাদী (৭) বিজ্ঞানবাদী আরো কত-কী-বাদী। তিনি ছিলেন বহুমুখী মস্ত মানুষ – প্রাণ ছিল তাঁর বহুভুক্, মন—বহুসন্ধানী। তাই এখানকার বিজ্ঞান, ওখানকার ব্যূহরচনাকৌশল, সেখানকার

* Golden Book of Tagore-এ Johan Bojer (৪০ পৃষ্ঠা)

যান্ত্রিকতায় মুগ্ধ হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল—কেন না আশ্চর্য সজাগ মানুষ তিনি, যাতেই সাড়া দিতেন তাকেই সমর্থন করতেন শিশুসরল উৎসাহে। এ অতি দুরূহ শক্তি—শ্রদ্ধেয় শক্তি সন্দেহ কী? কিন্তু তবু একথা মানতেই হবে যে তাঁর মতন মহাপ্রতিভাবান মানুষের সাড়া বিচিত্র হ'লে, সব সাড়া কিছু তাঁর কেন্দ্রীয় প্রকৃতির সাড়া নয়—মূল স্বভাবের ধারা নয়। মূল প্রকৃতি ছিল তাঁর ভারতীয়—ওরফে আত্মবোধের আস্তিক্য। এই জন্যেই পাশ্চাত্যে তাঁর গীতাঞ্জলি যে-সাড়া তুলতে পেরেছে সে-সাড়া তাঁর আর কোনো বইই তুলতে পারে নি। পাশ্চাত্য ভুলও করে নি—তাই তারা তাঁকে চিনেছিল তাঁর স্ব-রূপে, যদিও আমরা (পাশ্চাত্যের মোহে প'ড়ে) অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথকে ভেবেছি পাশ্চাত্যধর্মী, বিজ্ঞানপন্থী, বাস্তববাদী। তাই একথা বার বার মনে করার দরকার আছে—(বিশেষ ক'রে এ-যুগের নিরীশ্বর অধর্মের ধর্মপদবী পাওয়ার দিনে)* যে রবীন্দ্রনাথের মূল স্বরূপ ছিল তাঁর আস্তিক্য। এমন 'ক তাঁর যে-প্রাণানন্দ তারো মূলে ছিল এই ঈশ্বরমুখিতা (Godwardness)।

আমার বেশ মনে তাঁর আছে মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বার বারই সেদিন মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের দুটি বিশেষ প্রিয় ঔপনিষদিক শ্লোকের কথা। একটি হ'ল: "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" এ শ্লোকটির ভাষ্যে তিনি লিখছেন†: "কেই বা কোনো প্রকারের কিছুমাত্র চেষ্টা করত যদি আকাশ পরিপূর্ণ ক'রে সেই আনন্দ না থাকতেন! সেই আনন্দই বিশ্বকে অনন্তগতি দান ক'রে রয়েছেন—আকাশপূর্ণ সেই আনন্দ আছেন ব'লেই আমার চোখের পাতাটি আমি খুলতে পারছি।...জগতের সকলের চেয়ে যিনি অন্তরতম তাঁকেই যখন দূর ব'লে জানি তখন তিনি জগতের সকলের চেয়ে দূরে গিয়ে পড়েন...এই দূরত্বের বেদনা আমরা স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করিনে বটে কিন্তু এই দূরত্বের ভারে আমাদের প্রাতিদিনের অস্তিত্ব, আমাদের ঘরদুয়ার, কাজ-কর্ম, আমাদের সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে।"

এই আনন্দ তাঁর অন্তরতলে ধন্য হ'য়ে বিরাজ করত ব'লেই তিনি গাইতে পেরেছিলেন অমন সুরে:

* আমার এক অতি বুদ্ধিমান বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম একবার—বুদ্ধ ও লেনিন একই থাকের মানুষ। মনে পড়ে আর একজনের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য (আমাকে লেখা একটি পত্রে): "His ignorance of spiritual values is amazing!...

† শান্তিনিকেতন (বিশ্বভারতী সংস্করণ) ১৩৪১, ৮০ পৃঃ ও ৮২ পৃঃ

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর।

আর এই "সুন্দরই" তাঁর শেষরাত্রির দিনে দেখিয়েছিল "সমুখে শান্তি পারাবার"। প্রভাতে যে-সুর বেজেছিল প্রণয় সুরে নিশীথ রাতে সে বেজেছিল অভয় মিড়ে। এ-সুর যদি তাঁর সত্তার আপন সুর না হ'ত তাহ'লে কিছুতেই তিনি সমস্ত বেদনার মধ্যে দেখতে পেতেন না ছদ্মবেশী আনন্দদেবতাকে, পারতেন না এমন ক'রে অঙ্গীকার করতে যে

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে।

দুটি শ্লোকের অন্যটি ছিল: মৈত্রেয়ীর সেই অমৃতশপথ: "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম?" এই মন্ত্রটির যে তিনি কত ব্যাখ্যা করেছেন—গভীর স্নেহে শ্রদ্ধায় উচ্ছলতায় একে কত রঙে যে রঙিয়ে তুলেছেন, গদ্যে পদ্যে উপমায় অলঙ্কারে, তার আর অবধি নেই। তাঁর বিরহিণী নারী সম্বন্ধে অপরূপ কবিতাটির প্রেরণা এইখান থেকেই পাওয়া। তাই এ শ্লোকের তিনি ভাষ্য করেছেন এই ব'লে যে, 'এই-যে মৈত্রেয়ী তাঁর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে ব'লে উঠলেন: "যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব! এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয় তিনি তো চিন্তার দ্বারা ধ্যানের দ্বারা কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেক লাভ ক'রে একথা বলেন নি—তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে ঘ'ষে নিয়েই তিনি ব'লে উঠলেন: 'আমি যা চাই এ তো তা নয়।'…"…(৩৮ পৃষ্ঠা)

এই কথাটিই তিনি বলেছেন কবিতায় তাঁর অন্তরবাসিনী চিরবিরহিণীর কান্নায় যার ভাষ্য দিয়েছেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। সে-ভাষ্যটি এতই সুন্দর যে আর একটু উদ্ধৃত না ক'রে পারছি না।

"আমাদের অন্তর প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি এই নাও। খ্যাতি এনে বলি এই তুমি জমিয়ে রাখো।…আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনো স্পষ্ট ক'রে বলতে পারছে না যে, এসবে আমার কোনো ফল হবে না, সে মনে করছে হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও সব পেলুম ব'লে তার মন মানছে না…একদিন এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে একপাশে আবর্জনার মতো ঠেলে দিয়ে তাকে ব'লে উঠতেই হবে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম!" (৩৮ পৃষ্ঠা)

কথাটা এত ক'রে বলছি কারণ সেদিন তাঁর মহাপ্রস্থানের লগ্নে তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখে আমার মনে একটি প্রশ্ন ক্রমাগতই নানাদিক থেকে ঢেউয়ের মতন এসে লেগেছিল। প্রশ্নটি এই যে, রবীন্দ্রনাথের কোন্ রূপকে তাঁর সত্তার শ্রেষ্ঠ রূপ—স্বরূপ—বলব? The greatness of a man is the greatness of his greatest moments যদি হয়—তবে তাঁর উপলব্ধির শিখর-মুহূর্ত বলব কাকে?

উত্তর এল: তাঁর আস্তিক রূপকে। এই কথাটা আজকের দিনে অনেক অত্যাধুনিক ভুলে যান। তাঁরা মনে করেন তিনি এ-ও-তা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে এ-ভুল করেন নি। তিনি কালিম্পঙ থেকে তাঁর আত্মপরিচয়ের বিখ্যাত কবিতাটিতে বলেছিলেন যে তিনি সব আগে কবি। কিন্তু কিসের কবি? বস্তুবাদের? সুখবাদের? রণবাদের? আন্তর্জাতিকতাবাদের? বুদ্ধিবাদের? সাম্যবাদের? না তো। তিনি সব আগে কবি অস্তিবাদের: তাঁর শিল্পের প্রধান রূপের উদ্ভব তাঁর এই আস্তিক্যবোধ থেকে। রাসেলের Freeman's Worship-এর মনোবাদের—লেনিনের শ্রমিকবাদের—রোলাঁর শিল্পপূজাবাদের—মহাত্মাজির নীতিবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনবাণীর তুলনা করলেই একথার সত্যতা ধরা পড়বে। দেখা যাবে কোথায় এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভেদ—আর কেন সে-ভেদ মূলগত fundamental রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি (শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড ২ পৃঃ)

"ঈশ্বরকে যে জানি নে, তাঁকে যে পাই নি এইটে যখন অনুভব মাত্র না করি তখনকার যে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা সেইটে থেকে উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত।...আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চ'লে যাই যেন এ জগতে সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের কোনো স্থান নেই।...ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্বত্রই আছেন একথাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নয়, কিন্তু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমন ভাবেই চলি যেন তিনি কোনোখানেই নেই।...তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মে নি, সুতরাং তিনি থাকলেই বা কী না থাকলেই বা কী?"

এ-কান্না লেনিনের মতন পৃথ্বীবাদীর নয়, মহাত্মাজির মতন নীতিবাদীর নয়, জহরলালের মতন সংশয়বাদীর নয়, রোলাঁর মতন শিল্পাস্তিবাদীর নয়। এ-বাণী সেই মৃত্যুহীন ভারত-পতাকাবাহী রবীন্দ্রনাথের যিনি য়ুরোপের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আত্মার পরম বাণী—আর সে-বাণী হৃদয়বান দুঃখবাদ নয়, নিরীশ্বর রূপবাদ নয়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবাদ নয়—এমন কি তাঁর রূপঝংকৃত অনিন্দিত গীতিবাদও নয়, সে-বাণী হ'ল তাঁর গান রূপ শিল্প সবের ওপারের বাণী—"হেথা নয় হেথা নয় আর কোনোখানে"—হয়ত এ-অতীন্দ্রিয় আত্মবোধের সুর ফুটেছে তাঁর নানা কবিতার

একটুমাত্র আভাসে একটু ছোঁওয়ায় একটু গন্ধে একটু স্বপ্নে—তবু সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ কবির স্তর ছাড়িয়ে পৌছলেন ঋষির পর্যায়ে, বললেন যেখানে :

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
(আমার) সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।

আমার এই কথাটাই আরো বেশি ক'রে মনে হয় আজ তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে যে, তাঁর মধ্যেকার আস্তিক পূজারীকে বাদ দিয়ে তাঁর গদ্য পদ্য কর্ম চিন্তাকে বুঝতে যাওয়া হবে হ্যামলেট চরিত্রকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক বুঝতে যাওয়ার ম'ত।

মনে হয়েছিল আর একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে এতশত লোকের আশ্রয়স্থল হ'তে পেরেছিলেন? একি নাস্তিকের কাজ, না শুধু নিপুণ শিল্পীর কাজ? এ শুধু তারই কাজ যে ভগবানের আশ্রয় পেয়েছে।

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি

তোমার আশ্রিত যারা বিপদে তাদের নাহি ভয়
তোমার আশ্রয় লভি' হয় তারা সবার আশ্রয়।

তাঁর সুরেই শেষ করি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা :

একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
হংস যেমন মানসযাত্রী
তেমনি সারা দিবস রাত্রি
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ পারে।

রবীন্দ্রনাথের পত্রমর্মর

কল্যাণীয়েষু

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি আছি কাথিয়াবাড়ে রাজকোটে। এখান থেকে আরো নানা স্থানে ঘুরপাক খেতে হবে। হয়ত ডিসেম্বরের প্রারম্ভে একবার আমেদাবাদে যাব, তখন যদি তুমি সেখানে যাও তবে দেখা হবে।

সঙ্গীত সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মতের যদি অনৈক্য থাকে তা নিয়ে কোনো সঙ্কোচ বোধ কোরো না। পৃথিবীর ভূগোল-সংস্থানে পাহাড়ের সঙ্গে সমুদ্রের যদি অনৈক্য নিয়ে ঝগড়া হোতো তাহলে জীবজন্তুও টিকতে পারত না। আর যদি পাহাড়ে সমুদ্রে কোনো অনৈক্যই না থাকত তাহলে সেই মরুবসুন্ধরায় টেঁকা আরও দায় হত। মানুষের মানসজগতে মতের অনৈক্য থাকবে অথচ সেই অনৈক্য নিয়ে বিরোধ হবে না, সংঘাত হবে কিন্তু অপঘাত হবে না—এইটেই হচ্ছে প্রার্থনীয়। তুমি সঙ্গীততত্ত্ব নিয়ে আমার মতের প্রতিবাদ করলেও আমি বিবাদ করব না একথা নিশ্চয় জেনো। মতের সম্বন্ধ না থাকলেও প্রীতির সম্বন্ধ থাকতে পারে এটার দ্বারাই প্রীতির গৌরব প্রকাশ পায়। (নবেম্বর, ১৯২৩)

তোমাকে আমি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি। তোমার মধ্যে যে একটি বিশুদ্ধ সত্যপরতা ও সারল্য আছে তাতে আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করে। আমার সঙ্গে তোমার কোনো ব্যবহারে যদি সেই সত্যের কোনো বিকার দেখতুম তাহলে সেই ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিত। কখনো তা দেখিনি। অতএব আমার সম্বন্ধীয় কোনো কথায় তুমি মনে সঙ্কোচ বোধ করো না। আমার সম্বন্ধে তুমি যা কিছু আলোচনা করেছ তার কোথাও আমি দাম্ভিকতা দেখিনি। লোকের কথা শুনে যদি তুমি ব্যস্ত হয়ে ওঠো তাহলে তোমার স্বাভাবিকতা খর্ব হতে পারে। তুমি সহজ মনে যা বলবে, যা করবে তাতে দোষ স্পর্শ করবে না।···ইতিমধ্যে যদি একবার দেখা দিয়ে যাও তাহলে খুশি হব। (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২—১৯২৫)

খুব ঘুরে বেড়াচ্ছি। থেকে থেকে ক্লান্তির বোঝা উটের পিঠের শেষের তৃণের মতই আমার মেরুদণ্ডের উপর চাপ দিতে থাকে। কিন্তু দণ্ডটা বিধাতা বেশ পাকা করেই গড়েছিলেন, নইলে কোন্‌কালে ধুলোয় লুটোতে হ'ত।

এখানকার বিবরণ হয়ত লোকপরম্পরায় শুনতে পাবে। যেসব বোঝা বহন করে চুকিয়েছি, আবার তার বর্ণনা করে মনটাকে ক্লান্ত করতে ইচ্ছা করে না। বস্তুত ভোলবার শক্তি আর চলবার শক্তি এপিঠ ওপিঠ। ভুলি বলেই চলি আর চলি বলেই ভুলি। যারা পুরাতনকে কেবলি জমাতে থাকে তারাই চলা বন্ধ করে চণ্ডীমণ্ডপে গদীয়ান হয়ে থেলো হুঁকোয় টান দেয়—তার সাক্ষী আমাদের সনাতন ভারতভূমি।

যাহোক দেশে ফিরি, তারপরে কোনো একদিন বর্ষণমুখরিত অপরাহ্ণে, বা মলয়হিল্লোলিত সায়াহ্নে, বা শেফালী-সুগন্ধী প্রভাতকালে ভ্রমণবৃত্তান্ত আলাপ করব, কিম্বা সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার সেই অন্তহীন আলোচনার স্রোতে মনকে সাঁতার কাটাব।

কাগজে আজকাল তোমাকে নিয়ে দুএক জায়গায় যেসব মন্তব্য দেখা যাচ্ছে তা অত্যন্ত মোলায়েম নয়—তার থেকে অনুমান করছি আমার দলের লোক পাওয়া যাবে—আমার ক্লাসে এতদিনে তোমার প্রমোশন ঘটেছে বা। লোকনিন্দা জিনিষটা তিক্ত বটে, কিন্তু মানসযকৃতের বিকৃতি নিবারণের পক্ষে মন্দ নয়। (আষাঢ়, ১৩৩৩—১৯২৬)

অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। কেবল তোমার চিঠির উত্তরে আমি এই কথাটি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, কোন দিনই তোমার পিতার বিরুদ্ধে কারো সঙ্গে আলোচনা করিনি। তার কারণ যার কাছ থেকে আমি কোনো ক্ষোভ পাই তার সম্বন্ধে আমি সর্বপ্রযত্নে আত্মসংবরণ ক'রে থাকি। তোমাদের মত যাদের আমি ভালোবাসি, তাদের কখনো কখনো নিন্দা করা আমার পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু যাদের সম্বন্ধে আমার কোনো প্রতিকূলতা আছে তাদের নিন্দায় আমি পারতপক্ষে যোগ দিইনে। তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সেকথা জানিয়ে তাঁকে ইংলণ্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলেম, শুনেছি সে-পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখেছিলেন। সে-উত্তর আমার হাতে পৌছয় নি। (জানুয়ারী, ১৯২৭)

বহুদিন কেন তব সহাস্য
দেখিনি অমল কমল আস্য?
তব মুখ হতে
স্বর-সুধা স্রোতে

শুনি নি সরস ভাবের ভাষ্য ?
কেন যে তোমার এ-ঔদাস্য,
অবশ্য করে
লিখো লিখো মোরে
কারণটা যদি হয় প্রকাশ্য।

সুহৃজ্‌জনের বিস্মরণের
মন হতে তারে নিঃসারণের
চর্চায় আজি
হ'লে তুমি রাজি
একথা নেহাৎ অবিশ্বাস্য। (জানুয়ারী, ১৯২৭)

তোমাকে যদি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ না করতুম তাহলে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার লেশমাত্র চেষ্টা করতুম না। জীবনে এত লোক আমাকে বার বার ভুল বুঝেছে, যে সে-সম্বন্ধে আমার একটা উপেক্ষাবোধ জন্মে গেছে। আমি পারৎপক্ষে কৈফিয়ৎ দিতে যাইনে। তাছাড়া, আমাকে ভুল বোঝাবার সাইকলজিকাল কারণ যখন বুঝতে পারি তখন ক্ষোভ চলে যায়। এক দিকে বাতাস হালকা হলে অন্য দিক থেকে ঝড় আসে, এ নিয়ে মকদ্দমা করে ত কোনো লাভ নেই। হালকা বাতাসেরও দোষ নেই, না উদ্দাম বাতাসের। উভয়ের মধ্যেকার অসঙ্গতিই উপদ্রব করে থাকে। আমার নিজের স্বভাবের সব দিকটা সহজে পরিদৃশ্যমান নয়—বিশেষভাবে যে-দিকটাতে আমার মর্মস্থান। এইজন্য আমার অসম্পূর্ণ পরিচয়ের দ্বারা মানুষ যে আঘাত পায় এবং সব কাজের ঠিক হিসেব পায় না—সেটা আমার অদৃষ্টের চক্রান্তে। বস্তুতই সেটা নিয়তির রচনা—অর্থাৎ তার মূল হচ্ছে আমার যে-জায়গাটা দৃষ্ট নয় সেইখানে।—যাক গে। ঝড় আপনিই থেমে যায়—বিরোধের অসঙ্গতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আপনিই সামঞ্জস্যে গিয়ে পৌঁছয়। আরোগ্যের দাওয়াইখানা-বিভাগ কালের হাতে। (ফাল্গুন,—১৩৩৪)

কিছুকাল থেকে মনে মনে তোমার সন্ধান করছিলুম। কিন্তু বাহ্যজগতে তোমার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত বিবরণ না জানা থাকাতে এবং আমাদের ঋষিপিতামহদের দিব্যদৃষ্টির উত্তরাধিকার আমার জন্মকালের বহু পূর্বে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়াতে হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিলুম। হেনকালে তোমার পত্র এল—বোধ

করি তার মধ্যে আমার ইচ্ছাশক্তির কিছু প্রভাব ছিল। আশা করি সেই ইচ্ছাশক্তি শেষ পর্যন্ত কাজ করবে এবং তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ইচ্ছাশক্তির তুলনায় আমার চলৎশক্তি অনেক কম—তাই এখানে ব'সে ব'সে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। (বৈশাখ, ১৩৩৫-১৯২৮)

অমিয়কে যে-চিঠি লিখেছ দেখলুম। একটি কথা বলতে চাই—আমি তোমাকে গভীরভাবেই স্নেহ করে এসেছি—আজ কোনো কারণে তার অপঘাত ঘটবে এমন আশঙ্কামাত্র নেই। আমি কোনোদিন আঘাতের স্মৃতি স্নিগ্ধজনের বিরুদ্ধে মনে টাঙিয়ে রাখি নে।···তোমাকে যারা নানা প্রকারে নিন্দা করেছে তাদের সঙ্গে কোনোদিনই আমার মনের সায় নেই তাতে আমি খুবই ব্যথা বোধ করেছি। (কার্তিক, ১৩৩৫—১৯২৮)।

প্রাণের গতি নিঃশব্দ, নিগূঢ়। অঙ্কুর বীজকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে। তার ধ্বনি যদি থাকে সেটা ভিতরে, সেইটিই হচ্ছে নীরব ওঁ। গাছ প্রতি মুহূর্তে বাড়ে। তার ঘোষণা নেই। কিন্তু দিগ্বিজয়ী রাজা জয়স্তম্ভ যখন বানিয়ে তোলে তখন তার প্রত্যেক স্তরে স্তরে শব্দ, দূর থেকে মানুষ জানতে পারে একটা কাণ্ড হচ্ছে—কারণ তার এই সাধনার দ্বারা সে তার অহংকেই প্রচার করে। কিন্তু মুক্তির সাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে এই অহংকে তার নিগূঢ় গুহাগহ্বর থেকে খেদিয়ে নিয়ে মারা, নইলে তপস্যার ফল সেই চুরি করে, আত্মা হয় বঞ্চিত। (ডিসেম্বর, ১৯২৮)

সংসারে যত কিছু অকর্তব্য তার দুটিমাত্র শ্রেণীবিভাগ আছে। এক—অসত্য, দুই— নির্দয়তা। যে কাজে নিজেকে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা করতে হয় বা যাতে অন্যে পীড়া পায় তা বর্জনীয়। ব্যাংকের ম্যানেজার জুয়াচুরি করেছে, তাকে দোষ দিই তার দুটিমাত্র কারণ, প্রথমত সাধারণকে ভাঁড়িয়ে কাজ করেছে, দ্বিতীয়ত বহুলোককে দুঃখ দিয়েছে। তার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল—টাকায়,—সে-প্রয়োজন স্বাভাবিক, সে-প্রয়োজন সিদ্ধ করা নিন্দনীয় নয়, এমন কি জীবন ধারণ ও সংসার যাত্রার পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু যখন আত্মগোপন ও নির্দয়তার পথ দিয়ে সে-কাজ করতে হয় তখন প্রাণপণে সেই কামনাকে দমন করাই শ্রেয় বলে জানি। (ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮)

স্বত্বের জোর হচ্ছে তার সীমানা নিয়ে—ভাষায় ভাবের সীমানা নির্দেশ ক'রে দেয়। সেই সীমানায় ফাঁক পড়লেই সেটা নিতান্ত সাধারণ হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের গৌরব হচ্ছে সত্যের সাধারণত্ব নিয়ে, সাহিত্যের গৌরব—ভাবের বিশেষত্ব নিয়ে। এই বিশেষত্ব অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার উপর নির্ভর করে—তার উপরে আমার দরদ আছে, খ্যাতির তাগিদে নয় স্বভাবের তাগিদে। যেমন তেমন করে যাকে খাড়া করে তোলা হয় তার মধ্যে আমার বক্তব্য বিষয় থাকলেও তাকে আমি স্বীকার করতে পারি নে—তাকে জাতে তুলতে হলে শুদ্ধির দরকার হয়। অনেক সময় নষ্ট করলুম—এও স্বভাবের তাড়নায়। (জুলাই, ১৯৩০)

পত্র ব্যবহার সম্বন্ধে তুমি বর্গি-বিশেষ, পোষ্টকার্ডের পত্রপুটে দুচার কথা মুড়ে দিয়ে তোমার খাজনা দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। কিন্তু আমার ক্ষেতে যে বুলবুলির ঝাঁক,—কত প্রশ্ন, কত চিঠি, কত চিন্তা, তাদের ছোট ছোট চঞ্চুপুটে ধান উজাড় করে দিয়ে যায়—তোমার মত বর্গির খাজনা দেবে কিসে ?

বয়স সত্তর হোলো—আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায় বাকি নেই। আমি কি, আমি কোন্‌খানে আছি, তা নিয়ে যারা তকরার করে তারা চোখ বুজে করে, তাকিয়ে দেখে না। একদিন কোনো পঁচিশে বৈশাখে ষোল বৎসরের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, অনেকগুলো পথের সামনে, অনেকগুলো আন্দাজের মুখে। তার মধ্যে সবগুলোকে বাদ দিয়ে আজকে অন্তত একটাতে এসে ঠেকেছে। এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।

বহুকাল আগে "কড়ি ও কোমল"-এর একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

"মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

তার মানে হচ্ছে এই, মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যেই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠলো না,—কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে।

আমরা রাহুগ্রস্ত হ'য়ে মরি, যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।

তুমি আমাকে উপরের বেদীতে চড়িয়ে রাখবে কেমন ক'রে? আমি যে তোমাদের সমবয়সী। আমার এতপাকাদাড়ি নিয়েওআমি তোমাদের সঙ্গে বকাবকি করেচি, ঝগড়া করেচি, আসর জমিয়েচি, এক ইঞ্চি তফাতে স'রে বসিনি। আমার প্রবীণতায় অভিভূত হ'য়ে তোমরাও যে বিশেষ মুখ সাম্‌লিয়ে কথা কয়েছ, আমার ইতিহাসে এমন লেখে না। এতে অনেক অসুবিধে হয়েছে, সময় নষ্ট হয়েছে বিস্তর, কিন্তু মনে একটা গর্ব অনুভব না ক'রে থাকতে পারিনে যে, তোমাদের সঙ্গে অতি সহজেই একাসনে বসতে পারি। এর থেকে বুঝেছি বুড়ো হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যারা ধর্মে কর্মে বিষয় সম্পত্তিতে স্বকীয় বা স্বাজাতিক ভাগ বখরার মামলা নিয়ে পেকে উঠল কোনোদিন তাদের ছোঁয়াচ আমাকে লাগবে না। যে-মানব একই কালে "সনাতন" এবং "পূনর্নব" আমি তাঁরই কাছে কবিত্বের বায়না নিয়েচি— অতএব মানুষের মধ্যে আমি বাঁচব, তোমাদের সকলের মাঝখানে, কখনো বা তোমরা আমার গায়ে দেবে ধূলো, কখনো বা মালাচন্দন। আমি মানুষের অমৃতকে পেয়েচি, তাকে সুখে দুখে ভোগ করেচি—আমার রঙিন মাটির ভাঁড়ে তাকে রেখে গেলুম,—অনেক চু'ইয়ে গিয়েও কিছু তার বাকি থাকবে,—অল্প হ'লেও ক্ষতি নেই, কেননা ওজন দরেই তার দাম নয়।

তারপর তোমার কবিতার কথা বলি। পরিমাণ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম! ইতিপূর্বে পদ্যজাতীয় তোমার অনেক লেখাই দেখেচি। বার বার মনে হয়েছে বঙ্গবাণীর মধুকোষের পথ তুমি পাওনি, তুমি ছন্দে পঙ্গু। তা নিয়ে মাঝে মাঝে আমি বিচার করেছি, সেটা নিশ্চয় শ্রুতি-সুখকর হয়নি। অপ্রিয় কথা বলবার অপ্রিয় দায় তুমি আমার উপর আবার চাপাতে এসেচ মনে ক'রে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলুম।

কিন্তু এ কি ব্যাপার হে? হঠাৎ ছন্দ পেলে কোথা থেকে? গুরুমশায়গিরি করবার জো রাখো নি। অকস্মাৎ তোমার কান তৈরী হ'য়ে গেল কী উপায়ে? আর তো তোমার ভয় নেই। কিন্তু কাব্য রচনায় খোঁড়া কি ক'রে লাঠি ফেলে দিয়ে খাড়া হ'য়ে উঠে দৌড়ে চলে তার রহস্য আমি বুঝতে পারচিনে। এক একবার ভাবি তুমি আর কারো কাছ থেকে লিখিয়ে নাওনি তো? সরস্বতী যখন তোমার কণ্ঠে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছেন, তখন নবজাগ্রত ভাষায় তোমার যা-কিছু বলবার নিজের জবানিতেই বলে যেয়ো। তোমার বলবার কথাও ত জমে উঠছে তোমার ভিতরের থেকে। (১৩৩৭—১৯৩০)

শাস্ত্রে বলে "ভুক্তা রাজবদাচরেৎ"। অর্থাৎ পেট ভ'রে ভোগটার যখন সমাধা হয়েছে তখন বাদশার মত গা ঢেলে দিয়ে কুঁড়েমি করবে। জীবনের সুখ দুঃখ ও কর্মভোগ ত খুব পুরো পরিমাণেই হ'য়ে গেছে, এখন নৈষ্কর্তব্য ছাড়া আর কোনো কর্তব্যই নেই। খুব সাব্লাইম রকমের কুঁড়েমি করবার জন্যে মনের আকাঙ্ক্ষা—দার্জিলিঙের কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়টার মতো—চাষবাসের কোনো বালাই নেই, পশুপক্ষী-পতঙ্গের কোনো ধার ধারে না—চুপচাপ বসে কেবল মেঘে মেঘে রঙ লাগাচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমার মনের ভাব তুমি ঠিক মতো ঠাওরাও নি। একটু খোলসা ক'রে বলি। আজকাল প্রায় মাঝে-মাঝে ছবি-আঁকার তাগিদ আসে। তখন দরজা বন্ধ করতে হয়। কলমের মুখে রূপের আবির্ভাব হয় নির্জনে। এই যে দ্বারের বাইরে লোককে ঠেকিয়ে রাখি এজন্যে নিজেকে দোষ দিইনে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাঁর ছবির প্রথম আঁচড় টানেন গোপনে।

ছবি-আঁকা ব্যাপারটা যদিচ নির্জনে, তবু ছবি ব্যাপারটা সর্বজনের। এস্থলে জনতারই কর্তব্য নিষ্কৃতি দেওয়া, রচনাশালায় আড্ডা জমাতে আসা ধৃষ্টতা। যাঁরা ছবি আঁকাটাকেই মনে করে বাজে কাজ তারা বর্বর—তারা যা বলে বলুকগে, রাগ করে তো করুক। তারা কমিটি মিটিঙের ক্যোরাম রক্ষার জন্যে চেঁচামেচি করে—তখন দরজায় ডবল তালা লাগিয়ে কান বন্ধ করলে দোষ হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিবিষ্ট আছেন। তাঁর সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ নিয়ম খাটবে না। তাঁকে সসম্ভ্রমে দূরেই স্থান দিতে হবে—সব সৃষ্টিকর্তাই একলা, তিনিও তাই। আমাদের অভিজ্ঞতা সেইখানেই যেখানে জমেছে সকলের সঙ্গ,—তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে উত্তীর্ণ হয়ে। কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করি কেন?—যে জন্য মেঘকে সহ্য করি দূর আকাশে জমতে—শেষকালে বৃষ্টি পাওয়া যাবে চাষের জন্যে, তৃষার জন্যে। কিন্তু কলের পাইপটা যদি মেঘের মধ্যে চালান করে দেওয়া যায় তাহলে সহরের মেয়র সাহেবকে কাগজে গাল দিতেই হবে।...

তোমার হাল আমলের কবিতার পরে হস্তক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হই। শব্দের ধারা ও ধ্বনির কল্লোলও বাধা পাচ্ছে না কোথাও। হঠাৎ তুমি এ-ওস্তাদি কোথা থেকে অর্জন করলে ভেবে পাইনে।

তোমার কবিতার বইয়ের নাম চাও? নামকরণ রূপকরণের চেয়েও শক্ত রূপের পরিচয় স্বয়ং রূপেই, নাম এসে বেড়া লাগিয়ে দেয়—সীমা নির্ণয়টা ঠিক মনের মতো হয় না। তুমি নাম দাও না—"অনামী"। যার নাম খুঁজে পাই না তারি কথা বলি ছন্দে—ডিক্‌সনারি দূরে প'ড়ে থাকে। (৫ই বৈশাখ, ১৩৩৮—১৯৩১)

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম।...(অমুকে)র তরফের কথাটাও একবার চিন্তা ক'রে দেখা কর্তব্য। একদা তুমি তার অন্ধ উপাসক ছিলে। তোমার অন্ধ ভক্তির উপর দাবি করবার অধিকার তুমিই তাকে দিয়েছিলে। যে-অমরাবতীতে সে আর... (তমুক) পাশাপাশি থাকে সেখানে তোমার অর্ঘ আর পৌঁছচ্ছে না। তোমার সমস্ত নৈবেদ্য তুমি পণ্ডিচেরিতে রওনা করতে উদ্যত। এমন লোকসান অবিচলিত চিত্তে সহ্য করতে পারে কজন লোক? তোমার হিরোওয়ার্শিপে তাদের শ্রদ্ধা নেই কারণ সে-ওয়ার্শিপে তারা আজ বঞ্চিত। বাংলার জমিদারের কাছ থেকে পার্মানেণ্ট সেটল্‌মেণ্টের অধিকার যদি রাজসরকার কেড়ে নেয় তাহলে জমিদার মহলে সহজেই গর্জনধ্বনি ওঠে। তোমার হিরো-ওয়ার্শিপে (অমুকে)-র পার্মানেণ্ট স্বত্ব সহসা সংকটাপন্ন তাই সে চায় না যে তোমার নৈবেদ্যের অপচয় ঘটে। সে যদি নকল 'হিরো' না হত তাহলে এত রাগ করত না, মনে মনে হাসত। (আগষ্ট, ১৯৩১)

অহল্যা পাষাণীর প্রয়োজন ছিল রামচন্দ্রের পদস্পর্শ। দেশে পাষাণটাকে সচেতন করতে হবে। ওটা কেবল বাইরের ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে মরছে। পলিটিক্সের ঠেলা—গড়গড় শব্দ হচ্ছে, ধুলো উড়ছে, অন্তরে উদ্বোধন নেই। সেই জন্যেই প্রাণস্পর্শের অপেক্ষা করে আছি। (ভাদ্র, ১৩৩৮)

আজকাল খুব দরাজভাবে কুঁড়েমি করি। এমন দিন ছিল যখন চিঠি পেলেই তার উত্তর দেওয়া আমার একটা ব্যসনের মতোই ছিল। এখন সেই রিপুটা প্রায় ছেড়েছে বললেই হয়। ভূতটাকে আমার স্কন্ধ থেকে ঝাড়িয়ে নিয়ে অমিয়র উপরে চালান করে দিয়েছি। অনেকে তার হস্তাক্ষর আমারই মনে করে সযত্নে সংগ্রহ করে রাখছে। ভাবীকালের প্রত্নতত্ত্ববিদদের জন্যে গবেষণার খোরাক জমা হচ্ছে। হয়ত ৩০১৩ খৃষ্টাব্দে এই গৌড়দেশেই কোনো পণ্ডিত নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবেন যে, রবিঠাকুর ছিল Solar myth, তাঁর একচক্র রথের বঙ্গীয় নাম ছিল অমিয়চক্র, এই জন্যে তাঁর বাহনের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁকেই বলা হত অমিয়চক্রবর্তী। ডকুমেণ্টারি এভিডেন্স থেকে দেখানো শক্ত হবে না যে, ভারতের পূর্বগগনে যেখানে রবিঠাকুরের পীঠস্থান অমিয়চক্রবর্তীর অধিষ্ঠানও এই একই স্থানে। ভাবী জন্মে আমি হয়ত অতি আশ্চর্য পাণ্ডিত্য সহকারে এই মত সমর্থন করে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনশ্চ ডাক্তার উপাধি লাভ ক'রে সম্মানিত হব। আশা করি আমার প্রতিপক্ষ কোনো অধ্যাপক আমার আজকের লেখা এই চিঠিখানি হঠাৎ আবিষ্কার

করে রবীন্দ্রনাথের ভাবী জন্মান্তরীণকে যথোচিত লাঞ্ছিত করতে পারবে এবং সেই সঙ্গেই উপাধিদাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও। (আষাঢ়; ১৩৩৮—১৯৩১)

ছন্দের 'হিসাবও যেমন সূক্ষ্ম, ভাষারও তেমনি। এ নিয়ে কারো সঙ্গে মতের মিল করতে যাওয়া ভুল। লিখে যাও, তার পরে কালের দরবারে শিরোপা যখন পাবে তখন কারো কিছু বলবার থাকবে না। আপনার পথ আপনিই বের করো। কবি মাত্রেরই মতো তোমারও বলবার অধিকার আছে যে তোমার আদর্শই শ্রদ্ধেয়। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—কবিতা রচনাতেও খাটে।

তোমাকে পূর্বে বলেছি ছন্দ নিয়ে কোনো কথা বলব না। এ হোলো সূক্ষ্ম-বোধের কথা, ছান্দসিকের সাক্ষ্যসাবুদ নিয়ে রায় দেবার কাজ অন্তত আমার নয়। আজ প্রায় ষাট বছর ময়রার কাজ করে এসেছি, শেষ বয়সে সন্দেশের তার যাচাই করবার জন্যে ল্যাবরেটরির দোহাই পাড়তে যাব না, যে-রসায়নে সন্দেশের বিচার হয় সে আমার মনের মধ্যেই থাক, কলেজের ক্লাসের কাঠগড়ায় তার সন্ধানে যাব না। (জানুয়ারী, ১৯৩২)

তোমার লিপির প্রথম ছত্র পড়েই চমকে উঠেছিলাম।…শেষে প্রবাসীতে আমার "পত্রধারা" পড়ে বুঝলুম কোন লেখা থেকে তুমি আমার অপরাধ নিয়েছ।… তুমি জানো শ্রীঅরবিন্দকে আমি অকৃত্রিম ভক্তি করি। তাকে আমি আধুনিক কালের ব্যবসায়ী অবতারের দলে গণ্য করতে পারি এমন কথা তুমি কল্পনাও করবে এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। এ-কথা সকলেরই জানা আছে বাংলা দেশে অবতারের এপিডেমিক দেখা দিয়েছে তার কারণ সস্তায় মুক্তি পাবার জন্যে একদল লুব্ধ। এরা মোহবিস্তার করে এই মুগ্ধ দেশকে আরো আবিষ্ট করেছে একথা তুমিও স্বীকার করবে। দেশে মেকি কবিত্ব অনেক চলছে, তার কাটতিও আছে—তার উপরে যদি শ্লেষ কটাক্ষপাত কেউ করে তবে কি আমি বলবো এটা আমারই উপরে লক্ষ্য করা হোলো ? যাঁদের মহিমা উর্ধ্বলোকে বিরাজ করে তাঁদের ভক্তেরা তাঁদের সম্বন্ধে যেন নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁরা স্বতই নিরাপদ। অন্তত তাঁরা আমার মতো লোকের অবজ্ঞার লক্ষ্য হতেই পারেন না একথা যদি না বোঝো তবে তাতে আমার প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে, তাঁদের প্রতিও। ভালো জিনিষের কৃত্রিমতা সকলের চেয়ে হেয়—তাকে প্রশ্রয় দিলে বড়ো জিনিষেরই মূল্য কমানো হয়। (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২)

কারো উপরে আমি রাগ করে বিমুখ হয়ে বসে আছি একথা মনে করতেও আমার ভালো লাগে না, কেননা এটা আমার নিজের প্রতি শাস্তি ও অমর্যাদা। যদি কখনো সে রকম দুর্যোগ ঘটে তবে সেটা ক্ষালন না করে আমি নিরস্ত হইনে। তোমার উপরে আমার মন বক্র হয়ে আছে এটা সত্য নয় এবং কারণ যদি কিছু নির্ণয় করে থাকো সেটাও সেই জাতীয়।

আসল কথা আমার মনটা ফল্গুনদীর মতো অন্তঃশীলা হবার দিকে যাচ্ছে। বাইরের দিকে কাজ করতে হয় কিন্তু তাতে ঔৎসুক্য নেই। এটা বিশেষ কোনো সাধনার কথা নয় বয়সের কথা। তোমার চিঠিতে বার বার আমার ছবি-আঁকার প্রতি কটাক্ষ করেছ। বস্তুত ছবি আঁকাটাই আমার বাণপ্রস্থ্য—মন ওর মধ্যে আপনাকে হারায় অথচ পায়ও। একটা বয়সে মানুষের কাজের সময় চলে যায়, সেই ছুটি তার খেলা করবার ছুটি। যে সৃষ্টিকর্তার কর্তব্যের দায় নেই, যিনি যুগযুগান্তর খেলা করে কাটান, শেষ বয়সে আমি তাঁরই চেলা হতে ইচ্ছা করি। কাজের বেলায় কাজ যথেষ্ট করেছি, এখন যদি কর্তব্যের তাগিদ স্বীকার করতে অমনোযোগ ঘটে, বিশ্বকর্মা জরিমানা করবেন না বলে বিশ্বাস করি। যখন বয়স অল্প ছিল তখন ছোটো-খাটো নানাবিধ উপরি কাজের ভিড়ের মধ্যে দিয়েই নিজের আসল কাজগুলো সারতে পেরেছি। এখন উপরি কাজের দাবি দুঃসহরূপে বেড়ে গেছে, তারি ঠেলাঠেলিতে মনকে আপন সহজ পথে ঠিক রাখতে পারিনে। ছবি আমাকে সেই সহজের দিকে পথ করে দেয়।...

আমার মন স্পর্শকাতর এই তোমার ধারণা? এ-ধারণা অসত্য নয়। আমার বেদনাবোধ যদি অপেক্ষাকৃত অসাড় হত তাহলে সুরুতেই কবির কাজে ভর্তি হওয়া চলত না—আবার বেদনাকে যদি অধঃকৃত করতে না পারতুম তাহলেও কবির হার হত। এই দুই বিরুদ্ধতার জন্যেই একদল বিচারক আমার স্বভাবে বেদনাবোধের অভাব দেখতে পায়। সংরাগ, ইংরাজীতে যাকে প্যাশন বলে, আমার স্বভাবে তার স্বল্পতা তারা কল্পনা করে। দুটোই সত্য এবং দুটোই সত্য নয়। কিন্তু এসমস্ত তর্কের কথা, যে-তর্কের চরম নিষ্পত্তি নেই—অন্তর্যামীর মহলে কথা-কাটাকাটি চলে না। আমার জীবনের বহিরাকাশে প্রদোষের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে—এই সন্ধ্যাবেলায় বাদবিবাদের কোলাহল শান্ত হোক এইটেই কামনা করি।...

কারো প্রতি যখন মনে সংশয় জন্মায় তখন অধিকাংশ স্থলেই ভুল হয়—

অবিচারের সম্ভাবনা ঘটে। মানবস্বভাব দুর্গম, তাকে নিজের মনের ঝোঁক দিয়ে অনুমান করতে গেলে ঠিক জায়গায় চোখ পড়বে না। (ফেব্রুয়ারী ১৯৩২)

রাগ করে আছি মনে করে বৃথা তুমি নিজেকে পীড়ন কোরো না। তোমাকে কঠিন আঘাত করেছি জেনে অবধি অনুতপ্ত আছি। তোমার অহঙ্কার নিয়ে তোমাকে দোষারোপ করে কী হবে, নিন্দে যে করি সে-ও অহঙ্কার থেকে। অহঙ্কার উপড়িয়ে ফেলতে যে পারে সে তো ধন্য—পারিনে যখন তখন পরস্পরের অহঙ্কার বাঁচিয়ে চলতে পারলে সেও কম কথা নয়। আঘাত পেয়েও মনকে শান্ত করতে পারলে তুমি গভীর আনন্দ পাবে। (নভেম্বর, ১৯৩৩)

ছুটির যোগ্য বয়স যতই বাড়ছে কাজের ঝোঁক ততই ঘিরে দাঁড়াচ্ছে চারিদিকে। জীবনটা ক্রমেই হয়ে উঠছে হাল বাংলায় যাকে বলে বাধ্যতামূলক। তাতে অন্তরে অন্তরে অবাধ্যতার ঝাঁজটাই উঠছে উত্তপ্ত হয়ে। কিন্তু কর্মের শাসনের উপর না পারি প্রয়োগ করতে নিষ্ক্রিয় বিরুদ্ধতা, না হিংস্র বিদ্রোহ। ভালো মানুষের মতো দিনের পর দিন চলেছি বোঝা মাথায় নিয়ে, তার অনেকখানিই পুঞ্জীভূত বেগার খাটুনি।

দার্জিলিং যাব কি না তার স্থিরতা নেই। সেখানে যে-মহিলার কথা লিখেছ আমার সঙ্গে আত্মীয়তা জমানো তাঁর নিজের ইচ্ছা ও নৈপুণ্যের উপরই নির্ভর করবে। লোকের সঙ্গে অজস্র মেলামেশা করার টেকনিক জানিনে, ছেলেবেলা থেকে তার অভ্যাস থেকে বঞ্চিত। লোকে তাই নিন্দে করে আমাকে হিমশীতল অহৃদয় বলে। মেনে নিই, ফলভোগ করি। মনে ভাবি হয়ত কোনো তাপহীন গ্রহই আমার জন্মগ্রহ। বস্তুতই তাই, চন্দ্র আমার লগ্নে। অতএব কলঙ্ক আমার নয়, সে গ্রহের। নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো। (বৈশাখ, ১৩৪০—১৯৩৩)

অমুকের লেখা নিয়ে তুমি মনকে পীড়া দিয়ো না। আমার ছবি বা আমার গান তাঁর ভালো লাগে না এতে কোনো অপরাধ নেই।...ব্যক্তিগত আঘাতমাত্রকেই আমরা অত্যন্ত বেশি বাড়িয়ে তুলি—যতটা বেদনা পাই তার অনেকখানিই স্বকৃত। সাহিত্য বা কলারচনার মধ্যে একটা ঐকান্তিক ভালোমন্দের আদর্শ যদি থাকে তাহলে বাইরের স্তুতিনিন্দা নিয়ে অতি-মাত্র বিচলিত হবার দরকার দেখিনে—যা কেউ কেড়ে নিতে পারেনা তাকে কেড়ে নেবার ভঙ্গি করলে তাতে স্থায়ী লোকসান

নেই। রস-রচনার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে নিত্য আদর্শ যদি না থাকে তাহলে দরদাম নিয়ে কাড়াকাড়ি করা কিসের জন্যে? রসবস্তু নিয়ে যাদের কারবার, আত্মসান্ত্বনার জন্যে তাদের হাতে একটিমাত্র অস্ত্র আছে—অন্যপক্ষকে তারা বেরসিক বলে গাল দিতে পারে। কিন্তু সে-গালেরও জোর নেই কেন না অরসিকতার নিশ্চিত যুক্তি পাওয়া যায় না। যেহেতু রুচিসম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত সমর্থন পাওয়া যায় না সেইজন্যেই তা নিয়ে আমাদের মতামতে এত উত্তেজনার বাহুল্য থাকে (নভেম্বর, ১৯৩৪)

আমার বয়স অতি অল্পই বাকি আছে। বাইরের দিকে আমার ঔৎসুক্য ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ভিতরের দিক থেকে আমার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে বুঝতে পারছি। আপন সাহিত্য সম্বন্ধে আমার নিজের মনে একদা যে-উত্তেজনা ছিল সেও তার উত্তাপ প্রায় হারিয়েছে। এই ক্ষেত্রে চিরদিনই অতি কঠোর আঘাত পেয়েছি, আজও পাই। তাতে অতিমাত্র বিচলিত হলে গৌরবহানি হয় জেনে বেদনাকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছি, অন্তত তাকে ভাষায় প্রকাশ করিনি।

আমার কর্ম আমি শেষ করে দিয়েছি—আমার কাছে নতুন প্রত্যাশা করবার কিছু নেই। আমি মনে মনে নিজেকে নেপথ্যে সরিয়ে ফেলেছি। তাই বলে নূতন যুগের বাণী নীরব হবে না। তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ভাবপ্রকাশ সম্পূর্ণতর হোক এই একান্ত আশা করি। না যদি হয় তাহলে আমাদেরই কাজ বৃথা হয়েছে বলে জানব। আপন অধ্যবসায়ে তোমাদের কীর্তির যদি ভূমিকা করে দিয়ে থাকি তবে সেইটেকেই সকলের চেয়ে বড় সার্থকতা বলে জানব। পূর্বতনের পুনরাবৃত্তি সহজে বোধগম্য কিন্তু নূতনের পরিচয়ে বিলম্ব হতেই হবে যদি সে যথার্থ নূতন হয়। কামনা করি তোমাদের উদ্যম সার্থক হোক্—তাতে আমাদেরি সার্থকতা, দেশের সার্থকতা। শরতের উপন্যাস তর্জমা করছ, খুশি হলুম। অন্য দেশের কাছে আমাদের দেশের সাহিত্যপরিচয় মহিমান্বিত হোক। আমি ছুটি নিয়েছি। (মাঘ, ১৩৪১—১৯৩৪)

তোমার বয়স কম, আমি মান্ধাতার বয়সী, আমার পরে তোমার কোনো দরদ নেই। তাই আমি তোমাকে অভিযোগ দিতে বাধ্য হলাম যেন তুমি শতায়ু হও, অন্তত ছিয়াত্তর বছর যাও পেরিয়ে। এখন কেবল ভালো লাগে ঐ তরুমণ্ডলীর দরবার, যাদের ডালপালার বয়সের বোঝা নেই, আছে কালের প্রসন্নতা, চলে যাচ্ছে যে-দিন সে গোরুর গাড়ির চাকার মতো ওদের গায়ে গায়ে ক্ষতচিহ্ন রেখে যায় না

—রেখে যায় চিরযৌবনের আশীর্বাদ। আমি আছি এখন কৃত যুগে, কর্তব্যের যুগে নয়। আমার যে-মৌন সে সন্ধ্যাবেলাকার, এ নয় মধ্যাহ্নের। তোমাদের যে-স্মৃতি আমার কাছে আজ সত্য, সে হচ্ছে তোমাদের সৌম্যমুখের, স্নিগ্ধালাপের দিনের স্মৃতি, আমার দিনান্তের এই তারাবিভাসিত নিভৃতের সঙ্গে তারই মিল। তোমাদের নূতন নূতন পরীক্ষা আবিষ্কারও উৎসাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলি সে-উদ্যম আমার নেই। চেষ্টা করতে গেলে, ভুল হবে। তোমার "বহুবল্লভের" ভূমিকাটি পেয়েছি, ভাল লেগেছে বলতে সংকোচ বোধ করি—কিন্তু না বলাও অন্যায়। যদিও ওর মধ্যে আমার কথা আছে অনেক, তবু এমন সব বিষয়েরও আলোচনা আছে যার বস্তু এবং বেগ আদরণীর: আর এক সময়ে আবার পড়ে দেখব বলে ইচ্ছা রইল।

লরেন্সের পত্র নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তোমার যে উক্তি-প্রত্যুক্তি পাঠিয়েছ তা উপাদেয়। সেটা অত্যন্ত ভালো লেগেছিল এ-কথা বলা এত বাহুল্য যে বলতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

ছন্দ নিয়ে যে-কথাটা তুলেছ সে-সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলি। বাংলার উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণভেদ নেই সেইজন্যে বাংলা ছন্দে সেটা চালাতে গেলে কৃত্রিমতা আসেই।

॥ ॥ ॥ ॥ । । ॥ ॥ ॥
হেসে হেসে হল যে অস্থির
॥ ॥ ॥ । । ॥ । । ॥ ॥
মেয়েটা বুঝি ব্রাহ্মণ-বস্তির

এটা জবরদস্তি। কিন্তু

হেসে কুটি কুটি এ কী দশা এর
এ মেয়েটি বুঝি রায়মশায়ের—

এর মধ্যে কোনো অত্যাচার নেই। রায় মহাশয়ের চঞ্চল মেয়েটির কাহিনী যদি বলে যাই লোকের মিষ্টি লাগবে। কিন্তু দীর্ঘহ্রস্বে পা ফেলে চলেন যিনি, তাঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ চলে না। যেটা একেবারে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ তার নৈপুণ্যে কিছুক্ষণ বাহবা দেওয়া চলে তার সঙ্গে ঘর করা চলে না। "জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে" ওটা যে গান। দ্বিতীয়ত সকল প্রদেশের কাছে যথাসম্ভব সুগম করবার জন্যে যথাসাধ্য সংস্কৃত শব্দ লাগিয়ে ওটাকে আমাদের পাড়া থেকে জয়দেবীয় পল্লীতে চালান করে দেওয়া হয়েছে। (জুলাই, ১৯৩৬)

নিশিকান্ত তোমাদের আশ্রমে গেছে এতে আমি খুব খুসি হয়েছি। কেননা ওর মধ্যে প্রতিভা প্রচ্ছন্ন আছে। তোমাদের ওখানে যদি মন স্থির করে বসতে পারে তাহলে ওর শক্তি পরিণতি লাভ করবে। অনেকদিন থেকে জানি ওর অসাধারণতা আছে। ওর স্বকীয় উদ্ভাবনাশক্তি আছে, ওর আত্মনির্ভরেরও অভাব নেই। ওর মননশক্তি তোমাদের ওখানে ঠিক মতো আবহাওয়া পেলে আপনিই সফলতা লাভ করবে।

শ্রীঅরবিন্দ আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছেন শুনতে নিশ্চিত উৎসুক আছি। নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্বন্ধে আমার অভিমান নেই। বস্তুত আমি রসজ্ঞ—প্রাকৃতিক মানবিক আধ্যাত্মিক সকল বিভাগেই আমি রসপিপাসু—সেই রসের স্বাদ নেওয়া ও তাকে প্রকাশ করাই আমার কাজ বলে মনে করি। রসসমুদ্রে যাঁদের পারঙ্গমতা আছে তাঁরাই গুরু--নন্দনবনের ইন্দ্রত্ব পেয়েছেন তাঁরা। আমরা কখনো দৈব্যক্রমে পাই গন্ধ, পাই মধু-র কণা। আমাদের দলে যাঁরা বিশেষ বড়ো তাঁরা রচনা করেন মধুচক্র—বিশ্বজন যাহে আনন্দে করেন পান সুধা নিরবধি। (জুন, ১৯৩৪)

আজ এই চিঠি লিখছি তার একমাত্র কারণ শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমি অশ্রদ্ধা বহন করি এই মিথ্যা উক্তিকে নীরবে অগ্রাহ্য করা আমি অন্যায় মনে করি। বিশ্বাস করো বা না করো আমি নিজেকে কখনোই সাধক বলে কল্পনা করিনে। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে আমার অধিকার নেই একথা আমি নিশ্চিত জানি এবং কাউকেই আমি ভুল জানাই নে। আমার জীবনে যা কিছু অভিজ্ঞতা তা কবি প্রকৃতির অভিজ্ঞতা। তার উর্ধ্বেও উপলব্ধির ক্ষেত্র আছে কিন্তু সেখানে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান পৌঁছয় না। আমার মন প্রকাশের—appearanceএর—সীমার মধ্যেই সঞ্চরণ করে, আনন্দ পায়। এই কথাই আমি…"অমুক" -কে জানিয়েছিলুম। তিনি তাঁর গ্রন্থে যদি আমার উল্লেখ করতেন আমি কুণ্ঠিত হতেম কারণ আত্মিক সাধনায় আমি অনধিকারী এবং তত্ত্বজ্ঞানে সাধারণ ছাত্রদের চেয়েও আমার অধিকার সামান্য। কখনো কখনো ভ্রমক্রমে সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে জিজ্ঞাসু এসেছেন, আমি অনেকবারই শ্রীঅরবিন্দের কাছে তাঁদের পথনির্দেশ করেছি। কখনো কখনো বিদেশী লোকদের সম্বন্ধেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

যেকোনো কারণেই হোক পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে যখন জটিল গ্রন্থি পড়ে যায় তখন তার টানাটানি আমার কাছে ক্লান্তিজনক ও আত্মলাঘবকর হয়ে ওঠে এইজন্যে তার কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকে শান্তিকামনা করি। আমি কখনই কোনো উদ্বেজনাতে আঘাত দিতে চাইনে, এই ইচ্ছাটা যাতে সম্পূর্ণ আন্তরিক হতে পারে তাই মনে করে আঘাত বাঁচিয়ে চলি। এটার মধ্যে হয়ত দুর্বলতার লক্ষণ আছে—দ্বন্দ্বকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও নির্দ্বন্দ্ব হবার মতো মনের জোর থাকলে বেঁচে যেতুম।

একটা কথা মনে রেখো, নিজের বিচার বুদ্ধি আমি অন্ধভাবে বিশ্বাস করি নে। সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষত আধুনিক ইতিহাসে, খ্যাতির বাজারের চড়িমন্দা এত দ্রুত এবং অভাবনীয়রূপে প্রকাশ পেয়েছে যে, তার কঠিন শিক্ষাকে নিজের ব্যক্তিগত যাচাইখানায় মেনে নেওয়া দরকার বলেই জানি। আমাদের ছুটির পরে যে-আদালত বসবে তার উপরেই শেষ বিচারের ভার রইল।

কিন্তু হায় রে, শেষবিচারের দরবার শতাব্দীর কোন্ প্রান্তে বসবে তা কেউ বলতে পারি নে। সে এতই দূরবর্তী, বর্তমানের সমস্ত সদ্য মত ও আশু সংস্কার থেকে এতই তফাতে যে তা নিয়ে মাথা ভাঙাভাঙির মূঢ়তায় প্রবৃত্ত না হয়ে যে-কয়দিন এই সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের মেয়াদ আছে সহজ মনে হেসে খেলে পরস্পরকে ভালোবেসে কাটিয়ে যেতে পারলে জীবনের পালায় জিতলেম বলে জানব। জিৎ মতামতে নয়, খ্যাতি অখ্যাতিতে নয়, জিৎ ভালোবাসায়—শক্তির রাজ্যে নয়, আনন্দের রাজ্যে। এই কথা মনে করেই আজকাল নিজের প্রশস্তিবাদে আমি এত কুণ্ঠিত হই—যে-মূল্য তার নয় সে-মূল্য তাকে দেওয়ার মতো ঠকা আর কিছু হতে পারে না। (আগষ্ট, ১৯৩৫)

একটা কথা মনে রেখো, তোমাকে অনেকদিন থেকেই স্নেহ করে এসেছি—যদি অনিবার্য কারণে অনিচ্ছাবশতও তোমার মনে দুঃখ দিয়ে থাকি দুঃখ পেয়েছি নিজেও। নিজের সম্বন্ধে বেদনার কারণকে আমরা যত অত্যন্ত বেশি বাড়িয়ে থাকি ততটা তার বাস্তবতা নেই একথা নিশ্চিত জেনো।...মনের উপরিতলে ঢেউ যেমনি উঠুক, গভীরে তোমার পরে আমার আন্তরিক অনুরাগ আছে। আমরা কথায় বার্তায় যা বলে থাকি তাতে অনেক সময়ে সত্য আবিল হয়, কথা না-বলার মধ্যে অবিকৃত সত্য গোপনে থাকে—যদি সেটা জানবার কোন উপায় থাকত তাহলে জীবনে অনেক দুঃখ দূর হত। (এপ্রিল, ১৯৩৬)

ইংরেজী কাব্যে তোমার সফলতার লক্ষণ দেখে খুশি হলুম। আমার বিশ্বাস এই পথে তোমার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা প্রশস্ত। তার একটা কারণ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশের শক্তি অসাধারণ পরিণতিতে উত্তীর্ণ হয়েছে; স্বাভাবিক রচনাশক্তি এবং ঐ ভাষায় অধিকার থাকলে সিদ্ধিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজে হয়। প্রবহমান নদীতে সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চলার পক্ষে সাঁতারের নৈপুণ্য ও নদীর স্রোত দুইয়ে মিলে সহায়তা করে। বাংলাভাষায় নিজের মধ্যে অজস্র গতিশক্তি আজও সম্পূর্ণ উদ্ভাবিত হয়নি। এই ভাষায় কোনো উচ্চলক্ষ্যের দিকে কলম যদি চালাতে হয় তবে দরকার হয়ে পড়ে চলা এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পরিমাণে পথ কেটে নেওয়া। এমনি করে খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে যে-বাংলা সাহিত্যে একদিন পায়েচলা মেঠোপথ ছিল মাত্র সেখানে রাজপথ তৈরী হয়ে উঠছে, কিন্তু এখনও তার বাধাসঙ্কুল বন্ধুরতা বিস্তর আছে।

শরতের চিঠিখানি পড়ে মনে বেদনা পেয়েছি। বুদ্ধদেব শরৎকে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নিম্নতর আসনে বসিয়েছেন এ সংবাদ আমি জানিই নে।

তোমার বহুবল্লভ পড়ছিলুম। এর মধ্যে চরিত্ররচনার যে-ধারা চলেছে তাকে প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু তোমার ভাষা আমাকে বাধা দেয়। কথায় কথায় ইংরেজি কবিতার তর্জমা রচনাধারাকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে থাকে—বোঝা যায় ওটা রচনার অনিবার্য প্রয়োজন থেকে করছ না।...

তোমার রচনা উত্তরোত্তর জনাদর লাভ করছে। তার থেকে মনে হয় আমাকে যেটাতে গুরুতর বাধা দিচ্ছে আধুনিক শিক্ষিত পাঠকদের পক্ষে সেটা বাধা নয়। তাদের কাছে তোমার শক্তির রূপ যদি অবারিত ভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাহলে আমার বিচার নিয়ে তোমার আক্ষেপের বিষয় থাকবে না। সাহিত্যে নিজের পথে যশস্বী হয়েছেন যাঁরা তাঁদের অভিমত কত বারবার ইতিহাসে অপ্রমাণিত হয়েছে। অন্তরের দিকে তোমার শক্তি যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে—চিন্তা এবং কল্পনায় তোমার বাধা নেই। তোমার প্রতিভা বিষয়ের সম্পদ পেয়েছে প্রচুর। তোমার ঐশ্বর্যের প্রতি বিশ্বাস আছে, কিন্তু সেই সম্পদকে সম্পদ ব'লে প্রচার করবার অতিমাত্র উল্লাসে তোমার ভাষার উপর ভার চাপিয়েছ। সবশেষে একটা কথা বলে রাখি সাহিত্যের রসবিচারে বেদবাক্য বলবার অধিকার আমি রাখিনে। অনেক সমালোচক তোমার ভাষাকে অতুলনীয় বলেন দেখেছি। তাঁরা এ যুগের প্রতিনিধি—তাঁদের মন যদি পেয়ে থাকো আমার কথায় ক্ষোভের কারণ নেই। আধুনিক কোনো খ্যাতনামা

ইংরেজ লেখকের ভাষা যখন আমার কাছে অত্যন্ত সৃষ্টিছাড়া ঠেকে তখন আমার সেই মতকে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য দিই নে। সাহিত্য-রাজ্যে চিরকালই এইরকম অনিশ্চয়তা ছিল এবং থেকে যাবে। (জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারি—১৯৩৬)

নিশিকান্তের "রাজহংস" পড়ে দেখলুম (গীতশ্রী ব'লে স্বরলিপির বইটিতে এটি বেরিয়েছে)। এ পরিণত লেখনীর রচনা—ছন্দের তরঙ্গভঙ্গের উপর দিয়ে ভাবে ভরা ভাষা পাল তুলে চলেছে নিরাপদে। প্রথম থেকেই নিশিকান্তের প্রতিভার যে-পরিচয় পেয়েছি নিশ্চয় জানতুম তার সম্বন্ধে প্রত্যাশা পূর্ণ হবে—আজ আনন্দলাভ করলুম। (জুলাই, ১৯৩৬)

ছন্দ সম্বন্ধে একটি কথা—বাংলায় প্রাকহসন্ত স্বর দীর্ঘায়িত হয় একথা বলেছি। জল এবং জলা এই দুটো শব্দের মাত্রা সংখ্যা সমান নয়। এই জন্যেই, "টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে" পদটাকে ত্রৈমাত্রিক বলেছি। টু-মু দুই সিলেব্‌ল, পরবর্তী হসন্ত স-ও এক সিলেবলের মাত্রা নিয়েছে পূর্ববর্তী উ-স্বরকে সহজেই দীর্ঘ ক'রে। টুমু টুমু বাজা বাজে এবং টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে এক ছন্দ নয়। রণিয়া রণিয়া বাজিছে বাজনা—এবং টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে এক ওজনের ছন্দ। দুটোই ত্রৈমাত্রিক। আমি প্রচলিত ছড়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি।

তুমি লিখেছ আমার পক্ষ নিয়ে তুমি "অমুকের" সঙ্গে তর্ক করেছিলে অবশেষে তোমারই পরাজয় হয়। তোমার ওকালতির দৌড়টা কি রকম দূরের থেকে ঠিক কল্পনা করতে পারছি নে। বোধ করি আসামীর স্বভাব সম্বন্ধে পূর্ব হতেই তোমার নিজেরই মনে সন্দেহ ছিল। তদ্‌। নাসংশে বিজয়ায় সঞ্জয়।

তোমার মধ্যে যৌবনের জোয়ার লেগেছে তাই এত আবর্ত, এত তরঙ্গ, এত কল-কল্লোল। আমার ক্ষীণস্রোতে তার সাড়া দেওয়া অসম্ভব। আমার পক্ষে ফল্গুনদীর মতো মনটাকে বালুর তলায় তলিয়ে দেওয়াই ভালো। (জুলাই, ১৯৩৬)

কীর্তন সঙ্গীত আমি অনেককাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর

শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে,—কীর্তন সঙ্গীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি। কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে—রাগ-রাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারিনে হিন্দুস্থানি গাইয়ে কীর্তন গাইচে, এখানে বাঙালীর কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি বলা যায় না যে এতে সুর-সমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্থানি পদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে না? অর্থাৎ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সুরপর্যায় যে রকম একান্ত বিদেশী কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগরাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু ওর প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

নিশিকান্তর গানগুলি আমার খুব ভালো লাগল।...স্বরলিপি (গীতশ্রীর) আমার অনধিগম্য। অধিকাংশ বিদ্যায় যে আমি কত আনাড়ি তা তুমি জানো না। অল্প সম্বলের গৃহিণীপনায় ভদ্রতা-রক্ষা করে আসছি এই পর্যন্তই আমার বাহাদুরি।

এইবার বিদায় নিই। অনেকগুলো চিঠি লিখেছি। এখন কিছুকাল নীরবে নিরুত্তরে কাটবে। রেগেমেগে লেখনীটাকে বরখাস্ত করতে চাই কিন্তু অতি পুরাতন ভৃত্যের মতো সে বর্ধমান ষ্টেশনে এসে দেখা দেয়। কিন্তু আর চলছে না। প্রশ্নবর্ষী তোমাকে দুইহাত তুলে বলছি "ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে।" (জুলাই,—১৯৩৬)

অকৃত্রিম আগ্রহের সঙ্গেই তোমাকে আমন্ত্রণ করেছিলুম। রাণীর চিঠি থেকে জানতে পেরেছি সেটাতে লাগল অপঘাত। অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছি। পথের মধ্যে যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে আমার তাতে হাত ছিল না একথা নিশ্চয় জেনো। যে কারণেই হোক তোমার মনে যে-ধারণা জন্মেছে সেটা একেবারেই অমূলক একথা জানিয়ে দিলুম। তোমার সঙ্গে দেখা হলে খুশি হতুম, এ নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। আন্তরিক সত্যের বিরুদ্ধে বাহিরের যুক্তি প্রবল হলেও সকল সময়ে প্রামাণ্য হয় না একথা মনে রেখো। আগামী সপ্তাহপ্রান্তে শনিবারে এখানে বর্ষা-উৎসব হবে। যদি আসতে পারো আনন্দিত হব, যদি না পারো তবু নিমন্ত্রণ রইল। (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৪—১৯৩৭)

বহুকাল পরে তুমি এদিকে এসেছিলে, আবার ফিরে গেছ পণ্ডিচেরিতে। কেবল দেখা হোলো না বলেই যে আমার দুঃখ তা নয়, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ

যে স্নেহের সেটা প্রকাশ করবার প্রত্যক্ষ সুযোগ মিলল না এইটাতেই আমি ব্যথিত হয়েছি।

হয়ত তোমার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে আমার মতের বা রুচির মিল নেই, এবং কখনো কখনো তোমার সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়ে থাকব, কিন্তু এ সমস্তই বাহ্য। আমি নিজে খুশি হই যখন আবিষ্কার করি তোমার প্রতি আমার স্নেহের বিকার ঘটে নি। মাঝে মাঝে যখন কোনো কারণে রাগ করেছি তখন সেটা আমাকে ব্যথা এবং লজ্জা দিয়েছে। এবার অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্যে এবং অন্য বাধায় তোমাকে যে কাছে আনতে পারি নি তার বেদনা মনে রয়ে গেছে। আজকাল শরীর ক্লান্ত এবং মন কর্মবিমুখ থাকে সেইজন্যে বাহিরের ব্যবহারের কৃপণতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে সেজন্য আমাকে ভুল বুঝো না। (৩১ শ্রাবণ ১৩৪৪—১৯৩৭)

আজ এখানকার কোনো মেয়ের কাছ থেকে তোমার একটি গান শুনলাম, খুব ভালো লাগল। তোমার শক্তি এবং শিক্ষা নিয়ে তুমি যে বাংলাসঙ্গীতসৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছ এ একটি বড়ো কথা। অনেকদিন বাংলাগীতভারতী যথোচিত পূজা পান নি—তুমি তাঁর আনন্দলোকে স্বদেশের অধিকার বিস্তার করবার সুযোগ্য অধিনেতা। তোমার সুকণ্ঠে হিন্দি গৌড়ীয় এবং কীর্তন বাউলধারার ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে—এর প্রভাবের কথা চিন্তা ক'রে আমার মন আনন্দিত। (আগস্ট, ১৯৩৭)

হাসি-র (৺উমা বসু) কাছ থেকেই তোমার গান শুনেছিলুম। তার গলায় রস আছে।

বাংলাদেশের বিশেষত্ব নিয়ে যে-সঙ্গীত জেগে উঠেছে বাংলাদেশের বাইরে তার আদর ব্যাপ্ত হতে দেখেছি। অনেক বিদেশীর কাছে শুনেছি আধুনিক বাংলা গান তাদের বিশেষ প্রিয়। এর থেকে বুঝতে হবে, শুধু কবিত্বের গুণে এ-সঙ্গীত তাদের মন টানে না, এ-গানে সুর এমন একটা বিশেষ রূপ নিয়েছে যার একটি বিশেষ রস আছে। সেই বিশেষত্বকে একদল বাঙালি অনাদর করে, যেমন তারা অনাদর করেছিল বাংলার চিত্রকলাকে। বাংলাগানের রূপসৃষ্টিতে তুমি নেমেছ এতে আমি আনন্দিত। বাঙালি অনেক বিষয়ে আজ পেছিয়ে পড়েছে কিন্তু তার রসসৃষ্টির ক্ষমতাকে স্বীকার করতেই হবে। এই ক্ষেত্রে তোমার দান অজস্র এবং তোমার প্রভাব ব্যাপক হোক—বাংলা সঙ্গীতের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পুণ্যব্রত তোমার জীবনে সার্থক হোক। (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

এখনো ডাক্তারি দুঃশাসন চলছে, নানা নিষেধের বেড়ার মধ্যে আটক আছি। তোমার "গীতশ্রী" পূর্বেই দেখেছি। সঙ্গীত সম্বন্ধে এরকম বিস্তারিত আলোচনা বাংলাভাষায় আর দেখিনি। তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। ভারতীয় সঙ্গীতের সকল অঙ্গেই তোমার অধিকার আছে, অপক্ষপাত আনন্দ আছে, তাছাড়া তোমার লেখবার হাত আছে। এই শুভযোগের সৃষ্টি আদরণীয় হবে বলেই মনে করি।

ছাত্রীসহ যে-ছবিটি তুলেছ সেখানি সুন্দর লাগল। (অক্টোবর, ১৯৩৭)

আমার শরীর ও মনের অটুট কুঁড়েমি শেষ নৈষ্কর্ম্য রাত্রির পূর্বসন্ধ্যা বলে ধরে নিতে পার। এই নৈঃশব্দ্যের যুগে আমার কাছে শব্দসৃষ্টির প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ, কুণ্ঠিত করেছ আমার লেখনীকে। রচনা প্রসঙ্গে পরিভাষা যখন আপনিই এসে পড়ে তখন সেটা মাপসই মানানসই হয়। পা রইল এপাড়ায় আর জুতো তৈরী হচ্ছে ওপাড়ায় ব্যবহারের পক্ষে এটা অনেক সময়েই পীড়াজনক ও ব্যর্থ হয়। অপর পক্ষে নতুন জুতো প্রথমটা পায়ে আঁট হলেও চলতে চলতে পা তাকে নিজের গরজে আপনার মাপের করে নেয়। পরিভাষা সম্বন্ধেও সেরকম প্রায়ই ঘটে।

Harmony—স্বরসঙ্গম বা স্বরসঙ্গতি। Concord—স্বরৈক্য। Discord—বিস্বর। Symphony—ধ্বনিমিলন। Symphonic—সংধ্বনিক।

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় যেখানে সহজে সাড়া না দেয় সেখানে মূল শব্দের শরণ নিয়ো। ভাষার ম্লেচ্ছসংস্রবদোষ একদা গর্হিত ছিল। এমন সেদিন নেই—এখন ভাষার অন্নিবাসে ফিরিঙ্গিতে বাঙালিতে ঘেঁসাঘেঁসি বসে।

তোমার তারার প্রেম গানটি খুব ভালো লাগল (ওগো বিধুরা তারা—সাঙ্গীতিকী)। তার সুরটা unheard melody রূপেই আপাতত রইল আমার কানে। (নভেম্বর, ১৯৩৭)

বসন্ত ঋতুর প্রান্তভাগে বঙ্গভূমিতে তুমি অবতীর্ণ হবে। তখন উত্তর কি দক্ষিণ কোন্ অয়ন অবলম্বন করে কোথায় থাকব নিশ্চিত বলতে পারি নে। যদি এখানেই থাকি তাহলে "হাসি"-কে সঙ্গে ক'রে সহাস্য মুখেই আসতে পারবে, আর যদি বেলঘরিয়ায় রাণীর আশ্রয়ে লম্বা কেদারায় ক্ষণকালের নীড় বাঁধি তবে সেখানকার পথও তোমার পক্ষে দুর্গম নয়। যথাসময়ে আমার গতিবিধির সন্ধানে দিক্ বিদিক্ হাৎড়ে বেড়াতে হবে না। অতএব এযাত্রায় আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ মানবিক

সম্ভবপরতার সীমার মধ্যে সুনিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। তোমার (সাঙ্গীতিকীর) মার্গসঙ্গীতের যেটুকু পড়লুম তার ভাষা আর ভাবযোজনা খুব ভালো লাগল। তোমার গদ্য ক্রমেই পরিণত হয়ে উঠছে। (মার্চ, ১৯৩৮)

বাস্‌রে, সঙ্গীতশাস্ত্রমহার্ণব যে এমন দুস্তর তরঙ্গসঙ্কুল তা জানতুম না। কিন্তু তুমি তোমার পালের জাহাজ ছুটিয়ে চলেছ অনায়াসে। তোমার কাপ্তেনিকে সাবাস। দূরের থেকে বাহাদুরি দিই কিন্তু চড়ে বসব যে, তার পারানি দেবার সামর্থ্য নেই। এর থেকে একটা জিনিষ আবিষ্কার করা গেল—আমার প্রভূত অজ্ঞতা। খুসি হলুম তোমার স্পর্ধা দেখে। মনে পড়ল আধুনিক ইরানরাজ মোল্লাদের আধিপত্যের পরে কী রকম প্রবল সম্মার্জনী প্রয়োগ করে রাষ্ট্রনীতির পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন—সঙ্গীতশাস্ত্রের মোল্লাগিরির পরে একধার থেকে তুমি আন্দামানী নীতি প্রয়োগ করেছ। তাতে সনাতনী মহলে প্রচণ্ড বিক্ষোভের আশঙ্কা করি। তা হোক তোমাকে সাধুবাদ দিই। (মার্চ, ১৯৩৮)

এবারে কলকাতা থেকে ফিরেছি নির্জীবপ্রায় অবস্থায়। আমার দৃষ্টিশক্তির ম্লানতা সবচেয়ে আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে। বই পড়তেও কষ্ট হয়। অতএব জানিয়ে রাখছি জীবযাত্রার কর্মক্ষেত্র থেকে বরখাস্তর প্রথম নোটিস এসে পৌঁছেছে। তাই ভাবছি, বাতি নেভবার আগে এবার তোমার সঙ্গে পূরোদমে কথাবার্তা হতে পারল সেটা ভালোই হয়েছে। গোধূলি-লগ্ন বিবাহের পক্ষে ভালো কিন্তু বিশ্রম্ভালাপের পক্ষে বাধাজনক—হয়ত তোমাদের আসরে প্রবেশ করবার পথ আর খুঁজে পাব না। ক্ষীণ আলোয় এবার নিভৃতবাস-যাপনের প্রদোষ-বেলার নীড় খুঁজতে চললুম—তার পরের স্টেশনের বাসাটা খুঁজতে হবে না। (মার্চ, ১৯৩৮)

এখানে (কালিম্পঙে) এসে কিছু ভালো আছি! পাহাড়ে হাওয়া তার একমাত্র কারণ নয়, পাহাড়ে শান্তিও বটে। এ-জায়গাটায় অতিপ্রয়োজনের সংকট নেই—চুপ করে থাকার অবকাশ খুব বড় বহরেই পাওয়া যায়। আমাদের বয়সে বকুনি বেশি হলে শকুনি খবর পায়। তোমাদের মনের পক্ষে জনসমুদ্রের ঢেউ অত্যাবশ্যক। তোমাদের হাতে দেবার জিনিষ বাকি আছে ঢের—জনতার দাবিতে নিজের ভরা তহবিলের পরে নজর পড়ে। একসময়ে জলসত্র যখন

খুলেছিলুম কুয়োয় জলের উচ্চতল ছিল উচ্চে। এখন এত নেবে গিয়েছে যে বারবার টেনে তুলতে বুকে খিল ধরে।

তোমার সাঙ্গীতিকী পড়ে খুশি হয়েছি। ভাষার বেগ আছে রস আছে। অনেক আলোচ্য বিষয় উদ্‌ঘাটিত করেছ। এ-বইয়ের প্রয়োজন ছিল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার দুঃখ বাড়াবার জন্যে তোমার এ নিষ্ঠুর উৎসাহ কেন? আমি অক্লান্ত দাক্ষিণ্যে জনতাকে অভ্যর্থনা করি এটা ঘোষণা করা কি তোমার সজ্জনতা?

আশাকরি এখনো তোমার ছুটি ফুরোয় নি। নিভৃতবাসে ফেরবার পূর্বে একবার স-গানে আমাদের আশ্রমে যাবে এই আমার বাসনা। বর্ষা নাববার সঙ্গে সঙ্গে আমি নাবব। কিছু মেঘমল্লার জুগিয়ে দিয়ো। চোখের আবরণ এখনো ঘোচে নি। শেষ নিদ্রার পূর্বে আর একবার স্পষ্ট চোখে জগৎটা দেখে যেতে চাই। (এপ্রিল, ১৯৩৮)

তুমি যাওয়ার পর থেকে বর্ষা নিজমূর্তি ধরেছে। বর্ষামঙ্গলের কবির মন যে ময়ূরের মতো নৃত্য করছে তা বলতে পারি নে। যে-বর্ষা আমার অন্তরঙ্গ, বাংলাদেশের প্রান্তর পেরিয়ে সে নীপবনে দেয় বেণী এলিয়ে, এখানে পথে বাটে সে বিষম আধুনিকতা করছে। একটু রোদ্দুর দেখা দিলে মর্ত্যলোকের সঙ্গে ভালো মনে সন্ধিস্থাপন করা সহজ হবে—কিন্তু দেবতা পেসিমিস্‌ম্‌কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, খবরের কাগজগুলো তার সঙ্গে উঠে পড়ে যোগ দিয়েছে। (জুন, ১৯৩৮)

অবঙ্গে বঙ্গভারতীর জয়বিস্তার করে এসেছ শুনে খুশি হলুম। "গৌড়ীশ্বরকেতন" উপাধি তোমাকে দেওয়া উচিত। এখানে এবার শরৎ ঋতুতে নিষ্ঠুর ভাদ্রের ডিক্টেটরি শাসনতন্ত্র বিস্তার লাভ করেছিল। পরাভূত করেছিল আশ্বিনকে। এতদিন পরে হেমন্ত এসে সন্ধিস্থাপন করেছে। কালিম্পঙে আশ্রয় নেব স্থির করেছিলুম কিন্তু নন্‌-রেসিস্টেন্স নীতি অবলম্বন করে গ্রীষ্মের আক্রমণ উপেক্ষা করেছি। এখন এবং অব্যবহিত ভবিষ্যতে তোমার গতি কোথায়? (অক্টোবর, ১৯৩৮)

তোমার রাণীমাসিকে বড় বড় চিঠি লিখি আর বোনপোর বেলায়ই সব যত কার্পণ্য—হিন্দুসন্তান হয়ে তুমি অধিকার ভেদ মানো না? মাসির দাবি আর বোনপোর দাবি কি একই দামের?

অমুককে পত্র লিখেছিলুম কালিম্পঙে থাকতে। তখন দৃষ্টিশক্তির দৈন্য এতটা ঘটে নি—তুমিই তো সাক্ষী ছিলে। এখন শক্তিব্যয় করতে খুবই সাবধান থাকতে হয়েছে। চিঠি স্বচক্ষে পড়া প্রায় বন্ধ করেছি। তুমি পরিপূর্ণশক্তির জয়ধ্বজা নিয়ে দেশে বিদেশে স্বরবর্ষণ করে চলেছ, আমি আয়ুঃশেষের প্রদোষান্ধকারে এঘর থেকে ওঘরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলি—আমার দুঃখ বুঝবে কী করে? যৌবন নিষ্করুণ, আত্মাভিমানমদবিহ্বল।

আমি নিভৃতে নিশ্চল হয়ে বসে তোমার জয়কামনা করি। (নভেম্বর, ১৯৩৮)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিনের পরে আজ অল্পক্ষণের জন্যে ছুটি পেয়েছি—এ বৎসরকার নিরন্তর বর্ষণের ফাঁকে এক অপরাহ্নের রৌদ্রের মত। হারিনের কবিতা নিয়ে বসেছিলেম। বাংলায় তর্জমা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ওর ভাষার যে বায়ুমণ্ডল ও অর্থ এবং ভাবের যে ভূমণ্ডল সে বাংলা থেকে এত দূরে যে ওকে ভিন্ন কোনো জ্যোতিষ্ক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে—আমাদের এদিক থেকে ওদিকে পূরো দাম দিয়ে বাণিজ্য চালানো যায় না—ফাঁকি দেওয়া আমার অভ্যস্ত নয়। তাই নেড়ে চেড়ে দেখলুম—উজ্জ্বলতায় বিস্মিত হলুম কিন্তু বাংলাভাষার কৌটোর মধ্যে অসঙ্কোচে ভরবার মতো আমার সাহস ও শক্তি নেই। আমার পূর্ববর্তী অনুবাদকেরা সহজ দেখে বাছাই করেচেন কিন্তু আমার সাহস তাতেও কুলোত না কেননা আমার খুঁৎখুতে মন। বাংলাভাষা বাংলাদেশের বধূর মতো—পর তার কাছে অত্যন্তই পর—নিজের সংসারের মধ্যেই তার যত দাক্ষিণ্য যত মাধুর্য্য। বিদেশী সাহিত্য থেকে আমরা ভাবটা পেতে পারি—তাকে অনেক স্থলে আপন করেছি—কিন্তু তার রূপটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা অসম্ভব। ওদের প্রকাশের বিষয় ও প্রণালী যথেষ্ট সরল নয়। হারিনের কবিতা যদি তর্জমা করতে পারতুম তবে খুসি হতুম অর্থাৎ যদি খুসি হবার মতো তর্জমা আমার পক্ষে সাধ্য হোতো আমার শেষ বেলাকার বইগুলো তোমাদের পাঠাতে বলে দেব। হয়তো তোমাদের ভালো লাগবে না তাই এত দিন পাঠাইনি—বই সংগ্রহ করে লাভ নেই যদি গ্রহণ করা সহজ না হয়। ইতি—২৯ অগস্ট, ১৯৩৩

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

দিলীপ, কাব্য অনুবাদের শক্তি আমার নেই—চেষ্টাও প্রায় করিনে। নিতান্ত আবশ্যক হলে গদ্যের শরণ নিয়ে থাকি। ভাবকে ভাষান্তরে রওনা করে দেওয়া চলে কিন্তু রূপকে রূপান্তরিত করলে সেটা হয় অপঘাত। এক মুখ থেকে অন্য মুখে বাক্য চালানো যায়, কিন্তু কণ্ঠ?

হারিনের কবিতাটিকে অনাদর করেছি পাছে এই অপবাদ ওঠে তাই তাকে ভাষান্তরেও কোনো একটা ছন্দের পোষাক পরানো গেল—কিন্তু মিলটা বাদ দিয়েছি। সেটা রাখতে গেলে যেটা ছাড়তে হয় সেটা মিলের চেয়ে দামী। ইতি

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোন্ সে জটিল ঘন জঙ্গলে আনন্দহীন ঘুমে
সুদূরবাহিত অখ্যাত বীজ হ'তে
কবে উঠেছিনু সঙ্গীবিহীন বন্দী নিভৃত কোণে
আমি বিষণ্ণ বেণু॥

সহসা একদা কী শুভলগ্নে শুভ্র সুপ্রভাতে
ছুরি হাতে নিয়ে মা এলেন বনমাঝে,
কাটিয়া নিলেন মোরে নিজ ঘরে, শূন্য ধ্বনিল মম
প্রাণভরা নিঃশ্বাসে॥

একদিন ছিল সামান্য যাহা নগণ্য বেণুশাখা
গীতমাধুরীর বিরহে বোবার মতো
মায়ের করুণ অঙ্গুলিতলে কখন্ ধন্য হোলো,
হোলো সে পুণ্য বাঁশি॥

মা বাজান মোরে গভীর ছন্দে কখনো মধ্য দিনে
কভু সায়াহ্নে কভু নিশান্তকালে।
স্তব্ধ রয়েছে বাঁশির চিত্ত, তাহারি মৌন ভরি
তাঁর সঙ্গীত বাজে॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, যে ব্যাপারটা চুকে গেছে তা নিয়ে বৃথা আক্ষেপ কোরো না। ভুলে যাও। এ সম্বন্ধে আমার যে শেষ কথা সেটা একটু বিস্তারিত করে লিখে পাঠাচ্ছি। এটা কোনো একটা কাগজে ছাপিয়ে দেব। তুমি বরঞ্চ এক কাজ কোরো—এটা "আত্মশক্তি"তে ছাপতে দিয়ো। প্রবাসীতে বেরতে দেরি হবে। হয় ত এর কোনো কোনো পয়েণ্টের সঙ্গে তোমার মতের অনৈক্য হতে পারে কিন্তু মনে যে কথা আছে সেটাকে স্পষ্ট করে বলে ফেল্‌তে পারলে অনেক বালাই কেটে যায়। বিরুদ্ধ কথায় পৃথিবীতে তেমন হানাহানি হয় নি, যেমন হয়েচে অস্পৃষ্ট কথায়।

তুমি একবার যদি একদিনের জন্যও আসতে পারো তাহলে মোকাবিলায় অনেক জঞ্জাল ক্ষণকালের মধ্যে দূর হয়ে যায়। ঝগড়ার পাত্ররা যখন পরস্পরের দৃশ্যমান না হয় তখনি শব্দভেদী বাণগুলো মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। এখানে সম্প্রতি রাণী ও প্রশান্ত আছে অতএব যুগপৎ তর্ক করবার ও যত্ন করবার লোকের অভাব হবে না। আমি আজকাল অধিক কথা কই নে।

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"দ্বিতীয় বিবেচনা"য় লেখাটা প্রবাসীতেই পাঠানো গেল। যেখান থেকে ঝগড়ার উৎপত্তি সেইখানেই নিষ্পত্তির চেষ্টা করা ভালো।

কবির অনেকগুলি চিঠিই হারিয়ে গেছে—চিঠিগুলি যাঁর কাছে রেখে ১৯৫৩ সালে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলাম তাঁর অক্ষমনীয় অপরাধে। চিঠিগুলি তিনি রেখে দিয়েছিলেন তাঁর একটি তোরঙ্গে। কীট যথাবিধি প্রশ্রয় পেয়েছিল তোরঙ্গে D.D. T. দিতে তাঁর ভুল হয়েছিল ব'লে। এর মধ্যে একটি চিঠির একটি ছড়া মাত্র মনে আছে। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন আমার অনুরোধে।

পটভূমিকা: বোলপুরে কবিকে আমি একদা বলি—তাঁর এক স্তাবক তাঁর প্রতি বিরূপ হ'য়ে আমাকে বলেছিলেন: "ওহে দিলীপ, কবি জন্ম-অভিজাত, বেশি মিশতে গেলেই ঘা খাবে।" উত্তরে কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন: "এঁরা আমার 'পরে এ-অপবাদ কেন দেন আমি ভেবে পাই নে। বঙ্কিম ছিলেন গুরুগম্ভীর —কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। তবু লোকে তাঁর সম্বন্ধে কী উচ্ছ্বাসই না করত!" ব'লে কবি একটি ছড়া আওড়ান। পরে এ ছড়াটি কবি একটি চিঠিতে লিখে আমাকে পাঠান। ছড়াটি এই:

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে ভারি রাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি'।
বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বেড়ালের ছানা,
লোকে তাকে বলে নয়নের জলে:
দাতা বটে ষোল আনা।

নব সংযোজনা

দাম্পত্যে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের দেহের পরে পরস্পরের একান্ত অধিকার সম্বন্ধে বহুকালের প্রচলিত ধারণা য়ুরোপে কিছুকাল থেকেই শিথিল হয়ে আসছে। আমার বিশ্বাস এর প্রধান কারণ হচ্ছে, অনেকদিন থেকেই অনেক পুরুষ বিবাহ করতে নারাজ। ক্রমে ক্রমে য়ুরোপের জীবনযাত্রার আদর্শটা বহুব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে, ঘরকন্নার বোঝা ঘাড়ে নিতে সহজে কেউ চায় না। তাতে অনেক মেয়েকেই অবশ্য-অব্যূঢ়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। অবিবাহিত অবস্থায় দেহকে শুচি রাখবার যে বিধান ছিল সে কখনোই এমন সমাজে টিঁকে থাকতে পারে না যেখানে বহুসংখ্যক মেয়ের পাত্র জোটবার আশা নেই। আমাদের দেশে একদিকে এই শরীরের শুচিতা রক্ষা সম্বন্ধে যেমন কড়া বিধান তেমনি আর একদিকে মেয়েমাত্রেরই বিবাহের অবশ্যকর্তব্যতা সম্বন্ধে বিধান কঠিন। বিধবাদেরও আহার ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ে বাঁধাবাঁধির অন্ত নেই। য়ুরোপে বিবাহের দুঃসাধ্যতা যতই বেড়ে চলেছে ততই শারীরিক সতীত্ব সম্বন্ধে সংস্কার আপনিই আলগা হয়ে যাচ্ছে।

আরো একটা কারণ আছে। মেয়েরা যখন বাধ্য হয়ে পুরুষের অনুগত থাকত, জীবিকানির্বাহের জন্য বিবাহ ছাড়া যখন তাদের অন্য উপায় ছিল না তখন বিবাহের হাটে যে জিনিষের দাম বেশি সেটা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হত। আধুনিক কালে স্ত্রীলোকের সে বাধাও অল্প অল্প করে কেটে যাচ্ছে। সন্তান সমস্যাটাও এখন প্রবল নয়, নিবারণের উপায়গুলো সহজ। স্ত্রীলোককে গর্ভধারণ করতে হয় বলেই এতকাল দেহকে সাবধানে রাখার দায় সাধারণত স্ত্রীলোকের উপরেই বেশি প্রবল হয়ে এসেচে। এমন কি আমাদের দেশে পুরুষের বহুবিবাহ অথবা বহুস্ত্রী-সম্ভোগ সম্বন্ধে লোকনিন্দা ছিল না, অথবা ক্ষীণ আকারেই ছিল। ওটা এসেছে এখানকার কালে, খৃষ্টাননীতির সঙ্গে সঙ্গে। এমন কি আমরা যখন বালক ছিলুম তখনো এ শৈথিল্য সমাজে নির্লজ্জভাবেই প্রচলিত ছিল। মোট কথা হচ্ছে এই যে স্ত্রী-পুরুষের ও বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের দৈহিক শুচিতারক্ষা সম্বন্ধীয় সংস্কার যে সকল আর্থিক ও সামাজিক কারণের উপর এতদিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ছিল, সেই কারণগুলো ক্ষীণ হলে বা বিলুপ্ত হলে এটা কেবলমাত্র উপদেশের জোরে থাকতেই পারে না। সমাজ নিজের বিশেষ প্রয়োজনবশত স্বভাবকে ঠেকিয়ে রাখে—

ঠেকিয়ে রাখতে তার অনেক কলবল কৌশল অনেক দড়াদড়ি অনেক পাহারার দরকার হয়—কিন্তু প্রয়োজনগুলোই যখন আলগা হতে থাকে তখন স্বভাবকে ঠেকিয়ে রাখা আর সহজ হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ভোগের দৃষ্টান্ত দেখ না। আমার যখনই ক্ষিদে পায় তখন আমার গাছে যদি ফল না থাকে তবে তোমার গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে আমার স্বভাবতই ইচ্ছে হয়। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমারক্ষা করা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক এই জন্যেই ফল পেড়ে খাওয়াটা চুরি। এই চুরি সম্বন্ধে সমাজ আমাদের মনে যে সংস্কার দৃঢ়বদ্ধমূল করে দিয়েচে সেটা নিজের ব্যবস্থারক্ষা সহজ করবার উদ্দেশ্যে। যদি কোনোদিন বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক কারণে দ্রব্যসামগ্রীর বিশেষ মূল্য না থাকে তাহলে চুরি সম্বন্ধে সংস্কার আপনি চলে যাবে। বস্তুত চুরি না করার নীতি শাশ্বত নীতি নয়, এটা মানুষের ঘরগড়া নীতি, এ নীতিকে না পালন করলে সমাজে যদি অশান্তি না ঘটে, তবে পরের দ্রব্য নেওয়া চুরিই নয়, এই কারণেই তুমি দিলীপকুমার যদি আমি রবীন্দ্রনাথের লিচু বাগানে আমার অনুপস্থিতিতেও লিচু খেয়ে যাও তুমিও সেটাকে চুরি বলে অনুশোচনা করনা আমিও সেটাকে চুরি বলে খড়্গহস্ত হইনে। ব্যভিচার সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। এর মধ্যে যে অপরাধ সেটা সামাজিক অর্থাৎ এতে যদি সমাজে অশান্তি ঘটে তবেই সমাজের মানুষকে সাবধান হতে হয়, যদি না ঘটে তাহলে ব্যভিচার ব্যভিচারই হয় না—ভয় দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে তাকে যে কালো মুখোষ পরিয়ে রাখা হয়েছে সেটা খসে গেলে দেখা যায় ওর উপরে নরকের ছায়া নেই।

অবশ্য শারীরিক অসংযম সকল অবস্থাতেই অপরাধের, তাছাড়া বিশেষ সাধনায় হয়তো শারীরিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমন করবার বিশেষ অর্থ আছে। সে আলোচনাটা নৈতিক আলোচনার অন্তর্গত নয়। বস্তুত শাশ্বত নীতির দুটি বিভাগ আছে, একটা মনের একটা হৃদয়ের। একটা অসত্য একটা অপ্রেম। একটায় বঞ্চনা, একটায় নিষ্ঠুরতা। একটাতে ভোলাই আর একটাতে মারি। এর মধ্যেও একটু বলবার কথা আছে,—এক রকম অসত্য আছে যা সত্যেরই কোঠায়, যেমন কবিকল্পনা, এক রকম নিষ্ঠুরতা আছে যা প্রেমের কোঠায়, যেমন অন্যায়ের শাসন। অনেকখানি বকলুম, সময়ের অভাব হিসেব করে দেখলে এটাকে অপরাধ বলেই গণ্য করা যেতে পারে—সময়ের যদি মূল্য না থাকত বা অল্প থাকত তাহলে এই প্রগল্‌ভতা সম্বন্ধে কোনো দায় থাকত না। ইতি—

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ স্নেহাসক্ত—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু—

কাল তোমাকে যে চিঠি লিখেছি সেটা স্পষ্ট হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে, কেন না আসল কথাটা পত্রের শেষভাগে ইসারায় আছে।

আমার মতে চরিত্রনীতির দুটি মূল আশ্রয় আছে। এক সত্য আর এক প্রেম। প্রেম কথাটার পাছে সংকীর্ণ অর্থ নেওয়া হয় সেই জন্যে বৌদ্ধ পরিভাষা 'মৈত্রী' ব্যবহার করা নিরাপদ। আমাদের যে কোনো কাজে সত্যের স্খলন দ্বারা বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতার সৃষ্টি হয়, বা মৈত্রীর স্খলনদ্বারা সংসারে হিংসা, বেদনা, অশান্তির প্রচার হয় সেইটেই নৈতিক হিসাবে মন্দ। স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধের বিচার করবার বেলা এই কথাটাই স্মরণ করতে হবে। এর মধ্যে asceticism বা বৈরাগ্যের কথাটা নীতির দিকের কথা নয়—সেটা শারীরিক বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসাতত্ত্বের কথা। স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক সম্বন্ধে যেখানে অসত্য অশান্তির যোগ, সেইখানেই সেটা ব্যভিচার—যেখানে সে-আশঙ্কা নেই, সেখানে সন্ন্যাসীর কথায় কান দেবার প্রয়োজন দেখিনে। (৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৮)

স্ত্রী-পুরুষের দেহ সম্ভোগ নিন্দনীয় নয়, তার প্রয়োজন সুতীব্র, সহজ অবস্থায় তাকে দমন করাই অন্যায়—কিন্তু অন্যান্য ধর্মকর্মের মতো সে নিতান্ত অপরিবর্জনীয় —বস্তুত ধর্মের দিকে সুবুদ্ধির দিকে তাকিয়ে জীবনে আমরা এসম্বন্ধে আত্মদমন বহু দুঃখে বহুবার করে থাকি। না যদি করি তাতে আত্মশ্লাঘার কারণ নেই। যৌন প্রেমের পরিপূর্ণতার জন্য দেহ-মনের সম্মিলন আবশ্যক, কিন্তু যৌন প্রেমের উপরেও মানব প্রেম—অধর্ম মানব প্রেমের বিরুদ্ধ। সংসার-যাত্রার সম্পূর্ণতার জন্যে অর্থ চাই। কিন্তু তার চেয়ে বেশী করে চাওয়া উচিত সত্য, করুণা—সেটা পরমার্থ, তাতে আত্মার পরিপূর্ণতা। নিজের ভোগতৃপ্তি সাধনের জন্যে সংসারে অসত্য বা দুঃখ সৃষ্টি করব না এই সংকল্পটাকে দুর্বল না করাই ভালো। কামনার মধ্যে নিজেরি জোর যথেষ্ট আছে, তাকে শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে আরো বলবান ক'রে তুললে সামলাবে কে? সমাজনীতিকেই আমি ধর্মনীতি বলিনে—কিন্তু মানবনীতি আছে, তাতে বলে না দেহ জিনিষটা কলুষিত—তাতে ব'লে ছলনা করো না, পীড়া দিও না। সতীত্ব অসতীত্ব ব'লে কোনো ঐকান্তিক পদার্থ নেই, কিন্তু সত্য অসত্য আছে।······

স্ত্রীপুরুষের সংসর্গমাত্রেই যদি অন্যায় থাকত তাহলে তো স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধও বর্জনীয় হত।—কিন্তু যে সংসর্গ মিথ্যা দিয়ে চাপা দেওয়া হয় বা সমাজের ভয়ে

গোপন রাখা হয় লুকোচুরি দ্বারাতেই সেটা কলুষিত হয়ে ওঠে। যদি প্রশ্ন করো নিন্দা করতে সমাজের কোনো অধিকার আছে কি না তার উত্তর দীর্ঘ হয়ে ওঠে। সন্তানদের দিক থেকে স্বামীর দিক থেকে যে কঠিন চিত্তপীড়া ও ক্ষতির উদ্ভব হয় তাকে অবজ্ঞা করা চলে না। যতক্ষণ না সমাজ-নীতিরই পরিবর্তন ঘটে ততক্ষণ নিজেদের ভোগপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় এ সমস্ত দুঃখজাল সৃষ্টি করা কখনই অনুমোদনীয় হতে পারে না। রাশিয়াতে সমাজই বদ্‌লে যাচ্ছে। সেখানে ব্যভিচার শব্দটাই নিরর্থক হয়ে উঠল। সেখানে মাতৃহীন শিশু বা জারজ সন্তানের কোনো দুঃখ বা অপমান নেই। অতএব সেখানকার যৌন নীতি সেখানেই খাটবে অন্যত্র খাটবে না। সামাজিক অন্যায় তো ভালোবাসায় নেই, ব্যবহারে। অতএব দুঃখ দুর্গতি নিবারণের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের প্রবৃত্তিকে সংযত রাখবার কথা বলতেই হবে। যতক্ষণ বিষয়সম্পত্তি সমাজে সত্য ততক্ষণ চুরি যেমন অন্যায়, তেমনি যতক্ষণ বিবাহ বন্ধন সমাজে প্রচলিত ততক্ষণ যৌননীতিকে সংযমকে মানতেই হবে।* (জুলাই ১৯৩০)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কত কথায় আলোচনায়ই ইঙ্গিত করেছেন—সুপ্রকাশের ছায়ার মধ্যে দিয়েই চির-প্রচ্ছন্নের আলো ফুটে ওঠে ব'লে কোনো কিছুরই পরমতম এজাহার কেবলমাত্র অতিপ্রত্যক্ষের মধ্যে মিলতে পারে না—অগোচরকে না ছুঁলে গোচরকে নিয়ে দিনের পর দিন হাজার ঘর করলেও তার পরমস্বরূপকে জানা যায় না। সংসারে সব রূপের সব প্রকাশের মধ্যেই তাই তিনি চিরদিন সন্ধান ক'রে ফিরেছেন সেই অরূপের, যার রঙেই রূপ হ'য়ে ওঠে অপরূপ, প্রকাশ চরিতার্থ হয় অপ্রকাশের কাছে হার মেনে।

একথা আমি প্রথম বুঝবার কিনারায় আসি এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায়—যেদিন তিনি নারী সম্বন্ধে তাঁর এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিটিরই আভাস দিয়েছিলেন। আমার Among the Great—এর সব শেষে আমি প্রকাশ করেছি তাঁর এই অপূর্ব ভাষণটি—আমার স্বকৃত ইংরাজি তর্জমায়। কবি এ তর্জমাটি প'ড়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মূল বাংলা অনুলিপিটি প্রকাশ করি নি সে সময়ে—কারণ ইচ্ছা ছিল এ বিষয়ে কবির সঙ্গে আর একবার নিরালায় ব'সে আলোচনা ক'রে পরে প্রকাশ করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় Among the Great প্রকাশিত হবার পরে কবির

* এ চিঠিগুলি তীর্থংকর প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়েছিল। তারপর কেন বাদ দেওয়া হয়েছিল মনে পড়ছে না। যাই হোক এ ভুলটি শুধ্‌রে দেওয়া হল চতুর্থ সংস্করণে।

সঙ্গে আমার মূল বাংলা কথালাপটির অনুলিপি হারিয়ে যায় কবির অনেকগুলি মূল্যবান চিঠির সঙ্গে। এ-দুঃখ আমার যাবে না কোনোদিন। কিন্তু সে অন্য কথা। এ-ভাষণটির ভূমিকা শেষ করি।

১৯২৭ সালে যখন আমি দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যাই তখন এ-কথালাপের রিপোর্টটি টাইপ ক'রে পাঠাই হাভেলক এলিস সাহেবকে। তিনি আমাকে এ-সম্বন্ধে সোচ্ছ্বাসে লেখেন :

"It gives me joy to find that Tagore says clearly, at almost every point, what I have said, or tried to say clearly, in my book 'Man and Woman'. On the whole I could hardly desire to see a more beautiful presentation in a short space, of a conception which corresponds to my own, than what Tagore has put into this conversation, with a skill in speech beyond me."

কিন্তু এলিস সাহেবের Man and Woman বইটি প'ড়ে আমি একটু নিরাশই হয়েছিলাম। কেন না তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে কবির বক্তব্যের কিছু মিল থাকলেও কবি তাঁর কথালাপের মধ্যে দিয়ে নারীর স্বরূপের যে নিটোল মাধুর্য ও অপরূপ মহিমাটি ফুটিয়ে তুলেছেন এলিস সাহেবের বহির্মুখী দৃষ্টিতে সে-মহিমাটি আদৌ মূর্ত হ'য়ে ওঠেনি। এ শুধু আমার নিজের কথা নয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমও আমাকে লিখেছিলেন একটি পত্রে। তাঁর মন্তব্যটি গভীর ব'লে এখানে উদ্ধৃত করছি—আরো এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় আত্মার একটি পরম প্রকাশ আমার এ-ধারণা কৃষ্ণপ্রেমের পত্রে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। তিনি লিখেছিলেন তাঁর আল-মোরার তপোবন থেকে (১৪. ৯. ৪৫) :

"I have just finished reading your conversation with Rabindranath in 'Among the Great'. In particular I liked the discussion on the separate 'dharma' of Man and Woman. Nothing I have ever read of his writings struck me as so deeply and sensitively true. I dare say Havelock Ellis did say something of the sort in his own way, but I am quite sure it didn't have the sensitiveness of Rabindranath's treatment nor will it have been delineated aganist a spiritual background··· After all, India is India..."

ভারতের এই আত্মিক আবহের মূল্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দ তথা শ্রীঅরবিন্দ-

লিখেছেন তাঁদের নানান সুচিন্তিত মতামত। সেসবের সারমর্ম এই যে, এই অধ্যাত্মসংস্কার ভারতীয় ভাবুকের সহজাত। রবীন্দ্রনাথ নারী সম্বন্ধে তাঁর যে-আধ্যাত্মিক ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি ফুটিয়ে তুলেছেন তার গোড়াকার কথাটি এই যে, নারী পুরুষের আত্মার আত্মীয়া—শক্তিস্বরূপিণী। এ-দৃষ্টিভঙ্গি য়ুরোপের চিন্তার আবহে আজ পর্যন্ত ফুটে ওঠে নি ব'লেই আরো বহু য়ুরোপীয় ভাবুক এ যুগে তাঁর নারীর মূল্যায়ন সম্বন্ধে সচকিত হ'য়ে উঠেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের প্রশস্তিটি উদ্ধৃত করলাম শুধু এই কথাটির 'পরে জোর দিতেই।

আমার অনেকদিন থেকেই এ আলাপটির অনুবাদ করার ইচ্ছা ছিল, তবে নানা কারণে হ'য়ে ওঠেনি। আজ যথাসাধ্য কবির শৈলী ও ভঙ্গি বজায় রেখে এটি প্রকাশ ক'রে তৃপ্তি বোধ করছি। স্থলে স্থলে কবির শৈলীকে আদর্শ ক'রে অনুবাদ ঠিক মূলানুগ না ক'রে ভাবানুগ করেছি।

আর এ-সূত্রে একটি অঙ্গীকার করতে পারি অকুতোভয়েই : যে, কবির মূল বক্তব্যটির 'পরে আমি কোথাওই রং চং লাগাই নি বাহাদুরি দেখাতে চেয়ে।

শান্তিনিকেতনে অতুলপ্রসাদ ও আমার সঙ্গে ১লা জানুয়ারি ১৯২৭ সালে সকালে কবি বলেন লণ্ডনে তাঁর প্রথম রোমান্সের কথা। কবি আমাকে প্রায়ই বলতেন যে ভোগের চাবিটি আছে সংযমের হাতে—অর্থাৎ অসংযমে ভোগ হ'য়ে ওঠে দুর্ভোগ। নরনারীর সম্বন্ধে একথা খাটে সবচেয়ে বেশি—বলতেন তিনি—কেন না এ-আদান প্রদানে দম্পতি পরস্পরের টানে সবচেয়ে লাভবান হয় পবিত্রতার আবহে। সেদিন তিনি তাই শেষে বলেছিলেন আমাদের :

"আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব ক'রেই : যে, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি······প্রতি মেয়ের স্নেহ বলো, প্রীতি বলো, প্রেম বলো—আমার মনে হয়েছে একটা প্রসাদ—'ফেভর'। কারণ আমি এটা বরাবরই উপলব্ধি করেছি যে, প্রতি মেয়ের ভালোবাসা······ আমাদের মনের বনে কিছু না কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়—সে-ফুল হয়ত পরে ঝরে যায়—কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।"

যেদিন সকালে কবি অতুলদা ও আমার সামনে এই সব কথা বলেন সেদিন সন্ধ্যায় আমি ওঁকে একলা পেতে চেয়েছিলাম কোনো বিশেষ কারণে। সৌভাগ্য-বশতঃ সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর কাছে কেউ ছিল না। তিনি একদৃষ্টে নানারঙা মেঘের দিকে চেয়ে দেখছিলেন তারা ক্ষণে ক্ষণে কেমন রং বদলাচ্ছে বহুরূপীর মত। একটি

মৌমাছি তাঁর শুভ্র কেশের চারপাশে পরিক্রমা করছিল। কী সুন্দর যে তাঁকে দেখাচ্ছিল অস্তাকাশের রাঙা আলোয়!......

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কবি হাসলেন তাঁর চিরস্নিগ্ধ হাসি। বহুরূপীর মতনই তাঁর মুখের ও মনের ভাব বদলাত ক্ষণে ক্ষণে। বললেন: "কী? চুপ ক'রে কেন?"

আমি হেসে বললাম: "আপনাকে এমন ছবির মতন দেখাচ্ছে যে যুদ্ধং দেহি মূর্তি আমার উবে গেছে।"

কবি পরিহাসের সুরে বললেন: "রাখো হে রাখো। তোমাকে কি আমি চিনি নি হাড়ে হাড়ে? ভালোমানুষি তোমাকে মানায় না—কিন্তু বোসো, আলো নিভে আসছে। চলো যাই আমার বসবার ঘরে।"

কবির সামনে চৌকি টেনে নিয়ে আমি বললাম: "মেয়েদের সম্বন্ধে আপনি আজ সকালে যা যা বললেন আমি লিখে রেখেছি। আপনাকে দেখিয়ে নেব কালপরশু। কিন্তু আজ এ-সম্বন্ধে আরো কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে—যদি আপনার সময় থাকে—"

কবি (হেসে): অত বিনয়ও তোমাকে মানায় না হে। ধরো নিজমূর্তি। বলো কী প্রশ্ন? মেয়েরা ছেলে না হ'য়ে মেয়ে হ'ল কেন?

আমি (হেসে): আপনি অন্তর্যামী। সত্যই আমার জিজ্ঞাস্য ছিল—মেয়েরা যে আজকের দিনে ষোলো আনা পুরুষালি ঢঙে দীক্ষা নেবার বায়না ধরেছে—বলা সুরু করেছে যে নারী ও পুরুষের সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব একই—এ সম্বন্ধে আপনার কী মত?

কবি: উত্তরে বলতে হয় আমাকে একটা অতি পুরোনো কথা। যাকে ইংরাজিতে বলে প্ল্যাটিচিউড। কারণ আমি বরাবরই ব'লে এসেছি নারী পুরুষকে পূর্ণ করতেই এসেছে, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে নয়। কথাটা শুনতে খানিকটা সেকেলে শোনাতে পারে—কিন্তু কোনো উপলব্ধি যদি সত্য হয় তবে সময়ের শিলমোহরে তার খ'তিয়ে শ্রীবৃদ্ধিই হয়। তাই মামুলি শোনালেও আমি নিরুপায়—আমাকে বলতেই হবে সেই একই কথা: যে, পুরুষের কীর্তির প্রতিযোগী হ'তে চেয়ে যদি নারী কোমর বেঁধে পুরুষের আখড়ায় নামে তবে তাতে ক'রে শেষ পর্যন্ত তার লাভ হবে না—হবে ক্ষতি। কারণ জীবনকে যা সুষমিত করে না তাকে হাতিয়ে নিতে ছুটলে মেয়েদের অন্তর কোনো গভীর তৃপ্তি পেতেই পারে না। শ্রীমন্তিনী রাজত্ব করুক তার নিজের

জগতে—যার নাম শ্রী, সুষমা, মাধুরী। তাকে জেগে থাকতেই হবে তার স্বভাবে—আরো এই জন্যে যে, পুরুষ সহজেই ভুলে যায় যে তার পৌরুষ ও শক্তি পরুষ সভ্যতায় অজস্র ফাটল ধরাবার গুপ্তচরদেরই প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে—জান্তে বা অজান্তে। মেয়েরা এই অস্থিরতার রসদ যোগালে চলবে কেন? তার লক্ষ্মী-সত্তার মঙ্গল স্পর্শে হারিয়ে যাওয়া ভারসাম্যকে তাকেই যে হবে ফিরিয়ে আনতে, সারিয়ে তুলতে। পুরুষের সভ্যতা দিশা হারায় সহজেই: নৌকা তার ঝড় তুফানে সহজেই ওঠে দুলে—তাই মেয়েদের 'পরে ভার তাকে ঠিক পথে চালানো। নৈলে ভরাডুবি হবেই হবে।

আমি (একটু ভেবে): কিন্তু তাহ'লে কি আপনি বলতে চান—পুরুষের যেসব অধিকার আছে মেয়েরা সেসবের অনধিকারী?

কবি: ঠিক তা নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে, মেয়েদের স্বধর্ম পুরুষের স্বধর্মের প্রতিরূপ নয়। আমি বলছি না যে, সে পুরুষের কোনো সহযোগিতাই করবে না—তাকে হ'তে হবে বৈকি পুরুষের সহচারিণী—অনেক সময়ে তার দিশারিও সে হতে পারে—কিন্তু তাকে মনে রাখতেই হবে যে, সহযোগিতা মানে অনুকরণ নয়। সে যখন পুরুষের সেই ভাবে সহায় হবে যেভাবে সহায় আর কেউ হ'তে পারে না—তখনই সে হবে তার পূর্ণ সহযোগিনী—সংহত, নিটোল। তাই আমি বলি যে, সমাজে নারীকে সব আগে চাইতে হবে তার নিজের স্থানটি খুঁজে নিয়ে সেখানে আসীন হ'তে—পুরুষের কর্মক্ষেত্রে উড়ে এসে জুড়ে বসতে নয়। আর এ পারে সে তখনই যখন সে স্বধর্মে সুখাসীন হয়।

আমি: এ কথা সত্যি। কিন্তু তা ব'লে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এসেও সে তার কাজের খানিকটা ভার নিতে চাইবে না কেন?

কবি: সে-কাজে তার স্বভাব সাড়া দেয় না ব'লে। পুরুষের নানা কাজে রাজ্যের ধুলোবালি, বিক্ষিপ্ততা, মুখরতা, হানাহানি—সেখানে মেয়েরা এলে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়বে যে। কি জানো? (একটু থেমে) আসলে মেয়েদের শক্তি সক্রিয় হয় নীরবে গোপনে গহনে—খানিকটা গাছের শিকড়ের মতো, পুরুষ কৃতকৃত্য হয় নিজেকে প্রসারিত ক'রে—শাখাদের মতো চায় আন্দোলন, দুঃসাহস, কর্মিষ্ঠতা। কিন্তু এই বাহ্য কর্মিষ্ঠতায় স্থায়ী ফল ফলে তখনই যখন গহন ভূগর্ভে তার শিকড় অচল অটল থাকে। নৈলে সে উপর দিকে বাড়তে না বাড়তে নিজের ভারেই ভেঙে পড়বে। মেয়েরা হ'ল এই সহিষ্ণু মাটি—যে ধারণ করে—শিকড়কে জোগায় রস যাতে ক'রে বীজ বিকশিত হ'য়ে বনস্পতি হ'তে পারে।

আমি : কিন্তু, মাপ করবেন, একথার সদর্থ এইই নয় কি যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ আছে ?

কবি (মৃদু হেসে) : যদি না থাকত তাহ'লে কি এই বিশ্বলীলা চলতে পারত যুগ যুগ ধ'রে ? এই বিপুল বিশ্বলীলায় যদি স্ত্রীলোক ঠিক পুরুষের মতন একই দায় নিয়ে জন্মাত, একই ছকে একই খেলা খেলতে—তাহ'লে জীবনের যে-গতির সঙ্গে আমরা পরিচিত তার ছন্দপতন হ'ত কবে। (আরো হেসে) কিন্তু ভাগ্যবশে জীবনযাত্রায় মেয়েরা ছেলেদের প্রতিচ্ছবি নয়—সহযাত্রিণী, তাই লীলার গতি আজো থেমে যায় নি। আর সেইজন্যেই প্রকৃতি মেয়েদেরকে দিয়েছেন ঠিক সেই সব গুণ যা পুরুষের মধ্যে তেমন বিকাশ পায় নি—লজ্জা, একনিষ্ঠতা, বিনম্রতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি। নৈলে পুরুষের অশান্ত কর্মজগত হ'য়ে দাঁড়াত অপলকা। আসলে মেয়েরাই যে প্রাণস্পন্দনের ধারয়িত্রী, শক্তির খেলার ধাত্রী, ক্লান্তিতে তারাই তাপ বহন করে পদে পদে। তারা না থাকলে জীবন হ'য়ে দাঁড়াত অর্থহীন উচ্ছলতা, অস্থায়ী উত্তেজনা, লক্ষ্যহারা চঞ্চলতার সমষ্টি আর তার পরেই আসত অন্তহীন অবসাদ—কতকটা—কী বলব—যেমন নেশার পর আসে শ্রান্তির প্রতিক্রিয়া।

আমি : অনেকে বলেন : মেয়েরা সৃষ্টি করতে পারে শুধু জীবনের নিচের তলায়, কাজেই উচ্চতর সৃষ্টিলোকে সে থাকবেই থাকবে পুরুষের হুকুমবরদার।

কবি : ছি ছি ! মেয়েদের এমন ছোটো ক'রে দেখার কথা আমি ভাবতেই পারি না। জীবনে তাদের দানকে আমি খুবই বড় মনে করি। কেন—বলি শোনো।

জৈবলোকে পুরুষের শক্তিবীজ যেমন আড়ালে থেকে ভ্রূণ থেকে জীবসৃষ্টির সূচনা করে—স্ত্রী তাকে ধারণ ও লালন ক'রে ধীরে ধীরে রূপায়িত করে, ঠিক তেমনি মনের রাজ্যে নারীর অদৃশ্য প্রেরণাই বীজের মতন পুরুষের অবচেতনায় সক্রিয় হ'য়ে তার সৃষ্টিকে সফল করে। তাই মেয়েদের সৃষ্টি শুধু জৈবলোকেই আবদ্ধ নয়—পুরুষ তার মনোলোকে স্ত্রী-শক্তিকে ঠিক তেমনি কামনা করে তার মানস সৃষ্টির জন্যে যেমন স্ত্রী তার গর্ভে পুরুষের বীজকে কামনা করে নব জীবন সৃষ্টির জন্যে। কেবল হয়েছে কি, পুরুষের মনকে সে উদ্বোধিত করে খানিকটা তার প্রেরণাদাত্রী শক্তিকে আড়ালে রেখে ; তাই পুরুষের সৃষ্টির কাছে আমরা মেয়েদের দানকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না সচরাচর।

আমার মনে পড়ে গেল—কবির একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি চরণ :

"বলেছিনু 'ভুলিব না'—যবে তব ছল ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।……
তবু জানি একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসল মোর এ-জীবনে উঠেছিল ফ'লে
আজো নাই শেষ ; রবির আলোক হ'তে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্ম্মবাণী, বাজায়েছে বীণ
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখ মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান।" (পূরবী—কৃতজ্ঞ)

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম : "আপনি যা বলেছেন তাতে তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে, মেয়েদের আত্মসিদ্ধির পথ পুরুষের থেকে আলাদা ?"

কবি : খতিয়ে তাই বটে। প্রধান কথা হ'ল মনে রাখা যে, প্রকৃতি মেয়েদের গড়েন নি ঠিক পুরুষের পুরুষালি ঢঙে চলতে, তারই চলা-পথে তারই বুলি রপ্ত ক'রে। নদীর ধারা যা চায় তার দুই তীর ঠিক তা চায় না। একটা চলে, অন্যটা বাঁধে। অথচ ওদের গড়ন আলাদা ব'লেই ওরা পরস্পরকে সার্থক করে। দুই তীর খাড়া হ'য়ে নদীকে ধারণ করে ব'লেই তার স্রোত চলে সমুখ বাগে—নৈলে নদী নদী থাকত না, হ'ত জলা।

আমি : তাহ'লে পুরুষ ও নারীর গোড়াকার চাহিদা আলাদা—এই না ?

কবি (হেসে) : ধরেছ এইবার।

আমি : কিন্তু আলাদা ঠিক কী ভাবে একটু খুলে বলবেন ?

কবি : ধরো, পুরুষ বেশী সহজে অমানবিক অনেক কিছুর সঙ্গে ঘর করতে পারে, নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে, এমন কি অসামাজিকও হতে তার তেমন বাধে না। কিন্তু মেয়েরা স্বভাবতই আমাদের প্রকৃতির ব্যক্তিগত, মানবিক, সামাজিক রূপকে ভালোবেসে ফেলে। এককথায়, পুরুষেরা মানুষকে বরণ করে যখন সে কাজে আসে, মেয়েরা মানুষকে বরণ করে সে মানুষ ব'লে। তাই দেখতে পাবে যে মেয়েদের কাছে মানুষ মানুষ বলেই যতটা বাস্তব, স্পষ্ট, পুরুষের কাছে ততটা নয়। আর ঠিক সেই জন্তেই পুরুষেরা মেয়েদের কাছে শুধু যে বেশী প্রেরণা পায়

তাই নয়—তার স্নিগ্ধতায় ও বরণে প্রাণের খোরাক পায়। তাই এই শক্তিকেই নাম দেয়া হয়েছে হ্লাদিনী শক্তি—যে শক্তি নিরন্তরই আনন্দের রস চারিয়ে দিচ্ছে। এ-শক্তি তাদের খানিকটা সহজাতই বলব—স্বধর্ম—যেমন দোয়েলের স্বধর্ম চঞ্চলতা, তুষারের শুভ্রতা। তাই তো আমরা আমাদের একঘেয়ে কর্মচক্রের চাপে অতিষ্ঠ হ'য়ে তাদের সান্নিধ্যে এত আরাম পাই—তারা আমাদের টানে যেমন চুম্বক টানে লোহাকে। তাদের হ্লাদিনী শক্তিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে এ-উক্তিকে কবিত্বের অত্যুক্তি বলা চলে না, কেন না আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার এইই এজাহার—চিরন্তন, অপ্রতিবাধ্য, স্বতঃসিদ্ধ।

কবি আত্মমনস্ক ভাবে ব'লে চললেন—মনে হল আমার যেন কবিতার ঝংকার শুনছিঃ "তারই জন্যে পুরুষ মুক্তি চায় যেখানে মেয়েরা চায় নীড় বাঁধতে একথা মেনে নিলেও দেখা যায় যে পুরুষ পুরোপুরি সিদ্ধিলাভ করতে পারে না শূন্য ব্যাপ্তির মধ্যে। আমি তোমাকে একবার বলেছিলাম বুদ্ধদেবকে সুজাতার স্নিগ্ধ, সেবার কাছে হাত পাততে হয়েছিল, খৃষ্টদেবকে মার্থা ও মেরির কাছে। মানুষের আত্মবিকাশের ইতিহাসে এই সত্যটিরই পরিচয় পাই বারবার। এমন কি শিব যে শিব—তাঁর তপস্যাও ভিতরে ভিতরে চেয়েছিল পার্বতীর কোমল হাতের কমনীয় সেবা, পরিচর্যা।

আমিঃ এটুকু বুঝতে আমাকে বেগ পেতে হয়নি। কেবল আপনার একটি কথা আমার কাছে এখনো প্রাঞ্জল হয় নিঃ আপনি কি বলতে চাইছেন যে, মুক্তি চায় শুধু পুরুষ—মেয়েদের মুক্তির দরকার নেই?

কবিঃ না তা নয়। আমার বলবার উদ্দেশ্য—উচ্ছ্বাস আবেগ ইহলৌকিকতা মেয়েদের কাছে যত দরকার পুরুষদের কাছে তত নয়। অন্য ভাষায়, মেয়েরা পূর্ণ আত্মসিদ্ধিতে পৌছয় প্রেম ও নীড়ের মাঝে—যেখানে পুরুষের চাই মুক্তির আকাশ—অনাশক্তির আবহ। পুরুষ আত্মবোধের চূড়ায় পৌছয় যখন সে বরণ করে অসীমের অভিসার—সে ঘরে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না—সার্থক হবার জন্যে তার চাই নিত্যনব আবিষ্কার।

আমিঃ মেয়েরাও কি চায় না অসীমের অভিসার?

কবিঃ চায় বৈ কি। প্রতি সার্থকতায়ই অসীমের ছায়া কিছু না কিছু পড়বেই—তা সে সার্থকতা যত সামান্যই হোক না কেন—ঠিক যেমন যে-কোনো হর্ষ কি পুলক চিরন্তন আনন্দের কিছু না কিছু আভাষ দেবেই দেবে। (হেসে): কিন্তু দেখো, যেন শেষটায় আমার বদ্নাম রটিয়ো না এই ব'লে যে, আমি ব'লে বেড়াচ্ছি

—মেয়েরা চিরদিনই নাবালিকা কাজেই অসীমের স্বপ্ন তৃষ্ণা দুরাশার বেসাতি করতে অক্ষম। মেয়েরাও যখন মানুষ তখন অসীমের অভিসারে তাকেও চলতে হবে মুক্তি পেতে—বটেই তো। আমি কেবল জোর দিতে চাই এই কথাটির 'পরে যে, তার মুক্তির পথ ও পদ্ধতি আলাদা। কারণ অসীমকে, চিরন্তনকে তারও না পেলেই নয়—কেবল পুরুষের মতন সে তাকে চাইবে না ব্যাপ্তি ও অনাসক্তির মধ্যে দিয়ে—চাইবে বন্ধন ও সংহতির মাধ্যমে।

আমি : আরো একটু খুলে বলবেন ?

কবি : একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবে—প্রকৃতি পুরুষকে খানিকটা ছাড়া দিয়ে চেপে ধরেছে মেয়েদেরকে। ফলে পুরুষও শোধ তুলেছে ব'লে—বেশ, আমিও তোমাকে ছাড়ব—থাকব না তোমার অনুগত। মেয়েরা ঠিক এভাবে প্রকৃতির অবাধ্য হ'তে পারে না। বুঝলে!

আমি : এখনো একটু ঝাপসা লাগছে।

কবি : একটা দৃষ্টান্ত নাও : গোপাকে ছাড়তে চাওয়ার তাগিদ যেভাবে বুদ্ধের কাছে ছিল তাঁর পৌরুষের স্বধর্ম, গোপার কাছে বুদ্ধকে ছাড়তে চাওয়া ঠিক সেভাবে সম্ভব ছিল না তার মেয়েলি স্বধর্ম মেনে।

আমি : আপনি কি বলতে চাইছেন যে গোপার পক্ষে বুদ্ধকে ত্যাগ ক'রে মুক্তি খোঁজা হ'ত অস্বাভাবিক ?

কবি : এইবার ধরেছ।

আমি : কিন্তু কেন অস্বাভাবিক—বলবেন ?

কবি : কারণ গোপা ছিল নারী। তাই তার স্বভাব ত্যাগের ফাঁকার মধ্যে টিকতে পারত না যে ভাবে পেরেছিলেন বুদ্ধ—সহজেই।

আমি : কিন্তু এমন নারী কি দেখা যায় না—যারা খানিকটা পুরুষালি ধাঁচেই গড়া ?

কবি : কে অস্বীকার করছে ? পুরুষালি মেয়ে বা মেয়েলি পুরুষ জগতে থেকে থেকে এখানে ওখানে দেখা যায় তো বটেই। কিন্তু তা ব'লে কি বলবে যে মেয়েলি পুরুষ পুরুষের প্রতিনিধি, বা পুরুষালি মেয়ে মেয়েদের ? এদের বলতেই হবে ব্যতিক্রম।

আমি : কিন্তু আপনি যে বলছেন বুদ্ধ গোপাকে সহজেই ছাড়তে পেরেছিলেন তিনি স্বভাবে পুরুষ ছিলেন ব'লে তার নিহিতার্থটি ঠিক কী আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলবেন ? আমার জিজ্ঞাস্য—ডাক শুনলে মেয়েরাও কি এইভাবে ছাড়তে

পারে না সব কিছু? পুরুষের পক্ষে অসীমের ডাকে সাড়া দেওয়া বেশি সহজ হবে কেন? তাছাড়া নারীর কাছে পুরুষ যেমন অপরিহার্য, পুরুষের কাছেও কি নারী ঠিক তেমনি অপরিহার্য নয়? না, আপনি বলতে চাইছেন যে প্রেম পুরুষের বিকাশের পক্ষে খানিকটা বাহ্য—না হলেও চলে?

কবি (আত্মমনস্ক): না—ঠিক তা আমি বলতে চাই নি। কারণ এভাবে বললে আমার বক্তব্যটিকে খানিকটা বিকৃত করাই হবে—মনে হবে যেন আমি এ যুগের কর্ম ও নৈপুণ্যের বাণীতেই সায় দিই—যার সঙ্গে সৌন্দর্য ও সুষমার কোনো লেনদেনই নেই। সৌন্দর্য ও সুষমাকে বর্জন ক'রে কর্মে আনন্দ কোথায়? তুমি জানো—আমি বরাবরই দুঃখ পেয়েছি যে আমাদের আধুনিক সভ্যতা সৌন্দর্যকে পাশ কাটিয়ে উত্তরোত্তর শুষ্কতার দিকেই ঝুঁকছে ব'লে। বারবারই আমি বলেছি যে, এতে জগতের মঙ্গল নেই। সঙ্গে সঙ্গে বলেছি যে, এই হারিয়ে যাওয়া সুষমাকে ফিরিয়ে আনতে পারে কেবল মেয়েরা। পুরুষের সৃষ্ট সভ্যতায় তারা যদি এসে বেশি ক'রে যোগ দেয় তবেই রক্ষে। কাজেই আমি একথা বলতেই পারি না যে, মেয়েদের না হ'লে পুরুষের খাসা চলে। গোপা বুদ্ধকে প্রথম থেকেই একটুও ভালো না বাসলেও বুদ্ধের ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ত না এমন কথা বলাটা হবে মূঢ়তা। গোপার প্রেম বুদ্ধের কাছে ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয় ছিল যেমন ছিল গোপার কাছে বুদ্ধের প্রেম। তফাৎ এই যে, দাম্পত্য প্রেম গোপার কাছে ছিল সর্বস্ব, বুদ্ধের কাছে—আত্মবিকাশের সহায়, শক্তি। অন্যভাষায়, প্রেমের আবেগ নারীকে ধারণ করে মেরুদণ্ডের মত—যেখানে পুরুষকে সে তার পথচলার আলো ধরে, দিশা দেখায়—অপরূপ সে আলো, দিশা—কে না মানবে? কিন্তু তাই ব'লে বলা চলে না তার জীবনের চরম পরম লক্ষ্য।

আমি (একটু চুপ ক'রে থেকে): বুঝেছি—কিন্তু···মাফ করবেন···তাহ'লে কি বলতে হবে যে মেয়েরা মহত্ত্বে পুরুষের সমান নয়?

কবি: তা কেন? শুধু বলা—যে, দুজনের স্বভাব ও ছন্দ আলাদা, আর আলাদা ব'লেই সৃষ্টির লীলায় বৈচিত্র্য আজো ফুরোলো না। যদি মেয়েরা স্বভাবে স্বতন্ত্র না হ'ত তাহ'লে বিশ্বলীলার প্রকাশের ও লাবণ্যে প্রাণস্পন্দন থেমে যেত কবে! বস্তুতঃ, সৃষ্টির প্রেরণা নিজেকে নিত্যনতুন ক'রে রচনা করতে চায় ব'লেই প্রকৃতি একজনকে অপরের প্রতিরূপ ক'রে গড়তে চান নি। এককথায়, নারী ও পুরুষকে স্বভাবে ভিন্নধর্মী ক'রে তৈরি করা হয়েছে ব'লেই উভয়কে একলক্ষ্য হয়েও আলাদা ছন্দে চলতে হয়—যদি তারা কৃতকৃত্য হ'তে চায়।

কবি প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, বললেন: "আমি আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলি স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য ঠিক কোনখানে বোঝাতে।"

"পুরুষকে আমি নাম দিই জন্মজিজ্ঞাসু—অসীমের অধরার অভিসারী—এ-অসীম অধরাকে মুক্তি নির্বাণ ভগবান যে-নামই দাও না কেন। তাই কোনো উপলব্ধি যতই বড় হোক না কেন, তাকে পরম সার্থকতায় পৌঁছে দিতে পারে না যদি সে তাকে বাঁধে—তাকে নোঙর ছাড়া করতে বাধা দেয়। প্রেম তার কাছে খুব বড় উপলব্ধি হ'তে পারে, তার জীবনকে আলো করতে পারে—কিন্তু কেবল এই সর্তে যে সে বন্ধন হ'য়ে দাঁড়াবে না।

নারীর মুক্তি বা সার্থকতা অন্য পথের পথিক। তাই প্রেম তাকে শুধু আলো দেখায় না—ধারণ করে তার সত্তার কেন্দ্র—উপজীব্য হ'য়ে। এই জন্যে পুরুষ না পারলেও নারী পারে শুধু প্রেমের কাছে হাত পেতে জন্ম সার্থক করতে।"

কবি একটু থেমে বলে চললেন তাঁর গাঢ় মধুর কণ্ঠে: "সব গভীর প্রেমেই পাওয়া আর না-পাওয়া চলে হাত ধরাধরি ক'রে। তাই বিদ্যাপতি গেয়েছিলেন,

জনম অবধি হম রূপ নিহারলুঁ, নয়ন ন তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ, তবু হিয়া জুড়ন ন গেল!

"আমরা জীবনে কোনো কিছুই পাওয়ার মতন পেতে পারি না যতদিন না সে আমাদের সত্তার সঙ্গে মিশে ম'জে লীন হ'য়ে যায়—আর এ-পরম প্রাপ্তি হাতে আসে না যদি আমরা তাকে দাম না দিয়েই পেতে চাই। প্রেমের উপলব্ধিকে পেতে হ'লে দিতে হয় গভীর অনপনেয় বেদনার মূল্য। এ-দাম দিতে না চাইলে প্রেমকে উপলব্ধি করা যায় না—সে হ'য়ে ওঠে না আমাদের বিকাশের পরম সম্পদ। কেউ বাইরে থেকে কিছু দিলেই তাকে পাওয়া যায় না—কোনো মহৎ সম্পদকেই চাইতে না চাইতে মেলে না। আমাদেরকে হ'তে হবে তার যোগ্য, নৈলে প্রেম কোনোদিনই আমাদের বরণমালা পরিয়ে উজাড় ক'রে দেবে না তার যা কিছু আছে!"

নারী ও পুরুষ কী ভাবে পরস্পরের কাছে প্রার্থী—কী ভাবে এর রিক্ততা ওর সম্পদের কাছে হাত পেতে সার্থক হ'য়ে ওঠে তার একটি বড় সুন্দর নিটোল ছবি কবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন নারীর ডাককে তারার সুরে আরোপ ক'রে যার মর্ম আমি পরে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বিদেশে। কবিতাটির নাম কবি দিয়েছেন "অতিথি"।

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি' দিলে নারী,
মাধুর্যসুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি

দূরদেশী পথিকেরে ; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হ'তে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জন এ-বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে ঘরে চাহিলাম দক্ষিণ গগনে
ঊর্ধ্ব হ'তে একতানে এল প্রাণে আলোকের বাণী—
শুনিনু গম্ভীর স্বর, 'তোমারে যে জানি মোরা জানি ;
আঁধারের কোল হ'তে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।
তেমনি তারার স্বরে মুখে মোর চাহিলে কল্যাণী,
করিলে তেমনি স্বরে, 'তোমারে যে জানি আমি জানি।'
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি—
'প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।'

(জন্ম—১৮৭২)

He who would bring the heavens here,
Must descend himself into clay
And the burden of earthly nature bear
And tread the dolorous way.

—শ্রীঅরবিন্দ

ধরায় অধরা-আলোকের বাণী যে বহি' আনিতে চায়
ধূলিতলে তাকে আসিতে হবেই নেমে।
পৃথ্বীর ম্লান প্রকৃতির ভার সহিবে সে করুণায়
অপার বেদনে চলিবে—পারের প্রেমে।

উৎসর্গ

শ্রীশার্ল ফ্রাঁসোয়া বার্

সুহৃদ্বরেষু

হিংসার মাঝে অতন্দ্র প্রেম জপি'
বরাভয়ে জাগি' রহেন রাত্রে যিনি,
চরণে তাঁহার—আমরা পূজার কবি—
করি' প্রণিপাত অভয় লয়েছি চিনি'

প্রীতিস্নিগ্ধ

নববর্ষ, ১৩৫১ দিলীপ

ALDOUS HUXLEY

"Well what of it?" it may be asked. "Why shouldn't it (mysticism) die? What use is it when it's alive."

The answer to these questions is that where there is no vision the people perish and that, if those who are the salt of the earth lose their savour, there is nothing to keep that earth disinfected, nothing to prevent it from falling into decay. The mystics are channels through which a little knowledge of reality filters down into our human universe of ignorance and illusion. A totally unmystical world would be a world totally blind and insane...We are dangerously far advanced into the darkness

(From his recent book on mysticism,
Grey Eminence, 1942)

"যোগের যদি মরণদশা ঘ'নিয়ে এসেই থাকে তো ক্ষতি কি? যখন ও বেঁচে ছিল তখনই বা কার কাজে ও লেগেছিল?

এ-প্রশ্নের উত্তর এই যে যেখানে ধ্যানদৃষ্টি নাস্তি সেখানে মানুষের অপমৃত্যু অনিবার্য। যারা পৃথিবীর ক্ষালক তারা যদি অপদস্থ হয় তবে পৃথিবীকে নিষ্কলুষ রাখবার কোন উপায়ই থাকে না। ধ্যানী হ'ল সেই অদ্বিতীয় প্রণালী যার মধ্যে দিয়ে শাশ্বত সত্যের ছিটেফোঁটা কিছু এসে পৌছয় আমাদের এই অজ্ঞান ও আলেয়ার জগতে। যে-জগতে ধ্যান পূর্ণ বিলুপ্ত সে-জগৎ একেবারে অন্ধ ও উন্মত্ত।"......অলডাস হাক্সলি

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে স্পর্ধার কথা সন্দেহ কি? তবে তিনি আমার গুরু দীক্ষাদাতা। তাই অকৃতার্থ প্রয়াসেরও আছে চরিতার্থতা। মানুষ যার কাছে পায় চরমপথের আলো তার কথা বলতে তৃষ্ণা জাগে। কিন্তু আত্মসমর্থনের পালা থাকুক। সবাই এটুকু অন্তত বুঝবেন যে শ্রীঅরবিন্দের মহত্বের ছবি আঁকার প্রযত্ন এ নয়—সে অসম্ভব: শ্রীঅরবিন্দ আমাকেই একটি পত্রে লিখেছিলেন কয়েক বৎসর পূর্বে: "No one can write about my life because it has not been on the surface for man to see." আমার চেষ্টা হোক শুধু তাঁর কথা যা পারি কিছু বলতে – যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত ভাবেই। এক্ষেত্রে সেই পন্থাই সবচেয়ে নিরাপদ—যেহেতু যোগসম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক কথা বলার অধিকারী আমি নই। শ্রীঅরবিন্দের পত্রগুলির মধ্যে বিশেষ ক'রে ব্যক্তিগত পত্রগুলি নির্বাচন করেছি আরো এই জন্যেই।

শ্রীঅরবিন্দের গীতার কথা প্রথম শুনি বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কাছে। এঁর নাম আগে ছিল রোনাল্‌ড্‌ নিক্সন। এমন ইনি সন্ন্যাসী—আলমোরায় সাধনা করেন। তিনি বলেন আমাকে যে, এখন উজ্জ্বল ও গভীর ব্যাখ্যা তিনি আর কখনো পড়েন নি। সে আজ চব্বিশ বৎসর হবে। তারপর আমি শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী "Essays on the Gita", "Synthesis of Yoga", "Future Poetry", "Life Divine" ও "Mother" পড়ি। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একথা সত্য যে, আমার স্বদেশী বন্ধু সংখ্যায় প্রায় অগুন্তি হ'লেও তাঁদের কারুর মুখেই সে-সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বা তাঁর বইয়ের কথা শুনিনি – শুনলাম প্রথম এক বিদেশী বন্ধুর কাছে। সেই আমার প্রথম যোগী শ্রীঅরবিন্দের দিকে ফেরা।

তারপর তাঁকে চিঠি লিখি। না, তিনি দেখা করতে পারবেন না। বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁকে প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি যা বলেন, আমাকে লেখেন শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।—পত্র সুদীর্ঘ, সবটুকু উদ্ধৃত করা নানা কারণে সম্ভব নয়—তবে শেষের দিকে অল্প একটু উদ্ধৃত করি।

In your own case everything depends on your ideal, if it is to lead the ordinary life of vital and physical enjoyments, you can choose your mate just anywhere you like, if it is a nobler ideal of art or music or service to your country—the seeking for a life-companion must be determined not

by desire, but by something higher and the woman must have something in her in tune with the psychic part of your being. If your ideal is spiritual life, you must think fifty times before you marry......you given here the general principles only. From its complexity you can easily imagine how difficult it must be to give you a clear-cut answer. With these data before you, you must decide for yourself."

* * *

সে-সময়ে যোগের প্রশ্ন সবে আমার মনে উদয় হয়েছে। তাই শ্রীঅরবিন্দকে আবার লিখলাম আমার নানা সমস্যা জানিয়ে। হঠাৎ চিঠি পেলাম--আচ্ছা দেখা করবেন তিনি, যদি পণ্ডিচেরি আসি।

তখন সারা ভারতবর্ষে বেড়াচ্ছি গায়ক গায়িকার খোঁজে, লিখছি "ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা" গানের বক্তৃতা দিচ্ছি, গান গাইছি। সব ফেলে গেলাম ছুটে পণ্ডিচেরি। ছিলাম একটি হোটেলে।

এখানে ব'লে রাখি আমাদের কথাবার্তা হয়েছিল ইংরাজিতেই। কথা শেষ হ'তেই তখনি তখনি সেসব লিখে রাখি ইংরাজিতেই। পরে তাঁকে পাঠাই। তিনি স্বহস্তে (অল্পই) সংশোধন ক'রে দেন। এখানে দেওয়া হ'ল তারই অনুবাদ।

আরো একটু ভূমিকা আছে। শ্রীঅরবিন্দ আমার প্রশ্নের উত্তরে এমন অনেক কথা বলেছিলেন যার সবটা সে-সময়ে আমার বোধগম্য হয় নি, পরে তাঁর পত্রাদি থেকে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল সাধনার নানা অবস্থায়। সে-সব অংশ পাদটিকায় কিছু কিছু দিলাম—কথাবার্তাগুলিকে পূর্ণতা দিতে। সবটুকুই ইংরাজিতে উদ্ধৃত করতে পারলাম না। স্থানাভাব বশে। পাদটিকায় উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে যেসব কথা থাকবে সবই শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্ত-লিখিত—আমার নানা প্রশ্নের উত্তরে।

* * *

১৯২৪ সাল, ২৫-এ জানুয়ারী। সকাল বেলা। বারান্দায় শ্রীঅরবিন্দ একটি কেদারায় আসীন। প্রণাম ক'রে বসলাম। মাঝে টেবিল।

সৌম্য, প্রশান্তমূর্তি। এমন স্থির অতলস্পর্শী শান্তির আভা কারুর চোখে ফুটতে দেখি নি কখনো। শ্মশ্রুর প্রাচুর্য নেই, কিন্তু চুল আস্কন্ধ-এলায়িত। গায়ে একটি চাদর শুধু, খালি পা। মনে এমন সম্ভ্রমের ভাব এল। বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে। যোগী! এর আগে মঠের সন্ন্যাসী বড়জোর দু-একজন তান্ত্রিক দেখেছি, কিন্তু নির্জনবিলাসী যোগিতপস্বীর এত কাছে কোনোদিন আসি নি—বিশেষত এমন

যোগী যিনি আমার সম্বন্ধে কিছু খবর রাখেন। পরে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন আমাকে যে আমার সঙ্গীত সম্বিৎসার কথা তিনি শুনেছিলেন ও আমার এ-উৎসাহে সাড়াও দিয়েছিলেন। কিন্তু সে-সময় আমি ভাবিও নি আমার সম্বন্ধে তাঁর কণিকা-প্রমাণও ঔৎসুক্য আছে।*

* * *

শ্রীঅরবিন্দ খানিকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন—স্থির প্রেক্ষণে। কী রকম সব ভাবের ঢেউ যে জেগে উঠল প্রকাশ ক'রে বলতে পারব না—কেবল এইটুকু বলি যে তেমন ধারা দৃষ্টি কখনো আমার চোখে পড়েনি আজ অবধি। যাহোক প্রাণপণে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বললাম: "আমি এসেছি জানতে—আমি আপনার যোগে কোনোরকম দীক্ষা পেতে পারি কি না।"

শ্রীঅরবিন্দ শান্তকণ্ঠে বললেন: "আমাকে আগে গুছিয়ে বলো ঠিক কী চাও তুমি, আর কেনই বা আমার যোগে দীক্ষা চাইছ।"

কী চাই? কেনই বা—? আমি নিজেই কি জানি যে গুছিয়ে বলব? এলোমেলো চিন্তাদেরকে তবু কোনোমতে বাগ মানিয়ে বললাম: "যদি বলি আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন কি না—অর্থাৎ—মানে—জীবনের লক্ষ্য কী—শুধু—জানতে নয়—পেতেও।

"এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়," তিনি বললেন মৃদুকণ্ঠে, "আমি এমন কোনো ঈপ্সিত বস্তুর কথা জানি না যা সবারই জীবনে লক্ষ্য হিসাবে স্বীকৃত হ'তে পারে। জীবনের লক্ষ্য বহু ও বিচিত্র—না হ'য়ে পারেই না। যোগপন্থীরাও নানা লক্ষ্য নিয়ে আসে যোগ করতে। কেউ বা যোগ চায় এ-জীবন থেকে মুক্তি পেতে—যেমন মায়াবাদীরা। এরা বলে যে ইন্দ্রিয়ের জগৎ হ'ল মায়া, কি না

* পরে আমাকে লিখেছিলেন তিনি এ সময়ের কথা: "It is a strong and lasting personal relation that I have felt with you ever since we met and even before ......Even before I met you for the first time, I knew of you and felt at once the contact of one with whom I had that relation which declares itself constantly.. ...and followed your career with a close sympathy and interest. It is a feeling which is never mistaken......It was the same inward recognition that bought you here."

(সবটুকু ছাপতে কুণ্ঠা আসে তাই অল্প একটুই উদ্ধৃত করলাম—এতটুকুও উদ্ধৃত করতাম না তবে শ্রীঅরবিন্দের প্রাতিভজ্ঞান সম্বন্ধে এ-থেকে কিছু জানা যাবে ব'লেই লোভ হ'ল। অবশ্য এসবের বিন্দুবিসর্গও আমি সে-সময়ে জানতাম না—বা শুনিনি, শুনলে সে-সময়ে বিশ্বাস করতাম কি না তা-ই বা কে জানে?)

পরমলক্ষ্যকে ঢাকে। আবার কেউ কেউ যোগ চায় প্রেম বা মৈত্রীর আকাংক্ষায়, কেউ চায় আনন্দ, কেউ বা চায় দিব্য শক্তি, কেউ জ্ঞান। কাজেই তোমার আগে মনস্থির ক'রে আমাকে বলতে হবে তুমি যোগ করতে চাও কিসের জন্যে।"

বিপন্নকণ্ঠে বললাম: "আমি জানতে চাই—জীবনের—সংসারের—মানে—নানা অসঙ্গতি ও স্বতোবিরোধের—দুঃখদৈন্য—আধিব্যাধির—কোনো মীমাংসা যোগে মেলে কি না।"

"অন্য ভাষায়, তুমি চাও জ্ঞান—প্রজ্ঞা ?"

"হ্যাঁ—না, শুধু জ্ঞানই নয়—আনন্দও চাই অবশ্য।"

"জ্ঞান ও আনন্দ তুমি যোগে নিশ্চয়ই পেতে পারো।"

উৎসাহ পেয়ে বললাম—"তাহ'লে—আপনার কাছে দীক্ষা পাবার আশা করতে পারি কি ?

শ্রীঅরবিন্দ তেম্‌নি শান্তকণ্ঠে শুধু বললেন: "পারো, যদি যোগের সর্তে তুমি রাজি থাকো এবং তোমার যোগতৃষ্ণা প্রবল হয়।" (শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন Provided your call is strong.)

"যোগের সর্ত কী কী যদি একটু বুঝিয়ে বলেন—আর যোগের তৃষ্ণা—call—বলতেই বা ঠিক কী বোঝায় ?"

তিনি উত্তর দিতে যাবেন এমন সময়ে আমি বললাম: "আপনার 'Yogic Sadhan' বইটিতে আপনি নিজেকে 'তান্ত্রিক' বলেছেন—অর্থাৎ মায়াবাদী বৈদান্তিক নন, লীলাবাদী সাধক। আপনার Life Divine' বইটিতেও লিখেছেন: "To fulfil God in Life is man's manhood. We must accept the manysidedness of the manifestation even while we assert the unity of the manifested. All problems in life are essentially problems of harmony.*"

"আমি লীলাবাদী একথা সত্য। কিন্তু এ-প্রশ্ন কেন ?"

"আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার যৌগিক সাধনের যোগ করতে গেলে জীবন থেকে পেন্‌শন নিয়ে সব ঐহিক কর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে গুহাপন্থী তাপস মতন হ'য়ে পড়তে হবে না তো ?—আপনি মায়াবাদী নন বলেছেন ব'লেই একটু ভরসা হয়।"

* ভগবানের আবাহনে জীবনকে চরিতার্থ করার নামই মনুষ্যত্ব। যা আমাদের গোচর, তার মধ্যে ঐক্য রয়েছে একথা স্বীকার ক'রেও প্রকাশলীলার বহুমুখিতাকে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে। জীবনের সব সমস্যাই হ'ল আসলে সৌষম্যের সমস্যা।

শ্রীঅরবিন্দ একটু হাসলেন : "আমি মায়াবাদী নই বটে, কিন্তু 'যৌগিক সাধন' বইটির প্রণেতা আমি নই।"

"তবে ?"

"অটোম্যাটিক লেখা কাকে বলে জানো ?"

"প্লানচেট ?"

"ঠিক প্ল্যানচেট নয়। আমি কলম ধ'রে থাকতাম, বইটি লিখে যেত কোনো শক্তি সেই কলমের মুখে।"

"একথা শুনেছি বটে কার কাছে। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—আপনি এ-ধরণের লেখা লিখতেন কেন ?"

"আমি এ-সময়ে নির্ণয় করতে চাইছিলাম—এ-ধরণের ঘটনের মধ্যে কতখানি সত্য আছে আর মগ্নচৈতন্য থেকেই বা কতখানি ইঙ্গিত আসে।"

(শ্রীঅরবিন্দ এটুকু স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন এই ভাষায় : "At the time I was trying to find out how much of truth and how much of subliminal suggestion from the submerged consciousness there might be in phenomena of this kind,")

"কিন্তু সে কথা থাক," বললেন তিনি, "তোমার আসল প্রশ্নেই আসি।"

"পার্থিব স্তরে যেসব কর্মের মূল্য তোমার কাছে আছে," বললেন তিনি, "সেসব যে ছাড়তেই হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে সে-স্তরের সব কিছুতেই আসক্তি থেকে তোমাকে মুক্ত হ'তে হবে—তা তুমি কর্মচক্রের মধ্যেই থাকো বা বাইরেই থাকো। কারণ এ-আসক্তিকে যদি তুমি পুষে রাখো তাহ'লে উপরের আলো অব্যাহতভাবে তোমার মধ্যে দিয়ে তোমার প্রকৃতির রূপান্তর সাধন করতে পারবে না।"

"একথার মানে কি এই দাঁড়ায় যে আমাকে, ধরুন, দরদ, বন্ধুত্ব বা স্নেহভালোবাসার আনন্দও ছাড়তে হবে ?"

"তা নয়, স্নেহ দরদ বা বন্ধুত্ব থেকে দূরে না থাকলে যে ভগবানকে কাছে পাওয়া যাবে না এমন কোনো কথা নেই। বরং উল্টো : ভগবানের সান্নিধ্য ও ঐক্যবোধের ফলে সাধক যে দিব্যচেতনা লাভ করেন তার একটা আনুষঙ্গিক হবে—অন্য সবাইকারও কাছে আসা ও তাদের সঙ্গে ঐক্যবোধ।* মায়াবাদীদের

* শ্রীঅরবিন্দ পরে স্বহস্তে লেখেন : "Absence of love and fellow-feeling is not necessary to the Divine nearness ; on the contrary a sense of closeness

যোগে এবং সন্ন্যাসযোগে চরম লক্ষ্য হচ্ছে—বন্ধুত্ব ও স্নেহের সব রকম সম্বন্ধ, পরিহার, এ-বিশ্বজগতের জীব ও অন্য সবকিছুরই প্রতি আসক্তি থেকে মুক্তি—যার নাম মোক্ষ; যদিও সেখানেও শেষের দিকে নির্বাণের আগেই জীবের প্রতি একটা করুণা বা অনুকম্পার ভাব আসে—যেমন বৌদ্ধ সাধনায়। কিন্তু অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধ বা অন্যের প্রতি স্নেহভালোবাসার বিশ্বজনীন আনন্দ হ'ল জীবন্মুক্তির ও সর্বাঙ্গীণ পরিণতির গোড়াকার কথা—আর এ-মুক্তি ও পরিণতি হ'ল পূর্ণযোগের লক্ষ্য।"*

আমি বললাম: "আমার কথা বলি একটু শুনুন দয়া ক'রে। জীবন আমার বরাবরই খুব ভালো লাগে। কিন্তু ছেলেবেলায়—তের বৎসর বয়সে—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবে পড়ার ফলে আমার দৃঢ় নৈশ্চিত্য জন্মায় যে 'ঈশ্বর দর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।' বিলেতে গিয়ে ওদেশের জাঁকজমকে প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ফের সেই ছেলে-বেলাকার সুরই উঠল ফুটে। মনে হ'ল এসব নয়, নয়,—যশমান ধনজন খ্যাতি কর্ম সেবা শিল্প কিছুই নয়—ভগবানকে পেলে তবেই এসবের অর্থ থাকে, নৈলে সবই ফাঁকি, ছায়াবাজি।

"দেশে ফিরে বন্ধুবান্ধব হ'ল অগুন্তি—বোধ হয় টাকাকড়ি অবসর ও মেশবার ক্ষমতা ছিল ব'লে। কিন্তু আশ্চর্য ভগবানকে নিয়ে 'আধ্যাত্মিক' ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে বড় কাউকে মাথা ঘামাতে দেখলাম না। আমার চেনাশোনাদের মধ্যে ভগবানকে চাইতে দেখলাম শুধু এক ইংরাজ বন্ধুকে—রোনাল্ড্ নিক্সন। সে-ই আমাকে প্রথম বলল যে আপনি মস্ত যোগী, পড়ালো আপনার বইটই। তারপর থেকে কেবলই মনে হয় আপনার কাছে যদি দীক্ষা পাই তবেই এ-দুর্গম পথের পথিক

and oneness with others is a part of the Divine consciousness into which the Sadhaka enters by nearness to the Divine and the feeling of oneness with the Divine."

* শ্রীঅরবিন্দ লেখেন পরে স্বহস্তে: "An enitre rejection of all relations is indeed the final aim of the Mayavadin and in the ascetic yoga an entire loss of all relations of friendship and affection and attachment to the world and its living beings would be regarded as a promising sign or advance towards liberation, *moksha*; but even there, I think, a feeling of oneness and unattached spiritual sympathy for all is at least a penultimate stage, like the compassion of the Buddhist before turning to *moksha* or *nirvana*. In this yoga the feeling of unity with others, love, universal joy and Ananda are an essential part of the liberation and perfection which are the aim of the Sadhana...

হ'তে পারি—নইলে অসম্ভব। কিন্তু ওদিকে জীবনও যে আবার টানে। যেমন ধরুন বলছিলাম সামাজিক আদান-প্রদান, বন্ধুত্ব স্নেহ সঙ্গীত এই সব। প্রশ্ন জাগে —যোগ করতে হ'লে কি এসব ছাড়তেই হবে? মুস্কিল হয়েছে এই যে এসবে মন ভরেও না অথচ এসবই ছাড়তে হবে ভাবতে বাজে। কেন বুঝি না।"

শ্রীঅরবিন্দ খুব মন দিয়ে শুনলেন, শুনতে শুনতে তাঁর মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি —কিন্তু এত করুণায় ভরা। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার পানে। পরে ধীরকণ্ঠে বললেন:

"কি জানো? সামাজিক আদান-প্রদান, বন্ধুত্ব, স্নেহভালোবাসা দরদ এইসবের ভিৎ হল প্রাণগত—আর এসবের কেন্দ্র হ'ল আমাদের অহংবুদ্ধি। সচরাচর মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসে অন্যে আমায় ভালোবাসছে এতে সুখ আছে ব'লে, অন্যের সঙ্গে মাখামাখি হ'লে আমাদের অহং যে ফুলে ওঠে তাতে মনটা খুশি হয় ব'লে—প্রাণশক্তির দেওয়া-নেওয়ায় আমাদের ব্যক্তিরূপ খোরাক পায়—উৎফুল্ল হয় ব'লে। এছাড়া আরো স্বার্থসঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য মিশেল থাকে। অবশ্য উচ্চতর আধ্যাত্মিক, আন্তর, মানসিক ও প্রাণিক উপাদানও থাকে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ নমুনার মধ্যেও পাঁচমিশেলি থাকেই থাকে। এই জন্যেই হয় কি, অনেক সময়ে হয়ত দেখা গেল কারণে বা অকারণে সংসার, জীবন, সমাজ, প্রিয়পরিজন, লোকহিতৈষণা—সবই ঠেকল বিষাদ—জাগালো অতৃপ্তি। মনে রেখো, লোক-হিতৈষণার মধ্যেও অহংবুদ্ধি বেশ কায়েমি হ'য়ে বসবাস করতে পারে।*

"কখনো", বললেন শ্রীঅরবিন্দ, "এ বিতৃষ্ণার মূলে ধরা-ছোঁওয়া-যায় এমন কারণও থাকে—যেমন ধরো, হয়ত প্রাণের কোনো মূল কামনা ঘা খেল, কিম্বা হয়ত প্রিয়জনের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'ল, কিম্বা হয়ত হঠাৎ দেখতে পাওয়া

* শ্রীঅরবিন্দ পরে লিখেছেন: Human Society, human friendship, love, affection fellow-feeling are mostly and usually—not entirely or in all cases—founded on a vital basis and are ego-held at their centre It is because of the pleasure of being loved, the pleasure of enlarging the ego by contact and penetration with another, the exhilaration of the vital interchange which feeds their personality that men usually love and there are also other and still more selfish motives that mix with this essential movement, There are of course higher spiritual, psychic, mental, vital elements that come in or can come in ; but the whole thing is very mixed even at its best. This is the reason why at a certain stage with or without apparent reason the world and life and human society and philanthropy (which is as ego-ridden as the rest) begin to pall".

গেল যে যাদের ভালোবেসেছি তাদের চিনতে পারিনি, বা মানুষকে সচরাচর যা ভেবে এসেছি সে মোটেই তা নয়। আরো রকমারি হেতু থাকতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ স্থলেই বিতৃষ্ণা আসে তখনই যখন আমাদের আন্তর চেতনা একটা ঘা খায় কেন না সে আভাস পায়—যদিও হয়ত অনেক সময়ে আবছায়া ভাবে—যে এসব থেকে সে এমন কিছু প্রত্যাশা করেছিল যা এরা দিতেই পারে না। ফলে কেউ কেউ হয়ত ঝোঁকে বৈরাগ্যের দিকে—আঁকড়ে ধরে কঠোর ঔদাসীন্যকে, মোক্ষকে। আমাদের পূর্ণযোগে আমরা ব'ল কি, এই মিশেলকে হবে তাড়াতে, চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কোনো শুদ্ধস্তরে—যেখানে এই সব গ্লানির ছায়াও থাকবে না।* তাহ'লেই স্নেহ ভালোবাসা দরদ সখ্য ঐক্যবোধ—এই সবের নির্ভেজাল আনন্দ-পরিচয় মিলবে—যার বনেদ হ'ল আধ্যাত্মিক ও স্বয়ংসিদ্ধ। এ হ'তে গেলে একটা অদলবদল হওয়া চাই বৈ কি—যে-ভাবে এসব প্রবৃত্তির লীলাখেলা আগে চলত তাদের জায়গায় গোড়পত্তন করতে হবে আমাদের মধ্যেকার বড় আমি-কে। সে এসবের মধ্যে দিয়ে তার নিজস্ব ঢঙে প্রকাশ করবে আত্মোপলব্ধিকে—কি না, ভগবানকে। যোগের ভিতরকার কথা হ'ল এই।

"তাই", বললেন তিনি, "এই আদর্শকে তোমার সামনে রাখতে হবে—এইটে জেনে যে, কোনো কিছুতেই বাঁধা পড়লে চলবে না।"

"সেটা কি সম্ভব আমার পক্ষে?"

"প্রথমেই সম্ভব নয়। হ'লে তো বলতাম তুমি এখনি মুক্তপুরুষ ব'নে গেছ। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি তুমি যোগ করতে চাও তাহ'লে এই অন্তর্মুক্তির আদর্শ তোমাকে সর্বদাই নিজের চোখের সামনে ধ'রে রাখতে হবে—মানে, যদি তোমাকে কিছু ছাড়তে বলা হয় তার জন্যে তোমাকে হবে তৈরী থাকতে।"

* "There is sometimes and ostensible reason—a disappointment of the surface-vital, the withdrawal of affection by others, the perception that those loved or men generally are not what one thought them to be and a host of other causes; but often the cause is a secret disappointment of some part of the inner being, not well translated into the mind, because it expected from these things something they cannot give. For some it takes the form of a *vairagya*, which drives them towards ascetic indifference and gives the urge toward *moksha*. For us what we hold to be necessary is that the mixture should disappear and that the consciousness should be established on a purer level".

"ছাড়তে বলা কি হবেই হবে ?"

"বাইরের দিকে হয়ত অনেক কিছু না-ও ছাড়তে হ'তে পারে—কিন্তু তাতে বিশেষ আসবে যাবে না—কারণ ভিতরে ভিতরে তোমাকে পুরোপুরি নির্লিপ্ত থাকতেই হবে। অন্তরে যদি তুমি আসক্তিশূন্য হ'তে পারো তাহ'লে বাইরে যা কিছু বন্ধন আনে তাদের না ছাড়তেও হ'তে পারে। কিন্তু যাকিছু অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায় তাকে বিদায় দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হ'তেই হবে—যদি দরকার হয়। যোগের এ একটা প্রধান সর্ত তো বটেই।"

বললাম: "সূক্ষ্মতর স্তরের জিনিষের সম্বন্ধেও কি একথা খাটে—যেমন ধরুন গান ? গান আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাকেও কি ছাড়তে হবেই হবে ?"

শ্রীঅরবিন্দ মৃদু হাসলেন: "হবেই হবে এমন কথা তো আমি বলিনি। তবে যোগ যদি তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষ হ'ত তাহ'লে তার জন্যে গানকে ছাড়তে হতে পারে ভাবতেও তুমি এতটা উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতে কি ?"

আমি অপ্রতিভ হ'য়ে মাথা হেঁট করলাম। তারপর বললাম কুণ্ঠিতস্বরে: "আপনি ভাববেন না যে আমি গান ছাড়তে অক্ষম। কেবল—কি জানেন ?—কেমন ক'রে নিঃসংশয় হব যে যোগে গান-ছাড়ার ক্ষতিপূরণ মিলবেই মিলবে ?—আমার সমস্যাটা সরল—সোজাসুজি বললে দাঁড়ায় এই যে, একটা বড় কিছুর জন্যে ছোটকে ছাড়া আমার কাছে দুরূহ মনে হয় না যদি এই বড় কিছুর পূর্বাস্বাদ মেলে। কিন্তু যখন যৌগিক আনন্দের সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই আমার নেই তখন অধ্রুবের জন্যে ধ্রুবকে আগে থেকেই ছাড়তে হবে—বাধে এইখানে। কূলের মায়া কাটাবার আগে অকূলের কিছু স্বাদ অন্তত পেতে চাওয়া—এও কি খুব অসঙ্গত—অযৌক্তিক ?"

শ্রীঅরবিন্দ বললেন: "আমি তোমাকে বলেছি যে, তোমাকে সঙ্গীত বা অম্‌নিধারা ধ্রুব কিছুকে যে ছাড়তে হবেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেটা আবশ্যিক সেটা হচ্ছে এই যে যদি দরকার হয় তাহ'লে যে-সব জিনিষ তোমার যোগের প্রতিকূল সে সবকে বিদায় দিতে তুমি গররাজি হবে না।"

"কিন্তু এ-যোগ দেবে কী—যদি জিজ্ঞাসা করি ছাড়বার আগে ? মন যদি হয় কৌতুহলী, যদি চায় জানতে ? সেটা কি নিষিদ্ধ ?"

"নিষিদ্ধ নয়, তবে যোগ ঠিক মানস কৌতুহলের ব্যাপার নয়। যোগ হ'ল উপলব্ধির ব্যাপার—জীবন দিয়ে উপলব্ধি, সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি।

ক্ষতিপূরণের কথা বলছিলে ক্ষতিপূরণ আছে বৈ কি। সে স্থায়ী—গভীর। কিন্তু তাকে দাবি করলেই যে, সে ধরা দেবে এমন কোনো কথাও সে দেয় না আগে থেকে। তাছাড়া হয় কি জানো? যেসব আনন্দ নিম্নতর স্তরের জিনিষ, সেসব যতক্ষণ তোমার কাছে খুব বেশি আদরণীয়, খুব বেশি ধ্রুব ব'লে মনে হয় ততক্ষণ সেসবকে তুমি ছাড়তেই পারবে না যে। এদের বাসনা মানুষ ছাড়ে কেবল তখনই যখন এরা আনে একটা গভীর তীব্র অতৃপ্তি। যেখানে পার্থিব সুখের শেষ সেখান থেকেই পারমার্থিক আশ্বাসের সুরু।"

একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম: "কিন্তু যতক্ষণ পার্থিব বাসনা থাকে ততক্ষণ পারমার্থিক আনন্দের স্বাদও পাওয়া যায় না কেন?"

শ্রীঅরবিন্দ বললেন: "একেবারেই পাওয়া যায় না একথা সত্য নয়। জীবনে খুব সুখের মুহূর্তেও অতৃপ্তির ফাঁক দিয়ে তো কত সময়েই উপরের আলোর ডাক আসে। তবে সে-ডাক মিলিয়ে যায় আধার তৈরী না হ'লে। তখন ফের আঁধার ছেয়ে আসে। তাই যোগ আমাদের ঠেলে দেয় উপর দিকে যখন আলো সহজে নেভে না। হয় কি, বাসনার পিছু-টানকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে সে হ'য়ে দাঁড়ায় একটা শৃঙ্খলের মতন; আমাদের বেঁধে রাখে যেন নিম্নতর জগতের অনেক-কিছুর সঙ্গে। যোগের রাজ্য বুদ্ধি বা শিল্পরাজ্যের চেয়েও অনেক উর্ধ্বে ব'লে এ-সব রাজ্যের কামনাও কোনো না কোনো সময়ে হ'য়ে দাঁড়ায় বাধা।"

"তা-ই যদি হয়, তাহ'লে আপনার নানা বিচারে বুদ্ধি বা শিল্পের আনন্দকে আপনি প্রশংসা করেন কেন? আপনার লেখায়ই বা বুদ্ধির দীপ্তি এমন উজ্জ্বল কেন? আপনার **Future Poetry**তে কাব্যরসের সুখ্যাতিই বা করেন কেন? আপনার **Psychology of Social Development**-এও তো আপনি লিখেছেন: **'The highest aim of the aesthetic being is to find the Divine through beauty'.**"

শ্রীঅরবিন্দ বললেন: "বুদ্ধি বা শিল্পকে প্রশংসা করব না কেন? কিছুদূর অবধি ওরা আমাদের এগিয়ে দেয় তো বটেই। আসলে এ হ'ল ক্রমবিকাশ—ইভল্যুশনের কথা। আমি একবার লিখেছিলাম **Reason was the helper; Reason is the bar:** বুদ্ধি খানিক দূর অবধি সহায় হয় পথ দেখায় কিন্তু তারপর যেখানে সে দেখতে পায় না সেখানেও দিতে যায় উপদেশ। তখনই হয় বিপদ, কেন না তখন সে যে শুধু ঠকায় তাই নয়—নিজেও ঠকে। তাছাড়া আলাদা

আলাদা আধার আলাদা আলাদা সাধনার অধিকারী, মানে, প্রতি আধার তার নিজের স্বভাবের পথেই সহজ পরিণতি খোঁজে। অন্য ভাবে বলতে গেলে, যারা বুদ্ধিজগতের আলোর জন্যে ভালো আধার, তারা একদিক দিয়ে অন্য অনেকের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে যারা মানসজগতের বাসিন্দাই নয়। কিন্তু একথা বলার মানে নয় যে, বুদ্ধিজগতের উপলব্ধির চেয়ে বড় উপলব্ধি নেই। নিশ্চয়ই আছে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্বাদ পেতে না পেতে সেটা আমরা বুঝতে পারি। তাই জন্যেই তো মানসজগতের আনন্দ কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের আনন্দ দিলেও তৃষ্ণা হ'য়ে ওঠে নিবিড়,—উদারতর রাজ্যের সৌন্দর্য ভোগ করতে সাধ জাগে। বুঝতে পারছ?"

"মানে, আপনি বলতে চাইছেন যোগ আমাদের চেতনাকে আরো বিস্তীর্ণ করে, গভীর করে?"

"হ্যাঁ। আর ক্রমবিকাশ বলতে আমি এই-ই বুঝি—এই ধীরে ধীরে চেতনার বিকাশ। মানুষের অন্তর্বিকাশে এর পরের স্তরে যোগপথেই ঊর্ধ্বতর আলোক ও শক্তির অবতরণ হবে।"*

* * *

একটু পরে আমি প্রশ্ন করলাম: সবই তো বুঝলাম, কেবল আমার যোগ করা সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত?"

"প্রত্যেকেই কোনো না কোনো যোগ করতে পারে।"

"আমি বলছি আপনার পূর্ণযোগের কথা।"

"কী জানো?" বললেন শ্রীঅরবিন্দ—যেন একটু ভাবিত: "আমার যোগে তোমাকে দীক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে কি না এখন বলতে পারছি না।"

"কেন, জানতে পারি কি?"

"কারণ আমি যে-যোগপথে চলেছি তার লক্ষ্য হ'ল আমাদের সমগ্র প্রকৃতির রূপান্তর—দেহ পর্যন্ত। এ বড় কঠিন পথ। এর লক্ষ্য সহজলভ্য নয়—বিপদও যথেষ্ট আছে। তাই আমি কাউকেই এ-যোগ নিতে বলি না যদি না তার তৃষ্ণা এত বেশি প্রবল হয়—যে সে এর জন্যে তার যা আছে সব কিছু ছাড়তে

* "And it is Yoga which is to bring down further light and power in the next stop of human evolution—the next stage of the evolution of human consciousness."

রাজি থাকে।* অর্থাৎ আমি কেবল তাকে আমার যোগে দীক্ষা দিতে পারি যার কাছে এ যোগ ছাড়া অন্য কিছুই করণীয় মনে হয় না। তোমার মধ্যে এমন তৃষ্ণা তো এখনো জাগে নি। তুমি চাও জীবন-সমস্যার খানিকটা সমাধান। অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাসা—seeking—হ'ল আসলে মনের তৃষ্ণা—অন্তরাত্মার নয়।"

একটু দুঃখ হ'ল বৈ কি। বললাম: "শুনুন, আমার মনে হয় আপনি হয়ত ঠিক বুঝতে পারেন নি আমার কোথায় বাধছে। কারণ সত্যি বলছি আমার এ কৌতূহল নিছক মানসিক নয়—"

"আমি তো 'কৌতূহল' বলিনি, বলেছি 'জিজ্ঞাসা'। তাছাড়া আমি বলেছি তোমার 'এখনকার' কথা। তার মানে নয় যে, আন্তরতৃষ্ণা তোমার পরে জাগতে পারে না।"

"বুঝেছি। কিন্তু আমার কথাটা বলি আর একটু শুনুন দয়া ক'রে। ১৯১৯ থেকে ১৯২২ অবধি আমি ছিলাম য়ুরোপে। বহু লোকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে—মনস্বী, গুণী, জ্ঞানী, ভাবুক নানা লোকের কাছেই গিয়েছি আমি—সত্য কী, এই জিজ্ঞাসা নিয়ে। কারণ গীতার কথায় বরাবরই আমার সমগ্র মন সাড়া দিয়েছে যে 'প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা ক'রে তত্ত্বদর্শীদের কাছে যাবে সত্যজিজ্ঞাসু হ'য়ে। গিয়ে আমার লাভও হয়েছে প্রচুর—মহাত্মাজি, রাসেল, রোলাঁ, দুহামেল; রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, ভাতখণ্ডে—এছাড়া আরও কত অখ্যাত মহাত্মা মানুষের সংস্পর্শে। এঁদের সবারই কাছে তাই আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তবু জীবনের দুঃখ শোক অবিচার নিষ্ঠুরতা—হাজারো শোকাবহ দৃশ্যে—প্রকৃতির অর্থহীন অপচয়ের দৃশ্যে—মানুষের ভালো না চেয়ে মন্দটাই চাওয়ার দৃশ্যে—আমি বারবারই অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠেছি। কেবল মনে প্রশ্ন জেগেছে—এসবের কি প্রতিকার নেই?' যদি থাকে তবে কেন পাওয়া যায় না—কেন এত খুঁজে বেড়াতে হয়? মানুষ যদি 'অমৃতের পুত্রই' হবে, তবে যুগ যুগ ধ'রে কেনই বা তার বিষের প'রে এত টান? তাছাড়া, আমার প্রায়ই মনে প্রশ্ন জাগত—"

"বলে যাও, শুনছি মন দিয়ে।"

* "In fact so great are these dangers that I would not advise anybody to run them unless his call is so strong and urgent that he is prepared to stake everything."

"যখনই কোনো মহৎ মানুষের কাছে এসেছি মনে প্রশ্নজাগত—ইনি কি সত্য পেয়েছেন? শান্তি? অন্তরের অতল থেকে পরিষ্কার একটা স্বর উঠত—না তো। এযুগে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সম্বন্ধে—অন্তর বলত—হাঁ, তিনি পেয়েছিলেন 'যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—মিলেছিল তাঁর সেই পরমধন যা পেলে আর কিছু পাওয়ার থাকে না। হয়ত একটু বেশি আত্মজীবনীর মতন শোনাচ্ছে—"

"না না—বলো।"

"আমার মনে হ'ত ক্রমাগতই: কী ক'রে সে-অবস্থা মেলে—"যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—যেখানে প্রতিষ্ঠা পেলে জীবনের সব স্বতোবিরোধের হানাহানি যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—আপূর্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায় আনন্দে শান্তিতে। গান আমি অত্যন্ত ভালোবাসি বলেছি আপনাকে। কিন্তু কেবলই মনে হ'ত এহেন আত্মপর ফুলের ব্রত কি ভালো যখন দেখছি ও জনারণ্যে এত বেশি দুঃখের কাঁটাবন? ঠেলে ঠেলে ভিতর থেকে সত্যি কান্না উঠত—এ জগৎকে কি বদলানো যায় না?"

বলতে বলতে কেমন এক ধরণের লজ্জা এসে আমার কণ্ঠরোধ করল। এত গুছিয়ে বলা কি ভালো? রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবে তবু একটু ভরসা পেলাম। গুছিয়ে বলায় দোষ তো কিছু থাকতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দও তো কম গুছিয়ে বলেন না—কাজেই ক্ষমা করবেন না কি আর?

শ্রীঅরবিন্দের মুখচোখে এক অপরূপ স্নিগ্ধতার আভা উঠল দীপ্ত হ'য়ে। আমার দিকে রইলেন একদৃষ্টে চেয়ে। এমন করুণাভরা চাহনি কখনো দেখিনি জীবনে। অন্তরে শান্তি গেল বিছিয়ে।

বললেন: "তোমার কথা আমি বুঝেছি। আমার নিজেরও এক সময়ে ইচ্ছা হ'ত—যোগবলে জগৎটাকে মুহূর্তে দিই বদ্‌লে—মানবপ্রকৃতিটাকে ঢেলে সাজাই—জগতে মন্দ যা কিছু আছে, শোচনীয় যা কিছু আছে এই দণ্ডে লুপ্ত ক'রে দিই আমার সাধনবলে।"

বুকের মধ্যে রক্ত উঠল দুলে। প্রথম দর্শনে শ্রীঅরবিন্দ এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন? আর কার সঙ্গে? আমার মতন এক অজ্ঞাতকুলশীল অজ্ঞান যুবকের সঙ্গে? কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে উঠল। ইংরাজিতে বলে না drinking in every word? শুনতে লাগলাম সেই ভাবে।

"আমি প্রথমে এসেছিলাম এখানে," বললেন শ্রীঅরবিন্দ, "এই ধরণের

আকাংক্ষা ও উদ্দেশ্য নিয়ে—যদিও আমার পণ্ডিচেরিতে আসার প্রধান কারণ —আমি এইখানেই যোগসাধনা করবার আদেশ পেয়েছিলাম।"

"জানি, আপনার স্ত্রীর পত্রেও পড়েছি আপনি যোগসাধনায় নেমেছিলেন দেশোদ্ধার করতে।"

"সত্যি কথা। লেলে-কে আমি তাই বলি যে, যোগসাধনা করতে আমি রাজি কিন্তু কর্মসাধনা ছেড়ে নয়। দেশ ও কাব্য দুই-ই আমি অত্যন্ত ভালোবাসতাম।"

"তারপর ?"

"লেলে রাজি হ'ল, দিল আমাকে দীক্ষা। কিছুদিন পরে আমাকে শুধু নিজের অন্তর-নির্দেশ মেনে চলতে ব'লে বিদায় নিল।

"আমি পণ্ডিচেরি এসে পূর্ণযোগ-সাধনায় বসলাম। কিন্তু সাধনা করতে করতে আমার দৃষ্টিভঙ্গিই গেল বদ্‌লে। আমি দেখলাম যে আমি এখনি এখনি এসব করা সম্ভবপর ভাবতাম শুধু আমার অজ্ঞানের জন্যে।

"অজ্ঞান ?"

"হ্যাঁ, কেন না আমি এই সত্যটা তখন জানতাম না যে জগতের মানুষকে উদ্ধার করতে হ'লে একজন মানুষের পক্ষে বিশ্বসমস্যার চরম সমাধানে পৌঁছনই যথেষ্ট নয়—তা সে মানুষ যতই কেন অসামান্য হোক না। শুধু নিজে অমৃতলোকে পৌঁছলেই হবে না—বিশ্বমানবকেও হ'তে হবে অমৃতলাভের অধিকারী। কিন্তু তার জন্যে কালও অনুকূল হওয়া চাই। আসল সমস্যাটা হ'ল ঐখানে। শুধু উপরের আলো নামতে রাজি হ'লে হবে না—সে নামতেও পারে থেকে থেকে—কিন্তু তাকে সুপ্রতিষ্ঠ করা যাবে না যদি নিচের আধার —গ্রহীতা আধার ধারণ করতে না পারে।* কাজেই যা তুমি করতে পারো তা হচ্ছে এই যে, যাকিছু উপলব্ধি করেছ তার কিছুটা অংশ বিলোতে পারো—মানে, কেবল তাদেরকে দিতে পারো যারা কমবেশি গ্রহিষ্ণু (receptive)—

* "No real peace can be till the heart of man deserves peace ; the law of Vishnu cannot prevail till the debt to Rudra is paid......Teachers of the law of love and Oneness there must be, for by that way must come the ultimate salvation, but not till the Time-Spirit in man is ready, can the inner and ultimate prevail over the outer and immediate reality. Christ and Buddha have come and gone but it is Rudra who still holds the world in the hollow of his hand......

(Sri Aurobindo's Essays on the Gita—Vision of the World-Spirit.)

যদিও এ-ও খুব সহজ মনে কোরো না। তুমি নিজে পেতে পারলেই যে, যা পেলে তা বিলোতে পারবে এমন কোনো কথা নেই। কারণ গ্রহণের ক্ষমতা এক ধরণের শক্তি, দানের ক্ষমতা অন্য ধরণের শক্তি। বলতে কি, দিতে পারা একটা বিশেষ শক্তি। কেউ হয়ত পারে ধারণ করতে, কিন্তু যা পেল তা বিলোতে পারে না—কেউ বা আবার কিছু পেতে চাইলেও ধারণ করতে পারে না। শেষকথা, সেইসব মানুষের সংখ্যা, সবচেয়ে কম যারা গ্রহণ করতেও সক্ষম আবার দান করতেও পটু। কাজেই দেখছ, সমস্যাটা আদৌ সহজ নয়, তুমি করবে কী? সবাই কি আনন্দ বা জ্ঞান চায় যে তুমি দেবে? সবাইয়ের আন্তর বিকাশ বা অধিকার তো সমান নয়। সুতরাং এ-বিশ্বজগতের দুর্দৈবের কোনো আশু সমাধান বা অমোঘ ঔষধ চমৎকার ক'রে বাৎলে দেওয়া অসম্ভব। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ-কথার সাক্ষ্য মিলবে।"

শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনতে মনে পড়ল বুদ্ধের এক গল্প। একজন সংশয়ী তার্কিক এসে তাঁকে বলেছিল: "নির্বাণ যদি আধিব্যাধির এমনি অমোঘ ওষুধ তবে সবাইকে দেন না কেন এ-বর?" বুদ্ধ সেকথার উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন: "ঘরে ঘরে একবার গিয়ে শুধিয়ে এসো—কে কী চায়?" সে ফিরে এসে বলল: "কেউ চাইল টাকা, কেউ যশ, কেউ স্ত্রী, কেউ ছেলে, কেউ স্বাস্থ্য—" বুদ্ধ বললেন: "নির্বাণ কি কেউ চেয়েছিল?" "কই না তো।" বুদ্ধ হেসে বললেন: "যে-বস্তু কেউ চায় না সে-বস্তু কেমন ক'রে সবাইকে দেব বল দেখি?"

* * *

নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমি, বললাম: "কিন্তু এই ব্যাপক দুঃখ শোক ভয় কষ্ট—"

"এ সবের হেতু যদি হয় অজ্ঞান, আর যদি মানুষ জ্ঞান না চায়, তবে তাদের দুঃখ নিবারণ করবে তুমি কী ক'রে শুনি? যতদিন তারা অন্ধ আসক্তির কবলেই থাকতে চাইবে ততদিন তাদের ভুগতেই হবে—উপায় কী বলো? কর্ম করলে তার ফলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে কোন্ কৌশলে?"

"তাহ'লে আপনি সাধনা করছেন কিসের জন্যে? নিজের মুক্তি বা সিদ্ধির

"না। তাহ'লে আমার এত সময় লাগত না। আমি কিসের সাধনা করছি বললেও তুমি এখন বুঝতে পারবে না, বা ভুল বুঝবে। তবে এইটুকু জেনে রাখো যে আমি চাই ঊর্ধ্বতর লোকের এমন কোনো আলো এজগতে আনতে, এমন কোনো শক্তি এখানে সক্রিয় করতে—যার ফলে মানবপ্রকৃতির মধ্যে হবে

একটা খুব বড় রকমের অদলবদল ওলট পালট : এমন কোনো দিব্যশক্তি যা এ-পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় হয়নি।"

"আপনার নানা লেখায় এই শক্তিরই কি নাম দিয়েছেন অতিমানস—Supramental—শক্তি?"

"হ্যাঁ। তবে নাম নিয়ে কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে এমন কোনো দিব্যশক্তি যে এ-পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কাজ করতে পারেনি নানা কারণে।"

"যুগ অনুকূল ছিল না ব'লে?"

"তা-ও বটে, আরো অনেক কারণ আছে, কিন্তু সে-সব বললে ফের ভুলবোঝারই সৃষ্টি হবে, কারণ যাকে আমি সুপ্রামেণ্টাল বলছি মন দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না ব'লেই ভাষা দিয়ে তার বিষয়ে বলতে গেলে জিনিষটা শোনাবে যেন হেঁয়ালি।"

"আগেকার যুগের যোগীরাও কি এ-অতিমানস শক্তির কথা জানতেন না?"

"কেউ কেউ জানতেন। কিন্তু—কী ক'রে তোমাকে বোঝাব—তাঁরা এশক্তির সঙ্গে মিলিত হতেন নিজেরা তার রাজ্যে উঠে—তাকে আমাদের রাজ্যে নামিয়ে এনে নয়। এ-শক্তি আমাদের চেতনার অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে থাকুক এচেষ্টাও হয়ত তাঁরা করেন নি। তবে এসব কথা নিয়ে বেশি বলতে আমি চাই না এইজন্যে যে এধরণের আলোচনা শুধু পণ্ডশ্রম, কেননা মন দিয়ে এ-সব তত্ত্বের নাগাল পাওয়া তো দূরের কথা—আভাস পাওয়াও সম্ভব নয়।"

"কিন্তু জগতের যে-হাল হচ্ছে দিন দিন। আমি এসব বিষয়ে একটু যুক্তিবাদী—rationalist—ক্ষমা করবেন তো?"

শ্রীঅরবিন্দ একটু হাসলেন, বললেন: "করব, কারণ আমি নিজেও জগতের শোচনীয় অবস্থায় কথা বলেছি বহুবার। শুধু তাই নয়, অবস্থা যে আরো খারাপ হবে এ-ও আমি জানি। অনেক বড় বড় গুহ্যবিৎ যোগীরা বলেন যে জগতের অবস্থা যতই খারাপ হবে উপর থেকে এই প্রকাশ বা অবতরণের লগ্নও ততই কাছে আসবে। তবে আমাদের লৌকিক মন এসব জানবে কী ক'রে! সে হয় বিশ্বাস করবে, নয় অবিশ্বাস—দেখবে, হয় কি না হয়।*

* "The usual idea of the occultists about it is that the worse they are the more is probable the coming of an intervention or a new revelation from above. The ordinary mind cannot know : it has either to believe or disbelieve—wait and see—" (শ্রীঅরবিন্দ লেখেন স্বহস্তে)

গীতার কথা মনে পড়ল: "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম" (যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই আমি অবতীর্ণ হই)। কিন্তু এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখে শুধু বললাম: "এ-শক্তির কাজ হবে কার উপরে?"

"আমাদের দৈনন্দিন জীবনে—দৈহিক জগতে (Physical) বস্তুর (matter) 'পরে।"

"এ-চেষ্টা কি আগেকার যোগীরা করেন নি?"

"অতিমানস শক্তির সাহায্যে না। তাঁরা দেহ ও বস্তুকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামান নি কেন না অধ্যাত্মশক্তি দিয়ে দেহের, বস্তুর রূপান্তর ঘটানো সবচেয়ে শক্ত। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই এ-কাজ করতে হবে।"

"ভগবান কি সত্যি চান বড় রকমের এমনি একটা কিছু ঘটুক?"

"চান বৈ কি। এ-ও আমি নিশ্চিত জানি যে, অতিমানস—সত্য, তার আবির্ভাবও যথাকালে হবেই হবে। প্রশ্ন হচ্ছে—কখন হবে ও কেমন ক'রে! সেটাও উপরওয়ালারা ঠিক ক'রে রেখেছেন—তবে নিচে আমরা তার জন্যে লড়ছি হাজারো বিরুদ্ধ শক্তির হানাহানির মধ্যে।"*

"ঠিক বুঝতে পারলাম না—ক্ষমা করবেন।"

শ্রীঅরবিন্দ বললেন: "কথাটা একটু কঠিন। হয়েছে কি জানো? এই পার্থিব জগতে যা হবে তা অনেক সময়েই প্রচ্ছন্ন থাকে, আমরা যা চাক্ষুষ করি সেসব হ'ল হাজারো সম্ভাবনার সাজসজ্জা—দেখি নানান শক্তি চেষ্টা করছে কোনো কিছু ঘটাতে বা পেতে—যদিও এসবের লক্ষ্য—পরিণতি যে কী—মানুষের দৃষ্টি তার দিশা পায় না। তবে এটা বলা যায় যে, এ-যুগে অনেকগুলি মানুষ জন্মেছে —যাদেরকে পাঠানো হয়েছে—যাতে ক'রে এ-যুগেই এ-অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই হ'ল ব্যাপার। আমরা বিশ্বাস ও ইচ্ছা বলে যে, এযুগেই ঘটবে এ-অঘটন।

* শ্রীঅরবিন্দ যা লিখেছিলেন স্বহস্তে তার অনুবাদ প্রায় অসম্ভব তাই এখানে সবটুকুই উদ্ধৃত ক'রে দিলাম:

"As to whether the Divine seriously means something to happen, I believe it is intended. I know with absolute certitude that the Supramental is a truth and that its advent is in the very nature of things inevitable. The question is as to the when and the how. That also is decided and predestined from somewhere above; but it is here being fought out amid a rather grim clash of conflicting forces."

অবশ্য এখানে আমি বুদ্ধির পরিভাষায়ই কথা বলছি—মিস্‌টিক রাশনাল ভঙ্গিমায়।"*

"কিন্তু আরো একটু না বললে—"

শ্রীঅরবিন্দ হাসলেন: "আর বললে সেটা হবে বেশি ব'লে ফেলা।"†

"কিন্তু কবে হবে এ-অঘটন?"

"তুমি চাও আমি গণৎকারের ঢঙে কথা বলি? রাশনাল হ'য়ে এ তোমার সাজে না।"‡

আমি বললাম: "তাই হয়ত আপনি আপনার **Synthesis of Yoga** বইটিতে লিখেছেন যে, বাস্তব জগৎ আধ্যাত্মিকতার পথে বাধা ব'লেই যে বাস্তব জগৎকে বিদায় দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কারণ অদৃশ্য নিয়তির বিধানে আমাদের সবচেয়ে বড় বাধাই হ'য়ে দাঁড়ায় আমাদের সবচেয়ে বড় সুযোগ।"

শ্রীঅরবিন্দ একথার উত্তর দিলেন না—শুধু একটু হাসলেন।

আমি বললাম: "কিন্তু বাস্তবজগতের এই-যে আমূল রূপান্তর ঘটাতে আপনি চাইছেন, এ-চেষ্টা কি কোনো যুগের কেউই করেন নি?"

"চেষ্টা হয়ত হ'য়ে থাকতেও পারে, কিন্তু কাজে কিছুই হয়নি।"

"কেমন ক'রে জানলেন?"

"হ'য়ে থাকলে যে-সব সাধক পরে এসেছেন তাঁরা সে-সাধনার কিছু না কিছু ফল পেতেনই। কোনো আধ্যাত্মিক উপলব্ধি যদি একবার মানব-চেতনায় পুরোপুরি অবতীর্ণ হয়—তাহ'লে পরে ফের হারিয়ে যেতে পারে না।"

"এ-শক্তিকে তাহ'লে আগে আপনাকে তো নিজে উপলব্ধি করতে হবে?"

"তা তো বটেই। যুগে যুগে সবদেশেই নূতন ভাব বলো আলো বলো

* শ্রীঅরবিন্দ স্বহস্তে যা লিখেছিলেন তা এই: "For in the terrestrial world the predetermined result is hidden and what we see is a whirl of possibilities and forces attempting to achieve something with the destiny of it all concealed from human eyes. This is however certain that a number of souls have been sent to see that it shall be now. That is the situation. My faith and will are for the now. I am speaking of course on the level of human intelligence—mystically-rationally, as one might put it."

† "To say more would be going beyond the line."

‡ "You don't want me to start prophesying! As a rationalist, you can't."

আইডিয়া বলো নামে একজনেরই মধ্যে। তার থেকে দুজন—চারজন—দশজন—এমনি ক'রে ছড়িয়ে পড়ে। গীতাও তাই বলেছে 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ'—শ্রেষ্ঠরা যা করবেন কনিষ্ঠেরা তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কিন্তু আমার যোগে ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে হ'ল আমার কাজের আরম্ভ। অন্য অনেক যোগে উপলব্ধি realisation—হ'ল চরম লক্ষ্য। আমার যোগে প্রকাশ—manifestation-ই হ'ল মুখ্য উদ্দেশ্য। তার জন্যে বলেছি, আগে এই অতিমানস শক্তির নাগাল পাওয়া আমার চাই-ই। মানে, সেখানে আমায় উঠতে হবে—কেবল সে-ওঠার লক্ষ্য হচ্ছে এ-শক্তিকে নামিয়ে আনা। আরোহণ চাই অবতারণের জন্যে।"

"এ-অবতারণের ফল ফলবে কী ভাবে?"

"আমাদের সত্তায় এ-শক্তির ছোঁয়াচ লাগলে আমাদের চেতনা আলো-আঁধারী মানসের কোঠা ছেড়ে উঠবে ধীরে ধীরে অতিমানসের মুক্ত জ্যোতির কোঠায়। ফলে তার প্রভাবে মন প্রাণ ও দেহের হবে রূপান্তর। কারণ সে বস্তুজগতের উপর তার প্রভাব ফেলে ধীরে ধীরে আনবে যুগান্তর।

"একথা বলতে আমাকে ভুল বুঝো না যেন। আমি বলছি না যে, এই শক্তির অবতরণ হ'তে না হ'তে এ-জগৎটা হ'য়ে উঠবে অতিমানস জগৎ বা সব মানুষের হ'য়ে যাবে পূর্ণ রূপান্তর। তা অসম্ভব।"*

"আমরা পূর্ণ রূপান্তরের জন্যে এখনো প্রস্তুত নই ব'লে?"

"শুধু তাই নয়—এ-রূপান্তরের পথে হাজারো দুস্তর বাধা আছে ব'লে। জড়-জগৎ বস্তুর জগৎ হ'ল অন্ধকারের অচলায়তন—দুর্জয় দুর্গ, যুগ যুগ ধ'রে যেখানে তামসিকতা রাজত্ব ক'রে এসেছে—সেখানে আলোর সাড়া পৌঁছে দেওয়া সহজ কথা নয়। তবু এই অতিমানস শক্তি নিজের পথ নিজে ক'রে নিতে

* শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন: "What I want to achieve is the bringing down of the supramental to bear on this being of ours so as to raise it to a level higher than the mental and from there change and sublimate the workings of mind, life and body."—আরো লিখেছিলেন আমাকে: "What we propose just now is not to make the earth a supramental world, but to bring down the supramental as a power and established consciousness in the midst of the rest—to let it work there and fulfil itself, as Mind descended into life and matter has worked as a Power there to fulfil itself in the midst of the rest."

পারে যদি সে একবার নামতে পারে—অর্থাৎ যদি পার্থিব চেতনা একবার তাকে ধারণ করতে পারে।"

"পারলে এ-শক্তি সক্রিয় হবে প্রথমটায় কোথায় ?"

"প্রথমে কয়েকজনের ওপর—এমন হুচারজন যারা খানিকটা প্রস্তুত হয়েছে, এ-শক্তির বাহন হবার সামর্থ্য অর্জন করেছে। তারা কিছুটা দেখাবে মানুষ কী হতে পারে—যদি তার সত্তার রূপান্তর ঘটে। বুঝতে পারছ কি ?"

"একটু একটু পারছি বোধ হয়। কেবল জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—এ-শক্তির কাজ হবে কি শুধু ঐ মুষ্টিমেয় জনকয়েকের উপর, না অনেকের উপর ?"

"অনেকের উপর ত বটেই। পূর্ণযোগ যদি মাত্র আমার মতন হুএকজনের জন্যে হ'ত, তাহলে তার মূল্যও হ'ত খুবই কম। কেন না আমি তো আর এই বাস্তব জীবনকে ছাড়তে চাইছি না—চাইছি তার একটা আমূল গভীর পরিবর্তন।"

"কিন্তু, এ-পরিবর্তনের জন্যে আপনার পরবর্তীদেরও আপনার মতন অমানুষিক সাধনা করতে হবে না তো ?"

শ্রীঅরবিন্দ হাসলেন: "না। আর, করতে হবে না ব'লেই আমি বলেছিলাম অনেকদিন আগে যে, আমার যোগ শুধু আমার জন্যে নয়—সব মানুষের জন্যে। যাকে অচিন বনের মধ্যে দিয়ে প্রথম পথ কেটে চলতে হয় তাকে অনেক হুঃখই সইতে হয় পরবর্তীদের পথ সুগম করতে।"

আমার মনে পড়ল পরমহংসদেবের উপমা: আগুন যে করে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়—কিন্তু সে-আগুন পোহায় যারা তারা বলে, কী আরাম !

মনে হঠাৎ গভীর সম্ভ্রম এল। মনে হ'ল এতবড় একজন মহাপুরুষ রয়েছেন আমাদেরই মধ্যে অথচ জানে কজন ? পরমহংসদেবের যুগে তাঁকেই বা চিনেছিল কজন ? হঠাৎ প্রবল ইচ্ছা হল ফের প্রণাম করতে। কিন্তু প্রাণপণে সে-উচ্ছ্বাসকে রাখলাম দাবিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ এক-দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে।

কেন জানি না এর পরেই এল সন্দেহ, বললাম: "কিন্তু এ কি সত্যি সম্ভব ?"

"একআধজনের পক্ষে সম্ভব। আমি প্রত্যক্ষ করেছি," ব'লে শ্রীঅরবিন্দ হাতের একটা ভঙ্গি করলেন জোর দিতে, "কী ভাবে এ-প্রবল বিজয়ী শক্তির ক্রিয়া মুহূর্তে সেসব প্রভাবকে দূর করে দিতে পারে যারা আত্মাকে বেঁধে রাখতে চায় দেহের তাঁবে। উদাহরণতঃ, যদি কোনো যোগী বাইরের

শক্তিজগৎ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিভৃতে থাকেন তাহ'লে এখনি এখনি সবরকম রোগ থেকে তিনি মুক্তি পেতে পারেন।"

"কিন্তু বাইরে এলে আর পারেন না কেন?"

"কারণ বাইরে সর্বত্রই চারিয়ে রয়েছে রোগের ইঙ্গিত—প্ররোচনা।"*

"কিন্তু আপনি কি মনে করেন এ একটা মস্ত সিদ্ধি? যদি তাই হ'ত তাহ'লে আমাদের আধিব্যাধির শোকতাপের দৈহিক দিকটাকে ধরুন বুদ্ধদেবের মতন দ্রষ্টা পুরুষও এত নগণ্য মনে করতেন কি?"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, বুদ্ধ জীবনকে দেখতেন সম্পূর্ণ অন্য চোখে, কাজেই তাঁর লক্ষ্যও ছিল ভিন্ন। তিনি চাইতেন নির্বাণ—অর্থাৎ এ-ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে নিষ্কৃতি। হ'ত পারে যে সে-যুগের পরিবেশে মানুষ নির্বাণের চেয়ে বড় উপলব্ধির অধিকারী ছিল না। কিন্তু হেতু যা-ই হোক না কেন, তিনি যা চেয়েছিলেন সেটা জীবনলীলার প্রকাশচক্র থেকে অব্যাহতি; আমি চাই—জীবনের পূর্ণ রূপান্তর। আমার লক্ষ্য নয় বাস্তব জীবনকে পরিহার করা, আমার লক্ষ্য—বস্তুকে অধ্যাত্মের আলোয় রূপান্তরিত করা। আমাদের এই জড় দেহ আজও আত্মোপলব্ধির অন্তরায়। এবার তাকে হ'তে হবে উপলব্ধির সহায়। পূর্ণযোগের এ হবে একটা প্রধান লক্ষ্য।"

খানিকক্ষণ কথা কইতে পারলাম না। মনের মধ্যে একটা আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কুণ্ঠাও উঁকি দিল। না কেমন যেন ভয়ও।

তবু বললাম: "কিন্তু আমার সম্বন্ধে?" কী যে বলব মনস্থির করতে পারলাম না। মনে হ'ল সত্যি কি কিছু জানতে চাইছি? ঠিক যেন ঠহার পেলাম না।

শ্রীঅরবিন্দ একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, পরে বললেন আরও স্নিগ্ধ কণ্ঠে: "তোমার এখনো সময় হয় নি। তোমার মধ্যে যে-তৃষ্ণা জেগেছে সে হ'ল মনের জিজ্ঞাসা—কিন্তু অন্তত আমার যোগে দীক্ষা পেতে হ'লে এর চেয়ে বেশি কিছু চাই। আরো কিছুদিন যাক না।"

দুঃখে হ'ল বৈকি—কিন্তু সেই সঙ্গে একটা স্বস্তি একটা আনন্দের ভাবও যে অনুভব করিনি একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

বললাম উঠে: "সময় যদি পরে আসে—তাহ'লে আপনার একটু সাহায্য পাওয়ার আশা করতে পারি কি?"

* "Because of the universal suggestion of disease when he stirs out of his isolation".—বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ মৃদু হেসে শুধু একটু ঘাড় নাড়লেন।

* * *

সে সময়ে আশ্রমে সব জড়িয়ে পনের ষোলো জনের বেশি সাধক ছিলেন না। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কথা হ'ত যথেষ্টই। কয়েকটি পত্রও পেয়েছিলাম এঁদের কাছেই শ্রীঅরবিন্দের লেখা। তার মধ্যে একটি সেদিন আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লেখা। পত্রটি শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন তাঁকে ১৯২২ সালে ১৮ই নভেম্বর তারিখে। সে চিঠি থেকে একটু এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

Dear Chitta,

I think you know my present idea and the attitude towards life and work to which it has brought me. I see more and more manifestly that man can never get out of the futile cycle the race is always treading, until he has raised himself on to a new foundation. I have become confirmed in a perception which I had, always, less clearly and dynamically then, but which has now become more and more evident to me, that the true basis of work and life is the spiritual :* that is to say, a new consciousness to be developed only by Yoga But what precisely was the nature of the dynamic power of this greater conciousness ? What was the condition of its effective truth ? How could it be brought down, mobilised, organised, turned upon life ? How could our present instruments—intellect, mind, life, body—be made true and perfect channels for this great transformation ? This was the problem I have been trying to work out in my own experience and I have now a sure basis, a wide knowledge and some mastery of the secret··· I have still to remain in retirement. For I am determined

* বহুদিন পরে শ্রদ্ধেয় চিন্তাশীল অল্‌ডাস ঠিক এই কথারই যেন প্রতিধ্বনি করেছিলেন, লিখেছিলেন আমাকে একটি পত্রে (৮. ৭. ৪২)

"I have come to doubt more and more the possibility of even sensible political moves achieving what they are expected to achieve. Hence my chief concern is not with politics, but with the intellectual and spiritual conditions upon which alone successful political activity depends......" (Aldous Haxley—California).

not to work in the external field till I have the sure and complete possession of this new power of action—not to build except on a perfect foundation."

(ভাবার্থ : প্রিয় চিত্ত, তুমি আমার এখনকার ভাবধারা বোধ হয় জানো যার ফলে জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গি গেছে বদ্‌লে। যত দিন যাচ্ছে তত আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে এই সত্য যে, মানুষ যে-ব্যর্থ চক্রে আবহমানকাল পরিক্রমণ ক'রে আসছে তা-থেকে কখনই মুক্তি পাবে না—যতদিন না সে একটা নূতন সত্য ভিত্তির 'পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আমার এখন মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে—যা আমার আগেও ছিল, কেবল এত স্পষ্ট ও সক্রিয়ভাবে নয়—যে, জীবনের ও কর্মের সত্য বনেদ হ'ল আধ্যাত্মিক, কি না এমন একটা নব চেতনা যা কেবল যোগলভ্য। কিন্তু এই মহত্তর চেতনার প্রকৃতি ও সাধনশক্তি কী ধরণের? সে-সত্য সফল হবার সর্ত কী? কেমন ক'রে তাকে নামিয়ে এনে গ'ড়ে তুলে সুসংবদ্ধ ক'রে জীবনের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব? কী-উপায়ে আমাদের এখনকার আধার—বুদ্ধি মন প্রাণ দেহকে—এ মহৎ রূপান্তরের বাহন করা যায়? এই সমস্ত সমস্যার মীমাংসাই আমি খুঁজছি আমার নিজের অভিজ্ঞতায়। এতদিনে এ-সবের প্রতিষ্ঠাভূমি সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হ'তে পেরেছি, রহস্য খানিকটা ভেদ করতে সক্ষম হয়েছি।…তবু আমাকে এখনো প্রচ্ছন্ন থাকতে হবে। কারণ বহির্জগতে আমি কাজ সুরু করব না যতদিন না এই নব সাধনশক্তির পূর্ণ অধিকার আমি পাই—গড়তে আরম্ভ করব না, যতদিন না গোড়াপত্তন হয় নিখুঁৎ।)

আরো কয়েকটি পত্র ছিল। পড়লাম রাতে পণ্ডিচেরির একটি ম্লান হোটেলে ব'সে। আনন্দে, নেশায়, উৎসাহে রাত্রে ভালো ক'রে ঘুম হ'ল না। কেবলই মনে ঝলকে উঠতে থাকে শ্রীঅরবিন্দের জ্যোতির্ময় মূর্তি, আর দেশবন্ধুকে-লেখা এই আশ্চর্য পত্রের কথা।

পরদিন সকালে তাঁর কাছে গেলাম ফের।

বললাম: "কাল রাতে পড়ছিলাম দেশবন্ধুকে লেখা আপনার চিঠিটি। কিছু যদি মনে না করেন তবে এ সম্বন্ধে আমার মনে যে-দুএকটি সংশয় উঠেছে তার কথা—"

শ্রীঅরবিন্দ হেসে শুধু একটু হাত নেড়ে ভঙ্গি করলেন।

আমি বললাম: "দেশবন্ধুকে আপনি লিখেছেন যোগশক্তির ফলে একটা নব চেতনা মেলে। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এ-চেতনার কি কোনো প্রত্যক্ষ ফল ফলে? যদি ফলে—অর্থাৎ যোগ ক'রে যদি কোনো শক্তিলাভ হয়—তবে কি প্রমাণ করা যায় যে অমুক অমুক অঘটন ঘটল শুধু এরই গুণে, নইলে ঘটত না?"

শ্রীঅরবিন্দ একটু হাসলেন: "অর্থাৎ তুমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাও—যে বহির্জগতে অমুক অমুক কার্য ঘটল অন্তর্জগতে যোগবলে অমুক অমুক শক্তির সক্রিয়তায়, এই না? এ-ধরণের প্রমাণ যোগজগতে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এ-বিষয়ে প্রত্যেকে তার নিজের ধারণা অনুসারেই চলবে, কারণ এ-কথায় বিশ্বাস আসে যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগের ফলে নয়—আসে অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির ফলে, কিম্বা বিশ্বাসের ফলে, না হয় অন্তরে যে-অন্তর্দৃষ্টি আছে তারই ফলে—অথবা সেই গভীরে বুদ্ধির আলোয় যে দেখতে শেখায় দৃশ্যমানের যবনিকার পিছনে যা যা ঘটছে। আধ্যাত্মিক চেতনা তো নিজেকে জানান দেবার জন্যে হাঁকডাক করে না—সে অঙ্গীকার করতে পারে সত্য কী—তাকে প্রত্যেকের মানতেই হবে এজন্যে লড়াই করে না।"*

"আর একটা কথা কাল মনে হচ্ছিল। যোগের প্রেরণা বিনা আমরা জীবনে যা কিছু করি তার কি কোনো স্থায়ী মূল্য থাকতে পারে না?"

"তোমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আমার প্রশ্নটা 'আদেশ' নিয়ে। পরমহংসদেব বলতেন আদেশ না পেলে কোনো সত্যিকার বড় কাজ করা যায় না। কিন্তু যুগে যুগে দেশে দেশে আদেশ বিনাও তো মানুষ হাজারো কীর্তিকলাপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। সে-সবের কি কোনো সতিকার মূল্যই নেই বলবেন?—যেমন ধরুণ, বিজ্ঞানে শিল্পে দর্শনে কাব্যে।"

শ্রীঅরবিন্দ বললেন: "যে-কোনো দিকে মানুষ সতিকার সৃষ্টি করেছে—তার কিছু না কিছু মূল্য থাকবেই। ব্যাপারটা কি রকম বুঝিয়ে বলি।"

---

* "It is no use trying to *prove* that such and such a result was the effect of spiritual force. Each must form his own idea about that—for if it is accepted it cannot be *as result of* proof and argument, but only as a result of experience, of faith or of that insight in the heart or the deeper intelligence which looks behind appearances and sees what is behind them. The spiritual consciousness does not claim in that way, it can state the truth about itself but not fight for a personal acceptance......

শ্রীঅরবিন্দ বাঁ হাতটা মেলে ধরলেন সোজা ক'রে। বললেন: "ধরো আমরা এই স্তরে কোনো কিছু গ'ড়ে তুলছি, কেমন? যখন এ-কাজ সত্যিকার কোনো সৃষ্টি হ'য়ে দাঁড়ায় তখন হয় কি এর প্রবর্তনা আসে এর চেয়ে উচ্চস্বরের কোনো চেতনা থেকে—' ডান হাতটা বাঁ হাতের খানিকটা উপরে মেলে ধ'রে) অর্থাৎ এখান থেকে—যদিও যেটা গ'ড়ে উঠল সেটা রয়েছে এই (বাঁ হাতটা দেখিয়ে) নিচের স্তরে। কাজেই প্রতি সৃষ্টির কাজকে বলা যায় যোগ—কি না, উপরের স্তরের কোনো চেতনার সঙ্গে নিচের গ্রহীতা চেতনার একটা সেতু গ'ড়ে তোলা। মনের রাজ্যে মনের উপরের লোকের কোনো ধ্যানমূর্তিকে আবাহন করা—প্রতিষ্ঠা করা।"

মনে পড়ল Future Poetryতে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "The voice of poetry comes from a region above us, a plane of our being above and beyond our personal intelligence, a supermind which sees things in their innermost and largest truth by a spiritual identity It is the possession of the mind by the supramental touch and the communicated impulse to seize this sight and word that creates the psychological phenomenon of poetic inspiration and it is the invasion of it by a superior power to that which it is normally able to harbour that produces the temporary excitement of brain and heart and nerve which accompanies the inrush of the influence."

(ভাবার্থ: "কবিতার স্বর আসে আমাদের এক উপরের রাজ্য থেকে—আমাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধির উপরের কোনো স্তর থেকে—যেখানে এক অতিমানস চেতনায় প্রতি জিনিষের অন্তরতম ও বৃহত্তম সত্যকে দেখা যায় অধ্যাত্ম অভেদবোধে। তখন মনকে অধিকার করে এই অতিমানসের স্পর্শ—তার আবেগ এই দৃষ্টি ও শব্দকে নিজকীয় ক'রে নিয়ে সৃষ্টি করে কাব্যপ্রেরণার আন্তর অনুভূতি। আমাদের মস্তিষ্কে, হৃদয়ে ও স্নায়ুতে যে-সাময়িক উত্তেজনা এই প্রেরণার অনুষঙ্গী হ'য়ে আসে তার উৎস হ'ল এই মহত্তর শক্তির স্পন্দন যাকে সহজ মুহূর্তে আমাদের মন ধারণ করতে পারে না।")

মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আত্মপ্রসাদের ভাব জেগে উঠেছিল। হঠাৎ চমক ভাঙল—তাকাতেই দেখি শ্রীঅরবিন্দের শান্ত দৃষ্টির আলো যেন

বিছিয়ে রয়েছে আমার মাথায় চোখে মুখে। কি বলব ভেবে না পেয়ে বললাম: "তাহলে—মানে—শিল্প-সৃষ্টির কাজও একেবারে মূল্যহীন নয়?"

"মূল্যহীন হ'তে যাবে কেন? শিল্প যদি সত্যিকার শিল্প হয় তবে সে যে এই ইন্দ্রিয়-লোকেই বহন ক'রে আনে অতীন্দ্রিয়ের আভাস—বাণীতে, মন্ত্রে, ধ্যানে। অর্থাৎ যা জীবনে প্রচ্ছন্নই থেকে যায় বড় শিল্পের কাজ তাকেই উদ্‌ঘাটিত করা।"

মনে পড়ল শ্রীঅরবিন্দের **Future Poetry**তে আর একটি সুন্দর সংজ্ঞা:

"Poetical speech is the spiritual excitement of a rhythmic voyage of self-discovery among the magic island of form and name in the inner and outer world."

("কবিতার বাণী ছন্দতরণী বাহিয়া চলে
আপনারে চায় নব নব ভায় লভিতে যে সে:
কত রূপ রঙ নামের দ্বীপ যে সমুচ্ছলে
বাহিরে ভিতরে—ফুটাতে সে ধায় সুর-আবেশে।")

"তাছাড়া", শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "প্রতি সত্যিকার সৃষ্টির কাজই তো এই—সে মানুষকে নিচের দৃষ্টি থেকে উত্তীর্ণ করে উপরের ধ্যানলোকে। এ হ'ল মুক্তির কাজ—চেতনার মুক্তি—যেমন যোগের বেলায়ও।"

"একথার মানে কি এই যে, যোগ চেতনার যে-মুক্তি আনে তার ফলে সব মানুষই স্রষ্টা হ'য়ে উঠতে পারে?"

"এক হিসেবে তো বটেই। কারণ যোগে প্রত্যেকের সম্ভাবনাগুলিকে তোলে ফুটিয়ে—যারা অনেক সময়ে আমাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়। ফলে হয় কি, প্রত্যেকে স্পষ্ট দেখতে পায় কী তার করণীয়।"

"একথার তাৎপর্য কি এই যে, যোগ না করলে যা-যা আমি করতে পারতাম না যোগ করলে সে সবই করে ফেলতে পারব?"

"অতটা বলা চলে না—যদিও অসামান্য আধারে যোগবলে অসম্ভবও সম্ভব হয়—তবে সেরকম আধার খুবই বিরল। কিন্তু যোগশক্তি অঘটনঘটনপটীয়সী হ'লেও পূর্ণযোগের আসল লক্ষ্য কিছু মিরাক্‌ল্ ঘটানো নয়—তার লক্ষ্য হ'ল আমাদের প্রতি জীবনশক্তিকে শুদ্ধ নির্মল ক'রে তার চরম পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া।"

"এ যদি হয় তবে তো যোগের ফলে শিল্পীর শিল্পকলার উৎকর্ষ হওয়া উচিত।"

"নিশ্চয়ই, আর হয়ও—যদি অবশ্য শিল্প তার সত্যিকার বাণী হয়। তোমাকে বলছিলাম না এইমাত্র যে যোগ মানে হ'ল আত্মোপলব্ধির পূর্ণচেতনা যার আলোয় সে দেখতে পায় সে কিসের জন্যে জন্মেছে—জানতে পারে তার আসল স্বাধিকার।"

"এ কি মানুষ সচরাচর জানতে পারে না—বুদ্ধির বিশ্লেষণ দিয়ে?"

"সব সময়ে নয়। কারণ বাসনামুক্তি না হ'লে অহঙ্কার না গেলে, বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। যোগ দেয় এ-শুদ্ধি—কেননা তার গোড়াকার কথা হ'ল বাসনা ও অহঙ্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি।"

"আর একটি মাত্র প্রশ্ন আছে—যদি অভয় দেন—অর্থাৎ র‍্যাশনালিষ্ট ব'লে যদি সংশয় আমার ক্ষমা করেন।"

শ্রীঅরবিন্দ হাসলেন: "বলো।"

"আচ্ছা, এই যে যোগবলের কথা প্রায়ই শুনি, যে তার ভেল্কি—মিরাক্‌ল্—ঘটাবার ক্ষমতা আছে, সে নয়কে হয় করতে পারে—এসব কি সত্যি, না স্রেফ্ বুজরুকি—কানপাতলা লোকের গদ্‌গদ কল্পনা? কিছু মনে করবেন না, আমি হয়ত একটু ওদেশের প্রভাবে—"

শ্রীঅরবিন্দ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন: "আমি নিজেও ওদেশের খবর কিছু রাখি হয়ত শুনে থাকবে। ওরা এসব বিষয়ে চায় বেবিকেও বাথ-ওয়াটারের সঙ্গে ফেলে দিতে বুজরুকি—ভেল আছে ব'লে মনে করে সবই তাই, অতএব দাও ভাগিয়ে।"

"কি জানো? মেকি ঝুটো কোথায় নেই এ-জগতে? কিন্তু ভেল আছে ব'লেই কি প্রমাণ হয় যে সাঁচ্চা ব'লেও কিছু নেই? জনশ্রুতি আছে ব'লে সত্যশ্রুতিও সব নামঞ্জুর? এভাবে দেখতে গেলে কোনো কিছুরই সত্যনির্ণয় হয় না। যোগজ্ঞরা সবাই জানেন এসব শক্তি কত প্রত্যক্ষ কত সত্য। এদের সাক্ষ্যও এতই জোরালো যে এদের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা মাথাঘামানোর কথাও ভাবতে পারেন না।"

"কিন্তু ওদেশের সাক্ষ্যবিৎরা—"

"তাঁরা যে মঞ্জুর করেন শুধু বস্তুকে—বস্তুতান্ত্রিকতার থিওরিতে যার নাগাল ওয়া যায় না তাকে সরাসরি ডিশমিশ। সবাই নয় অবশ্য—তবে অনেকে। ব আমলে তাঁরাও বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে জীবন এত বহুবিচিত্র ও ভাবে তাকে না চলে বিচার করা, না যায় মেপে পাওয়া। তাছাড়া

যে-সব শক্তিকে তাঁরা চলতি ভাষায় ভেল্কিবাজী বলেন তারা আসলে তো ভেল্কি কি বুজরুকি নয়—যদি কেবল তুমি মেনে নেও যে আমাদের অন্তঃশক্তি ইন্দ্রিয়পথে ছাড়াও অন্য পথে সক্রিয় হ'তে পারে। য়ুরোপে আমিও একসময়ে ছিলাম অবিশ্বাসী। কিন্তু এসব অঘটন যখন প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম তখন থেকেই আমি ওদের ভঙ্গিতে এসব ব্যাপারকে বিচার করা ছেড়ে দিলাম।"

"আবার এ-ও শুনতে পাই যে এসব শক্তিকে প্রয়োগ করলে আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি হয়?"

"ক্ষতি হবেই এমন কোনো কথা নেই। করছে কে—আর কোন্ প্রেরণায় তারই উপর সব নির্ভর করে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আত্মাভিমান থেকে, নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বা কোনো দেখানেপনার জন্যে যদি কেউ যোগবিভূতিকে জাহির করে তবে তাতে সমূহ ক্ষতি। কিন্তু যেসব যোগীরা নির্বাসনা, নিরভিমান, গীতার ভাষায় 'সর্বভূতহিতেরতা' তারা এসব শক্তির প্রয়োগ করে—উপরের আদেশে, নিচের আহ্বানে না। তাই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুরা শিষ্যদের দীক্ষা দেবার সময়ে বলেন সব আগে চাই অহঙ্কারমুক্তি বাসনামুক্তি—নৈলে এসব বিভূতি বিপদই টেনে আনে—হাজারো গুহ্যশক্তির অপপ্রয়োগে। কিন্তু কোনো শক্তির ব্যাভিচার আছে ব'লে যে সে-শক্তিটাই বর্জনীয় এমন তো হ'তে পারে না। তা যদি হ'ত তাহ'লে তো বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারই হ'ত বর্জনীয়। বৈজ্ঞানিক শক্তি দিয়ে ভ্রষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা বহু অন্যায় কাজ করছেন—সেজন্য শক্তিকে দায়িক করা ভুল। যোগ বিভূতির বেলায়ও ঐ কথা। ভ্রষ্ট যোগীরা এসব বিভূতি ভগবানের কাজে না লাগিয়ে লাগাতে চায় স্বার্থসেবায়। কিন্তু মুক্ত যোগীরা কখনো এমন কাজ করেন না। তাঁদের শক্তি মানুষের ইষ্টই করে—অনিষ্ট কখনো না। কারণ মুক্ত যোগীর বাসনা নেই, অহঙ্কার নেই—তিনি যা-ই করেন তার প্রেরণা আসে ভাগবত চেতনা থেকে, মানুষী চেতনা থেকে তো নয়।"

* * *

প্রণাম ক'রে চ'লে এলাম। রাত্রে ট্রেন ধরলাম মান্দ্রাজের। শেক্সপীয়রের একটি কথা কেবলই ভেসে উঠছিল থেকে থেকে:

When he shall die,
Take him and cut him out in little stars
And he will make the face of heaven so fine

That all the world will be in love with night,
And pay no worship to the garish sun.

যেদিন সে-পুণ্য দেহখানি রক্ষা করিবেন তিনি
রচিও তাহার প্রতি কণা দিয়ে এককেটি তারা
তাহ'লে নীলিমাননে উদ্ভাসিবে এমন সুষমা
নিরখি' যাহারে, সবে সন্ধ্যারে করিবে মাল্যদান
না চাহি' অর্চিতে আর আলোক-উদ্ধত সূর্যরাজে।

(শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ১৯৪৩-এ আমার পুনরায় কথালাপ হয়। তার ইংরাজী রিপোর্ট শ্রীঅরবিন্দ দেখে ছাপাবার অনুমতি দেন। সেটি আমেরিকায় আমার Among the Great গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে ছাপা হয়েছে। এটি তার বঙ্গানুবাদ। প্রথমাংশটি অবতরণিকা। ইতি—লেখক)।

এর পরে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যে-কথাবার্তা হয়—উনিশ বৎসর পরে—তার একটু ভূমিকা করতেই হবে। কেননা এ-কথালাপের উপজীব্য হ'ল নেপথ্যতত্ত্ব—যাকে ইংরাজিতে বলে occultism; এ-তত্ত্বের তাত্ত্বিক যাঁরা তাঁরা এযাবৎ মন্ত্রগুপ্তি মেনেই চলে এসেছেন। শ্রীঅরবিন্দের কাছে শুনেছি নেপথ্যতত্ত্বকে যবনিকার আড়ালে না রাখলে সে-জগতের গুহ্য শক্তিরা সক্রিয় হতে বাধা পায়। ভাগবতে এ-উক্তির সমর্থন মেলে যেখানে নারায়ণ অদিতিকে বলছেন তাঁর গর্ভে বামনরূপে তিনি জন্ম নিয়ে তিনি বলিকে হার মানাবেন বটে কিন্তু

"বলিও না কারেও এ-কথা: দেবগুহ্য সুগোপন
রাখিলেই হয় তার মন্ত্রগুপ্তি সফলসাধন"।*

শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একাধিক পত্রে এই কথাটি বোঝাতে বার বার চেষ্টা পেয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে আছে অনেক অবিকশিত শক্তি যাদের বিকাশ হয় যোগবলে। বিখ্যাত মরমী দার্শনিক (mystic philosopher) প্লটিনাস বলেছেন যে "এ-জাতীয় শক্তি আছে অনেকেরই কিন্তু তাদের প্রয়োগ জানে মাত্র দুচারজন" "many have but few used"; শ্রীঅরবিন্দ সম্প্রতি একটি পত্রে আমাকে নতুন করে আভাস দিয়েছেন এ-সব শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে। ব্যাপারটা এই। আমার এক বান্ধবীর থ্রম্বোসীস অসুখ আছে। তিনি আমাদের আশ্রমে কিছুদিন থেকে ফিরে যাবার সময় নাগপুরে

* সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্।"

হঠাৎ বুকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা। মনে হ'ল তাঁর—কাল বুঝি আসন্ন। তিনি আমাকে লিখলেন: "মূর্চ্ছা যাবার ঠিক আগে মাকে ডাকলাম তারপরই আশ্চর্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে কী যে হ'ল—এতটুকু গ্লানি নেই আর শরীরে। বাকি পথটা চ'লে গেলাম যেন উড়ে..." ইত্যাদি। আমি তাঁর এ-চিঠিটি শ্রীঅরবিন্দকে পাঠিয়ে দিলাম এই প্রশ্নটি ক'রে যে মা তাঁর প্রার্থনা শুনতে পেয়েছিলেন কি না। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখলেন:

"ওর প্রার্থনা শ্রীমার কাছে পৌঁছেছিল বৈ কি, যদিও মার বাইরের মনে ওর অসুখ প্রভৃতির সবকিছুর খুঁটিনাটি হয়ত জাগরূক নাও থেকে থাকতে পারে। এরকম ডাক শ্রীমার কাছে আসা তো একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার —কখনো কখনো হয়ত শতাধিক ডাক এল একের পর এক। যে-কারণে ডাকটা জেগে ওঠে তার রকমফের আছে অবশ্য, কিন্তু ডাকের হেতু যাই হোক না কেন, সাড়া যায়ই যায়। নেপথ্য স্তরের শক্তিদের এমনিই ধারা। চলতি মানবিক ক্রিয়ার সঙ্গে এর মিল নেই—এসব শক্তি মুখের ডাক বা কলমের লেখারো অপেক্ষা রাখে না। আন্তর ভাবজ্ঞাপন হলেই যথেষ্ট—তাহলেই এ-সব শক্তি সক্রিয় হ'তে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে বলব যে, এসব-যে কোনো একটা নৈর্ব্যক্তিক শক্তির খেলা তাও নয়: অর্থাৎ এমন নয় যে, ভাগবত শক্তি বিশ্বভৌম সুতরাং যে-ই তাকে ডাক দেবে সে-ই পাবে সাড়া। এ-শক্তি একান্তভাবেই শ্রীমার স্বকীয়। আর তাঁর যদি এ-জাতীয় শক্তি না থাকত তা'হলে তাঁর কাজই চলত না। কিন্তু বাস্তব স্তরে শক্তি যেভাবে সক্রিয় হয় এ-ধরণের শক্তি সে-জাতের নয়—এ-দুইয়ের রীতি-ভেদ আছে বটেই তো, যদিও নেপথ্যশক্তির ক্রিয়া বাস্তবশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে আর তখন বাস্তবশক্তির কাজ সব চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়। অপিচ, যে এ-গুহ্য শক্তির সহায়তা পেল অজান্তে, তার জানাটা হয়ত শক্তির কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিতে পারত কিন্তু তাব'লে যে সে না জানলে শক্তি অচল হ'ত এমনও নয়। উদাহরণতঃ, কলকাতায় ও অন্যত্র তোমার কাছে আমার শক্তি বরাবরই তোমার সহায় ছিল, আর আমার মনে হয় না যে বলা চলে—তাতে ক'রে কার্যসিদ্ধি হয় নি। কিন্তু তবু এ-শক্তি স্বভাবে নেপথ্য শক্তিরই সমধর্মী এবং তুমি যদি আমার শক্তি সম্বন্ধে খানিকটা সচেতন না-ও থাকতে তাহলেও তার ফল সমানই ফলত।"

১৯২৪-এ পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথালাপের পরে যখন আমি

কলকাতায় ফিরে আসি তখন আমার মনের মধ্যে সব আলো গেছে নিভে। আশাভরসার চিহ্নও খুঁজে পাই না কোথাও—যেই মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দের সেই সাংঘাতিক প্রশান্ত উক্তি: "তোমার এখনো সময় হয়নি। তোমার মধ্যে যে-তৃষ্ণা জেগেছে সে হ'ল মনের জিজ্ঞাসা—আমার যোগে দীক্ষা পেতে হলে এর চেয়ে বেশি কিছু সম্বল চাই।" থেকে থেকে মনে পড়ে তাঁর **Synthesis of Yoga**-এর **Self-consecration** অধ্যায়ে ঘোর সূত্র:

"দৃশ্যমানের ওপারে ঊর্ধ্বতর কিছুর সম্বন্ধে শুধু বুদ্ধির অনুসন্ধিৎসা বিশেষ কাজে আসে না—যতই কেন না মানসিক ঔৎসুক্য নিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরা যাক—যদি না হৃদয়ও তাকে সেই সঙ্গে বরণ করে অদ্বিতীয় বাঞ্ছিত ব'লে, আর ইচ্ছা তাকে গ্রহণ করে অদ্বিতীয় সাধনা ব'লে। কারণ আত্মিক সত্যকে পাওয়া যায় না শুধু চিন্তা দিয়ে, কি খণ্ডিত ইচ্ছা দিয়ে, কি শক্তির ভগ্নাংশ দিয়ে, কি দ্বিধাগ্রস্ত মন দিয়ে। ভগবানকে যে সত্যি চাইবে তাকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে একান্তভাবে শুধু তাঁরি চরণে।"

যোগের দাবিদাওয়া কঠিন এটুকু জানবার মতন বিদ্যাবুদ্ধি বোধহয় সে-সময়েও আমার ছিল। কারণ সে-সময়ে আমার মনে যে-গভীর নিরাশা জেগেছিল তার মূলে ছিল যে আমার আত্ম-প্রস্তুতির অভাব এই সদাজাগ্রত চেতনার তিরস্কারে আমার মনপ্রাণ ম্রিয়মান হ'য়ে দিন কাটাত। অনেক দিন পরে—১৯৪৮ সালে—যখন শ্রীঅরবিন্দ "সাবিত্রী"-তে আমি পড়ি জীবনের কোনো এক সন্ধিলগ্নে তার নিরাশার বর্ণনা তখন চম্‌কে উঠেছিলাম: এ যে ঠিক আমারি মনের ছবি সে-সময়কার (**Part I, Book 2, Canto 4**):

"দেবতার পরিত্যক্ত অনাথার সম ভ্রাম্যমাণা
অসূর্যলোকের দ্বারে শিশুর আত্মার সম যেন
স্বর্গেরে সে অন্বেষণ করে কুয়াশায় নেত্রহীনা…
ক্ষণিকের তরে শুধু করায়ত্ত করে আনন্দেরে,
দুঃখই তাহার যেন মর্মের নিগূঢ়তম স্বর,
নিরাশার পথে পথে চিরপান্থ সহায়বিহীনা,
বেদনার মর্মলোকে সুখেরে যে বেড়ায় খুঁজিয়া।"

কিন্তু "ক্ষণিক" আনন্দ যখন ক্রমশ "ক্ষণিকতর" ও "কুজ্‌ঝটিকা" গভীরতর হ'য়ে এল তখন "নিরাশার" পথগুলি হ'য়ে এল আরো অন্ধকার। এই সময়ে স্বামী অভেদানন্দের একটি বক্তৃতা শুনলাম—"বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌"। মনের মধ্যে

বৈরাগ্যের সুর তখন প্রবল—কাজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব এ আর আশ্চর্য কি? ধরলাম তাঁকে—আমাকে দীক্ষা দিতে হবে। তিনি রাজি হলেন। কিন্তু আমার এক বন্ধু আমাকে মানা করলেন। মনে পড়ল "ন ত্বরমাণেন লভ্যঃ" বলেছেন স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞ সনৎকুমার—মহাভারতে। কাজেই দ'মে যাব এর আর আশ্চর্য কী? শুধালাম তাঁকে: "অথ কিং কর্তব্য?" তিনি "বিমূঢ়" হ'তে উপদেশ না দিয়ে নিয়ে গেলেন টেনে এক সুদূর গ্রামে তাঁর এক যোগিবন্ধুর কাছে।

যোগিবর সব শুনে বললেন: "বসুন আমার ঠিক সামনে চোখ বুজে।"

কতক্ষণ এভাবে কাটল জানি না। জানি শুধু এই যে, একটা গভীর শান্তি নেমেছিল আমার তৃষ্ণার্ত মনে—আমার সমগ্র অন্তর ভ'রে উঠেছিল সে-শান্তিতে কানায় কানায়। আমার বন্ধু আমাকে স্পর্শ করলেন। চমকে চোখ মেলে দেখলাম যোগিবর একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে। অস্বস্তির ভাব এল বৈ কি।

তিনি আচমকা শুধালেন: "বাঃ, আপনি গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছেন কী দুঃখে শুনি—যখন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ আপনাকে গ্রহণ করেছেন?"

"সে কেমন ক'রে হবে?" বললাম আমি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে, "আপনাকে তো বলেছি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

"বাঃ—আমি আপনাকে বলছি—করেন নি।"

বুকের মধ্যে রক্ত উচ্ছল হ'য়ে উঠল, বললাম: "কী বলছেন আপনি? একটু প্রাঞ্জল ভাষা ধরলেনই বা।"

"প্রাঞ্জল? বাঃ! এ তো প'ড়েই রয়েছে," বললেন তিনি মুখ টিপে হেসে। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে: "তিনি এসেছিলেন—হ্যাঁ ঠিক আপনার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন: 'বলো ওকে অপেক্ষা করতে, বলো—আমি সময় হলেই ওকে গুটিয়ে নিয়ে আসব আমার কাছে।' এবার যথেষ্ট প্রাঞ্জল হয়েছে কি?"

তাঁর চোখ যেন হাসছিল। আমি হতবুদ্ধি মতন হ'য়ে গেলাম: লোকটা বলে কি? পরিহাস, না—

চিন্তায় বাধা পড়ল, যোগিবর ব'লে বসলেন: "শুনবেন তবে একটা কথা—বিশ্বাস হবে তাহ'লে?"

তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। বুকে মৃদঙ্গ বেজে উঠলো। যোগিবর বললেন:

"আচ্ছা আপনার তলপেটের ডানদিকে কি একটা ব্যথা মতন আছে?"

আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম: "কেমন করে জানলেন?"

"জানলাম ? বাঃ ! তিনি বললেন ব'লে।"

"ব—বললেন ? কে।"

তিনি এবার হেসে উঠলেন, কৌতুকের হাসি :

"কে আবার—বাঃ আপনার গুরুদেব ছাড়া ? তিনি আমাকে স্পষ্ট ব'লে গেলেন যে আপনাকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে ঐ ব্যথাটা সেরে গেলে তবে যেন যোগ সুরু করেন আপনি।"

ব'লে একটু থেমে : "কিন্তু ব্যথাটা কিসের শুনি ?"

"ব্যথা হার্নিয়া। টানাটানি—টাগ অব ওয়ার—করতে গিয়ে 'রাপচার'টা হয় প্রথম বহুদিন আগে।"

আত্মপ্রসাদে তিনি প্রফুল্লই হ'য়ে উঠলেন বলব। বললেন : "বাঃ! সব জলের মত সাফ হ'য়ে গেল। কারণ যোগ করতে গেলে অন্ত্রে চাপ পড়ে সব আগে। হয়ত সেই জন্যেই আপনাকে তিনি 'না' করেছেন।"

"এবার আপনার ভুল হ'ল—কারণ শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বলেছিলেন আমার শুধু মনের তৃষ্ণা, তাঁর যোগের পক্ষে এটুকু যথেষ্ট নয়।"

ব'লে আমি তাঁর কাছে বললাম শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কী কী কথাবার্তা হয়েছিল ১৯২৪ সালে।

তিনি সব শুনলেন খুব মন দিয়ে, তারপর বললেন : "ঝাপসা কিছুই রইল না এবার। বাঃ। তিনি আপনাকে বলেছেন অপেক্ষা করতে—যতদিন না তাঁকে আপনি চিনতে পারেন আপনার গুরু ব'লে। এখন পর্যন্ত আপনি তা পারেন নি দেখাই যাচ্ছে—নৈলে কি আপনি আর কোনো গুরুকে বরণ করবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন ?"

ব'লে তিনি ধীরে সুস্থে আমাকে বললেন—সে কত কথাই যে! যোগের, গুরুবাদের, মনের নানা আশ্চর্য লীলাখেলার—সর্বোপরি শ্রীঅরবিন্দের মহিমা ও বিভূতির কথা, তাঁর অতিমানস সাধনার কথা—কেন সে-অতিমানস শক্তির জন্যে আগে চাই পৃথিবীর প্রস্তুতি—কি না তাকে ধারণ করবার শক্তি। তিনি আরো বললেন যে, তিনি ধ্যানে দেখতে পেয়েছেন শ্রীঅরবিন্দকে এ-যুগের যুগাবতার রূপে —শ্রীমাকে তাঁর যোগশক্তির নিয়ন্ত্রী-রূপে ইত্যাদি ইত্যাদি। সব শেষে তিনি আমাকে কয়েকটি উপদেশ দিলেন যাতে ক'রে আমার প্রস্তুতির সময়টায় আমি শ্রীঅরবিন্দের সহায়তাকে বেশি কার্যকরী ক'রে তুলতে পারি। তিনি আরো কী কী বলেছিলেন মনে নেই—তবে তাঁর একটি কথা মনে চিরদিন

থাকবে জেগে—তিরস্কারই বলব তাকে। বললেন তিনি: "ডাক আপনার এসেছে, কিন্তু মনে রাখবেন এরো পরের কথা হ'ল গৃহীত হওয়া—নির্বাচিত হওয়া—**to be chosen**; এর জন্যে আপনাকে গুরুচরণে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করতে হবে যাতে ক'রে আপনাকে তিনি যেভাবে ইচ্ছে ঢালাই ক'রে নিতে পারেন—কিন্তু তাঁর ইচ্ছাম'ত, আপনার ইচ্ছাম'ত নয়, ভুলবেন না। এবং এই কাজটি সুসম্পন্ন হ'তে হ'লে আপনার মধ্যে চাই এই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা যে তাঁর জ্ঞান উচ্চতর আর এ-বিশ্বাস চাই শুধু এই জন্যেই নয় যে তিনি আপনার গুরু, চাই এজন্যেও বটে যে যোগবিভূতির শিখরসিদ্ধিতে তিনি পৌঁছে গেছেন।"

শুনতে শুনতে আমি কেমন যেন বিহ্বলের মতন হ'য়ে গেলাম। কারণ এযাবৎ যোগ-বিভূতির সঙ্গে আমার কোনো সাক্ষাৎ পরিচয়ই ছিল না—বিশেষ ক'রে এমন বিভূতির যার কীর্তিকলাপকে এভাবে বাস্তব দিয়ে যাচাই ক'রে নেওয়া যায়। কিন্তু বেশ মনে আছে আমার মন সব চেয়ে অভিভূত হয়েছিল এই জন্যে যে, যোগিবর আমাকে পরিষ্কার ব'লে দিলেন শ্রীঅরবিন্দ আমাকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন আমার হার্নিয়া সম্বন্ধে। সেকথা আমি কাউকেই বলি নি। কেবল যোগিবরের একটি মাত্র কথা আমার মন মেনে নিতে পারে নি তখনও যে আমার সময় হ'লেই গুরুরূপী শ্রীঅরবিন্দ শিষ্যরূপী দিলীপকে সাক্ষাৎ দীক্ষা দেবেন পণ্ডিচেরিতে টেনে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু সে যাই হোক, এতে ক'রে আমার এই একটি মহালাভ হ'ল যে, আমি নিষ্কৃতি পেলাম আমার গুরুসন্ধানের দায়িত্ববোধ থেকে—কারণ শ্রীঅরবিন্দকে গুরু পেয়েও অন্য গুরু চাইতে পারে এতবড় অবোধ যদি এ-পৃথিবীতে কেউ থাকে তবে বুঝতে হবে তার বোধোদয় হবার দেরি আছে।

কিন্তু এর ফলে যে-মানসিক নিশ্চিন্তি এল সে রইল না বেশি দিন। আমি পড়ে গেলাম এক হৃদয়াবেগের জালে, পৌঁছলাম ফের এক চোরাগলিতে। কর্ম থেকে কর্মান্তরে। স্থির করতে হ'ল—ফের কালাপানি পার হব। আর এমনিই যোগাযোগ ঘটল যে পাড়ি দিতেই হ'ল। হ'ল কি, নিউয়র্কের এডিসনের গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে এল জরুরি এক নিমন্ত্রণ। সুতরাং ফের যাত্রা করাই স্থির হ'ল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও সুভাষ তিনজনে মিলে য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটুটে এক বিরাট সভায় আমাকে ফুলের তোড়া ও অভিনন্দন দেওয়ার ফলে ব্যাপারটা আরো ঘনিয়ে উঠল। বন্ধুরা দিলেন সোনার কলম, রূপোর কাস্কেট। বান্ধবীরা লিখলেন কবিতা—পুস্তিকা ক'রে

রাতারাতি ছাপানো পর্যন্ত হ'য়ে গেল। নৈলে হয়ত শেষ পর্যন্ত যেতাম না। কিন্তু এসব অভিভাষণ শুনে, অভিনন্দন নিয়ে ও উপঢৌকন পেয়ে ঘরে ব'সে থাকলে লোকসমাজে মুখ দেখানো ভার হ'য়ে ওঠে, কাজেই "জয়যাত্রায় চলো মন, ওঠো ওঠো তরণীতে তব" ভাঁজতে ভাঁজতে সোজা নীসে পৌছলাম ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু সেখানে যে-উদ্দেশ্যে প্রথমেই যাওয়া—কি না জিরিয়ে নিতে—সেটা ভেস্তে গেল। অন্তর্যামী এমন অন্তরটিপুনি দিলেন যে বোড়ের কিস্তিতে দাবা গতাসু—বাজিমাৎ হ'য়ে ফিরে আসতে হ'ল। 'সাবিত্রী'তে লীলাময়ের এই চাতুরীর কথা পড়েছিলাম প্রায় বিশ বৎসর পরে—যেখানে শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন যে আমাদের নিয়তির রহস্যময় নিয়ন্তা যিনি তিনি—

আঁধার যেথায় গাঢ়তর সেই সত্তার ছায়াতটে
আঁধার-ঘেরা সে-অলখ অতিথি ব্রতী তার সাধনায়
যতদিন না সে তমিস্রাবৃত অতলেও জেগে ওঠে
স্বভাব-রূপান্তরের এষণা তাঁহারি মিলনাশায়।

এককথায়, যাওয়া হ'ল না যেখানে যাব ব'লে লুটে নিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, শরৎচন্দ্রের শুভৈষণা, সুভাষের অভিনন্দন ও বন্ধুবান্ধবের সোনার দোয়াত না হোক সাক্ষাৎ মহাকায় কলম যার ক্ষমতা সে-প্রাক্‌-হিটলারী যুগে কৃপাণের চেয়ে অধিক ব'লে প্রসিদ্ধি ছিল। আর এতবড় অঘটন ঘটল নীসে এমন একটি মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার দরুণ যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল সেখানে বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে যাকে বলে দৈবাৎ—কিন্তু আমার জীবনের দিক থেকে দেখতে গেলে মনে হয় বুঝি অনিবার্য—অবশ্যম্ভাবী। মানুষটির নাম শ্রীঅরবিন্দ-ভক্তদের কাছে অজানা নেই—তিনি পল রিশার (**Paul Richard**)—শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহযোগী। তাঁর নাম শুনেছিলাম বহুদিন থেকেই—তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিতও ছিলাম বৈকি। ১৯২০ সালে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়, তাতে শেষ অধ্যায়ের শিরোনামা—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। এ-অভিভাষণে রিশার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে চীনের বুদ্ধি, জাপানের সূক্ষ্মবোধ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে জগতে নামবে এক নব আকাশগঙ্গার আলোকপ্রপাত আর সে-আলোকের কল্লোলে জেগে উঠবে নীৎসের অহংস্ফীত অতিমানব না—"এশিয়ার দেবমানব—করুণার অবতার—এক নব-বিশ্বস্রষ্টা।" তাই বলেছিলেন রিশার—"তোমারা দীক্ষা

চাও এই ভাবীকালের কাছে—কারণ এশিয়ার মহামানবদের আবির্ভাব আসন্ন। এই-যে দিব্য অবতার যাঁদের খুঁজেছি আমি সারা জীবন—তাঁরা এসেছেন, আর তাঁদের মুকুটমণি শ্রীঅরবিন্দ, আগামী কালের একচ্ছত্র অধীশ্বর। সেদিন এল ব'লে যেদিন তিনি তাঁর ধ্যানাসন ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন দিনের পূর্ণালোকে জগদ্‌গুরুর আসন স্বীকার করতে।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে লিখেছেন যে সংসারে কিছুই 'দৈবাৎ' ঘটে না, তুচ্ছতম. ঘটনারও ভাগবত অর্থ আছে ঃ

The world is not built with random bricks of chance
A blind God is not destiny's architect
There is a meaning in each curve and line

অর্থাৎ

রচিত হয় নি বিশ্ব নিরর্থ অণুর উপাদানে,
এক অন্ধ বিভু নয় নিয়ন্তা মানবনিয়তির ঃ
প্রতি রেখা বৃত্ত এক নিহিতার্থে নিত্য স্পন্দমান।

আমার সঙ্গে পল রিশার-এর দেখা হয়েছিল ভগবানের এমনি কোনো এক গূঢ় উদ্দেশ্যে। সে-উদ্দেশ্যের সবটুকু আমি জানি না, কিন্তু একটি উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পারি ঃ তিনি এসেছিলেন আমার জীবনের সন্ধিলগ্নে আমার সুপ্ত বৈরাগ্যকে জাগাতে। তাই আমি আমেরিকা না গিয়ে ফিরে এলাম ১৯২৭ সালের শেষে—ও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গুরুদেবের চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় নিলাম ২২ এ নভেম্বর ১৯২৮ সালে।

* * *

১৯৪৩ সালে আবার এক সংকটলগ্নে গুরুদেবের দর্শন চাইলাম। তিনি সস্নেহে ব'লে পাঠালেন—"এসো"। তাঁর সঙ্গে কথালাপ হ'ল ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সালে।

শ্রীঅরবিন্দের ঘরে প্রবেশ করলাম—সেই পুণ্যমন্দির যেখান থেকে ১৯২৬ সাল থেকে আর একটি বারও বেরোন নি। প্রণাম করলাম, মাথায় হাত দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করলেন।

"এখন একটু ভালো মনে হচ্ছে তো?" শুধালেন তিনি। চোখে তাঁর করুণার কোমল কিরণ।

বাক্‌স্ফূর্তি হ'তে চায় না ঃ বললাম কোনোমতে ঃ "হ্যাঁ"। তাঁর নক্ষত্রাভ

চোখদুটির দিকে চেয়েই ফের মাথা নিচু করতে হ'ল…এত আলো সহে না যে…মুস্কিল। না পারি তাকাতে, না ফোটে মুখ। অথচ আমি এসেছিলাম একগঙ্গা প্রশ্ন নিয়ে।

শেষটায় তিনিই ফের কথা কইলেন আমার অস্বস্তি কাটাতে বললেন: "আজ সকালে তুমি কয়েকটি প্রশ্ন লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলে। তার প্রথম প্রশ্নটি থেকেই সুরু করি?"

আমি মাথা হেলিয়ে জানালাম সাগ্রহ সম্মতি।

এর বেশি ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু ব'লে রাখি যে, আমি এবারো কথাবার্তা শেষ হ'তেই তিনি যা যা বলেছিলেন লিখে রেখেছিলাম এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলাম তাঁর বলার ভঙ্গিটিকে ফুটিয়ে তুলতে। কেবল এবার আমি ছিলাম আরো বেশি সজাগ—মানে, চেয়েছিলাম যাতে অনুলিপিটি আরো নিখুঁৎ হয়। তাই যেখানে যেখানে তাঁর কথা ভালো স্মরণ করতে পারিনি পরদিন সকালেই লিখে জানাই—তিনি ফাঁকগুলি ভরাট ক'রে দিয়েছিলেন নিজের হাতে লিখে—যাকে বলে filling up the gaps,

আমার প্রথম প্রশ্নটি ছিল সুদীর্ঘ, তাই দিলাম না—আরো এই কারণে যে তাঁর উত্তর থেকেই সেটি অনুমান করা যাবে।

গুরুদেব বললেন: "তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব যে, মোটামুটি দুটি পথ আছে সাধনার। এক, বুদ্ধের যিনি বলতেন—তুমি জানো—যে, যদিও গুরু বা অন্য কারুর কাছ থেকে তুমি কমবেশি সাহায্য বা নির্দেশ পেতে পারো বটে, কিন্তু খতিয়ে তোমাকে চলতে হবে একলাই—নিজেরি শক্তিতে বনের মধ্যে থেকে পথ কেটে বেরুতে হবে। এককথায়, সনাতন তপস্যার পথ। অন্যটি হ'ল গুরুবাদ—কি না গুরুকে ভগবানের প্রতিনিধি ব'লে বরণ করা—মেনে নেওয়া যে, তিনি নিজে পথান্তে পৌছেছেন ব'লে অপরকে পথের খবর দিয়ে তাদের সন্ধানের সহায় হ'তে পারেন। আমাদের আশ্রমে যারা আছে তাদের এই পথ।"

আমি বললাম: "এসবই আমিও জানি। কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন ছিল—যদি গুরুর শক্তিকে দেখি মানবিক সীমাবদ্ধ তাহ'লে কী ভাবে দেখব তাঁকে, চলব পথে? এখানে আর একটু বলি: এ-প্রশ্ন ব্যক্তিগত হিসেবে যে, আমার কাছে খুব সঙিন তা নয় কেন না আমার ভাগ্য প্রসন্ন—আমি যে আপনাকে পেয়েছি গুরুরূপে। কিন্তু হ'লে হবে কি, আমার এমন বন্ধুও 'তো আছেন

যাঁদের ভাগ্য এত ভালো নয়—তাঁদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে? আশা করি আপনি ধরতে পেরেছেন কী আমি বলতে চাইছি?"

গুরুদেব হেসে বললেন: "অব্যর্থ। তবে একথার জবাব তো আমি ইতিপূর্বে দিয়েছি, বলেছি যে গুরু যখন সত্যের প্রণালী হ'য়ে এসেছেন তখন তাঁর উপরে খানিকটা নির্ভর না ক'রেই পারে না বটে, তবু ঢের বেশি নির্ভর করে তাদের উপর যারা চলবে সে-প্রণালী বেয়ে—কি না শিষ্যের উপর।" মুখে তাঁর একটু হাসির আভা ফুটে উঠল: "হয়েছে কি, আধুনিক মন এ-নিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রায়ই মুস্কিলে পড়ে শুধু এই জন্যে যে, যে-শক্তি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে সে ঠিক মনের যুক্তি মেনে সিদ্ধিলাভের দিশা দেয় না। আধুনিক মন তাই এই সোজা কথাটা বুঝতে বেগ পায় যে, শিষ্য গুরুকে ভাগবত প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানও গুরুর মধ্যে দিয়ে এসে তাকে স্বীকার করেন: অর্থাৎ গুরুর কাছে নিজেকে খুলে ধরা মানেই ভগবানের কাছে খুলে ধরা। কাজেই গুরু তাঁর 'মানবিক সীমাবদ্ধতা' সত্ত্বেও শিষ্যের হাত ধ'রে নিয়ে চলতে পারেন সেই শক্তিকে আবাহন ক'রে যে গুরুর ব্যক্তিরূপের মধ্যে দিয়ে সক্রিয় হয়—কি না, সেই শক্তির বলে যে গুরুর 'মানবিক সীমাবদ্ধতার' দরুণ ক্ষুণ্ণ হয় না। আমি তোমাকে বোধহয় একবার লিখেওছিলাম যে এমন কি গুরুর ত্রুটি চ্যুতিও শিষ্যের পথে অনতিক্রম্য বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না, এমন কি সেই গুরুর মাধ্যমেই সে গুরুর আগেও ভাগবত সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারে। কাজেই খতিয়ে দাঁড়ায় এই যে, গুরুর ইষ্টের সঙ্গে ঘটকালি করার শক্তিই হ'ল আসল, তাঁর মানবিক সীমাবদ্ধতা বড় কথা নয়, বুঝলে কি এবার?"

তারপরে উঠল নেপথ্যশক্তিদের রীতিনীতির প্রশ্ন—যেমন ভৌতিক আবির্ভাব বা শূন্যে চলা। এ নিয়ে ফের একটু ভূমিকা করতেই হ'ল। হয়েছিল কি একদিন আমার এক গুরু-ভাইয়ের সঙ্গে এই সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি আমার সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম এদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে। আলোচ্য বিষয় ছিল বিশেষ ক'রে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রসঙ্গে যেসব কিম্বদন্তী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর "সদ্‌গুরুসঙ্গ" গ্রন্থে। এ-সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিচারকদের রায় নিয়েও কিছু জল্পনা হয়েছিল। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বলেছিলেন আমার সন্দিগ্ধতার কথা। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, এসব তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে লৌকিক বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি যে-সব রায় দেয় সেসব প্রায়ই ভ্রান্ত—কেন না এসব শক্তিদের ক্রিয়া সত্যভিত্তিই

বটে, সবটাই জালজালিয়াতিই নয়। এ-উত্তরে আমার সংশয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় নি, আমার মন কেবলই জিজ্ঞাসা করত—এসব ব্যাপার যে সত্যভিত্তি তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে কি না! কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এসব ঘটনার যাথার্থ্যকে মঞ্জুর করা সত্ত্বেও যে আমি আমার অবিশ্বাসকে কাটিয়ে উঠতে পারি নি এজন্যে ভারি অস্বস্তি ঘনিয়ে উঠেছিল আমার মনে। অস্বস্তির আরো একটা কারণ যে আমার সন্দেহের ফলে আমি দেখতে পেলাম যে গুরুর বিচারশক্তির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহকে কেমন যেন প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে—যার ফলে আমার আত্মাদর অহঙ্কার বেশ একটু খোরাক পেয়ে খুসি হ'য়ে উঠছে। একথা তাঁকে সামনা সাম্‌নি আবার বললাম খোলাখুলি। কিন্তু ব'লেও স্বস্তি পাই নে—যা মনে আসে তাই কি মুখে বলা উচিত?—জাতীয় কুণ্ঠা।

গুরুদেব শান্ত স্বরেই আশ্বাস দিলেন, বললেন: "মা ভৈঃ। যোগের পরম লক্ষ্য হ'ল ভাগবত উপলব্ধি তথা জীবনে তার সুপ্রকাশ। এহো বাহ্য—অধ্যাত্ম-উপলব্ধির দিক দিয়ে দেখতে গেলে খানিকটা অবান্তর—এসবে বিশ্বাস হোক বা না হোক বিশেষ যায় আসে না। কাজেই এ বিষয়ে তোমার নিজের বুদ্ধির রায়ে তুমি আস্থা রাখতে পারো স্বচ্ছন্দে।"

আমি আশ্বস্ত হ'য়ে বললাম: "আপনার একথা শুনে যেন বাঁচলাম। কারণ আমার একটা ভারি ভয় ছিল যে সবকিছুতেই কেউ গুরুর মতামত মেনে নিতে না পারলে বুঝি তাতে ক'রে সাব্যস্ত হ'য়ে যায় যে, সে গুরুবাদের পথে চলবার অধিকারী নয়।"

গুরুদেব স্নিগ্ধ স্বরে বললেন: "তোমাকে ফের আশ্বাস দিচ্ছি—মা ভৈঃ। কারণ তুমি আমার একথায় বিশ্বাস করতে পারো যে, আমি যখন বলি বা লিখি তখন আমি শুধু প্রকাশ করি আমার নিজের জীবনদর্শন, গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করি আমার দৃষ্টিভঙ্গি—আর সবাইকে সে সব নির্বিচারে মেনে নিতেই হবে এমন কথা আমি বলিনা রুখে উঠে। আর এত বৎসর ধ'রে আমাকে জেনে চিনেও তুমি ভাবতে পারো যে, আমি আমার নিজের মতামত চাপাব অপরের ঘাড়ে? ডিক্টেটর হবার লোভ আমার কোনোদিনই ছিল না, আমি চাই নি কোনোদিনই যে, আর সকলেরি মত আমার মতের ছাঁচে ঢালাই করা হোক—এমন আব্দারও করি না যে, যে যেখানে আছে আমার অনুবর্তী হোক কি আমার যোগ করুক।" হঠাৎ থেমে তিনি বললেন: "কেমন? ধ'রো ঐ সামনের ধাতুমূর্তিটি। আমার চোখে মূর্তিটি ভারি চমৎকার

লাগে। কিন্তু যদি তোমার চোখে না লাগে তবে কি আমি মুখ ভার ক'রে ব'সে থাকব?"

"তাহ'লে অনেকের মুখেই শোনো যায় কেন যে গুরু আনুগত্য চান শিষ্যের মধ্যে আন্তর ঐক্য বা সুষমা গ'ড়ে তুলতে—কিম্বা—"

"কিন্তু ঐক্য মানে তো একাকার নয়। এক বলেছিলেন আমি বহু হব—'বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'। কাজেই সেই একেকে স্বীকার করতে হ'লে তোমাকে বহুকেও অঙ্গীকার করতেই হবে—প্রকাশের বহুমুখিতাকেও মানতে হবে প্রকাশিতের ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে। বুঝলে?"

"এটা বুঝেছি," বললাম আমি খুশী হ'য়ে, "বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা—আপনিই বলেছেন কোথায়। কিন্তু তবু—হয়েছে কি, আমি আপনাকে এত ভক্তি করি যে তুচ্ছ কিছু নিয়েও আপনার সঙ্গে মতভেদ হ'লে তাতে ক'রে আমাকে বাজে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—বিশ্বাস করা ভালো, আর বিশ্বাস করুন আমি চাই বিশ্বাসীদের মতনই বিশ্বাস করতে। বলতে কি, আপনি যা-ই বলুন আমি চাই বিশ্বাস করতে, মেনে নিতে। ধরুন ঐ ধাতুমূর্তিটি। আমি যদি জানি যে ও-মূর্তিটি আপনার সুন্দর লাগে তা'হলে আমার না লাগলেও আমি সেকথা মুখ ফুটে বলতে সঙ্কুচিত বোধ করব। এই ধরণের নানান্ অস্বস্তির দরুন আমার মনে হয়—বুঝি বা আমি আপনার যোগের অধিকারী নই। বুঝতেই পারছেন এর ফলে আমার মনে কী রকম দুশ্চিন্তার ঘূর্ণী ওঠে জেগে: তাছাড়া আমার নিজের তরফ থেকেও আমি চাই বিশ্বাস করতে—অন্তত আমার মনের সংস্কারগুলিকে জয় করবার জন্যেও বটে। এককথায়, আমি চাই আমার মন ছেড়ে দিক তার সিংহাসন। কিন্তু চাইলে হবে কি? সে শূন্য সিংহাসনে বসাই কাকে? কোন্ নতুন আলোকরাজকে ডাক দেব মনের স্ফুলিঙ্গ-জটলাদের স্থান অধিকার করতে?"

গুরুদেব আমার দিকে একটু চেয়ে রইলেন তারপর বললেন: "মনের পক্ষে সেই নতুন আলোকরাজকে পাওয়া একটু কম কঠিন হ'ত যদি সে না বড় গলা ক'রে বলত যে, তার বর্তমান দণ্ডধর যুক্তিরাজ বেশ পুরোপুরি শক্ত সমর্থ। কারণ এ-দাবি হ'ল সেই দাবিরই নামান্তর যে, মনই হ'ল আমাদের সব অভিজ্ঞতা উপলব্ধির শেষ দরবার। কিন্তু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলে যে, মন কোনো কিছুই যথার্থ বুঝতে পারে না—পারে না কোনো কিছুর মূলে পৌঁছতে। মনের গড়নই এম্‌নি যে, ভাগবত সত্যের বা ক্রিয়ার একটা সামান্য ভগ্নাংশের

বেশি সে ধারণা করতেও অক্ষম। যেমন ধরো নেপথ্য-তথ্য। তোমার মনের পরখ দিয়ে এসবের স্বরূপ তুমি কিছুতেই ধরতে পারবে না। কাজেই এসব তথ্যকে স্রেফ্‌ জাল জুয়াচুরি ব'লে ডিশমিশ না ক'রে যদি তুমি তোমার বিচার শক্তিকে নিরস্ত রাখতে—যতদিন না তুমি স্ববিচারী হ'য়ে ওঠো—তাহ'লে ভালো হ'ত। ভালো হ'ত কেন না এই গভীরতর বিচারশক্তি আসে একটা উচ্চতর চেতনা থেকে—আর শুধু তারি আলোয় দেখা যায় এই সব পার্থিব বা নেপথ্য-শক্তির অন্তরালের প্রচ্ছন্ন ভাগবত ক্রিয়াকলাপকে।"

তবু মনের খট্‌কা যায় না, বললাম: "তবু—মানে—হয়েছে—হয়েছে কি —থিওরিতে তো শুনতে খাসা লাগে এসব—কিন্তু যখন মুখোমুখি হ'তে হয়— এই ধরুন না কেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীরই সম্বন্ধে যেসব জনশ্রুতি। কুলদানন্দ লিখেছেন অম্লানবদনে যে গোঁসাইজির গুরু তাঁর স্ত্রীকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আকাশপথে। আপনি কি বলতে চান যে এ হ'তে পারে বা হয়েছিল?"

গুরুদেব বললেন: "তাঁর স্ত্রীকে সত্যি সত্যি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কি না বলতে পারি না। কিন্তু জড়পদার্থকে যে শূন্যে উঠতে ও চলতে দেখা গেছে এটা যখন অকাট্য এবং যখন যোগীঁরাও পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে এ সত্য, তখন একে হুশ্‌ ক'রে অসম্ভব ব'লে ডিশমিশ করবে কেমন ক'রে? হাজার হাজার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি আমাদের হয় যাদের কোন দিশাই পায় না আমাদের মন। খতিয়ে এ তো মানতেই হবে যে, কোন কিছু সত্য কি না তার চরম কষ্টি-পাথর হ'ল অভিজ্ঞতা (experience) আর অভিজ্ঞতা বলে যে, শূন্যে-ওঠা বা চলা (levitation) বা কোথাও-কিছু-নেই-মূর্তি গ'ড়ে ওঠা (materialisation) এ ঘটে—"

আমি থাকতে পারলাম না, বললাম: "ঐ তো। ভালোই হ'ল আপনি আমার মুখের কথা টেনে নিয়ে বললেন। কারণ আমিও এই ভৌতিক আবির্ভাবের—মেটিরিয়ালাইজেশনের—প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম আপনাকে। এ সম্বন্ধে নানা গল্পগুজব কে না শুনেছে বলুন? কিন্তু কই আমি তো এপর্যন্ত একজনের কাছেও শুনলাম না যে সে স্বচক্ষে দেখেছে শূন্য থেকে বস্তুর আবির্ভাব। শুধু জনশ্রুতি তো আর এমন কিছু সাক্ষ্য নয় যার উপর ভর করা চলে—"

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন: "আচ্ছা তাহ'লে বলি শোনো যা আমার 'স্বচক্ষে দেখা'; তাহ'লে তোমার জনশ্রুতির বিরুদ্ধে আপত্তির অন্তত নিরাকরণ হবে।

আর এ-ব্যাপারটার আমি ছাড়া আরো ছসাত জন সাক্ষী ছিল—যাঁরা সেসময়ে আমার সঙ্গেই ছিলেন।"

ব'লে গুরুদেব সুরু করলেন এই ভুতুড়ে ব্যাপারটি বলতে। ব্যাপারটা উদ্ভট ব'লেই আমি পরদিন তাঁকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছিলাম এর একটা বিবৃতি আমাকে লিখে পাঠাতে। উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন তা নিচে দিচ্ছি। (আমি অবশ্য এখানে বাংলা অনুবাদটুকুই দিচ্ছি)।

"আমি তোমাকে দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলাম দেখাতে নেপথ্য-শক্তির কার্যকলাপ ; প্রমাণ করতে, যে, এসব না কল্পনা, না মনের ভুল, না জালজুয়াচুরি ; বোঝাতে যে, এসব বাস্তব ঘটনা হ'তে পারে ও হ'য়ে থাকে।

"আমাদের অতিথিশালার (Guest-house) রান্নাঘরে প্রথম দিকে ঢিল পড়তে আরম্ভ করে নিরীহভাবে—যেন কেউ সামনের ছাদ থেকে ছুঁড়ছে, অথচ কেউ কোথাও নেই সে-ছাদে। উৎপাতটা প্রথমে আরম্ভ হয় সন্ধ্যাবেলা আর চলে আধঘণ্টা ধ'রে। কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলল ঢিলগুলির আবির্ভাব, প্রবলতা ও আয়তন। পড়তে লাগলও ক্রমশ বেশিক্ষণ ধ'রে—কখনো বা ঘটনার পর ঘণ্টা। শেষে, দুপুর রাতের একটু আগে ক্ষেপণ হ'য়ে উঠল যাকে বলে বম্বার্ডমেণ্ট। আর একটা নতুন ব্যাপার হ'ল এই যে, শুধু রান্নাঘরেই নয় অন্যত্রও ঢিল পড়তে লাগল—যেমন ধরো বাইরের বারান্দায়।

"প্রথমে আমরা কোনো দুষ্ট লোকের কীর্তি ভেবে পুলিস ডাকি। কিন্তু পুলিসের তদন্ত সুরু হ'তে না হ'তে সারা : যেই একটা পুলিসের দুপায়ের মধ্যে দিয়ে একটি ঢিল বোঁ ক'রে উধাও, অমনি পুলিসেরও ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট। তখন আমরা নিজেরাই তদন্ত সুরু করলাম, কিন্তু যে-সব জায়গা থেকে ঢিলগুলি ছোঁড়া হতে পারত সে-সব জায়গায় কোথাও মানুষের চিহ্নও নেই। শেষে, যেন আমাদের প্রতি করুণা ক'রে সংশয়ভঞ্জন করতে ঢিলরা পড়তে আরম্ভ করলেন ঘরের মধ্যে—যখন দুয়ার জানালা সব বন্ধ। এদের মধ্যে একটি ছিল প্রকাণ্ড, পড়ার পরই আমি তাকে দেখতে আসি। সেটি তখন একটি বেতের টেবিলে সুখাসীন—দিব্যি গদিয়ান যাকে বলে। এইভাবে চলতে লাগল উৎপাত—শেষটায় হ'য়ে উঠল সাংঘাতিক। এতদিন তবু বিজয়ের ঘরের দুয়ারে ঢকাঢক করা ছাড়া ঢিলগুলো আর, বিশেষ কিছু ক্ষতি করে নি—কাউকেই করে নি আঘাত। শেষ কদিনের মধ্যে একদিন—যেদিন উৎপাতটা বন্ধ হয় তার ঠিক আগের রাতে—আমি মন দিয়ে দেখছিলাম কাণ্ডটা। ঢিলগুলো মাটি থেকে

ফুটকয়েক উঁচুতে হঠাৎ রূপ নিচ্ছে, দূর থেকে আসছে এমন নয়—হঠাৎ আবির্ভাব—তাদের গতিমুখ দেখে মনে হয় কেউ তাদের ছুঁড়ছে অতিথিশালার পাশের জমিটা থেকে, অথচ আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—সেখানে বা কোথাও কোন মানুষই নেই বা থাকতে পারে না লুকিয়ে। শেষটায় ঢিলগুলি এসে বিষম ভাবে আঘাত করা সুরু করল আমাদের একটা আধপাগলা বালক চাকরকে। সে-ই ছিল ঢিলদের যেন প্রধান নিশানা। তাকে বিজয়ের ঘরে রাখা হয়েছিল বিজয়েরই আশ্রয়ে। কিন্তু তবু বন্ধ ঘরে ঢিলের উৎপাতে সে আহত হ'ল—রক্তপাত পর্যন্ত। শেষবার যে-ঢিলটা তাকে এসে আঘাত করে তাকে আমি পড়তে দেখেছিলাম—বিজয় আমকে ডাক দিয়েছিল ব'লে। ওরা দুজান তখন পাশাপাশি ব'সে—কিন্তু ছুঁড়ছে কে? কেউ তো কোথাও নেই ওরা দুজন ছাড়া। কাজেই যদি সে ওয়েল্‌সের 'অদৃশ্য মানুষ' না হয়ে থাকে—

"এযাবৎ আমরা ছিলাম পরিদর্শক বা চৌকিদার মতন। কিন্তু এ-যে বিষম কাণ্ড, ব্যাপারটা সঙিন হয়ে উঠতে চলল—কিছু একটা না করলেই নয়। তখন শ্রীমা—যিনি ভৌতিক লীলাখেলার খবর রাখতেন—সাব্যস্ত করলেন যে, অতিথিশালার সঙ্গে ঐ চাকরটাই হ'য়ে উঠেছে যোগসূত্র যাকে আশ্রয় করে ব্যাপারটা ঘটছে। কাজেই এই যোগসূত্রটা যদি ছিন্ন করা যায়—কি না, চাকরটাকে অতিথিশালা থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়—তাহ'লে ঢিল-পড়ার উৎপাত থেমে যা্‌বে। আমরা তাকে যেই পাঠিয়ে দিলাম হৃষীকেশের কাছে অম্‌নি সব ঠাণ্ডা। আর একটিও ঢিল পড়ে নি সেই থেকে। ওঁ শান্তিঃ।

"এ থেকে দেখা যাচ্ছে" শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন সব শেষে, "যে এসব ভৌতিক বা অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ বাস্তবের কোঠায়ই পড়ে, বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের মতন তাদেরো ঘটবার আছে বাঁধাধরা পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতির জ্ঞান অর্জন করলে যেমন তাদের নামানোও যায় তেমনি থামানোও যায়।"

এখানে একটু বলি ব্যাপারটার ইতিহাস—সাধারণ পাঠকের জন্যে। শ্রীঅরবিন্দের কাছে শুনে আমি খোজ নিয়েছিলাম যাঁরা সাক্ষী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কারুর কারুর কাছে। তাঁরা সবাই বলেছিলেন ব্যাপারটা তাঁরা দিনের পর দিন চাক্ষুষ করেছেন। সবচেয়ে সন্তোষজনক এজাহার পেয়েছিলাম অমৃতের কাছে—কারণ সে উৎপাতটার একটা রিপোর্ট লিখে রেখেছিল—সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত। তাথেকে জানা গেল যে বাস্তুল্‌ নামে

এক চাকর ছিল শ্রীঅরবিন্দের। তাকে ডিশমিশ করাতে সে ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলেছিল সবাইকেই সে বাড়িছাড়া করবে। সে যায় এক মুসলমান ফকিরের কাছে যে তান্ত্রিক অভিচার জানত। তারই তান্ত্রিক তুকতাকের দরুণ ঘটে ঐ উৎপাত। আমি অমৃতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঢিলগুলো দেখতে চোখের ভুল হয় নি তো? সে হেসে বলেছিল সেগুলো সে একটা ঝুড়ি ক'রে জমা ক'রে রেখেছিল বহুদিন, অনেকে দেখতে আসতেন ব'লে—আর সেগুলো বেশ শক্তসমর্থই ছিল বরাবর—উবে যাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যায় নি। আর একটা কথা সে বলেছিল ভারি অদ্ভুত—ঢিলগুলোয় গায়ে সমুদ্রশৈবাল ছিল। খবর নিয়ে আরো জানা গেল যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমটা এসব ভুতুড়ে কাণ্ড শুনে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বরাবরই একজন দারুণ বুদ্ধিবাদী, বলেছিলেন যে-সব ভূত এ-সব ছুঁড়ছে তাদের হাতে নাতে ধ'রে তিনি দেখিয়ে দেবেন যে তারা কেউ মরে নি। কিন্তু শেষটায় তিনি কোমর বেঁধে তদন্ত ক'রেও কোনো কূলকিনারা পান নি এর। তারপরে আরো একটু আছে—উপসংহার। উৎপাত যখন থেমে গেল তখন বাত্তলের স্ত্রী "রক্ষা করো রক্ষা করো" বলতে বলতে একদিন এসে হাজির শ্রীঅরবিন্দের ও শ্রীমার কাছে। বাত্তল যায় যায়। বাত্তল এসব মারণক্রিয়ার হালচালের কিছু খবর রাখত, তাই জানত যে, মারণশক্তি যদি এমন লোকেদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবার শক্তি ধরে তখন সে ফিরে এসে মারককেই করে আক্রমণ (কনান ডয়েলের বিখ্যাত The Speckled Band নামে সাপের গল্প মনে পড়ে। শার্লক হোম্‌স্ সাপটাকে বেত মারলেন যখন গভীর রাতে সে এসেছিল ছাদের একটা ফুটো-থেকে-ঝোলা দড়ি বেয়ে। অপর ঘরে সৎ-পিতা সৎ-কন্যাকে মারবার জন্যে পোষা সাপটাকে পাঠিয়েছিলেন। মেয়ের ঘরে মার খেয়ে সাপটা ফিরে গিয়ে তাঁকেই ছোবল মারে)। শ্রীমার দ্বারা প্রতিহত হবার পরেই বাত্তলের এমন অসুখ করে যে ডাক্তারেরা জবাব দেয়। শ্রীঅরবিন্দের কাছে এসে বাত্তলের স্ত্রী কান্নাকাটি করাতে ক্ষমাময় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন করুণার্দ্র হ'য়ে অমৃতের সাম্‌নে—"এজন্যে ওকে মরতে হবে না—মা ভৈঃ।" তার পরে বাত্তল বেঁচে ওঠে।

* * *

গুরুদেব কাহিনী শেষ ক'রে বললেন: "শ্রীমা উত্তর আফ্রিকায় নেপথ্যশক্তি সম্বন্ধে চর্চা করেছিলেন ব'লে তিনি ধরতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা।"

"আর আপনি ?"

শ্রীঅরবিন্দ একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : "আমারো এসব শক্তিদের সম্বন্ধে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা আছে বৈ কি।"

"মাটি থেকে শূন্যে ওঠা সম্বন্ধে কী বলেন আপনি ?"

"সিদ্ধ ব'লে আমি মনে করি, কারণ প্রাকৃত শক্তিদের গতিবিধি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা থেকে এ-সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, তাদের বিকাশ করতে জানলে শূন্যে ওঠা বা চলা সাধ্য হ'তে বাধ্য। তাছাড়া আমার এমন দৈহিক উপলব্ধি হয়েছে যা হওয়া অসম্ভব হ'ত যদি এসব মিথ্যা হ'ত।"

"আচ্ছা তাহ'লে আধুনিক মন এসব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য মেনে নিতে এত নারাজ কেন ?"

গুরুদেব বললেন : "আমার নানা লেখায় আমি এর কারণ দর্শিয়েছি। আমাদের মন হ'ল অজ্ঞানের জ্ঞানোন্মুখ যন্ত্র (the mind is an instrument of Ignorance growing towards knowledge)। এমন কথা বলি না যে, আধ্যাত্মিক জীবনে মনের কোনো স্থানই নেই; কিন্তু একথা বলতেই হবে যে, সে এবিষয়ে এমন কি প্রধান যন্ত্রও হ'তে পারে না—সে এমন কোনো মহামহোপাধ্যায় তো নয়ই যার রায় মঞ্জুর সব কিছু সম্বন্ধে—মায় ভগবান পর্যন্ত। যে-উচ্চতর চেতনার মোহানায় তার গতিমুখ তার কাছে তাকে নত হ'য়ে শিখতে হবে—নিজের মান বা মতি সে-উপরওয়ালার ঘাড়ে চাপাতে চাইলে চলবে না। মনের পক্ষে এ সুসাধ্য নয়—কেন না তার ধর্মই এই যে, সে যুগপৎ দুটো জিনিষ দেখতে পায় না—একটা একটা ক'রে দেখলে তবেই পরিষ্কার দেখে। এর হেতু এই যে জীবনকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ভাগ ক'রে দেখলে তবেই সে ঠিকমতন অভিনিবিষ্ট হ'তে পারে—অর্থাৎ অখণ্ডকে নিষ্করুণভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে—এক এক ক'রে পরীক্ষা ক'রে তবেই সে স্বধর্ম পালন করতে পারে। এ-পদ্ধতির একটি মস্ত সার্থকতা এই যে, এ-পথে চলার ফলেই সে প্রথম পেয়েছে সেই শিক্ষা যা তার দরকার ছিল—যাতে ক'রে সে নিজের সামনে ধ'রে রাখতে পেরেছে 'সেই অমুত্র বা পরমের ভাবরূপকে যার দিকে তাকে মোড় নিতেই হবে। কিন্তু তবু বলব : বুদ্ধির যুক্তি এই পরমতমের একটা আবছা আবছা আভাস দিতে পারে মাত্র—কোনোমতে হাৎড়ে হাৎড়ে চলতে পারে সেই মুখে কিম্বা পারে বড় জোর পৃথিবীতে তার আংশিক বিভাসের ইঙ্গিত দিতে; সে পারে না তাকে

জানতে কি তার মধ্যে প্রবেশ করতে।' কিন্তু তুমি যখন পূর্ণযোগ তথা পূর্ণজ্ঞানের দীক্ষা নিতে এসেছ তখন তুমি কেন মানসিক সংস্কারের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাকবে—মানে, সম্ভব-অসম্ভবের মন-গড়া আগে-থাকতে-গ'ড়ে-ওঠা ধারণার মধ্যে বাঁধা পড়বে কী দুঃখে? হয়েছে কি, মানুষ তার লৌকিক চেতনার স্তরে অবস্থিত থেকেও তার চেয়ে ঊর্ধ্ব-তর চেতনার সম্বন্ধে রায় দিতে পারে এই চলতি ধারণাটি ভ্রান্ত। ঊর্ধ্বতর চেতনায় উঠতে হ'লে মনকে আগেভাগে যথাসম্ভব নিস্পৃহ করা দরকার—তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে যদি তুমি তাই করতে পারো। আসলে চাই চেতনার বিকাশ যাতে ক'রে ঊর্ধ্বতর সত্য আমাদের উপলব্ধির পরিধির মধ্যে আসে। তুমি যদি এইটুকু করতে পারো, যদি তোমার চৈত্যপুরুষ Psychic Being-কে দিশারি করতে শেখো তাহ'লে তুমি যথাকালে সেই উন্মুক্তির কাছে পৌঁছবে যা তুমি চাইছ—যেখানে মন তার আধ-আলো-আধ-ছায়া চেতনা নিয়ে তোমার দৃষ্টিকে ব্যাহত করতে পারবে না, কেননা তখন একটা উপরের আলো—" তিনি হাত দিয়ে মাথার উপরে নির্দেশ করলেন—"নেমে তার স্থান অধিকার করবে। তখন মনের উপরের স্তরগুলি থেকে অধিমানস ও অতিমানস পর্যন্ত (Overmind and Supermind) আলোকের প্রপাত হবে। এইই আমার যোগ, জানোই তো।"

মনমরা ভাবে সায় দিয়ে বললাম: "জানি বৈ কি। আর এটুকু বুঝতেও আমি বেগ পাই নে যে, এবিষয়ে মনের নিস্পৃহতা খুবই কাজে আসতে পারে যদি সে-অবস্থা কোনোমতে একবার লাভ করা যায়। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, আমার মন একরোখা—চায় না তার সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে আমাকে বাধিত করতে। তাছাড়া তা—মুস্কিলটা কমে না যখন আমার মনে দ্বিধা জাগে—প্রশ্ন আসে যে আমাদের সংশয়গ্রন্থি ভোগায় কি একেবারেই অকারণ—কোনো উদ্দেশ্যই কি তাতে ক'রে সিদ্ধ হয় না? একটি কবিতা এ-ই'র আমার এত ভালো লাগে:

> শুধু আলোকেরি চিরদাস রবে তারা
> জানে নি যাহারা জীবনে অন্ধকার,
> তমসা তিমির মাঝে পায় নাই যারা
> বেছে নিতে নিজ ধ্বংসেরো অধিকার।

They are but the slaves of light
Who have never known the gloom
And between the dark and bright
Willed in freedom their own doom.

এ-প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব যা যা বলেছিলেন আমার ভালো মনে না থাকার দরুণ আমি তাঁর শরণাপন্ন হই ফের। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি কথা তাঁকে লিখি পরদিন। তার মধ্যে আমি উদ্ধৃত করি তাঁর Life-Divine থেকে একটি অপূর্ব গভীর দর্শন। তার ভাবানুবাদ দিচ্ছি এখানেঃ

বিনা ব্যথা-উপলব্ধি পরমানন্দের অন্তহারা
মহিমার মর্ম কে জেনেছে—যে-আনন্দ চিরধারা
ব্যথার দুলাল? জ্ঞান জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যমণি ঃ
অজ্ঞান-উপান্তে তারি কাঁপে আধ আলোছায়া ধ্বনি।
ভ্রান্তি কারে বলে? সে যে পুরোহিত সত্যসাধনার ঃ
আসন্ন যে-আবির্ভাব—তারি প্রত্যূষের অঙ্গীকার।
ক্লৈব্যে পরাজয়ে জাগে আদিমন্ত্র অতলশক্তির
গূঢ় ওঙ্কারের ঃ চির-অগ্রদূত সে—পরিণতির।
বিচ্ছেদ নিয়ত সাধে লাবণ্যের বিচিত্র উচ্ছ্বাসে
উল্লাসের উলুধ্বনি—মিলনের সম্ভোগবিলাসে।"*

উত্তরে গুরুদেব স্বহস্তে লিখে পাঠানঃ "প্রাণের সব কামনা বাসনাই দুঃখ আনতে বাধ্য। যে-অজ্ঞানের মধ্যে আমাদের বাস—সেই অজ্ঞানেরি ফল দুঃখ বেদনা। মানুষ নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই বর্ধমান হ'তে পারে—কি দুঃখ বেদনা কি তাদের উল্টোপিঠ—সুখ, হর্ষ, পুলক। ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারলে সব কিছু থেকেই বললাভ করা যায়। দুঃখবেদনায়ও অনেকে উল্লসিত হন যখন তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে আপ্রাণ চেষ্টা, কি দুঃখসাহসিকতার উদ্যম। কিন্তু এর কারণ হ'ল চেষ্টার ভিতরকার উত্তেজনা বা প্রাণস্ফূর্তি—ঠিক যন্ত্রণার জন্যে যন্ত্রণা তাঁরাও চান না। কিন্তু প্রাণশক্তির মধ্যে এমন কিছু আছে যে সমগ্র জীবন থেকেই আনন্দ আহরণ ক'রে থাকে—কি আলোয়, কি অন্ধকারে।

* The Life Divine, Vol II p. 170 "Without experience of pain we would not get all the infinite value the divine delight of which pain is in travail ;

প্রাণের মধ্যে একটা দুর্মতিও আছে যে নিজের যন্ত্রণা বা কারুণ্যেও এক ধরণের নাটুকে সুখ পায়—এমন কি নিজের রোগ বা অধঃপতনেও। আর সংশয় সম্বন্ধে এই কথা বলব যে নিছক সংশয়ে বিশেষ কোনো লাভ আছে ব'লে আমার মনে হয় না। মানস প্রশ্নে লাভ হ'তে পারে যদি জিজ্ঞাসা প্রযুক্ত হয় সত্যের অভিসারে। কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয় শুধু সংশয় প্রকাশ করার জন্যে, কি প্রতিবাদ করতে, তখন তাথেকে লাভ হয় শুধু ভ্রান্তি কিম্বা একটা স্থায়ী দ্বিধা—মানে, যদি প্রতিবাদটা হয় আত্মিক সত্যের বিপক্ষে। আলো এলে যদি আমি সমস্তক্ষণই তাকে জেরা করি, কি যে-সত্যকে সে ডাক দিল তাকে দিই ফিরিয়ে তাহ'লে সে-আলো আমার মধ্যে না পারে স্থায়ী হ'তে, না থিতিয়ে যেতে। কাজেই যখন সে দেখে যে সে অস্বাগত, পায় না মনের মধ্যে কোনো ভিত্তি—তখন সে ফিরে যায়। আলোর মুখের এগিয়ে চলতে হবে, ক্রমাগত পিছু হ'টে অন্ধকারের মধ্যে ঠাঁই চাইলে, কি তাকে আলো ব'লে বরণ করলে হবে না। দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে যে-সার্থকতাই মিলুক না কেন সে পড়ে অজ্ঞানের কোঠায়। সত্যিকার সার্থকতা নিহিত—দিব্য আনন্দে, দিব্য সত্যে ও সে-সত্যের নৈশ্চিত্যের মধ্যে। আর যোগীর সাধনা এই সবেরি জন্যে। এই আপ্রাণ চেষ্টায় তাকে সংশয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হ'তে পারে সাধ ক'রে কি রোখ ক'রে নয়—এই জন্যে যে, তার জ্ঞান এখনো নিখুঁৎ হয় নি।"

* * *

এরপরে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মানসিক বিকাশ কখনো কখনো আন্তর বিবর্তনের (psychic evolution) পরিপন্থী হ'য়ে দাঁড়াতে পারে কি না।

গুরুদেব বললেন: "খুব পারে আর প্রায়ই পেরে থাকে, বিশেষত যদি সাধকের মূল মনো-ভঙ্গিটি হয় বিপরীত (if the attitude is wrong); অর্থাৎ যদি সে ধ'রে বসে থাকে যে তার মনই হ'ল তার ব্যক্তিরূপের চরম পরিণতি। কারণ, যে-উর্ধ্বলোক ক্রম-বিকাশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে আসে সে অপেক্ষা রাখে আমাদের সহযোগের। সুতরাং যদি মন তার অগভীর মানসিক ধারণা নিয়ে অহঙ্কার ক'রে এ-আলো-কে ঠাঁই ছেড়ে না দেয় তাহ'লে সে ঢুকবে কী ক'রে? সেই জন্যে আমি তোমাকে বারবারই বলেছি যে, আমাদের অন্তর্জগতে সত্যিকার জ্ঞানের আলো নামতে আরম্ভ করে শুধু তখন থেকে যখন আমরা টের পাই আমরা কী অজ্ঞান। কারণ যতদিন আমরা মনের কোঠা পেরুতে না চাই ততদিন চেতনার উচ্চতর বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে আমাদের

ধারণা আবছাই থেকে যাবে। কী রকম আবছা ও অজ্ঞান—একটা উদাহরণ দিই। যারা মনোজগতের বাসিন্দা ও সেখানে বাস ক'রেই খুশী তারা প্রায়ই নিজেদেরকে অন্নময় প্রাণময় বা মনোময় জীব ব'লেই গর্ব ক'রে চলে—আত্মা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ আত্মাকে তারা অনুভব করে না—কি বড় জোর অনুভব করে সেই আশা-স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত ক'রে যে বলে আত্মা হ'ল তারি নাম যে দেহপাতের পরেও অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এর বেশি কিছু তারা স্বীকার করতে নারাজ শুধু এই জন্যে যে, আত্মা-যে মন থেকে পৃথক এ তারা আদৌ উপলব্ধিই করে নি। কাজেই এরা নিজেদেরকে সনাক্ত করে তাদের মনোময় পুরুষের সঙ্গে, বলে—আত্মা কল্পনা, বলে—কই আমরা তো কেউ আত্মাকে মন থেকে আলাদা ক'রে অনুভব করি নি! আর এই ধরণের মতি ততদিন কায়েমি হ'য়ে থাকে—যতদিন আমাদের চৈত্যপুরুষ psychic being গুণ্ঠিত হ'য়ে পিছনে অবস্থান করে।"

শুনতে শুনতে আমার মনটা কেমন যেন পুলকিত হ'য়ে উঠল, বললাম: "এ আমার জানা আছে—বটেই তো। আপনি আপনার নানা চিঠিতে নানা লেখায়ই বলেছেন যে আমাদের চৈত্যপুরুষ আমাদের সত্তার গভীরে ততদিন পর্যন্ত আড়াল থেকেই কাজ করে যতদিন না আমরা ক্রমবিকাশের পথে খানিকটা এগিয়ে আসি। একথা বিশদ ক'রেই আপনি লিখেছেন আপনার 'লাইফ ডিভাইন'-এ।"

গুরুদেব মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বললেন: "আর যতদিন এই বিকাশ আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ না হ'য়ে ওঠে ততদিন পর্যন্ত আমাদের চৈত্যপুরুষকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয় শুধু আমাদের ব্যক্তিরূপকে বিকশিত ক'রে তোলার সহায় হ'য়ে—যতদিন না সে আত্মসাৎ করতে পারে সেই সব উপলব্ধিকে আত্মা যাদের আহরণ করে তার তনু মন প্রাণরূপী যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। এই প্রাক্-স্ফুরণের অবস্থায় মন খুব বেশি সহায়তা করতে পারে যদি সে রাজি হয় নমনীয় (plastic) থাকতে: কি না, আত্মার বাহন—অধিরাজ নয়, অন্যভাষায় তার সংকীর্ণ মানস বিচারাসন থেকে সত্যাসত্য সম্বন্ধে রায় দিতে না ছুটে। বুঝলে?"

উৎসাহ ফের দপ্‌ ক'রে নিভে গেল, ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললাম: "বুঝি তো সবই। সে-অনুসারে চলতে পারলে তবে তো! হয়েছে কি, মনকে সহায় পেলে অনেক কিছুর সুরাহা হয় এ তো আর কারুর বুঝতে বাকি নেই,

কিন্তু ফ্যাসাদ হ'ল এই যে মনঠাকুর বাগই মানতে চান না—নমনীয় হবেন কোত্থেকে? আপনি আমাকে এই বিষয়ে কিছু নির্দেশ দিতে পারেন —অর্থাৎ কী ক'রে এ-অসাধ্যসাধন করা যায়?"

গুরুদেব হাসলেন: "কিন্তু নির্দেশ তো আমি দিয়েছি—আর সে কি একবার? তোমাকে কত চিঠিতেই তো বলেছি তোমার আন্তর সত্তার সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে, অন্তর্মুখী জীবন যাপন করতে, তোমার নিজের ক্ষেত্রে কবিতা ও গানের চর্চা করতে—কেন না এরা তোমার ভক্তির সহায় ব'লে পারে তোমাকে ঠিক প্রকৃতিস্থ রাখার সহায়তা করতে। আমি তোমাকে বলেছি—যা তুমি নিজেও জানো—যে, আন্তর পথের পথচারী হওয়া, সুগম আনন্দের পথে চলা (the sunlit path) কতখানি সহজ হ'য়ে আসে যদি আমাদের মূল মনোভঙ্গিটি যথাসীন থাকে, কেন না তাহ'লে আমাদের চৈত্যপুরুষ পারে সহজে সাম্‌নে এগিয়ে আসতে। এ-ও আমি তোমাকে বলেছি যে, তোমার চৈত্যপুরুষ যতই প্রকট হবে ততই সুসাধ্য হ'য়ে আসবে মানবিক স্বভাবকে তার দিব্য আদর্শে রূপান্তরিত করা। তাই তো তোমাকে আমি অগুন্তিবার বলেছি এই ভক্তি-সেবা-কর্ম-পথের পথিক হ'তে কেন না তোমার স্বভাবের পক্ষে এপথের পথিক হওয়াই সবচেয়ে সহজে।"

আমি বিমর্ষ হ'য়ে বললাম: "এসব বুদ্ধি দিয়ে তো বেশ বুঝতে পারি —কিন্তু—মানে আমিও আপনাকে বলেছি অগুন্তিবার যে, এই সহজিয়া পথে চলা আমার কাছে একটুও সহজ মনে হয় না। আমার মন প্রাণের স্বেচ্ছাভিমান এসে যেই ঢুঁ মারে অমনি সব যায় ভেস্তে—আর আমি পড়ি অথই জলে, দেখি সব কিছুই ভুল দৃষ্টিতে।"

"ঠিক উল্টো", বললেন গুরুদেব, "কারণ আমি দেখেছি যে তুমি যখনই তোমার আন্তর স্বভাবে থাক—অর্থাৎ যখনই তোমার ভক্তি বা প্রাণের উচ্চতর বৃত্তিগুলি স্বস্থানে থাকে, তখনই তুমি প্রায় যেন যন্ত্রের মতন সব কিছু দেখ নির্ভুল দৃষ্টিতে। কারণ আমি দেখি যে, সে-সময়ে তোমার মনের দৃষ্টি খুলে যায় তোমার বিচারবুদ্ধি হ'য়ে ওঠে আশ্চর্য স্বচ্ছ যথার্থদর্শী—এমনকি সময়ে সময়ে দীপ্যমান্‌ই বলব।"

নিজেকে চাবুক মারায় আনন্দ আছে বৈ কি, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ মেলে যদি শ্রদ্ধেয় কেউ প্রতিবাদ করেন যে চাবুক মেরে অবিচার হচ্ছে। কিন্তু আমি আত্মপ্রসাদকে দাবিয়ে রেখে নিরীহভঙ্গিতে

বললাম: "আপনি বলেন কী? আমি? আমিও হ'তে পারি নির্ভুলদর্শী? এ-ও কি একটা কথা হল?"

"সব সময়ে ও সববিষয়ে যে পারো তা বলতে চাই নি আমি। আমার বলবার উদ্দেশ্য—যখনই তুমি তোমার স্বাভাবিক ভক্তির অবস্থায় থাকো তখনই তুমি এই ভাবে সাড়া দিয়ে থাকো—সহজেই—অর্থাৎ যখনই তোমার মন চলে তোমার আন্তর প্রভাবের নির্দেশে কি প্রাণ-শক্তি হ'য়ে ওঠে উচ্ছল। তোমার কবিতায় গানে এই উচ্ছলতা অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে ওঠে। তাই তো আমি তোমাকে গান গাইতে কি কবিতা লিখতে এত উৎসাহ দেই।"

এবার আমি সত্যিই ঈষৎ আশ্বস্ত হ'য়ে উঠলাম, বললাম: "তা আপনি দেন—মানছি। কিছুদিন আগেও আপনি আমাকে লিখেছেন যে খুব বিষণ্ণ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে গেলেও যে-ই আমি কলম ধরি সে-ই আমার চৈত্যপুরুষ এসে হাজিরি দেয় ও তার নিজের কথা ব'লে চলে অনর্গল। এজন্যে আমি অবশ্য আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ—কিন্তু—তবু—"

"মা ভৈঃ।"

"মানে, আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এতে ক'রে সমস্যার সমাধান হয় কই?"

"সমস্যা? যথা?" গুরুদেবের মুখে কৌতুকের হাসি।

"যথা?" ভারি বিপন্ন বোধ করলাম। "যথা কি? বাঃ, আমি যে—মানে ঐ আন্তর স্বভাবে তিষ্ঠুতে পারি না। কেন এমন হয়?"

"এর উত্তর দিতে আমাকে বেগ পেতে হবে না। পারো না শুধু এই জন্যে যে তোমার প্রাণশক্তি হ'য়ে ওঠে অশান্ত—অধৈর্যবশে, আর অমনি তোমার মন ওঠে উজিয়ে—প্রশ্নের পর প্রশ্ন দাঁড় করায় সারবন্দী ক'রে— আমি বলি নি কি একথা বারবারই?"

"তা তো বলেছেন। কিন্তু এর প্রতিষেধের কথা বললেন কই? আপনি কেন দেখেও দেখতে চাইছেন না বলুন দেখি যে, আমি শান্তি পাচ্ছি না একটুও? যদি পেতাম আমার পক্ষে আন্তর স্বভাবে থাকা কত বেশি সহজ হ'য়ে উঠত—বুঝছেন না?"

গুরুদেব কৌতুক বোধ করলেন, হেসে বললেন: "বুঝছি না কে বললে? তুমিই তো দেখেও দেখতে চাইছ না যে তুমি তোমার চৈত্যপুরুষকে যদি দাও ভিশমিশ ক'রে আর তার জায়গায় ডেকে এনে বসাও তোমার প্রাণপুরুষকে

তাহ'লে শান্তি তুমি পেতে পারো না? পারো না—কারণ প্রাণশক্তি শুধু তার নিজের শক্তিতে পারে না শান্তিকে ডাক দিতে শান্তি তার স্বধর্ম নয় ব'লে।"

"মনে প'ড়ে গেল—আপনি একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন—আমাদের প্রাণপুরুষ খুব শিষ্ট বাহন কিন্তু দুষ্ট মনিব।"

"আর তার কারণও আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম: অর্থাৎ যোগশক্তি আমাদের স্বভাবের সেই সব জায়গায় চাপ দেয় যেখানে অস্বচ্ছ ও অশুদ্ধ সব কিছু বেশ গদিয়ান হ'য়ে বিরাজ করে। প্রাণপুরুষ এ-চাপে বড়ই ব্যথিত হ'য়ে ওঠে তার কারণ: এক সে অন্ধকার নিয়েই ঘর করে ব'লে বোধ তার ঝাপসা; দুই, তার মধ্যে এমন অনেক অংশ আছে যারা চায় তাদের স্থূল তমসাচ্ছন্ন মতিগতির মধ্যেই বিহার করতে—কাজেই তারা আলো দেখলেই তড়পে ওঠে—নিজেদের ঘাঁটি ছাড়তে বা প্রকৃতিকে বদলাতে চায় না ব'লে।"

ধমক খেয়ে স্বর একটু নামিয়ে নিয়ে শুধালাম: "আর মনপুরুষ? তিনি কি শান্তি পেতে পারেন? না, না?"

গুরুদেব চিন্তাবিষ্ট স্বরে বললেন: "মন? হ্যাঁ সে এক ধরণের নিষ্প্রভ শান্তি পেতে পারে—নিজেকে তুতিয়ে পাতিয়ে বশে আনলে (through a quietend mind); কিন্তু সে-শান্তিরো উৎস হ'ল ঐ পিছনের চৈত্যপুরুষ। খতিয়ে সব সত্যিকারে শান্তির ভরই ঐখানে। কি নির্ভরের আরাম, কি সহজ বোধ, কি স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ সবই তার কাছে যেন স্বভাবসিদ্ধ যেমন বিশ্বাস প্রেমের কাছে। কাজেই তুমি ওকে বাদ দিয়ে পার পাবে কেমন ক'রে? এমন কি শান্তি চাইলেও ওর কাছেই দিতে হবে ধর্ণা। তাই তো আমি তোমাকে পই পই করে মানা করি অধীর হ'য়ে গভীর নিরাশার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে। এমন কি অথই জলে প'ড়ে তা থেকে উঠতে চাইলেও তোমাকে শরণাপন্ন হ'তে হবে ভক্তিবিশ্বাসেরি খেয়ার কাছে. বুঝলে?

"কিন্তু ধরুণ জ্ঞানমার্গীরা যে-ভাবে মনকে বশে আনেন সেভাবে যদি চলি?"

"তারও বিহিত পদ্ধতি আছে—কিন্তু সে-পদ্ধতি—তাদেরই কাজে আসে এই পথে চলাই যাদের স্বভাবসিদ্ধ। যেমন ধরো বিবেকানন্দের পদ্ধতি—জানো তো?"

"পড়েছি—তাঁর 'রাজযোগ'।"

(স্বামীজি যা লিখেছিলেন রাজযোগে তা এই: "প্রথম পাঠ হ'ল চুপ ক'রে ব'সে থাকো মনকে ছেড়ে দাও ছুটোছুটি করতে। ও তো সমস্তক্ষণই

টগবগ ক'রে ফুটছে। যেন বাঁদর—লাফালাফি করতেই আছে। করুক না যত পারে। তুমি শুধু চুপটি ক'রে ব'সে দেখ না কাণ্ডটা…যতদিন না হদিশ পাও কতদূর ওর দৌড় ততদিন ওকে বাগ মানানোর আশা দুরাশা। তাই দাও ওকে রাশ ছেড়ে…কিছুদিন এইভাবে চললে দেখবে যে ও ক্রমশ শান্ত হ'য়ে আসছে—আরো—আরো—আরো—যতদিন না পুরোপুরি বশে আসে। কেবল মনে রেখো যে, এ দারুণ মামলা—দু'চারদিনের সাধনা নয়। বহু বৎসর ধ'রে নিরন্তর চেষ্টার ফলে তবে আসে এপথে সিদ্ধি ”)

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের ভাষায় এ-পদ্ধতির ব্যাখ্যা ক'রে বললেন: “আরো পথ আছে যেমন ধরো যে-পথের কথা আমাকে লেলে বলেছিলেন। 'মনকে শান্ত করো'—বলেছিলেন তিনি—'চিন্তার দিকে একদম ঝুঁকো না (don't think actively); তাহ'লে ক্রমশ দেখতে পাবে যে, যে-সব চিন্তাকে তুমি তোমার নিজের ব'লে মনে ক'রে এসেছ সেসব আসে বাইরে থেকে। যেই তাদের আসতে দেখবে করো নিষ্কাশিত—তাহ'লেই দেখবে তোমার মন ক্রমশ থিতিয়ে একেবারে নিস্তব্ধ হ'য়ে যাবে।' এ-ধরণের কথা আমি কস্মিনকালেও শুনি নি। কিন্তু আমি একে প্রথম থেকেই অসম্ভব ব'লে উড়িয়ে দিই নি, কিম্বা এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হই নি। তিনি যা বলেছিলেন আমি অকুণ্ঠে মেনে নিয়েই আমার মনকে নিরুদ্যম করেছিলাম—কেবল দেখতে কী সব চিন্তা আসছে আর কোত্থেকে। আর দেখতে পেলাম সে এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার: দেখলাম মন আমার নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে আর এক এক ক'রে সত্যিই চিন্তারা আসছে বাইরে থেকে! আর যেই তারা এসে পৌঁছয় আমার মনের চৌহদ্দির কাছে; অমনি আমি তাদের বলি—আসতে না-আজ্ঞা হোক। এইভাবে ঠিক তিন দিনে আমি সব রকম চিন্তা থেকে পেলাম অব্যাহতি—সঙ্গে সঙ্গে আমার মন হ'য়ে পড়ল বিশ্বভৌম ও মুক্ত, যেসব চিন্তা ঢুকতে চাইছে আমি রইলাম না আর তাদের হাতের খেলার পুতুল, হ'য়ে উঠলাম তাদের নিয়ন্তা—কেন না আমি তখন বাছাই করতে শিখেছি—যাদের ঠাঁই দিতে চাইতাম তাদের দিতাম আসতে, যাদের চাইতাম না তাদের দিতাম না ঢুকতে।”

“একথা আমার বেশ মনে আছে, কারণ আপনি আমাকে এসবই লিখেছিলেন, আর তখন আমার খুব অবাক লেগেছিল ভাবতে যে, আপনার গুরু আপনাকে এমন উদ্ভট কথা বলা সত্ত্বেও কেমন ক'রে ষোলো আনাই অকুণ্ঠ মেনে নিতে পারলেন!”

গুরুদেব হাসলেন: "হ্যাঁ। এটা যে অনেকেরই কাছেই সুসাধ্য নয় আমার জানা আছে।"

তাঁর নিশানা যে কে বুঝতে আমার বাকি রইল না। আমি টপ্ ক'রে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করলাম: "আচ্ছা, যদি ধরুন আমি এই ভাবে আমার মনকে বাগ মানাতে যাই—কেমন হয়?

কথাটা ব'লেই আমি ডরিয়ে উঠলাম: যদি গুরুদেব বলেন: "বেশ হয়!"

কিন্তু তিনি নিশ্চয় আমার মনোভাব টের পেয়েছিলেন, কারণ তিনি খুব হাসলেন,* তারপর বললেন: "কিন্তু তুমি সেই আয়ারের ঢঙে বাগ মানাতে যাও যদি?" ব'লে আবার এক গাল হেসে: "সে এক কাণ্ড! আয়ার আমাকে জিজ্ঞাসা করল: মন স্থির করা যায় কী ক'রে? আমার নির্দেশ ম'ত একটু চেষ্টা করতে না করতে তার সিদ্ধি—ভাগ্য বলে আর কাকে? কিন্তু কী হ'ল তার পর শুনবে? এল সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আমার কাছে। বলে কি: 'কী সর্বনাশ! আমার মাথা একেবারে ফাঁকা—আমি ভাবতে ভুলে যাচ্ছি। হা ভগবান! আমি কি জড়ভরত হ'য়ে পড়লাম?" ব'লে গুরুদেব ফের হেসে উঠলেন। "কিন্তু একটা কথা সে সমঝে দেখে নি: যে, কেউ তা 'হ'তে' পারে না যা সে 'হ'য়ে আছে' প্রথম থেকেই (little did he realise that one could not very well become what one already was) যাই হোক সে-সময়ে আমার মধ্যে তিতিক্ষা বেশি ছিল না—কাজেই আমি তাকে কিছু না ব'লে বিদায় দিলাম—সে হারালো তার বহুভাগ্যে দৈবাৎ-পাওয়া নৈঃশব্দ্য।"

ব'লে ফের শিশুর মতন সে কী হাসি! আমিও যোগ দিলাম সে অপরূপ হাসিতে।

* আমি আমার রিপোর্টে লিখেছিলাম: "তিনি এমন হাসলেন যে তাঁর সারা শরীর কাঁপতে লাগল।" গুরুদেব এ-বর্ণনা কেটে দিয়ে লিখলেন পাতার কিনারায়: "এ চলবেনা। এর নাম অতিবর্ণন—আহ্লাদে আট খানা। ফল্‌স্টাফের কথা মনে পড়ে গেল। আমার প্রফুল্লতার সঙ্গে এর গোড়ায়ই গরমিল। এভাবে হাসতাম আমি—সে কবে—এতক্ষণ ধ'রে বা এমন উদ্দাম ভাবে। এ বর্ণনা সত্য হ'তে হ'লে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে S. D. I. সাল অবধি (Year I, Supramental Descent) আর "rollicking!" এবিশেষণ আমার মাতামহের (৺রাজনারায়ণ বসু) সম্বন্ধে প্রযোজ্য হ'তে পারে, তাঁর অনুদ্দাম দৌহিত্রের সম্বন্ধে খাটে না। ("The epithet applied to my grandfather but not to his less explosive grandson").

হাসি থামলে গুরুদেব বললেন: "কিন্তু তোমার বেলায় এসব পথের দিকে না ঝুঁকে ভক্তি-মার্গী হওয়াই ভাল—যা আমি তোমাকে বলেছি ইতিপূর্বে।"

আমি বললাম: "আমি চেষ্টা তো কম করিনি সে-পথে—সঙ্গীত বলুন, কবিতা বলুন সবই তো ক'রে দেখলাম। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই—আর সে-মুস্কিলের আশান হবার তো কোন লক্ষণও দেখছি নে—যে, এসব কাজের মধ্যে দিয়ে আমার মন যেন ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছে না আর—যেকথা আমি আপনাকে বারবারই লিখে জানিয়েছি। আর যত চেষ্টাই করি না কেন, আমার কেন জানি না কেবলই মনে হয় যে খতিয়ে এসব মিথ্যে কাজ—মায়ার খেলা—অর্থাৎ এমন খেলা যা আমাদের খেলতে না চাইলেও খেলতে হয় ও ভালো না লাগলেও অন্তত ভঙ্গি করতে হয় ভালো লাগার।"

"জানি", ব'লে গুরুদেব একটু ভাবলেন, তারপর চিন্তিত মুখে বললেন: "এ হ'ল সেই মামুলি বৈরাগ্য যা তোমার স্বভাবের মধ্যে শিকড় গেথেছে।" ব'লে তিনি আমার দিকে খানিক একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন: "আমার নিজের মত যদি শুনতে চাও তবে বলব যে আমি বৈরাগ্যের খুব পক্ষপাতী নই—যেকথা তুমি জানো।* আমি বরাবরই গীতার 'সমতা'র অনুমোদন ক'রে এসেছি—অর্থাৎ অনাসক্তি।"

"জানি। কিন্তু আমার বিপদ আসক্তি থেকে আসবে ব'লে তো মনে হয় না—বিশেষ যখন আমি কাব্য কি সঙ্গীতেও আর তেমন রস পাচ্ছি না—যদিও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি লিখতে বসতে-না-বসতে আসে নতুন নতুন কবিতা। গান গাইতে শুরু করতে না করতে আসে নতুন নতুন সুর—চেষ্টা করতে হয় না।"

"ঐ হ'ল তোমার চৈত্যপুরুষের কাজ—যে তোমার কবিতা বা গানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে জানান দেয়—বলছিলাম না?"

আমি করুণ কণ্ঠে বললাম: "বলছিলেন তো! কেবল মুস্কিল এই যে, প্রাণান্ত পর্যন্ত কেউ পারে না—না-থেমে কবিতা লিখে বা গান গেয়ে চলতে—বিশেষ যখন ভগবানকে এত দূরে মনে হয় যে সময়ে সময়ে ভাবনাই হয় তিনি বাস্তব তো? কিন্তু আরো এক ফ্যাসাদে পড়েছি এই কারণে যে, বাইরের পাঁচজনে অনেকেই দেখি ঠাউরে ব'সে আছেন যে, আমি আনন্দ বিশ্বাস বলিষ্ঠতার

* বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমাকে-লেখা শ্রীঅরবিন্দের তিনটি চিঠি দ্রষ্টব্য—আশ্রম থেকে সদ্য প্রকাশিত Letters of Sri Aurobindo পুস্তকে—Vol II (pp. 392—395)

একটি দীপ্ত বিগ্রহ—যেখানে আসলে আমি হচ্ছি বিষণ্ণ, দুর্বল ও একলা। এর ব্যাখ্যা কী ?”

“খুব সোজা। তারা তোমার ভিতরের মানুষটার দেখা পেয়ে বলে একথা। তার মধ্যে ঐসব গুণ বিদ্যমান রয়েছে যে। তোমার বাইরের মানুষটাই পড়েছে গোলমালে কেন না সেই এনেছে আড়াল যার বলে তোমার নিজের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না তোমার সেই অন্তর্লোকের স্বরূপকে।”

আমার মনে পড়ে গেল ১৯৩৬ সালের একটি ঘটনা, খানিকটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বলব। আমি সে-সময়ে খুব সংশয়ে কষ্ট পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যোগ বড় কঠিন, হয়ত পেরে উঠব না শেষ পর্যন্ত। সন্ধ্যার দিকে আমি প্রায়ই একা একা বেড়াই সমুদ্রের ধারে। সেদিন হঠাৎ দেখা এক মহারানীর সঙ্গে। তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে আমাকে ডাকতেন। মহারাজা ও রাজ-কুমারীরাও আমার গান ভালোবাসতেন, আর গানের সূত্রে ঘনিষ্ঠতাও হয় সহজেই। মহারানী ছিলেন পাগল হরনাথের শিষ্যা—খুব ভক্তিমতী। আমরা পিয়ারে ব'সে গল্পালাপ করছি। কথা উঠল যোগে বিশ্বাসের স্থান নিয়ে। আলোচনা সুরু হতে না হ'তে আমি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলাম, মুখে আমার খই ফুটতে লাগল—ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা ক'রেই চলি এ-ও-তা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নানা সুন্দর সুন্দর ভাষ্য। বললাম তিনি বলেন : বিশ্বাস যেন সেই আলো যা আকাশে ফুটে ওঠে সূর্য ওঠারো আগে। বলতে বলতে কোথায় বা আমার সংশয়—আর কোথায় বা বিষাদ! ঐ ওদিকে মহারানীও এমনি মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন যে দেখি তাঁর চোখে জল। খানিক বাদে যখন একা বাড়ি ফিরছি--হঠাৎ মনের মধ্যে শিউরে উঠলাম : এ আমি করলাম কী ? মনে আমার সংশয় তুলছে তুফান আর আমি উজিয়ে উঠলাম কি না বিশ্বাসের মহিমা কীর্তনে! তবে কি আমি অভিনয় করলাম মহারানীকে কাছে পেয়ে তাঁর কাছে নিজের গুণপনা জাহির করবার জন্যে ? দেখতে দেখতে ধিক্কারে আমার সমস্ত অন্তর কালো হ'য়ে গেল—নিজের চোখে আমি যেন ছোট হ'য়ে গেলাম, অথচ—আশ্চর্য! যতক্ষণ বিশ্বাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলাম কই একবারও তো আমার এ-সন্দেহ হয় নি যে আমি ভণ্ডামি ক'রে চলেছি! বাড়ি ফিরেই অনুতপ্ত হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দকে জানালাম আমার এই স্খলনের কথা, আত্মধিক্কারের কথা, অভিনয়ের কথা…

তিনি উত্তরে লিখলেন (খুব সম্ভব লিখবার সময়ে তাঁর মুখে ঈষৎহাস্যের ঝিলিক খেলে গিয়েছিল) :

"মহারানীর সঙ্গে তোমার কথাবার্তার কাহিনী পড়লাম। এ-অভিজ্ঞতা সবারই হয়। হয়েছিল কি, তোমার চেতনার সেই অংশটা উপরে এসে পরিস্ফুট হয়েছিল যার মধ্যে শুধু যে এ-বিশ্বাস ছিল তাই নয়—যে জানে এসবই সত্যি। তোমার মধ্যে যে-অংশটা অবসাদে আচ্ছন্ন সে তখনকার মতন পিছিয়ে পড়েছিল কিম্বা তলিয়ে গিয়েছিল—যাই বলো। অনেকেই জানেনা মানবচরিত্রের এই বহুভঙ্গিম বিচিত্রতার কথা—তাই তারা একে নাম দেয় কপটতা—নিজেদের বা অপরের মধ্যে (**People do not know this multitudinousness in human personality, so they call it insincerity in themselves or others**) কিন্তু এ আদৌ সত্য নয়। আমাদের মধ্যে অনেক কিছু বিশ্বাস বা অনুভব বিদ্যমান যাদেরকে আমাদের স্বভাব খুব শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকে—নিরাশার ঝড়ঝাপটা তাদের হয়ত সময়ে সময়ে ঢেকে ফেলে কিন্তু মুছে ফেলতে পারে না।"

এসব মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা চোখের ঠুলি খুলে গেল আমার। আমি দেখতে পেলাম অনেক কিছু যা এমন পরিষ্কার করে বোধহয় কখনও দেখিনি এর আগে। আর তখন যেন বুঝবার কিনারায় এলাম—গুরুদেব বারবার কেন আমাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করতেন আমার এই আন্তর প্রকৃতির কথা, চৈত্যপুরুষের কথা—যাকে তিনি তাঁর যোগশক্তি তথা করুণা-শক্তি দিয়ে ক্রমাগত চেষ্টা ক'রে এসেছেন উস্কে দিতে—বিকশিত ক'রে তুলতে। আমার মন হঠাৎ ছেয়ে গেল গভীর কৃতজ্ঞতায়—সেই সঙ্গে একটু লজ্জাও এল বৈ কি। কেমন ক'রে এহেন জ্ঞানীর জ্ঞানদৃষ্টি মহাপুরুষের সত্যোপলব্ধি সম্বন্ধে আমি সংশয় পোষণ করতে পেরে-ছিলাম—এতদিন ধ'রে তাঁর চরণচ্ছায়ায় থাকা সত্ত্বেও? তাঁর নিজেরি সংজ্ঞা মনে পড়ল সত্যিকারের গুরু সম্বন্ধে: সত্যিই তো তিনি যা 'শিখিয়েছেন তার চেয়ে কত বেশি জাগিয়েছেন!' এক মুহূর্তে কেমন যেন সব ওলট পালট হ'য়ে গেল আমার মধ্যে, আমি দেখতে পেলাম যা এমন ক'রে কখনো দেখি নি: কত পেয়েছি, কত জেনেছি কত দেখতে শিখেছি—সবার উপর, যে-পথের মোড়ে মোড়ে যুগযুগান্তের অজ্ঞান-আঁধারঘাঁটি আগলে ব'সে সে-পথের প্রতি বাঁকেই তিনি চলেছেন কী অসীম ধৈর্য ধ'রে পথ দেখিয়ে—শুধু দিশারি বা সহচর-রূপে নয়—শান্ত্রী ও রক্ষাকবচ রূপেও বটে। মনে পড়ল তাঁরই একটি চিঠি যে, নিজের ব্যক্তিগত মুক্তির জন্যে নয় তাঁর সুদীর্ঘ তপস্যা—শুধু ব্যক্তিগত মুক্তি যদি তিনি চাইতেন তাহ'লে বহুপূর্বেই তিনি নির্বাণসমাধি লাভ ক'রে নিশ্চিন্ত হতে

পারতেন। তাঁর তপস্যা অবোধ মানুষেরই জন্যে—আমাদের মতন অবোধ যারা ডাক শুনেও, সাড়া দিয়েও তবু ফিরে ফিরে বিদ্রোহ করে, তাঁকে গুরু ব'লে বরণ ক'রেও তাঁর কথায় ক্রমাগত সন্দেহ করে, সর্বোপরি তাঁর কাছে আঁধার পথের এত আলোর পাথেয় পেয়েও বারবার ভুলে যায় তাঁর ঋণ, ভাবে কী-ই বা এমন পেয়েছি? কেন এমন হয়?

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে তিনি বললেন—যেন আমার মনের কথা টেনে: "যোগের পথে এমন অনেক কিছুই ঘটে যা মন ঠিক ধারণা করতে পারে না। একটা উদাহরণ দেই তোমাকে। এমনও দেখা গেছে যে গুরু শিষ্যের চেয়ে ছোট হ'য়েও শিষ্যকে এগিয়ে দিতে পারেন—এমন কি তিনি নিজে যা উপলব্ধি করেন নি তাও শিষ্যকে পাইয়ে দিতে পারেন নিজে প্রায় উপলক্ষ্যের মতন হ'য়ে।"

"ঠিক বুঝতে—"

"পারবে—একটু মন দিয়ে শুনলেই। লেলের কথাই বলি। তিনি চেয়েছিলেন সাধনায় আমার কয়েকটি উপলব্ধি হয়, কিন্তু হ'লে হবে কি, আমার হ'ল এমন এক উপলব্ধি যা তিনি ধরতেই পারলেন না। কাজেই তিনি আমার হাল ছেড়ে দিয়ে প্রস্থান করলেন। যাবার সময়ে তিনি তাঁর নিজের অন্তরে একটি আদেশ শুনলেন—আমাকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করতে। আমাকে তিনি ব'লে গেলেন—এখন থেকে তুমি তোমার আন্তর দিশারির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে তাঁরই নির্দেশ মেনে চ'লো। কিন্তু তবু আমি বলব—তিনি আমার সহায়তা করেছিলেন—যদিও ঠিক সেভাবে নয় যেভাবে তাঁর মন চেয়েছিল।'

অগত্যা বললাম: "হুঁ।" কী আর বলি?

গুরুদেব আমার দুরবস্থা দেখে ফের হেসে ফেললেন, বললেন: "আচ্ছা তাহ'লে আর একটা উদাহরণ দেই যা বুঝতে তোমাকে এতটা বেগ পেতে হবে না। শ্রীমা ও আমি তোমার 'পরে—শুধু তোমার' পরেই নয়, আরো অনেকের 'পরেই ক'রে আসছি আমাদের যোগশক্তির প্রয়োগ, বটে তো? আর

* ১৯৩২-এর মে মাসে গুরুদেব আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে লেলের সঙ্গে ধ্যানে বসতে বসতে "একের পর এক হ'ল আমার কয়েকটি প্রচণ্ড শক্তিস্পন্দিত উপলব্ধি ও সেই সঙ্গে এল চেতনার এক আমূল রূপান্তর যা তিনি মোটেই চান নি—কারণ সে অভিজ্ঞতাগুলি ছিল অদ্বৈত-বৈদান্তিক অভিজ্ঞতা···আমি বিশ্বলীলাকে দেখলাম অক্ষর ব্রহ্মের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বভৌম পটভূমিকায় শূন্য মূর্তিদের ছায়াবাজির মতন"···

তার ফলে অনেক কিছুই তো ইতিমধ্যে ঘটেছে, কেমন? তুমি এই যোগশক্তির ক্রিয়াকে চাক্ষুষ করো নি—কিন্তু তুমি বহুবার নিজের কাছেই স্বীকার করেছ যে—অনেক সময়েই তোমার মধ্যে বা আশেপাশে এমন অনেক কিছু ঘটেছে যাকে ইন্দ্রজালের খেলা (miracle) ব'লেই তোমার মনে হয়েছে। যদি তোমার সেই দৃষ্টি থাকত যে শক্তির আন্তর ক্রিয়া দেখতে পায় তাহ'লে তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই পরিষ্কার হ'য়ে যেত—সন্দেহের আর অবকাশ পর্যন্ত থাকত না। কিন্তু যেহেতু এ-দৃষ্টি তোমার ছিল না সেহেতু ব্যাপারটাকে প্রথমে ইন্দ্রজাল নাম দেওয়ার পরেও তুমি বিজ্ঞের মতন বিচার শুরু ক'রে দিলে যে ভেল্কিটা ঘটল যোগশক্তিরই বলে নয়—অন্য কোনো কারণে।"

আমি অপ্রতিভ স্বরে বললামঃ "আমি আপনার কথায় ঠিক যে অবিশ্বাস করেছিলাম তা নয়—তবে কি জানেন—কী ক'রে বোঝাই?—আমার মনে প্রশ্ন জাগত যে, আপনি শক্তি বলতে প্রত্যক্ষ বাস্তব—concrete—কিছু বুঝছেন—না আবছা জাতীয় কিছু?"

"প্রত্যক্ষ বাস্তব? কী বলতে চাইছ তুমি? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রত্যক্ষতা বাস্তবতা তার নিজস্ব। সে একটা মূর্তি নিতে পারে—যেমন একটা স্রোতের মতন—যার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায়—যাকে খুব প্রত্যক্ষ ভাবেই পাঠানো যায় যে কোনও স্থানে—প্রয়োগ করা যায় যে-কারুর উপরে। অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যে শক্তি আছে ওতপ্রোত হ'য়ে এ হ'ল একটি সত্যোক্তি সে-শক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে। কিন্তু এছাড়া এমনও হতে পারে যে কোনো—আধ্যাত্মিক মানসিক বা প্রাণিক—শক্তির প্রয়োগ করা হ'ল জগতের কোনো একটা বিশেষ স্থানে বিশেষ কোন ফল ফলাতে। যেমন অনেক অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তি আছে (কসমিক ঢেউ-জাতীয়) কি ধরো বিদ্যুতের প্রবাহঃ তেমনি আছে মনের প্রবাহ, চিন্তার প্রবাহ, আবেগের প্রবাহ—যথা রাগ, দুঃখ ইত্যাদি। এরা উধাও হ'য়ে গিয়ে উদ্দিষ্টদেরকে প্রভাবিত করতে পারে তাদের অজান্তে—কেউ কেউ হয়ত টের পায়—এ-শক্তি আসছে, কিন্তু তারা জানে না কোত্থেকে এল—কেবল অনুভব করে সে-শক্তির ফল।

যার নেপথ্য কি আন্তর অনুভূতি জেগেছে সে অনুভব করে যখন এ-সব শক্তি আসবার মুখে, কি তাকে অধিকার করতে বসেছে। ভালো বা মন্দ প্রভাব এভাবে চারিয়ে যেতে পারে দিকে দিকে। এ ঘটতে পারে স্বাভাবিক ভাবেও—কেউ ইচ্ছা না করলেও এমনটা ঘটতে দেখা যায় কিন্তু বেশ বুঝে সুঝে ভেবেচিন্তেও এ-ধরণের শক্তির প্রয়োগ সম্ভব। কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েও আধ্যাত্মিক

বা অন্য জাতের শক্তির প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া কোনো ভাবকেও সোজাসুজি প্রয়োগ করা যেতে পারে কোনো বাহ্য ক্রিয়া, কথা বা অন্য কোনো রকম মাধ্যমের সাহায্য না নিয়ে। এ-ধরণের শক্তির প্রয়োগ হয়ত ঠিক ঐভাবে প্রত্যক্ষ নয় কিন্তু তাই ব'লে এরা যে কিছু কম ফলপ্রদ তা নয়। আসলে এসব ব্যাপার না কল্পনা, না ভ্রান্ত-দর্শন, না ভণ্ডামি : এরা হ'ল বাস্তব ঘটনা।"

এসব কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ যেন এক দিব্য উদ্ভাসে দীপ্ত হ'য়ে উঠল। আমার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে এক বিস্ময়ানন্দের স্রোত শির শির ক'রে উর্ধ্বে উঠতে লাগল। মুহূর্তে কী যেন হ'য়ে গেল—আমার সমস্ত সংশয়গ্রন্থি যেন ছিন্ন হ'য়ে গেল এক কিরণ-কৃপাণের আঘাতে। অন্ধকার? কোথায়? চারদিকেই তো শুধু আলোর উচ্ছল প্রপাত—আশার ঝঙ্কার! সঙ্গে সঙ্গে রোমে রোমে জাগল শিহরণ ভাবতে যে এহেন মহামানব এহেন শক্তি ও জ্ঞানের মূর্ত প্রতিভূ আমার-সঙ্গে আলাপ করছেন, তর্ক করছেন, হাসছেন, ভাববিনিময় করছেন যেন সমানে সমানে—যেন পদবীতে আমি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু অন্তরঙ্গ। ভাগবতে কৃষ্ণের অকিঞ্চন বন্ধু, শ্রীদামের কথা মনে প'ড়ে গেল :

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥
কোথা আমি দীন মুগ্ধ পাপী—কোথা তুমি শ্রীনিবাস জন্মসিদ্ধি!
তবু আলিঙ্গন করিলে আমারে, হে ত্রিলোকপতি অপাপবিদ্ধ।

* * *

নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমিই : কেন জানিনা, প্রশ্ন ক'রে বসলাম না-ভেবেচিন্তেই :

"কিন্তু আপনি নিভৃতবাস থেকে বেরুবেন কবে?"

গুরুদেব মৃদু হাসলেন, বললেন : "জানি না।"

"জানেন না? সে কি আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

গুরুদেব হেসে উঠলেন, বললেন : "যেভাবে তোমরা জানো সেভাবে না।" ব'লে একটু থেমে : "কারণ আমি মানস স্তরে তো আসীন নই আর। মন থেকে আমি কোনো কিছু করার সঙ্কল্প করি না।"

আমি নাছোড়বান্দা, বললাম : "বুঝলাম। কিন্তু তবু একথা কী ক'রে মেনে নিই বলুন তো যে আপনার মতন দীপ্যমান্ মানুষ আর বেরুবেন না এই ছোট ঘরটি থেকে—চিরদিন থাকবেন এখানে বন্দী হ'য়ে?"

নিরুত্তাপ স্বরে তিনি বললেনঃ "তোমাকে তো বলেছি—কী করবে তা আমার আগে থেকে ঠিক করা থাকে না। তাই শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে যা যা আমাকে করতে হবে—না করলেই নয়—সেসব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যদি বেরিয়ে আসি, লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি—ইত্যাদি।"

আমি আর পীড়াপীড়ি করলাম না, আমার মনে পড়ে গেল মাত্র কিছুদিন আগে তাঁর আমাকে লেখা একটি চিঠি (৩০-৫-৪২):

"আমি এ-নিয়ম করতে বাধ্য হয়েছি (শিষ্যদেরও আর চিঠিপত্র না লেখার) নিজের পছন্দ অপছন্দের খাতিরে নয়, শুধু এই জন্যে যে, সম্প্রতি চিঠিপত্রের উত্তর দিতে দিতে আমার বেশির ভাগ সময় কেটে যাচ্ছিল—আর তাতে ক'রে আমার আসল কাজের ক্ষতি হচ্ছিল। জগতের এই সঙ্কটলগ্নে—(যখন আমার সমস্তক্ষণ সজাগ ও সংহত হ'য়ে না থাকলেই নয়—আর, এছাড়া, যখন আমার সাধনার প্রধান সিদ্ধির জন্যেও চাই একান্ত অভিনিবেশ ও অধ্যবসায়—তখন)—আমার পক্ষে সম্ভব নয় এই নিয়মকে লঙ্ঘন করা। উপরন্তু, সাধকদের সাধনার স্বার্থের দিক থেকে দেখতে গেলেও আমার এই মূল সাধনায় সিদ্ধিলাভ হওয়া দরকার—কেননা এ-সিদ্ধি হ'লে তবে আসবে সেই অনুকূল অবস্থা যখন তাদের পক্ষে সাধনার বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হবে।"

মনে পড়ল, আর একটি পত্র তিনি আমাকে লিখেছিলেন। আমি সেসময়ে প্রশ্ন করেছিলামঃ অতিমানস শক্তিকে নামিয়ে এনে মহিমান্বিত হওয়া তো সাধনার লক্ষ্য নয়—আর যখন স্বয়ং কৃষ্ণও অতিমানসের অবতরণ করাতে পারেন নি তখন আর কেউ কি পারবে? এর উত্তরে গুরুদেব লিখেছিলেন তাঁর আশ্চর্য ভাষায়ঃ "অতিমানস শক্তিকে আমি নামিয়ে আনত চাইছি নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে নয়। মানুষ যাকে ছোট বা বড় ব'লে থাকে তার জন্যে নেই আমার মাথাব্যথা। আমি চাই এক আন্তর সত্য, আলো, সুষমা ও শান্তির নীতিকে পার্থিব চেতনার রাজ্যে আবাহন করতে। তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি উপরে—আমি যে জানি সে কী বস্তু—আমার চেতনার ঊর্ধ্ব হ'তে তার জ্যোতিঃপ্রপাত হচ্ছে আমি প্রত্যক্ষ করেছি—আমি চাই যাতে ক'রে আমাদের সমগ্র সত্তাকে সে তুলে নিতে পারে তার স্বকীয় শক্তিস্বরূপের মধ্যে—অন্যথা মানুষের স্বভাব চলতে থাকবে আধ-আলো-আধ-ছায়ার সনাতন ভূমিকায়। এ-প্রত্যয়

আমার দৃঢ়মূল হয়েছে যে, এই সত্যের অবতরণ হ'লে জগতে খুলে যাবে এক দিব্য চেতনার বিকাশের পথ আর পার্থিব বিবর্তনের সেই হবে পরম নিহিতার্থ। আমার চেয়ে মহত্তর মানুষের মধ্যে যদি এই দৃষ্টি বা আদর্শ ঠাঁই না পেয়ে থাকে তাতে কী যায় আসে?—আমাকে অনুসরণ করতেই হবে আমার নিজের সত্যবোধকে, নিজের সত্যদৃষ্টিকে। কৃষ্ণও যে-সিদ্ধির চেষ্টা করেন নি সে-চেষ্টা করার জন্যে যদি মানবিক বুদ্ধি আমাকে নির্বোধ নাম দেয় তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। এখানে অমুক তমুকের কোনো প্রশ্নই ওঠে না: এ হ'ল শুধু ভগবান ও আমার মধ্যে বোঝাপড়া। প্রশ্ন হচ্ছে—এ ভাগবতী ইচ্ছা কি না প্রশ্ন হচ্ছে—আমাকে পাঠানো হয়েছে কি না সে-শক্তিকে অবতরণ করাবার জন্যে—অথবা সে-অবতরণের পথ খুলে দেবার জন্যে। এজন্যে যদি সমস্ত জগৎ আমাকে উপহাস করে করুক—এমন কি, নরকও যদি আমার স্পর্ধার জন্য আমার উপরে ভেঙে পড়ে পড়ুক—আমি চলব আমার পথে এগিয়ে যতদিন না আমি সিদ্ধিলাভ করি কিম্বা ধ্বংস হই। এই মনোভাবই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে অতিমানস-সাধনায়—আমার নিজের বা আর কারুর মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে নয়।"

এসব মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমি কেমন যেন অভিভূত হ'য়ে গেলাম। কতক্ষণ আমার এ ভাব ছিল মনে নেই। সম্বিৎ ফিরে এল তাঁর সম্ভাষণে।

গুরুদেব বললেন: "আমি তোমাকে আমার নানা চিঠিপত্রেই কিছু বুঝিয়ে বলেছি আমি কী সাধনায় নিরত। কিন্তু তুমি তাথেকে আন্দাজ ক'রে নিতে পেরে থাকবে যে, আরো অনেক বাধা আমাকে অতিক্রম করতে হচ্ছে যাদের কোনো উল্লেখই আমি করি নি।"

আমি বললাম: "আমাকে অন্তত একটা কথা খোলাখুলি বলবেন কি? আপনি আমাকে একাধিকবার লিখেছেন পার্থিব প্রকৃতির বাধার কথা। শ্রীমার কাছেও একবার শুনেছিলাম যে যুগপ্রলয় হাহাকার জাতীয় বিপ্লব হ'ল একটা নব অবতরণ বা আবির্ভাবের পূর্বাভাস। এ কি সত্যি?"

"যাঁরাই নেপথ্যতত্ত্বের খবর রাখেন তাঁরা সবাই বলেছেন একথা একবাক্যে —যুগে যুগে।"

"তাঁদের নজির থাক্। আমি জানতে চাই আপনার নিজের মত—বা অভিজ্ঞতার এজাহার—যাই বলুন।"

(এর পর গুরুদেব আমাকে দুটি পত্রে এসম্বন্ধে লিখেছিলেন: "দুর্দিন যতই

শোচনীয় হোক না কেন—সে সাময়িক। যাঁরাই আত্মিক শক্তি বা বিশ্বশক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু খবর রাখেন তাঁরাই এ-দুর্দিনের জন্যে প্রস্তুত আছেন। আমি নিজে জানতাম যে, দুর্দিনের এই দারুণতম লগ্ন আসন্ন—প্রত্যূষের আগে অন্ধকার। কাজেই আমি নিরুৎসাহ হইনি। আমি যে জানি অন্ধকারের অন্তরালে কী নববিধান গ'ড়ে উঠছে—আর দেখতে পাচ্ছি তার আবির্ভাবের সূচনা। যারা ভাগবত সাধক তাদের চাই এখন দৃঢ়ভাবে সাধনপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে লক্ষ্যসিদ্ধির দিকে এগুনো, অতঃপর অন্ধকার লুপ্ত হবে—আলো হবে আবির্ভূত।" (৯-৪-৪৭) আর একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন: "আজকের দিনে যা কিছু ঘটছে তাতে আমি নিরুৎসাহ হইনি কারণ আমি হাজারো বার উপলব্ধি করেছি যে, নীরন্ধ্র অন্ধকারের পরেই ভাগবত জয়সিদ্ধির আলোক তার পথ চেয়ে থাকে যে হ'তে পারে ভাগবত বাহন।")

গুরুদেব চুপ ক'রে রইলেন।

আমি শুধালাম: "আমার জিজ্ঞাস্য আপনি নিজে কোনো নিশ্চিত সাক্ষ্য পেয়েছেন কি না এ-ভবিষ্যদ্বাণীর স্বপক্ষে?"

তাঁর ওষ্ঠাধরে ফের হাসির রেশ ফুটে উঠল। তিনি আমার চোখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন, পরে শুধু বললেন: 'পেয়েছি"।

"তাহ'লে সত্যিই ভরসা দিচ্ছেন যে, আপনার অতিমানস ঠাকুর উদয় হবেন মানুষের দেশে—বেচারি মানুষের জন্যে?"

তাঁর হাসি আর একটু প্রকট হ'য়ে উঠল, বললেন: "দিচ্ছি। কেবল তুমি তাঁদের সঙ্গে দেখা হ'লে বোলো যে এ নিয়ে তাঁরা বেশি মাথা না ঘামিয়ে আমাকেই ছেড়ে দেন এ-ভার।"

"বলব? কাকে?"

গুরুদেব হেসে উঠলেন: "যে-মানুষদের কথা বলছিলে—অর্থাৎ যাঁরা অতিমানস বলতে বোঝেন তাঁদের মনগড়া একটা কিছু। এঁরা খুবই নিরাশ হবেন যদি সে অতিমানসের অবতরণ হ'লে তাঁরা দেখেন যে তাঁদের কল্পিত রূপের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ রূপের বিশেষ মিল নেই।"

আমিও হাসলাম: "কিন্তু এরকম সাধক আছেন নাকি?"

"নেই? বলো কি? তুমি কি নিজেই আসোনি এমন অনেকের সংস্পর্শে যাঁরা চেয়েছেন অতিমানসকে টেনে নামাতে যাতে ক'রে তাঁরা নিজেরাই হ'তে

পারেন এ-জগতের অগ্রণী অতিমানব? আর দেখোনি কি সে-চেষ্টার সঙিন পরিণাম?" গুরুদেব ফের হেসে উঠলেন:

"এঁরা আপাতত অতিমানসকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তাঁদের নিজের নিজের পরিবেশে নিজের নিজের যেটুকু করণীয় আছে সেটুকু যদি সাধন করতেন —অতিমানসের ভার আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার কাজ ব'লে!"

হাসি থামলে গম্ভীর হ'য়ে আমি বললাম: "আচ্ছা আসুরিক শক্তিদের পরাজয়ই কি অতিমানস অবতরণকে আবাহন করবে?"

"আসুরিক শক্তিদের পরাজয় হ'লেই যে অতিমানস শক্তি আসবে এভাবে বললে একটু ভুল বলা হবে। ঠিক বলা হবে যদি বলা যায় যে, এদের পরাজয় হ'লে এমন একটা আবহ বা পরিবেশ গ'ড়ে উঠবে যার ফলে অতিমানসের অবতরণ সম্ভবপর হবে।"

এত শান্ত অথচ দৃঢ় স্বর! অথচ কতবড় অভ্যুদয়ের বাণী! কবি নিশিকান্তের স্তব মনে পড়ল তাঁর সম্বন্ধে:

তুমি ছাড়া আর কাহারো কণ্ঠে ধ্বনিয়া ওঠে না অভয় উক্তি।
তুমি ছাড়া আর কেহ তো আনে না তৃষিতের প্রাণে প্লাবনমুক্তি॥

হৃদয়ের তলে আনন্দ উঠল কল্লোলিত হ'য়ে। তবু—কেন জানি না—সাধ জাগল একটা প্রশ্ন করতে সাম্‌নাসাম্‌নি। বললাম: "আপনি বলেছিলেন খানিক আগে আপনার মূল সাধনার সিদ্ধির কথা। এ-মূল সাধনা বলতে কী বুঝব? আপনার তপস্যায় অতিমানস শক্তির অবতরণ?"

গুরুদেব অত্যন্ত শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন:

"হ্যাঁ। আমার আসা সেই জন্যেই।"

এহেন যুগপ্রবর্তকের কথায় আমি সংশয় প্রকাশ করেছি, তাঁর বাণী সম্ভব কি না প্রশ্ন করেছি, তাঁর সঙ্গে গল্পালাপ তর্কাতর্কি করেছি এই অধিকারে যে আমাকে তিনি সম্বোধন করেছিলেন তাঁর চিঠিতে "a friend and a son" ব'লে!

গীতায় অর্জুনের অনুতাপ মনে পড়ল কৃষ্ণ সম্বন্ধে:

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥

যচ্ছাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত ত্বৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

সখা ভ্রমে সখা কৃষ্ণ বলি' ডাকি'
আহারে বিহারে এক শয়নে,
একাসনে হাসি-প্রগল্ভতা যত
করেছি প্রণয়ে তোমার সনে,
একান্তে কি সভামাঝে ভুলে তব
মানের হানি যে করেছি হায়,
না জানি' তোমার মহিমা অপার-
ক্ষমিও সে-অপরাধ কৃপায়।

Dilip,

This hostile force that has seized hold of you and wants to take you away does not want to give time for reflection, for resistance, for the saving power to be felt and act. Its other signs are doubt, tamasic depression, and exaggerated sense of unfitness, the idea that the Divine is remote, does not care for one, etc.···If you reject entirely the falsehood that this force casts upon the sadhaka, if you remain faithful to the Light that called you here, you conquer, and even if serious difficulties still remain, the final victory is sure and the Divine triumph of the soul over the Ignorance and the Darkness···I do not wish to disguise from you the difficulty of this great and tremendous change or the possibility that you may have a long and hard work before you : but are you really unwilling to face it and take your share in the great work ? Will you reject the greatness of this endeavour to follow a mad irrational impulse towards some more exciting work of the hour or the moment—political work—for which you have no true call in any part of your nature ?

Hitherto your soul has expressed itself through the mind and its ideals and admirations or through the vital and its higher joys (poetry, music, etc.) and aspirations : but that is not sufficient to conquer the physical difficulty and enlighten Matter. It is your soul itself, your psychic being that must come in front and make the fundamental change. The psychic being will not need the support of intellectual ideas or outer signs and helps. It is that alone that can give you the direct feeling of the Divine, the constant nearness, the inner support and aid. You will not then feel Him remote or have any further doubt about realisation : for the mind thinks and the vital craves, but the soul feels and knows the Divine ...The one need for you and for all is to be, even in the darkness of the powers of obscurity of the physical consciousness,

stubbornly faithful to your soul and to the remembrance of the Divine Call. Be faithful and you will conquer.

30-3-1930 Sri Aurobindo

Dilip,

When I spoke of being "faithful" to the light of the soul and the Divine Call, I was not referring to anything in the past or to any lapse on your part. I was simply affirming the great need, in all crises and attacks, to refuse to listen to any suggestions, impulses, lures and to oppose to them all the call of the Truth, the imperative beckoning of the Light. In all doubt and depression to say : "I belong to the Divine, I cannot fail" ; to all suggestions of impurity and unfitness, to reply : "I am a child of Immortality, I have but to be true to myself and then—the victory is sure : even if I fell, I would rise again" ; to impulses to depart and serve some other ideal, to reply : "This is the greatest, this is the Truth, this alone can satisfy the soul within me ; I will endure through all tests and tribulations to the very end of the divine journey." This is what I mean by faithfulness to the Light and the Call.

31-3-1930 Sri Aurobindo

Dilip,

I cannot say that I follow very well the logic of your doubts. How does a noble and selfless friend suffering in prison-hospital invalidate the hope of yoga ? There are many dismal spectacles in the world, but that is after all the very reason why yoga has to be done. If the world were all happy and beautiful and ideal, who would want to change it or find it necessary to bring down a higher consciousness into the earthly Mind and Matter ? Your other argument is that the work of the yoga itself is not easy—not a happy canter to the goal. Of course it isn't, because the world and human nature are what they are. I never said it was easy or that there were not obstinate difficulties in the way of the endeavour.

Again I do not understand your point about raising up a new race by my going on writing trivial letters ten hours a day. Of course not—nor by writing important letters either ; even if I were to spend my time writing fine poems it would not build up a new race. Each activity is important in its own place : an electron or a molecule or a grain may be small things in themselves, but in their place they are indispensable to the building up of a world ; it cannot be made up only of mountains and sunsets and streamings of the aurora borealis—though these have their place there. All depends on the force behind these things and the purpose in their action—and that is known to the Cosmic Spirit which is at work ; and It works, I may add, not by the mind or according to human standards but by a greater consciousness which, starting from an electron, can build up a world and, using a tangle of ganglia, can make them the base here for the works of the Mind and Spirit in Matter, produce a Ramakrishna, a Napoleon, a Shakespeare. Is the life of a great poet, either, made up only of magnificent and important things ? How many trivial things had to be dealt with and done before there could be produced a King Lear or a Hamlet ?

Again, according to your own reasoning, would not people be justified in mocking at your pother—so they would call it, I do not—about metre and scansion and how many ways a syllable can be read ? Why, they might say, is Dilip Roy wasting his time in trivial prosaic things like this while he might have been spending it in producing a beautiful lyric or fine music ? But the worker knows and respects the material with which he must work and he knows why he is busy with "trifles" and small details and what is their place in the fulness of his labour.

Sri Aurobindo

Dilip,

Aspiration and will to change are not so very far from each other, and if one has either, it is usually enough for going

through,—provided of course it maintains itself. The opposition in certain parts of the being exists in every sadhaka and can be very obstinate. Sincerity comes by having first the constant central aspiration or will, next, the honesty to see and avow the refusal in parts of the being, finally, the intention of seeing it through even there, however difficult it may be. You have admitted that certain things changed in you, so that you can no longer pretend that you have made no progress at all.

The peculiarity you note—of self-contradiction in yourself—is universal—it is one part of the being which believes and speaks the right and beautiful things ; it is another which doubts and says the opposite. I get communications for instance from X in which for several pages he says wise and perfect things about the sadhana—suddenly, without transition, he drops into his physical mind and peevishly and complainingly says, well, things ignorant and quite incompatible with all that wisdom. X is not insincere when he does that—he is simply giving voice to two parts of his nature. Nobody can understand himself or human nature if he does not percieve the multi-personality of the human being ; to get all parts into harmony, that is difficult thing.

As for the lack of response, well, can't you see that you are in the ancient tradition ? Read the lives of the saints—you will find them all (perhaps not all, but at least so many) shouting like you that there was no response, and getting into frightful tumults and agonies and desperations until the response came. Many people here who can't say that they haven't had experiences do just the same—so it does not depend on experiences. I don't advise the procedure to anybody, mind you. I only say that the feeling of your never having had a very concrete response does not mean that you will never have and that fits of despair at having arrived nowhere do not mean that one will never arrive......

Sri Aurobindo

Dilip,

The light which you saw seems to have got clouded by your indulging your vital more and more in the bitter pastime of sadness. That was quite natural, for that is the result sadness always does bring. This is the reason why I object to the gospel of sorrow and to any sadhana which makes sorrow one of its main planks (*abhimâna*, revolt, *viraha*, etc.). For sorrow is not, as Spinoza pointed out, a passage to a greater perfection, a way to *siddhi* , it cannot be, for it confuses and weakens and distracts the mind, depresses the vital force, darkens the spirit. A relapse from joy and vital elasticity and ananda to sorrow, self-distrust, despondency and weakness is a recoil from a greater to a lesser consciousness......out of which it is the very aim of yoga to rise.

Take the psychic attitude ; follow the straight sunlit path, with the Divine openly or secretly upbearing you,– if secretly, he will show himself in good time—do not insist on the hard, hampered, roundabout and difficult journey.

5-5-1932 Sri Aurobindo

Dilip,

To me the ultimate value of a man is not to be measured by what he says, nor even by what he does, but by what he becomes.

Human beings are less deliberate and responsible for their acts than the moralists, novelists and dramatists make them and I look rather to see what forces drove them than what the man himself may have seemed by inference to have intended or purposed. Our inferences are often wrong and even when they are right touch only the surface of the matter.

As for the question whether Heaven wants Man, the answer is that if Heaven did not want him he would not want Heaven. It is from Heaven that the longing and aspiration for Immortality have come, and it is the godhead within him that carries it as a seed.

Sri Aurodindo

Dilip,

There is nothing unintelligible either in what I say about strength and Grace. Strength has a value for spiritual realisation, but to say that it can be done by strength only and by no other means is a violent exaggeration. Grace is not an invention, it is a fact of spiritual experience. Many who would be considered as mere nothings by the wise and strong have attained by Grace. Illiterate, without mental power or training, without strength of character and will, they have yet aspired and suddenly or rapidly grown into spiritual realisation, because they had faith or because they were sincere. Strength, if it is spiritual, is a power of spiritual realisation; a greater power is sincerity; the greatest power of all is Grace. I have said times without number that if a man is sincere, he will go through in spite of long delay and overwhelming difficulties. I have repeatedly spoken of the Divine Grace. I have referred any number of times to the line of the Gita:

"*aham twâm sarvapapebhyo mokshayishyâmi mâ shuchah.*"

—"I will deliver thee from all sin and evil—do not grieve."

Sri Aurobindo

Dilip,

There is a development which takes place through crises and one cannot always escape them; but it seems to me a wasteful process, and not one I would recommend to anyone. It comes like that because some vital part in you opens to a Force that wants it like that—even though your own mind does not want it. If it had been your own difficulty it would have been solved long ago, but by surrendering to the depression you make yourself a sort of representative of the World-Vital or that part of it which is dissatisfied with life and attached to it seeking from Yoga a spiritual release and yet revolting against it, finally crying out in bitter *vairâgya* against both the Divine and world-existence.

There is no reason at all why you should fail in this Yoga. Defeat is not truly in your nature, success and victory are in

your nature. But you must get rid of this habit of indulging depression, of making yourself the mouthpiece for the painful feelings and defeatist reasonings of this sorrowful and dangerous World-Vital. You must give a real chance to the capacity within you to come out as it did in poetry in spite of the first outward incapacity and failures. It has shown itself whenever you got an experience and it has only to gather strength to push down the screen for good. But it can't be done by the method of seeking a mournful solitude.

Attacks and crises come and they go, but the Goal and the Ideal remains—for that is Eternal.

10-9-1932 Sri Aurobindo

Dilip,

The passage you have quoted is my considered estimate of Ramakrishna :

"Nor would a successive practice of each of them in turn be easy in the short span of our human life and with our limited energies, to say nothing of waste of the labour implied in so cumbrous a process. Sometimes, indeed, Hathayoga and Rajayoga are thus successively practised. And in a recent unique example, in the life of Ramkrishna Paramhansa, we see a colossal spiritual capacity first driving straight to the Divine realisation, taking, as it were, the kingdom of heaven by violence and then seizing upon one yogic method after another and extracting the substance out of it with an incredible rapidity, always to return to the heart of the whole matter, the realisation and possession of God by the power of love, by the extension of inborn spirituality into various experience and by the spontaneous play of an intuitive knowledge"... ...(*Synthesis of Yoga*).

It is a misunderstanding to suppose that I am against Bhakti or against emotional Bhakti—which comes to the same thing, since without emotion there can be no Bhakti. It is rather the fact that in my writings on Yoga *I have given Bhakti the highest place.* All that I have said at any time which could account

for this misunderstanding was against an *unpurified* emotionalism which according to my experience, leads to want of balance, agitated and disharmonious expression or even contrary reactions and, at its extreme, nervous disorder. But the insistence on purification does not mean that I condemn true feeling and emotion any more than the insistence on a purified mind or will means that I condemn thought and will. On the contrary the deeper the emotion, the more intense the Bhakti, the greater is the force for realisation and transformation. It is oftenest through intensity of emotion that the psychic being awakes and there is an opening of the inner doors in the Divine.

3-2-1932 Sri Aurobindo

Dilip,

No, there is no obligation of gloom, harshness, austerity or lonely grandeur in this Yoga. If I am living in my room, it is not out of passion for solitude, and it would be ridiculous to put forward this purely external circumstance as if it were the obligatory sign of a high advance in the Yoga or solitude the aim. So you need not be anxious ; solitude is not demanded of you, for an ascetic dryness or isolated loneliness cannot be your spiritual destiny since it is not consonant with your *swabhâva* which is made for joy, largeness, expansion, a comprehensive movement of the life-force. —And, as for stern gravity and the majesty of a speechless and smileless face, your transformation into that would be terrifying to think of ! I may remind you that we always recommended to you a sunlit and cheerful progress as the best ; if we were inclined to complain of anything in you—which we are not, knowing that one does not choose one's difficulties—it would not be that you have too much gaiety but that you are not always as gay and cheerful as we would like you to be ! The storm, cloud, difficulty, suffering come, but they are no part of the Yogic ideal ; they belong to the Nature that is now, not to the divine Nature that is to be.

1932 Sri Aurobindo

Dilip,

You quote from Lowes Dickinson where he says : "Surely, if one didn't approach the question with an irrational basis towards optimism, one would never imagine that there is such a thing as progress in anything that matters. Or, are even we here impressed by such silly and irrelevant facts as telephones and motor-cars ?......If we are to look for progress at all we must look for it, I suppose, in men. And I have never seen any evidence that men are generally better than they used to be : on the contrary, I think there is evidence that they are worse."

Were not his later views greyed over by the sickly cast of a disappointed idealism ? I have not myself an exaggerated respect for Humanity and what it is—but to say that there has been no progress *at all* is as much an exaggerated pessimism as the rapturous hallelujahs of the nineteenth century to a Progressive Humanity were an exaggerated optimism ...... After all the best way to make Humanity progress is to move on oneself : this may sound either individualistic or egoistic if you will, but it isn't. It is only common sense. As the Gita says : "*Yadyadâcharati shreshthah tattatevetaro janah*" ("whatever the best of men do is taken as the model by the rest.")

There are always unregenerate parts tugging people backwards and who is not divided ? But it is best to put one's trust in the soul, the spark of the Divine within and foster that till it rises into a sufficient flame.

Sri Aurobindo

Dilip,

It is only when one lives centrally in the psychic, with the mental, vital and physical held under its rule that one knows what psychic intensity is. It is only when the higher consciousness comes down in its floods that one can know what can be the intensities or ecstasies of spiritual peace, light, love, bliss.

Is it that the body does not accept the sex thoughts and

desires ? If so you are entitled to reject it as something external to you or at most existing only in the subconscient. For it is only what something in us accepts—supports—takes pleasure in—or still mechanically responds to—that can still be called ours. If there is nothing of that, it belongs to take general Nature but not to us. Of course it returns and tries to take possession of its lost territory, but that is a foreign invasion. The rule of these things is that they have to be extruded outside the individual consciousness. Rejected by the mind and higher vital, they still try to hold on to the lower vital and physical - rejected from the lower vital, they still hold the body as a physical desire—rejected from the body, they retire into the environmental consciousness (sometimes the subconscient also, rising in dreams)—I mean by the environmental a sort of surrounding atmosphere which we carry about with us and by which we communicate with the universal forces and try to draw from there. Rejected from there, they become in the end too weak to be more than external suggestions—till that too ends - and they are finished and non-existent.

You need not think that anything can alter our attitude towards you. That which is extended to you is not a vital human love which can be altered by external things : it remains and persistently we shall try to help and lift you up and lead you towards the Light where in the union of soul and heart you will recognise the Friend and the Mother.

Sri Aurobindo

Dilip,

As for the two natures, it is only one form of the perpetual duality in human nature from which nobody escapes, so universal that many systems recognise it as a standing feature to be taken account of in their discipline : the two Personæ—one bright, one dark in every human being. If that were not there, yoga would be an easy walk-over and there would be no struggle. But its presence is not any reason for thinking that there is unfitness : the worldly element is always obstinate in its very

nature. It is like the Germans in their trenches, falling back and digging themselves in for a new mass attack every time they are baffled. But for all that, if the bright Personæ is equally determined not to be satisfied without the crown of light, if it is strong enough to make the being unable to rest content in lesser things, then it is the sign that the being is called, one of the elect, in spite of outward appearances and 's own doubts and despairs (who has them not ?—even a Christ or a Buddha is not without them) and that the inner spirit will surely win in the end.

31-10-1933 Sri Aurobindo

Dilip,

Keep through all the aspiration which you express so beautifully in your poems. For it is certainly there and comes out from the depths, and if it is the cause of suffering—as great aspirations are in a world and nature where there is so much to oppose them—it is also the promise and surety of emergence and victory in the future......

Sri Aurobindo

Dilip,

I was overjoyed to read your letter first because it relieved me from the anxiety which your persistent trouble has given, and most because the clarity of consciousness which has liberated you. Yes, that was the main difficulty—that clinging to wrong ideas. You should never doubt about the reality and sincerity of our feeling towards you, for that creates a veil and separates where there should be no separation. As for your new poem the bhakta poet in you has always been thoroughly sincere—there is no cloud of the vital ego there.

My point about my sadhana was that my sadhana was not done for myself but for the earth-consciousness as a showing of the way towards the Light—so that whatever I showed in it to be possible (inner growth, transformation, manifesting of new faculties, etc.) was not of no importance to anybody, but

meant as opening of lines and ways for what had to be done. The question of degree or greatness does not come in at all.

1933 Sri Aurobindo

Dilip,

I have always told you that you ought not to stop your poetry and similar activities. It is a mistake to do so out of asceticism or tapasya. One can stop these things when they drop of themselves because one is full of experience and so interested in one's inner life that one has no energy to spare for the rest. Even then, there is no rule for giving up, for there is no reason why poetry, etc., should not be part of sadhana. The love of applause, of fame, of ego-feeling has to be given up, but that can be done without giving up the activity itself.

What you write is perfectly true, that all human greatness and fame and achievement is nothing before the greatness of the Infinite and the Eternal. There are two possible deductions from that : first that all human action has to be renounced and one should go into a cave ; the other is that one should grow out of ego so that the activities of the nature may become one day consciously an action of the Infinite and the Eternal. I myself never gave up poetry or other creative human activities out of tapasya—they fell into a subordinate position because the inner life became stronger and stronger slowly—nor did I really drop them, only I had so heavy a work laid upon me that I could not find time to go on. But it took me years and years to get the ego out of them or the vital absorption, but I never heard anybody say nor did it ever occur to me that that was a proof that I was not born for yoga. You say I had made the mistake of my life in pronouncing you to be a "born yogi" ? I had *not*. I very explicitly based my remark on the personality that showed itself in your earlier experiences in a very vivid way which no one accustomed to the things of the yoga or having any knowledge about them could fail to recognise. But I did not mean that there was nothing in you

which was foreign to a "born yogi". Everyone has many personalities in him and many of them are not yogic at all in their propensities. But if one has the will to yoga, the "born yogi" prevails as soon as he gets a chance of manifesting himself through the crust of the mind and vital nature. Only, very often that takes time. One must be prepared to give, the time.

Sri Aurobindo

Dilip,

The essence of surrender is to accept whole-heartedly the influence and the guidance when the joy and peace come down, to accept them without question or cavil and let them grow ; when the Force is felt at work, to let it work without opposition, when the knowledge is given, to receive and follow it, when the Will is revealed, to make oneself its instrument.

The Divine can lead, he does not drive. There is an internal freedom permitted to every mental being called *man* to assent or not to assent to the Divine leading : how else can any real spiritual evolution be done ?

If I constantly encourage you, it is because I have faith in your capacities and see the nobler Dilip behind all outward weakness.

13-5-1933 Sri Aurobindo

Dilip,

......Another thing : It seems to me that you identify faith very much with the mental belief, but real faith is something spiritual, knowledge of the soul. The assertions you quote in your letter are the hard assertions of a mental belief leading to a great vehement assertion of one's mental creed and goal because they are one's own and must therefore be greater than those of others – an attitude which is universal in human nature. Even the atheist is not tolerant but declares his credo of Nature and Matter as the only truth, and on all who disbelieve

it or believe in other things he pours scorn as unenlightened morons and superstition shalf-wits. I bear him no grudge for thinking me that, but note that this attitude is not confined to religious faith but is equally natural to those who are free from religious faith and do not believe in Gods or Gurus. You will not, I hope, mind my putting the other side of the question : I want to point out that there is the other side.

1934 Sri Aurobindo

Dilip,

I ask you to have faith in the Divine, in the Divine Grace, in the truth of the sadhana, in the eventual triumph of the spiritual over its mental and vital and physical difficulties, in the Path and the Guru, in the existence of things other than are written in the philosophy of Haeckel or Huxley or Bertrand Russel, because if these things are not true, there is no meaning in the Yoga. As for particular facts and asseverations about Bejoy Goswami or anybody else, there is room for discrimination, for suspension of judgment, for disbelief where there is good ground' for disbelief, for right interpretation where the facts are not to be denied or questioned. But all that cannot be for the sadhaka as it is for the materialistic sceptic founded on a fixed prejudgment that what is only normal, in consonance with the known (so-called) laws of physical nature is true and that all which is abnormal or supernormal must *a priori* be condemned as false. The abnormal abounds in this physical world, the supernormal is there also. In these matters, apart from any question of faith, any truly rational man with a free mind (not tied up like the rationalists or so-called free-thinkers at every point with the triple cords of *a priori* irrational disbelief) must not cry out at once "Humbug ! Falsehood !"- but suspend judgment until he has the necessary experience and knowledge. To deny in ignorance is no better than to affirm in ignorance. If your method has saved you from quack gurus, that shows that everything in this world has its uses, doubt and denial also, but it does

not prove that doubt and denial are the best way of discovering the Truth. One can apply here the epigram of Tagore about the man who shut and locked up all the doors and windows of his house so as to exclude Error—but, cried Truth, by what way then shall I enter ?

The faith in spiritual things that is asked of the sadhaka is not an ignorant but a luminous faith, a faith in light and not in darkness. It is called blind by the sceptical intellect because it refuses to be guided by outer appearances or seeming facts,—for it looks for the truth behind,—and because it does not walk on the crutches of proof and evidence. It is an intuition —an intuition not only waiting for experience to justify, but leading towards experience. If I believe in self-healing, I shall after a time find out the way to heal myself—if I have faith in transformation, I can end by laying my hand on and unravelling the whole process of transformation. But if I begin with doubt and go on with more doubt, how far am I likely to go on the journey ?

However, this is only a retort, not my reply for which I have no time to-night My reply will come lengthier and later.

25-8-1934 Sri Aurobindo

Dilip,

I was never ardent about fame even in my political days. I don't believe in advertisement except for books and in propaganda except for politics and patent medicine. But for serious work it is a poison. It means either a stunt or a boom —and stunts and booms exhaust the things they carry on their crests and leave them lifeless and broken high and dry on the shores of nowhere—or it means a movement, which in the case of a work like mine means the founding of a school or a sect or some other nonsense. It means that hundreds or thousands of useless people join in and corrupt the work or reduce it to a pompous farce from which the truth that was coming down recedes into secrecy and silence. It is what has happened to

the "religious" and is the reason of their failure. If I tolerate a little writing about myself, it is only to have a sufficient counter-weight in that amorphous chaos, the public mind, to balance the hostility that is always aroused by the presence of a new dynamic Truth in this world of ignorance. But the utility ends there and too much advertisement would defeat that object. I am perfectly "rational", I assure you, in my methods and I do not proceed merely on any personal dislike of fame. If and so far as publicity serves the Truth, I am quite ready to tolerate it; but I do not find publicity for its own sake desirable.

2-10-1934 Sri Aurobindo

Dilip,

What I want of you besides aspiring for faith? Well, just a little thoroughness and persistence in the method! Don't aspire for two days and then sink into the dumps, evolving a gospel of eathquake and Schopenhaur plus the ass and all the rest of it. Give the Divine a full sporting chance. When he lights something in you or is preparing a light, don't come in with a wet blanket of despondency and throw it on the poor flame.

...To put it more soberly—accept once for all that this thing has to be done, that it is the only thing left for yourself or the earth. Outside are earthquakes and Hitlers and a collapsing civilisation and, generally speaking, the ass and the flood. All the more reason to tend towards the one thing to be done, the thing you have been sent to aid in getting done. It is difficult and the way long and the encouragement given meagre? What then? Why should you expect so great a thing to be easy or that there must be either a swift success or none? The difficulties have to be faced and the more cheerfully they are faced, the sooner they will be overcome. The one thing to do is to keep the *mantra* of success, the determination of victory, the fixed resolve "*Have it I must and have it I will.*" Impossible? There is no such thing as an impossibility—there are difficulties and things of *longue haleine*, but no impossibles. What one is

determined fixedly to do will get done now or later—it becomes possible. Drive out dark despair and go bravely on with your poetry, your novels—and your yoga. As the darkness disappears the inner doors too will open.

27-1-1934 Sri Aurobindo

Dilip,

Let us first put aside the quite foreign consideration of what we would do if the union with the Divine brought eternal joylessness, *nirânanda* or torture. Such a thing does not exist and to drag it in only clouds the issue. The Divine is Anandamaya and one can seek him for the Ananda he gives; but he has also in him many other things and one may seek him for any of them, for peace, for liberation, for knowledge, for power, for anything else to which one may take a fancy. It is quite possible for someone to say: "Let me have Power from the Divine and do His Work or do His Will and I am satisfied, even if the use of Power entails suffering also." It is possible to shun bliss as a thing too tremendous or ecstatic and ask only or rather for peace, for liberation, for Nirvana. You speak of self-fulfilment,—one may regard the Supreme not as the Divine but as one's highest Self; but one need not envisage it as a self of bliss, ecstasy, Ananda—one may envisage it as a self of freedom, vastness, knowledge, tranquillity, strength, calm, perfection—perhaps too calm for a ripple of anything so disturbing as joy to enter. So even if it is for something to be gained that one approaches the Divine, it is not a fact that one can approach him or seek union only for the sake of Ananda and nothing else.

That involves something which throws all your reasoning out of gear. For there are aspects of the Divine Nature, powers of it, states of his being,—but the Divine Himself is something absolute, not existing by them, but they existing only because of Him. It follows that if he attracts by his aspects, all the more he can attract by his very absolute selfness which is sweeter, mightier, profounder than any aspect. His peace,

rapture, light, freedom, beauty are marvellous and ineffable, because he is himself magically, mysteriously, transcendentally marvellous and ineffable. He can then be sought after for his wonderful and ineffable self and not only for the sake of one aspect or another of his. The only thing needed is, first, to arrive at a point when the psychic being feels this pull of the Divine in himself and, secondly, to arrive at the point when the mind, vital and each thing else began to feel, too, that that was what it was wanting and the surface hunt after Ananda or whatever else was only an excuse for drawing the nature towards that supreme magnet.

Your argument that, because we know the union with the Divine will bring Ananda, therefore it must be for the Ananda we seek the union, is not true and has no force. One who loves a queen may know that if she returns his love it will bring him power, position, riches and yet it need not be for the power, position, riches that he seeks her love. He may love her for herself and could love her equally if she were not a queen ; he may have no hope of any return whatever and yet love her, adore her, live for her, die for her simply because she is she. That has happened and men have loved women without any hope of enjoyment or result, loved steadily, passionately after age has come and beauty has gone. Patriots do not love their country only when she is rich, powerful, great, and has much to give them ; love for country has been most ardent, passionate, absolute when the country was poor, degraded, miserable having nothing to give but loss, wounds, torture, imprisonment, death as the wages of her service ; yet even knowing that they would never see her free, man have lived, served and died for her own sake, not for what she could give. Men have loved Truth for her own sake and for what they could seek or find of her, accepted poverty, persecution, death itself ; they have been content even to seek for her always, not finding, and yet never given up the search. That means what ? That man, country, Truth and other things besides can be loved for their own sake and not for anything else, not for any circumstance or attendant quality or resulting enjoyment, but for something

absolute that is either in them or behind their appearance and circumstance. The Divine is more than a man or woman, a stretch of land or creed, opinion, discovery, or principle. He is the Person beyond all persons, the Home and Country of all souls, the Truth of which truths are only imperfect figures. *And can He* not then be loved and sought for his own sake, as and more than these have been by men even in their lesser selves and nature?

What your reasoning ignores is that which is absolute or tends towards the absolute in man and his seeking as well as in the Divine—something not to be explained by mental reasoning or vital motive. A motive, but a motive of the soul, not of vital desires; a reason not of the mind, but of the self and spirit. An asking too, but the asking that is the soul's inherent aspiration, not a vital longing. That is what comes up when there is the sheer self-giving, when "I seek you for this, I seek you for that" changes to a sheer "I seek you for you". It is that marvellous and ineffable absolute in the Divine that Krishnaprem means when he says, "Not knowledge nor this nor that, but Krishna". The pull of that is indeed a categorical imperative, the self in us drawn to the Divine, because of the imperative call of the greater Self, the soul ineffably drawn towards the object of its adoration, because it cannot be otherwise, because it is it and He is He. That is all about it.

I have written all that only to explain what we mean, ourselves and Krishnaprem and other spiritual seekers, when we speak of seeking the Divine for himself and not for anything else—so far as it is explicable. Explicable or not, it is one of the most dominant facts of spiritual experience. The will to self-giving is only an expression of this fact.

29-10-1935 Sri Aurobindo

P.S.

Don't misunderstand me—I am not saying that there is to be no Ananda. Why, the self-giving itself is a profound Ananda

and what it brings, carries in its wake an inexpressible Ananda —and it is brought by this method sooner than by any other, so that one can say almost : "A selfless self-giving is the best policy." Only one does not do it out of policy. Ananda is the result, but it is not for the result, but for the self-giving itself and for the Divine himself—a subtle distinction, it may seem to the mind, but very real.

Dilip,

There is only one logic in spiritual things : that when a demand is there for the Divine, a sincere call, it is bound one day to have its fulfilment. In your case it is likely to come through the heart, through increase of bhakti or psychic purification of the heart : that is why I was pressing the psychic way upon you.

Do not allow these wrong ideas and feelings to govern you or your state of depression to dictate your decisions : try to keep a firm central will for the realisation—you can do so if you make up your mind to it—these things are not impossible for you : they are within the scope of your nature which is strong. You will find that the obstinate spiritual difficulty disappears in the end like a mirage. It belongs to the physical self and, where the inner call is sincere, cannot hold even the outer consciousness always : its apparent solidity will dissolve.

You are no doubt right about asking for the bhakti, for I suppose it is the master-claim of your nature : *for that matter, it is the strongest motive force that sadhana can have and the best means for all else that has to come.* It is why I said that it is through the heart that spiritual experience must come to you.

21-5-36 Sri Aurobindo

Dilip,

People contact *ânanda* in you even when you feel extremely gloomy ? The solution of the enigma is that the being and nature are made up of different parts and personalities. There is a being in you which is a bhakta and in potency a yogi—it is the one that has joined to him the poet and the musician and

singer and expresses himself through them, they form now a harmonious group almost a composite person. There is another part or being in you which was drawn towards the world, society, success, fame, etc.,—a spoilt child of Fortune and Nature—(but still vitally strong, generous, full of enthusiasm, amiable, affectionate) which was dragged to the yoga rather than came to it willingly, but it came because the others insisted and did not allow it to have the *rasa* of the outside life and besides promised it something that would be the divine equivalent or compensation of these vital pleasures : a spiritual vital love, ananda, enjoyment of the Divine. This part has less attraction for the old things or none, but it wants badly the thing promised and has no taste for *tapasya* and the long effort of *sadhana*. Thirdly, there was yet another who had many defects of egoism, vanity, hypersensitiveness, etc., which made a tremendous row against changing. A large part of this has been modifying itself—(it is perhaps what Somanath meant when he spoke to Mother of the miraculous change in your character)—but it is the combination of No. 2 and No. 3 which has made the difficulty all along, because they were mixed up together, otherwise No. 2 would not have been difficult to manage. The despair, defeatism, fretfulness, gloom, angry impatience etc., which No. 3 brought into the affair was the chief cause of your despondencies, other wise No. 2 might have been eager and impatient but not in this way. In combination with No. 1 there might have been yearnings, pangs of *viraha*, etc., but not the crises. There is not the slightest doubt that your nature was made for ananda and that all the other beings except the last one are naturally themselves full of it. That is what people feel when you meet them and they contact your natural self "the radiant Dilip" through your songs, poems, music. The rest from which you suffer so much is, as I have repeatedly told you, a formation, a sort of accretion, a recurring artificial crisis imposed on you from outside and accepted by No. 3, not normal or native to the healthy soundness of your nature···The oversensitiveness which makes you suffer by the smallest things

in the contact with others is the present obstacle : it has to be changed into a sensibilty which will be the means of the deep and sensitive realisation of the Divine. All parts of nature have a spiritual use once the change can be brought about. I hope the trouble will now pass and you'll be able to get back the poise. These things are only dust-storms on the way and one must try to pass quickly through. To see them for what they are and not to dwell on the thought of them is best. Shake away the dust and go forward.

Professor Buddhadeva Bhattacharya's warm praise of your poems in "Suryamukhi" is very welcome. (B. wrote, however, that nowadays the Bengal intelligentsia hold that yogic spiritual poetry etc., are "achal", these being not poetry proper.—Dilip). But what a change in India ! Once religious or spiritual poetry held the first place—Tukaram, Mirabai, Tulsidas, Surdas, Kabir, Tyagaraj, the Tamil mystic poets and a number of other —and now spiritual poetry is not poetry, altogether "achal" !! But luckily things are "sachal" in this world and this *movability* may bring back an older and sounder feeling.

Sri Aurobindo

Dilip,

First of all, faith does not depend upon experience, it is something that is there before experience. When one starts the Yoga, it is not usually on the strength of experience, but on the strength of faith. And it is so not only in Yoga and the spiritual life, but in ordinary life also. All men of action, discoverers, inventors, creators of knowledge proceed by faith and, until the proof is made or the thing done, they go on in spite of disappointment, failure, disproof, denial, because of something in them that tells them that this is the truth, the thing that must be followed and done ; Sri Ramakrishna even went so far as to say, when asked whether blind faith was not wrong, that blind faith was the only kind to have ; for faith is either blind or it is not faith but something else—reasoned experience, proved conviction or ascertained knowledge.

Faith is the soul's witness to something not yet manifested or not yet realised, but which yet the Knower within us, even in the absence of all indications, feels to be true or supremely worth following or achieving. This thing within us can last even when there is no fixed belief in the mind, even when the vital struggles and revolts and refuses. Who is there that practises the Yoga and has not his periods, long periods of disappointment and failure and disbelief and darkness—but there is something that sustains him and goes on in spite of himself, because it feels that what it followed after was yet true and it more than feels, it knows. The fundamental faith in Yoga is this, inherent in the soul, that the Divine exists and the Divine is the one thing to be followed after—nothing else in life is worth having in comparison with that.

Sri Aurobindo

Dilip,

But why allow *anything* to come in the way between you and the Divine, and idea, and incident ? When you are in full aspiration and joy, let nothing count, nothing be of any importance except the Divine and your aspiration. If one wants the Divine quickly, absolutely, entirely, that must be the spirit of approach, absolute, all-engrossing, making that the one point with which nothing else must interfere.

What value have mental ideas about the Divine, ideas about what he should be, how he should act, how he should not act—they can only come in the way. Only the Divine himself matters. When your consciousness embreces the Divine, then you can know what the Divine is, not before. Krishna is Krishna, one does not care what he did or did not do : only to see Him, meet Him, feel the Light, the Presence, the Love and Ananda is what matters. So it is always for the spiritual aspiration—it is the Law of the spiritual life.

8-5-1934 Sri Aurobindo

Guru,

Last night I was reading the book "World Predictions" by the world-famous astrologer Cheiro, published in 1925. He did make some astonishing prophecies. To quote only one, as I am sending up the book to you so that you may read the others : he writes anent King George VI :

"In his case it is remarkable that the regal sign of Jupiter increases as the years advance." And then of the Prince of Wales : "His astrological chart shows perplexing and baffling influences that most unquestionable point to changes that are likely to take place greatly affecting the throne of England...... he will fall a victim to a devastating love affair. If he does, I predict that the Prince will give up everything, even the chance of being crowned, rather than lose the object of his affection." (!!!)

But if it was all preordained, Guru, then it is evident that Shakespeare was wrong when he said :

> "Our fault, dear Brutus, lies not in our stars
> But in ourselves that we are underlings."

And right when he said :

> "Life's but a walking shadow, a poor player
> That struts and frets his hour upon the stage
> And then is heard no more : it is a tale
> Told by an idiot, full of sound and fury,
> Signifying nothing."

For I, for one, feel myself to be utterly an underling to have to think, say, that it had been sidereally decided that Dilip would read a book at midnight on the fifteenth of December in the year of Grace, 1936, and would on the morrow write to his Guru of his deep dejection whereupon the latter would write off a convincing reply the next day couched in words of wisdom. And then tell me, did these stars know what Your Wisdom is going to write tomorrow ?

16-12-1936 Dilip

Dilip,

Your extracts taken by themselves are very impressive, but when one reads the book, the impression made diminishes and fades away. You have quoted Cheiro's successes, but what about his failures ? I have looked at the book and was rather staggered by the number of prophecies that have failed to come off. You can't deduce from a small number of predictions, however accurate, that all is predestined down to your putting the questions in the letter and my answer. It may be, but the evidence is not sufficient to prove it. What is evident is that there is an element of the predictable, predictable accurately and in detail as well as in large points, in the course of events. But that was already known ; it leaves the question still unsolved whether all is predictable, whether destiny is the sole factor in existence or there are other factors also that can modify destiny,—or, destiny being given, there are not different sources or powers or planes of destiny and we can modify the one with which we started by calling in another destiny source, power or plane and making it active in our life. Metaphysical questions are not so simple that they can be trenchantly solved either in one sense or in another contradictory to it—that is the popular way of settling things but it is quite summary and inconclusive. All is free-will or else all is destiny—it is not so simple as that. This question of free-will or determination is the most knotty of all metaphysical questions and nobody has been able to solve it—for a good reason, that both destiny and will exist and even a free-will exists somewhere—the difficulty is only how to get at it and make it effective.

Astrology ? Many astrological predictions come true, quite a mass of them, if one takes all together. But it does not follow that the stars rule our destiny ; the stars may merely record a destiny that has been already formed ; they are then a hieroglyph, not a Force,—or if their action constitutes a force, it is a transmitting energy, not an originating Power. Some one is there who has determined or something is there which is Fate, let us say ; the stars are only indications The

astrologers themselves say that there are two forces *daiva* and *purushakâra*, fate and individual energy, and the individual energy can modify and even frustrate. Moreover the stars often indicate several fate possibilities : for example that one may die in mid age, but that if that determination can be overcome, one can live to a predictable old age. Finally, cases are seen in which the predictions of the horoscope fulfil themselves with great accuracy up to a certain age, then apply no more. This often happens when the subject turns away from the ordinary to the spiritual life. If the turn is very radical the cessation of predictability may be immediate ; otherwise certain results may still last on for a time, but there is no longer the same inevitability. This would seem to show that there is or can be a higher power or higher plane or higher source of spiritual destiny which can, if its hour has come, over-ride the lower-power, lower-plane or lower-source of vital and material fate of which the stars are indicators. I say vital because character can also be indicated from the horoscope and much more completely and satisfactorily than the events of the life.

The Indian explanation of fate is Karma. We ourselves are our own fate through our actions, but the fate created by us binds us ; for what we have sown, we must reap in this life or another. Still we are creating our fate for the future even while undergoing old fate from the past in the present. That gives a meaning to our will and action and does not, as European critics wrongly believe, constitute a rigid and sterilising fatalism. But again, our will and action can often annul or modify even the past Karma, it is only certain strong effects, called *utkat karma*, that are non-modifiable Here too the achievement of the spiritual consciousness and life is supposed to annul or give the power to annul Karma. For we enter into union with the Will Divine cosmic or transcendent, which can annul what it had sanctioned for certain conditions, new-create what it had created, the narrow fixed lines disappear, there is a more plastic freedom and wideness. Neither Karma nor Astrology therefore point to a rigid and for ever immutable fate.

As for prophecy, I have never met or known of a prophet, however reputed, who was infallible. Some of their predictions came true to the letter ; others do not, they half fulfil or misfire entirely. It does not follow that the power of prophecy is unreal or that the accurate predictions can be all explained by pro-probability, chance, coincidence. The nature and number of these that cannot is too great. The variability of fulfilment may be explained either by an imperfect power in the prophet some times active, sometimes failing or by the fact that things are predictable in part only, they are determined in part only or else by different factors or lines of power, different series of potentials and actuals. So long as one is in touch with one line, one predicts accurately, otherwise not—or if the line of power changes one's prophecy also goes off the rails. All the same, one may say, there must be, if things are predictable at all, some power or plane through which or on which all is foreseeable ; if there is a divine Omniscience and Omnipotence it must be so. Even then what is foreseen has to be worked out, actually is worked out by a play of forces,—spiritual, mental, vital and physical forces and in that plane of forces there is no absolute rigidity discoverable. Personal will or endeavour is one of those forces, Napoleon when asked why he believed in fate, yet was always planning and acting, answered "because it is fated that I should work and plan", in other words, his planning and acting were part of Fate, contributed to the results she had in view. *Even if I foresee an adverse result, I must work for the one I consider should be; for it keeps alive the force, the principle of Truth which I serve and gives it a possibility to triumph hereafter becomes part of the working of the future favourable Fate, even if the fate of the hour is adverse.* Men do not abandon a cause, because they have seen it fail or foresee its failure ; and they are spiritually right in their stubborn perseverance. *Moreover, we do not live for outward result alone ; far more the object of the growth of the soul, not outward success of the hour or even of the near future. The soul can grow against or even by a material destiny that is adverse.*

Finally, even if all is determined, why say that Life is, in

Shakespeare's phrase or rather Macbeth's "a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing"? Life would rather be that if it were all chance and random incertitude. But if it is something foreseen, planned in every detail, does it not rather mean that life does signify something, that there must be a secret purpose that is being worked up to, powerfully, persistently through the ages and ourselves are a part of it and fellow-workers in the fulfilment of that invincible Purpose.

17-12-1936 Sri Aurobindo

P.S.—Well, one of the greatest ecstasies possible is to feel oneself carried by the Divine, not by the stars or Karma, for the latter is a bad business, dry and uncomfortable—like being turned on a machine—*yantrârudhâni mâyaya*

18-12-36 Sri Aurobindo